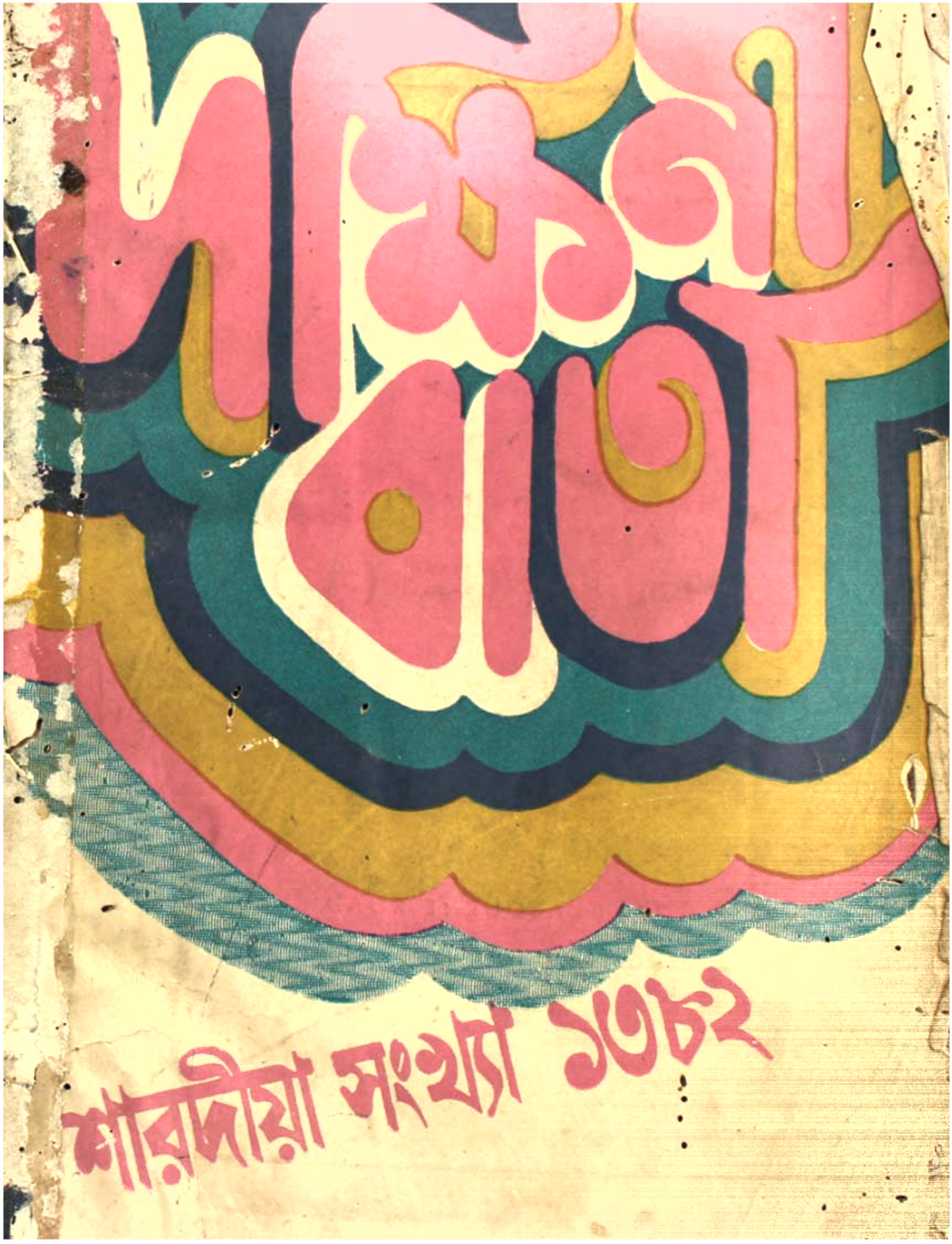
শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮২

With best compliments of

... Libr.
DAYS from

Date ...
Issu...

INDIAN PAPER MACHINERY & ENGINEERING WORKS (Pvt.) LTD.

20, BRABOURNE ROAD,

CALCUTTA-700001

Phone : 22-6472

you'll feel the difference when you stay with us

The Park is Calcutta's best located luxury hotel. Situated on fashionable Park Street, we welcome you to a happy experience.

Walk into the personalised atmosphere of the Reception and feel at home with the beautifully decorated modern interiors of the hotel which spell efficiency and service.

The Park offers exclusive facilities like centrally airconditioned guestrooms with individual climate control, international telephone and telex systems, parking space for over 200 cars, mechanised same day laundry service, private baths, piped music and 24-hour room service.

The hotel also has a valet service and a travel counter to look after the needs of guests, arranging tours, air and rail bookings, and, cinema and theatre tickets. Foreign currencies can be easily exchanged by guests at the cash counter.

Step into SUJATA theatre restaurant where the food is as exotic as the cabarets.

The Park boasts of having the swinging IN & OUT discotheque club.

Quench your thirst in the cool comfort of the 007 BAR. Relax and while away your leisure hours over coffee and snacks in the friendly informality of the 24 hour coffee shop CAPPUCINO.

Spacious BANQUETROOMS and CONFERENCE HALLS accommodating 12 to 1000 people with a wide range of audio-visual aids are there to cater to the different needs of CONFERENCES, CONVENTIONS, BANQUETS, COCKTAILS, and MARRIAGES.

For wizards of high finance The Park offers the posh and private atmosphere of the VIP ROOM.

For lovers of fanciful fashions, for him or for her, there is a mere boutique HIS FOR HERS.

THE PARK

CALCUTTA'S BEST LOCATED LUXURY HOTEL
17 PARK STREET CALCUTTA 16
TELEPHONE : 24-8301

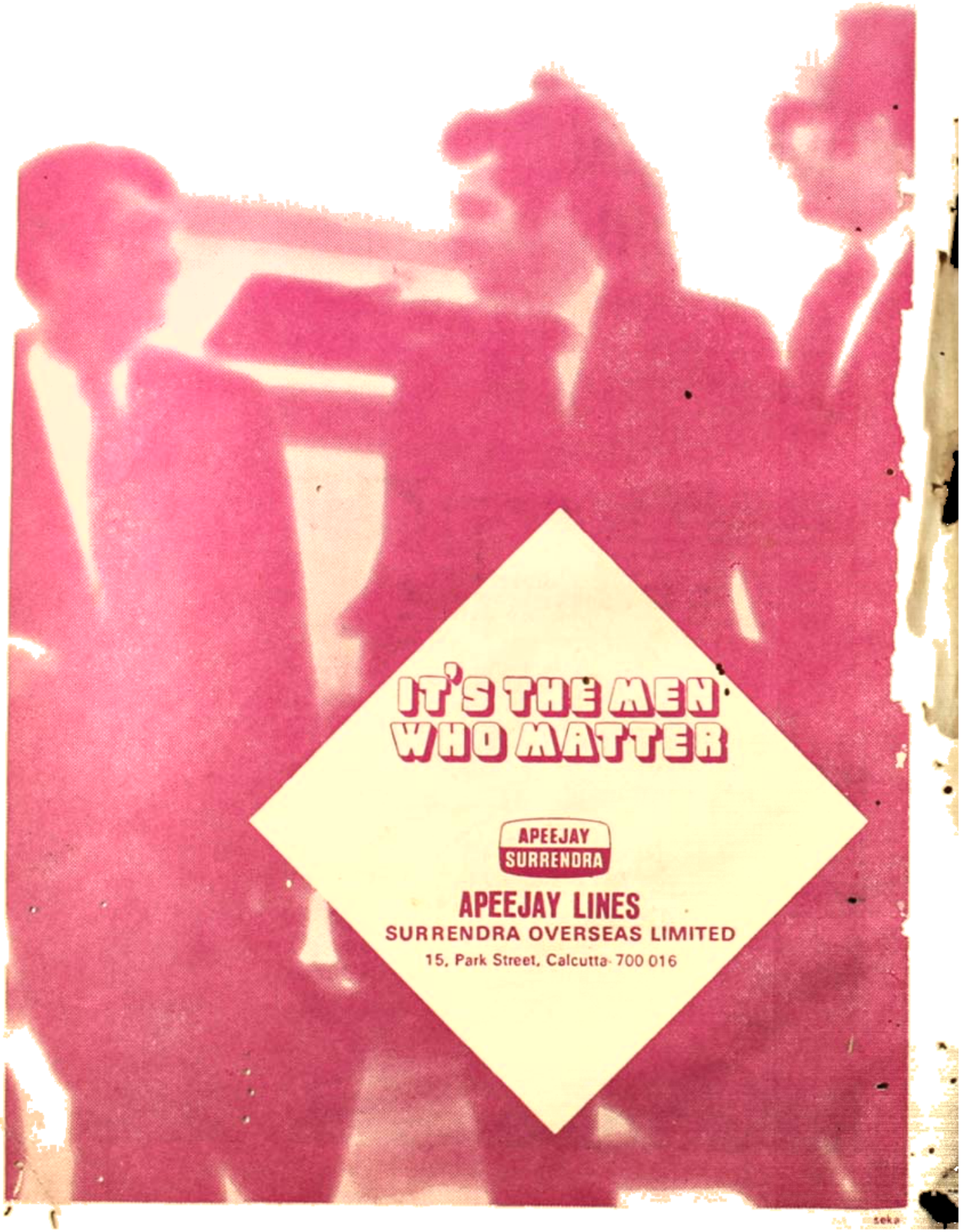
IT'S THE MEN
WHO MATTER
APEEJAY
SURRENDRA
APEEJAY LINES
SURRENDRA OVERSEAS LIMITED
15, Park Street, Calcutta-700 016

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন

শরৎচন্দ্র-বিষয়ক রচনা

গল্পকথক শরৎচন্দ্র ॥ বনফুল ১
শরৎচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত ভাষণ ॥ গোপালচন্দ্র রায় ১১
শরৎচন্দ্র ও উনিশ শতক ॥ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
শিল্পীরূপী শরৎচন্দ্র ॥ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
পণ্ডিচেরি-প্রসঙ্গে-শরৎচন্দ্র ২১
শরৎচন্দ্র ॥ মঞ্চে ও পর্দায়

প্রবন্ধ

শরতের কথা ও গান ॥ সত্যেন্দ্রকুমার বসু ১৬১
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ॥ শান্তিদেব ঘোষ ১৭৫
সংগীত সম্পর্কে ॥ অনুবাদ ॥ কমলকুমার মজুমদার

চারটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

উত্তর মেরুর ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ৪৩
টেক ওভার ॥ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ১৮১
যে নতর্কী ইতিহাসের ॥ শ্রীপান্থ ২২৫
কুলবেড়ের কড়চা ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২৮১

বিশেষ নিবন্ধ

কেবলি স্বপন কেরছি বপন ॥ অমলশংকর রায় ৪১
সাম্প্রতিক ইতিহাস ॥ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৫৩
হে বঙ্গের নবীন যুবক ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ২২১

রসরচনা

পেঁয়াজ থেকে পয়জার ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ৬৫
হরমোহন ও ক্ষীরমোহন ॥ শ্রীবিরূপাক্ষ ১৯৯
ভোজ ॥ মনোজ বসু ১৭৭

রহস্যাকল্প

কালো ঘোড়ার সওয়ার ॥ অষ্টাদশ বর্ধন ৬৯
সেকোনল ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ১১৭
কামনার বাঁশি ॥ বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ১৪১

গল্প

জীবিকা ॥ সমরেশ বসু ৩৫
নারীমেধ যজ্ঞ ॥ প্রতিভা বসু ৮১
বিষ ॥ বিমল কর ৮৫
হরিপদ ভরসা ॥ বিমল মিত্র ২৫৭
ধ্বংস নিমাই ভট্টাচার্য ৩১৩
কে ছেলেটি ॥ নীললোহিত ৩১৭

বড় গল্প

মণিমোহনের স্বপ্নভঙ্গ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৭৩
ঘর-সংসার ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২৫
ওরা সুখে থাক ॥ প্রফুল্ল রায় ২৪৯
দুপুরের দিকে ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৩২৯

খেলাধুলা

যদি এমন হতো ॥ চিরঞ্জীব ১৫৭
জীবনের প্রয়োজনেই খেলার প্রয়োজন ॥ মতি নন্দী ১৬৩
প্রমীলা ফুটবল ॥ অজয় বসু ১৬৫

চলচ্চিত্র-বিষয়ক প্রবন্ধ

দুটি প্রশ্ন, কিছু উত্তর, একটি অনুরোধ ॥ তরুণ মজুমদার ১৭১
বাংলা ছবির মুখ ও মুখোশ ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী ২৬৫
ফিল্ম শুধুই ফিলম ॥ সেবাব্রত গুপ্ত ২৭৩
যুবমানসে চলচ্চিত্র ॥ উত্তমকুমার ২৭৭

কবিতা/২৩-২৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় . দিনেশ দাস
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মণীন্দ্র রায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তিব্রত চৌধুরী মুকুল দত্ত (গীতিকার)
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

সাক্ষাৎকার/৩৩৫

মহেন্দ্র গুপ্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কানন দেবী
ভহর রায় কাবেরী বসু অপর্ণা সেন ছায়া দেবী
সুহাসিনী মুলে শান্তি গোপাল অরুণ দাশগুপ্ত
শংকর ব্যানার্জি গৌতম সরকার তপতী মণ্ডল

প্রচ্ছদ : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
অলংকরণ : শ্যামল সেন

সম্পাদক : প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী
দিলীপ ব্যানার্জি কর্তৃক ৩৪ বি, কে, পি, রায় লেন, কলিকাতা-৩৩ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীগণেশচন্দ্র দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ নং অক্রুর দত্ত লেন কলিকাতা-৭০০০১২ হইতে মুদ্রিত। ফোন: ৪১-০০০১।
সহ-সম্পাদক : মিহির কিরণ ভট্টাচার্য

294872

তুমি ছিলে বলেই তোমার কলমের আঘাতে
আমরা পেয়েছি লজ্জা, চোখ খুলেছে আমাদের
সমাজকে জানতে। আমরা তোমার
আকাঙ্ক্ষার সমাজকেই গড়ব।

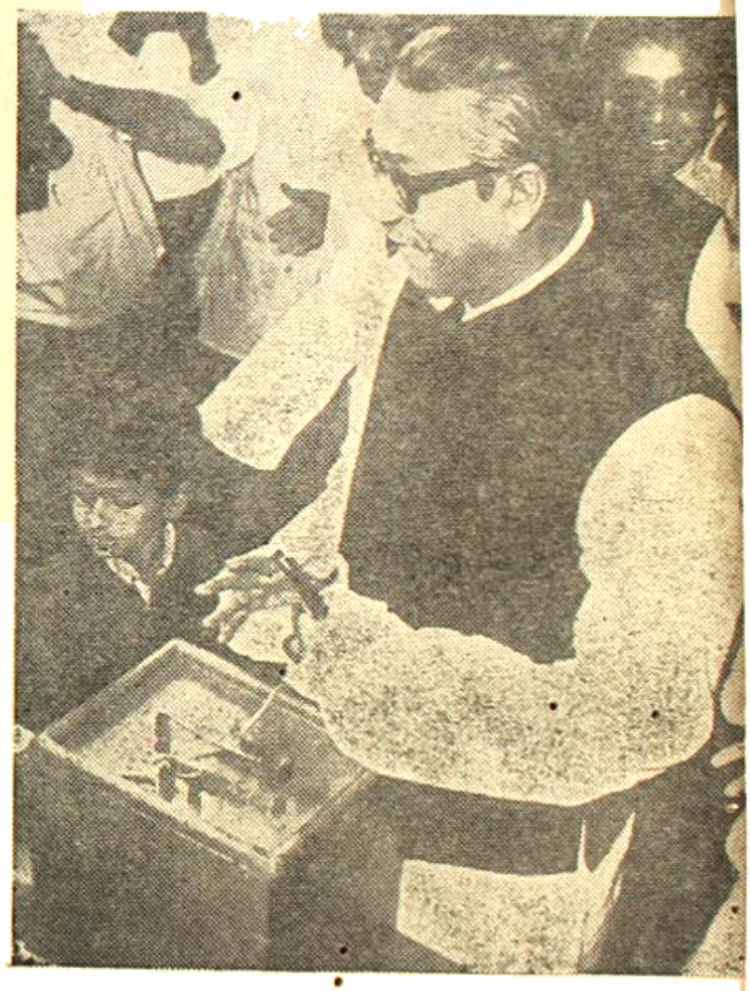

কে বলেছে তুমি নেই, তুমি আছ ততদিন
পদ্মা আছে যতদিন। তুমি আছ
বাঙ্গালীর বাঙলার
ঘরে ঘরে, হৃদয় মন্দিরে।

বন্যাদুর্গত

ত্রাণ তহবিলে

মুক্ত হস্তে

সাহায্য

করুন ।

দক্ষিণী বার্তার সৌজন্যে

[এই চিঠিটি শরৎচন্দ্রের বাল্যে শিবপুরের প্রতিবেশী এবং তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীরও নিকটবর্তী দেউল গ্রামের অধিবাসী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা। অমরবাবু বাল্যকাল থেকেই শরৎচন্দ্রের পরম স্নেহাস্পদ ছিলেন। ইনি বর্তমানে হাওড়ায় নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়ে হাওড়া শহরেই রামকৃষ্ণপুরে বাস করছেন।

এই চিঠি এবং চিঠির পরিচিতি গোপালচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। —সম্পাদক]

প্রধান মন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস লেবার সেলের সৌজন্যে

সম্পাদকের নিবেদন

অবশেষে আপনাদের হাতে দক্ষিণী বার্তার শারদীয় সংখ্যা তুলে দেওয়া সম্ভব হল। এবার ভাবতেই পারিনি ঠিক সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদনা শেষ করে আপনাদের বিচারের জন্য শারদ সাহিত্যের এই ছোট্ট জমির দলিলটি পেশ করতে পারব। রাজনীতির ঝড়, ইমারজেন্সী, বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু, আর বাগদেবীর সম্মেলনে আমার উপস্থিতি সব মিলিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম যে 'দক্ষিণী বার্তা'র শারদ বাসরের ফুলশয্যার মালার দায়িত্ব পালনে ভীষণ বিঘ্ন হচ্ছিল। সাহিত্যের মর্যাদা ও কৌলীন্য রক্ষা করে পাঠকদের সঙ্গে সাহিত্যিক ও কবির মিলনের যে ঘটকালি করা তা আজকালকার "ঘরোয়া-বারবধূ-চরস স্নাকস্ আর লম্বাচুলের" প্লাবনে ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ সেখানে পাচনের মধ্যে প্রচুর দিশী গুড় ঢেলে তার মিষ্টত্ব ও নেশা দুই-ই তৈরী করা হচ্ছে। ফলে পাচন যেমন তার গুণ হারাচ্ছে তেমনি তা খাঁটি সরবৎ হতেও পারছে না। অথচ এই ককটেলের আস্বাদে ট্রিংকাসের মাস মাইনের প্রথম সপ্তাহের ডিনার টেবল থেকে বারুইপুরের বাগানবাড়ীর বাথরুমে টয়লেট পেপার ব্যবহার করা হিন্দুস্থানী প্রগ্রেসিভ মধ্যবিত্ত মেজরিটি বিভোর ও বিহ্বল। এদের সাপোর্ট পাব না জেনেও রিস্ক নিতে হয় কাগজকে। যাদের জন্য রিস্ক নেই তাদেরও পড়বার সময় কম। তারা কাজের ফাঁকি দিয়ে পত্রিকা পড়ার রিস্ক নেয় না। তার পরে তাতে যখন তাড়ির স্বাদ নেই। কিন্তু এরই মধ্যে একদল আছে যারা কনুই পর্যন্ত জল ঢেলে আহ্নিক করে আর প্রাতঃকালে পিতৃপ্রণাম করে। এই সব হাফ গেরস্ত কনসার্ভেটিভ মিডলক্লাসের ভাইনে বাঁয়ে ভালমন্দ যারা আছে তাদের অনেকেই "দক্ষিণী বার্তায়" বারতা শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাদের জন্য কিছু দায়িত্ব পালন করতে হলেও আমাকে নিষ্ঠাবান হতে হয়। কিন্তু স্বীকার করছি নিষ্ঠার ত্রুটি ঘটেছে।

রাজনীতির সোনালী সকাল আর ভীষণ অন্ধকারের রাতগুলো যখন ইমারজেন্সীর প্রভাবে আর শেষ রাতের ধানমন্ডির মুজিবের কথা মনে করিয়ে দেয় তখন হাসি ও কান্নার দোলনে কলমের গতিও রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন আমার মত অনেকেরই 'অবশ-বিবশ-মানস' মূল পথ থেকে কিছুক্ষণের জন্য ঠিকানা হারিয়ে ছিটকে পড়ে। খুঁজেপেতে হাতড়ে পথ বের করে আবার যখন পথ চলতে শুরু করি তখন সোনালি সকাল পেরিয়ে রক্তিম সূর্যাস্ত এসেছে অথবা ভয়ঙ্কর ধানমন্ডির রাত বিষন্ন টুলিপাড়ার অপরাহ্নে আমাকে এনে দিয়েছে। তবুও এই বার্তার শঙ্খ নিয়ে যে যে দরবারে আমার ভাই, বন্ধু, সহযোগী, সাথী প্রীতিভাজন মিহির গেছে সেখানেই সব নামী ও দামী লেখক, খ্যাতিমান শিল্পী কলাকুশলী, খেলোয়াড় সাংবাদিক সবাই বরণ করে নিয়েছেন আমাদের শঙ্খকে। এবার শাঁখ বাজাবে যারা তাদের কণ্ঠ আছে, ধ্বনি আছে কিন্তু শাঁখের শুভ্র সৌন্দর্য দেখবার দৃষ্টি তাদের নেই। ওরা অন্ধ, ওরা দৃষ্টিহীন। ওরা শঙ্খ দেখতে চায় না কিন্তু বাজাতে চায়, সবুজকে দেখতে পাবে না কিন্তু সবুজ হতে চায়। ওই যারা হাজারে হাজারে দৃষ্টি প্রদীপের শলতে নিবিয়ে তেলের অভাবে বসে একা মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, স্কুলে কলেজে, ময়দানে, ওদের সবাইকে না পারি করেকজনের জন্যও যদি প্রসাদ পৌঁছে দিতে পারি তাহলেও ত বলবে ওরা যে মন্দিরে দেবতা আছে, মসজিদে খোদা আছে, গীর্জায় ঈশ্বর আছে তাই বাঁচারও সার্থকতা আছে।

আমরা তাই এবারের বই বিক্রয়ের ও অনুষ্ঠানের সব টাকাটাই ওদের জন্য আমার আপনার লেখকদের পাঠকদের, মুদ্রক ও সহযোগীদের তরফে শুভেচ্ছার একটা ছোট্ট দূর্বাঘাস আর কয়েকটা ধান হিসেবে পাঠিয়ে দিতে চাই সরকারী তহবিলে। যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। তারাও এই যজ্ঞের সমান অংশীদার, "দক্ষিণী বার্তা" প্রযোজক মাত্র।

নেতাজীর আদর্শেই আমাদের কাগজের গতি ও ছন্দ। মানবসেবার কথাও বলেছেন তিনি বারবার বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যের মত। আমরা তাঁর বিরাট আশ্রমের সামান্য কয়েকজন সেবক। অনুসরণ করে তৃপ্ত থাকতে চাই। অন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই।

দুঃখ এই যে এবারের শারদ অর্ঘ্যের ডালি সাজাতে আর একটি ফুলের আসবার কথা ছিল। পদ্মার ওপারের সেই বজ্রকণ্ঠ দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধুর লেখা পাব সব ঠিক ছিল। কিন্তু সে আর কলমে নেই মন্ত্র, নেই প্রুফ রীডারের রেজর্ভে। কিন্তু সে আছে আমার অন্তরে—আপনার ও সবার অন্তরে। যতদিন বাংলা ভাষা আছে ততদিন মুজিব আছে।

অপরাজেয় কথা সাহিত্যের সম্রাট শরৎচন্দ্রের শতবর্ষের দীপ জ্বলতে শুরু করেছে অঙ্গনে অঙ্গনে। শরতের শিউলি আর কাশবনের দোলায় শ্রীকান্তরা উন্মুখ, বোড়শী বিচলিত, রমেশরা অস্থির। তবুও 'পল্লীসমাজে'র বুকে সমারোহ নাকি আসবে এই প্রচণ্ড বিশ্বাস নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অছ্যুত শ্রেণীচ্যুত লোকেরা শরৎবাবুর লেখাতেই শ্রেণী যন্ত্রণার নির্মম ছবি, সামাজিক অত্যাচার আর গ্রামবাংলার জলচৌকিতে বাংলা মায়ের চোখের জলের ফোঁটা দেখেছি। একে ঘোচাতেই হবে, আনতেই হবে নূতন দিন এ অঙ্গীকার করছি। শরৎবাবুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেও কিছু লেখা আমরা প্রকাশ করেছি এই সংখ্যায়। শ্রীগোপাল রায়ের কাছ থেকে শরৎবাবুর লেখা অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য। এই সংখ্যা পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগবেই এমন জোর করে বিজ্ঞাপনী ভাষার দাবী রাখতে আমি অক্ষম তবে স্বাদ করে পরখ করে দেখলে রুচি নষ্ট হবে না এই ছোট্ট কবিরাজী প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

অনিবার্য কারণে শংকরের লেখা এবং খেলা-পাগল সুভাষের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা গেল না—এজন্য পাঠকদের কাছে আমরা দুঃখিত।

মা, তুমি এসো সুন্দর বেশে, তোমার ত্রিশূল মহিষাসুররূপিণী অন্যায়, দুর্নীতি, হিংসা আর লোভকে দমন করতে এগিয়ে যাক, অস্ত্র যদি ঘাতীত পড়ে আমাদের দেশ-প্রেমকে তুমি ভরসা করতে পারো মা—ত্রিশূলের মতই কাজ করবে। তোমাকে আনন্দে মর্তের মা-এর মত প্রাণ দেবার তুচ্ছ বাহাদুরি দেখাতে চাই না। ও তো তোমার দেওয়া—তোমারই হাতে নেওয়ার ভার। তোমাকে দেশভক্তি দিয়ে কাছে রাখতে চাই। 'তুমি কাছে থেকো আমাদের সবাকার ঘরে। তোমার তিনয়নে ধরা দিক আমাদের দারিদ্র্য, দৈন্য আর হতাশা। তুমি দেখবে চেয়ে সব। তারপর তুমি এগিয়ে এসো মা এই ক্ষুধা, দারিদ্র্যের বিনাশে। "তোমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"

গল্প-কথক শরৎচন্দ্র

বনফুল

শরৎচন্দ্র বাঙলা কথা সাহিত্য জগতে একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি দেশের মাটির ভিতর থেকে রস আহরণ করে আশ্চর্য সাহিত্য-সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের ভিতর আমাদের দোষ-গুণ আমাদের মহিমা কলঙ্ক, আমাদের সুখ দুঃখ অপরূপ রসোত্তীর্ণ দক্ষতায় তিনি মূর্ত করে গেছেন বাঙলা সাহিত্যে। সেইজন্য মনে হয় তিনি শুধু ঔপন্যাসিকই নন তিনি আমাদের আপন লোক। আমাদের দুঃখে তিনি অশ্রু ফেলেছেন, আমাদের গৌরবে উল্লসিত হয়েছেন।

এই নিবন্ধে আমি সুরসিক মানুষ শরৎ-চন্দ্রের একটি আলেখ্য আঁকব। এটি আমার ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা। শরৎচন্দ্রকে ওই একবারমাত্রই আমি দেখেছিলাম।

তখন আমি ভাগলপুরে থাকি। তারিখটা ঠিক মনে নেই। একদিন সকালে উঠে শুনলাম শরৎচন্দ্র তাঁর মামা সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে এসেছেন। আমার খুব ইচ্ছা হল তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার আগেই আলাপ ছিল, তাঁকে গিয়ে বললাম। তিনি বললেন, তুমি কাল সকালে এসো। সকালে গেলাম। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই গেলাম। আমার ভয়ের কারণ ছিল। আমি তখন 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখক। আর ঠিক সেই সময় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে শনিবারের চিঠি কাগজে নানা রকম বিদ্রূপাত্মক লেখা লিখছিলেন অনেকে, বিশেষ করে প্রমথনাথ বিশী। তাঁকে নিয়ে কার্টুনও বেরুচ্ছিল নানা রকম। আমি নিজে যদিও তাঁকে বিদ্রূপ করে কখনও কিছু লিখিনি, কিন্তু যারা লিখছিল তারা আমার বন্ধু, একই কাগজে লিখি। সুতরাং তাঁর কাছে যাবার সময় একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। মনে হল আমাকে দেখে উনি প্রসন্ন হবেন না—হয়তো রূঢ় কিছু বলবেন।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। সুরেনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি একজন লেখক। 'বনফুল' ছদ্মনামে লেখেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর গড়গড়ার নল পরিষ্কার কর-ছিলেন। কিছু বললেন না, নিবিষ্ট মনে তাই করতে লাগলেন। গায়ে ফতুয়া, পরণে লুঙ্গী, চু-ঘুগল ঈষৎ কুঞ্চিত, নির্বিকার। কয়েক মিনিট আমাকে যেন আমোলের মধ্যেই আনলেন না। নল পরিষ্কার করবার পর একটা ছিঁচকে নিয়ে গড়গড়াটাও পরিষ্কার করলেন।

তারপর বললেন—'আপনি লেখেন? কি লেখেন?

'কবিতা গল্প প্রবন্ধ সব রকমই লিখি।'

'কোন কাগজে লেখেন।'

'বেশী লিখি শনিবারের চিঠিতে।'

'ও'।

তারপর একটু থেমে বললেন—'কোথায় থাকেন আপনি?'

'ভাগলপুরেই থাকি। আমি ডাক্তার। এখানে আমার প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি আছে।'

'তাই না কি?'

বলেই আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—'আমার কাছে এসেছেন কেন?'

বললাম—'আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। শুনেছি আপনি ভালো গল্প বলতে পারেন। তা শোনবারও লোভ আছে।' ততক্ষণ গড়গড়া ঠিক হয়ে গিয়েছিল। একটি ছেলে ভিতর থেকে এসে এক কলকে তামাকও দিয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন—'আমি তো গল্প বানিয়ে বলি না। যা দেখি তাই বলি।'

তামাক খেতে লাগলেন। খানিকক্ষণ তামাক খেয়ে বললেন—মনে পড়েছে একটা গল্প। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। ঘটেছিল এই ভাগলপুরেই সিঁড়ি ঘাটে। আমি তখন এইখানেই থাকতুম। এ অনেক দিন আগেকার ঘটনা। একদিন সকালে শুনলাম সিঁড়ি ঘাটে একটি খুব নামজাদা সাধু এসেছেন নাকি। অনেক লোক তাঁর কাছে যাচ্ছে। কাশী থেকে এসেছেন শুনলাম। গেলাম একদিন দেখতে। দেখলাম তিনি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি। লম্বা চুল, মুখে গোঁফ দাড়ি, কপালে তিলক গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ডান হাতে প্রকাণ্ড একটা ত্রিশূল।

আমি যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন তিনি গঙ্গার ঘাটের শেষ সিঁড়িতে বসে কোশাকুশি ভাস্রকুণ্ড, জবাফুল, প্রভৃতি নিয়ে খুব সাড়ম্বরে পূজা করছিলেন সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। অনেক ভক্ত হাতজোড় করে বসেছিলেন সেখানে। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। আই. জি. এস. এন্ (I. G. S. N) কম্পানীর প্রকাণ্ড জাহাজটা ভোঁ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘাটের সামনে দিয়ে। গঙ্গার জলে বড় বড় ঢেউ উঠতে লাগল। সাধুর পূজোর কোশাকুশী ফুল বিল্বপত্র ভেসে গেল সব। শুনলাম আরও দু'তিনদিন নাকি এই ঘটনা ঘটেছে। সেদিন জাহাজ চলে যাওয়ার পর সাধু উঠে দাঁড়ালেন এবং রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন জাহাজটার দিকে। তারপর বললেন—কল উসকো খা ডালেগো। এর মানে, কাল ওটাকে খেয়ে ফেলব। সাংঘাতিক কথা! জাহাজকে খেয়ে ফেলবেন? বিদ্যুৎ বেগে সমস্ত শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। তার পরদিন সিঁড়ি ঘাটে লোকে লোকারণ্য। ঘাটের আশপাশে তো বটেই ঘাটের কাছে যে গাছগুলো ছিল সেগুলোর উপরেও লোক জমায়েৎ হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ জাহাজ খেয়ে ফেলছে এ দৃশ্য তো সচরাচর দেখা যায় না।

ক্রমশ দেখা গেল জাহাজ আসছে, ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল ঘাটের দিকে। তারপর খুব সুদীর্ঘ একটা ভোঁ শোনা গেল। মনে হল সেও সাধুকে যেন চ্যালেঞ্জ করছে।

আপনি রবি বর্মার বিখ্যাত ছবি গঙ্গাবতরণ দেখেছেন? তাতে মহাদেব কোমরে দুহাত দিয়ে মাথা তুলে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলাম সিঁড়ি ঘাটের সাধুটিও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক সেই রকম 'পোজ'। সকলের বুক দুর দুর করছে, কি হয়, কি হয়।

এমন সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড হল। সাধুর একজন ভক্ত আছড়ে পড়ল সাধুর পায়ে।

"ক্ষমা করিয়ে মহাত্মাজি—"

তারপর বিশুদ্ধ হিন্দীতে সে যা বলল তার মর্ম হচ্ছে—জাহাজ অপরাধ করেছে, তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু ওই জাহাজে যেসব যাত্রী আছে তারা তো কোনও অপরাধ করেনি। জাহাজটা যদি আপনি গিলে ফেলেন, ওদের কি গতি হবে? ওরা তো বাঁচবে না। কিন্তু ওরা তো নির্দোষ—

সাধু ভ্রূকুঞ্চিত করে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন জাহাজটার দিকে। তারপর বললেন—ঠিক হ্যায়। তুমহারা বাত মান লিয়া। ক্ষমা কর দিয়ে—

বেশ তোমার কথা মেনে নিলাম। ক্ষমা করলাম—

শরৎচন্দ্রের মুখে গল্পটি শুনেছিলাম আমি। গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে গল্পটি বলেছিলেন আমাকে।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এই ছবিটি মনে পড়ছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।

শরৎচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত ভাষণ

গোপালচন্দ্র রায়

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় (সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) দেখা যায়, শরৎচন্দ্রের একটি অভিভাষণ ছাপা হয়েছে। অভিভাষণটির নাম দেওয়া হয়েছে—'হাওড়া যুব সম্মেলনে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ।'

এই অভিভাষণটি এ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কোনও গ্রন্থভুক্ত ত হয়ইনি, এমন কি কোন শরৎ-গবেষকও এ অভিভাষণটির উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এটি এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থাতেই নবশক্তির পাতায় আবদ্ধ ছিল। নবশক্তি পত্রিকাও পাওয়া আজ অত্যন্ত দুর্লভ। এক জাতীয় গ্রন্থাগারেই যা কয়েকটি আছে দেখলাম। তাও সেখানে এই পত্রিকাকে মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি যখন ২৭শে সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন অনুমান করা যায়, এর কয়েকদিন আগেই হাওড়া যুব সম্মেলনের সভাটি হয়েছিল। সভা হয়েছিল যুব সম্ভব হাওড়ার টাউন হলে। ঐ সভায় শরৎচন্দ্র ছিলেন উদ্বোধক, আর সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। সভাপতি বিপিনবাবুর অভিভাষণটিও ঐ সংখ্যার নবশক্তিতে ছাপা হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোল-

লন সুরু হলে সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে গোড়াতেই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তখন হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে থাকতেন বলে, দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মাঝে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু তা হতে দেননি। বোধ করি খুব কম দেশনেতাই এত দীর্ঘকাল ধরে একটানা একটা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি থেকেছেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী হলেও, দেশের মুক্তির জন্য তখন যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও তাঁর সমানই যোগাযোগ ছিল। শুধু পরিচয় বা যোগাযোগই নয়—অর্থ, নিজের বন্দুক ও রিভলবারের টোটা ইত্যাদি দিয়েও এইসব বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই যোগাযোগের কথা নিয়ে কোন কংগ্রেসকর্মী তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলতেন—দেখ, সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনকে আমি হয়ত ঠিক সমর্থন করি না। কিন্তু তবুও কি জানি এই বিপ্লবীদের উপর আমার একটু সহানুভূতি আছে। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যে-পথেই কাজ করুক না কেন, আমি সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেইজন্যই আমি এঁদের খোঁজ-খবরও রাখি এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকি।

শরৎচন্দ্র যেমন বিপ্লবীদের, তেমনি ছাত্র বা যুবকদেরও রাজনৈতিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন। ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে তখন কংগ্রেস নেতাদের অনেকেরই নির্দেশ ছিল যে, ছাত্ররা স্বাধীনতা সংগ্রামে আসবে না। তারা তাদের যে কাজ সেই পড়াশুনা নিয়েই থাকবে।

শরৎচন্দ্র এ যুক্তি স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন যে, রাজনীতিটা কেবল বুড়োদেরই একচেটে নয়। আর তাছাড়া বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না। শরৎচন্দ্রের মত ছিল দেশ সেবায় হাতে খড়ি একেবারে ছেলেবেলা থেকে হওয়াই ভাল।

বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন। শরৎচন্দ্র নিজেই যুবকদের পক্ষ থেকে বলে তাঁকে ঐ হাওড়া যুব সম্মেলনের সভাপতি ঠিক করেছিলেন।

হাওড়ার ঐ যুব সম্মেলনে শরৎচন্দ্রের সেই অজ্ঞাত উদ্বোধনী অভিভাষণটি এবার এখানে উদ্ধৃত করছি—

এই সভার উদ্বোধনের ভার আমার উপর পড়েছে। আমি যৌবনকে অতিক্রম করে বার্ধক্যের প্রপর পারে এসে পৌঁছেছি। সুতরাং এই সমিতির কাজ করা আমাকে মানায় না। তবুও তার ভার নিয়েছি, তার কারণ, আমি যুবকদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। এই সভায় অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার ভার ডাক্তার সামন্তের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আপনাদের মর্যাদার কোন ত্রুটি না ঘটে তাঁর তো দেখতে হবে।

এ সভায় যিনি সভাপতি হয়েছেন, বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে না চেনা একটা মস্ত অপরাধ বলে মনে করি। পরাধীন মাতৃভূমির জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁর আদেশ ও উপদেশ শুনে আমরা কৃতার্থ হব।

আমার অভিভাষণে যাঁরা গুরুম কিছু শোনবার ব্যাকুল প্রত্যাশায় উন্মুক্ত হয়ে সভার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণ হবেন। কারণ, নিজের আবেগ দিয়ে নিষ্প্রয়োজনে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি চিরদিন পরাঙ্মুখ। আমি যখন পৃথিবীর অন্যান্য মানবের মত মানুষ

হয়েই জন্মগ্রহণ করেছি, তখন বিদেশীয় অধীনতা খুব তীক্ষ্ণ করেই বুকে বাজে।

একটা প্রশ্ন কানে আসে, যুব সমিতির উদ্দেশ্য যখন দেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসেরও লক্ষ্য যখন একই, তখন আলাদা করে আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার আবশ্যকতা কি? শক্তিকে খণ্ডিত করার তার অপব্যয় হয় না কি?

আমি কিছুদিন পূর্বেই সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটা ছাপানো নিবেদন প্রচার করি। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে একটা কথা ছিল যে, কংগ্রেসের ধরা বাঁধা, কাটা-ছাঁটা মুষ্টি ভিক্ষায় দেশে যৌবনশক্তির ক্ষুধা মেটে না বলেই এই যুব সমিতির উদ্ভব।

লক্ষ্য এক হলেই যে তাকে পাবার পথ এক হবে সংসারের এমন বিধান নয়। তাই এখানে ভারতীয় ঐকাসূত্র বহু বিভক্ত নয়। লাভ করার উপায় উদ্ভবের ক্ষেত্র হল বুদ্ধি ও বিচারশক্তি। এইখানেই অসংখ্য মতবাদের ও মতভেদের সৃষ্টি। উদ্দেশ্য এক হলেই একটা পথ দিয়ে সকলের চলবার সুবিধা হয় না।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে পরাধীনতার সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা যখন প্রাণে অনুভূত হল, তখন ভারতের কয়েক জনের চেষ্টায় ভারতে জাতীয় মহাসভার জন্ম। তখন সভার মূল নীতি ছিল—আবেদন নিবেদন। সেই নীতির পরিবর্তন আজও হয়নি। মূলস্রোত তেমনি প্রবহমান, কেবল বাহিরের নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা ভেবেছি, প্রবল ধ্বনিতে ইংরেজের ঘুম ভাঙাবে। তারা আমাদের হুমকিতে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু ইংরেজ যেমন ছিল, তেমনি আছে, কংগ্রেসেরও নীতির পরিবর্তন ঘটেনি। প্রধান কথা তাদের মোহ ঘোচেনি। নবীন ও প্রবীণের এইখানেই মতভেদ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'নিজেদের মূঢ়তার কাছে আমরা বন্দী।' বস্তুত এর চেয়ে বেশী আর কেউ আমাদিগকে বাঁধেনি।

আমরা ভয় করি কাকে? করি ত অনেককেই, কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভয় করি মানব জীবনের সত্য চিন্তাকে। মোহগ্রস্ত মন কিছুতেই ভাবতে চায় না যে কালের পরিবর্তনে একদিনের সত্য নিরূপণ আর একদিন মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। এই সত্য-বিমুখতা তাদের সকল দুর্গতির মূল- সমাজেও, তাই, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই।

অহিংসা দিয়ে যখন কাজ হল না, তখন যুদ্ধের অহিংসা চাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের পর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল, তখন চরকার প্রবর্তন, স্কুলকলেজ বয়কট প্রভৃতি আইটেম-এর সৃষ্টি হল। সমস্ত কলের তৈরি বস্ত্রও বয়কট করা উক্ত তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু একে একে সকলই নিষ্ফল হল। এখন বাকি আইন অমান্য। এই অস্ত্র এখন তূণে আবদ্ধ। আগামী বছর তার প্রয়োগ হবে। এতগুলো কৌশলের কোনটাই যে লাগল না, তার বেশীরভাগ অখ্যাতির ভার শিক্ষিত যুবকদের উপর পড়ল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাই, উহাতে কোন ত্রুটি আছে কিনা? ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। উহা অসত্য। একবার আরম্ভ করে দেখা গেছে তার গতি পিছনে যায়।

এই যুবসঙ্ঘ সত্য, একান্ত সত্য। প্রাচীনদের মুখেও ইহার সত্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন যে, চীন ও তুর্কীর ন্যায় স্বাধীনতা অর্জনের সত্যকার দায়িত্ব দেশের নবজাগ্রত যৌবনের উপর। অতএব তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। অনেকে বলে গঠনমূলক কার্য কর। এ কাজে যে কিছু না হয়, তা আমি বলি না। গঠনমূলক কাজের আমি বিরোধী নই। গঠনটা যে ঠিক কি এবং কোন উপায়ে সার্থক হতে পারে, এ কথাটা তোমাদের নির্ভীক সত্য চিন্তাধারার দ্বারা নতুন করে স্থির করে নিতে বলি।

এখন যুবকরা জিজ্ঞাসা করতে পারে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে করব কি? কি আমাদের প্রোগ্রাম? শক্তির উৎস কি? কোথায় এর সন্ধান পাওয়া যায়। তার উত্তরে বলব—সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা একটা বড় প্রোগ্রাম।

ভীড় করে একত্র জমা হওয়ার নাম সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া নয়। যেদিন প্রকৃত সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে, সেদিন তোমাদের শক্তির অবধি থাকবে না।

একটা বছরও যদি তোমরা একের হাতে সকলের সমবেত দায়িত্ব অর্পণ করে সুকঠোর শৃঙ্খলায় নিজেদের আবদ্ধ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পার, সেদিন পথ রোধ করতে পারে এমন কোন বাধাই তোমাদের চোখে পড়বে না। সেই অজেয় শক্তিকে তোমরা যার বিরুদ্ধে নিয়োগ করবে তার পরাভব হবেই হবে। এছাড়া ঐক্য সাধনার আর কোন পথই দেখতে পাই না।

তোমাদের সম্মুখে তিনটি নীতি বর্তমান—সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি। তোমাদের মধ্যে হউক রাজনীতি। অপর দুই নীতির জন্য অনেক লোক আছেন। তোমরা যুবক, রাজনীতিই তোমাদের বরণীয়।

যাহাই কেন না তোমরা কর এই সত্য কথাটা তোমাদের নিরন্তর মনে রাখতে হবে তোমরা যুবক। তাই তোমরা দরিদ্র। সাংসারিক নিয়মে টাকার যাঁরা মালিক, তাঁরা প্রবীণ, তাদের বয়স হয়েছে। সৎ পরামর্শ দেওয়া ছাড়া কোনদিন টাকা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করার সাহস তাঁদের থাকবে না। দৈন্যের ভিতর দিয়ে তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তোমাদের গভীর অন্ধকারেও সত্যের পথের সন্ধান দেবে।

আজও সপ্তাহ অতীত হয়নি, যতীনের মৃত দেহ একটা রাত্রির জন্য এই শহরের বুকে বিশ্রাম লাভ করেছিল। সেই মৃত্যুর ইতিহাস তোমাদের অন্তরে যেন চিরদিন ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল হয়ে থাকে। যেদিন থেকে মৃত্যুকে সে সত্যরূপে চেয়েছিল, সেদিন থেকেই সে হয়েছিল অপরাজেয়। তাকে পরাস্ত করার শক্তি এতবড় দুর্জেয় সরকারেরও ছিল না। মৃত্যু দিয়ে সে এই খবরটি তোমাদিগকে দিয়ে গিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণের প্রথমেই অভ্যর্থনার ভার যাঁর উপর আছে বলে যে ডাঃ সামন্তের কথা বলেছিলেন, তিনি ছিলেন হাওড়ার বিখ্যাত চিকিৎসক ও কংগ্রেসকর্মী ডাঃ বিভূতি ভূষণ সামন্ত।

আর শেষে যে 'যতীনে'র কথা বলেছেন, তিনি হলেন বিখ্যাত শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস। তিনি ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লাহোর বরসটাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করে আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহ লাহোর থেকে কলকাতায় আনার সময়, কলকাতায় আসার আগের দিন রাত্রে হাওড়া টাউন হলে ছিল।

শরৎচন্দ্র ও উনিশ শতক

অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বেশ মনে পড়ে, এক সময়ে সাহিত্য-রসিক ও সমালোচকের দল শরৎ সাহিত্যকে উচ্চতর কথাশিল্প বলে গ্রহণ করতে চাইতেন না কেউ, কেউ বলতেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিতান্তই ঘরোয়া 'টেল' ধরনের হয়ে গেছে। হয়তো তাঁর লেখনীমূলে কিঞ্চিৎ তরলরস থাকতে পারে, যাকে করুণরস বলে। এবং কে না জানে, করুণরসের সামান্য আঘাতেই ভাবপ্রবণ বাঙালী উদ্বেল হয়ে পড়ে! বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন ঐতিহ্য ধরেই শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যতই বিপ্লবাত্মক কথা বলুক না কেন, আসলে তাঁর মধ্যে উনিশ শতকের দুজন ঔপন্যাসিক অদৃশ্যভাবে বর্তমান ছিলেন। একজন রমেশচন্দ্র দত্ত, আর একজন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সিভিলিয়ান, অশেষ গুণধাম রমেশচন্দ্র সহৃদয় সহানুভূতির সঙ্গে মানুষের জীবনকে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নানা পার্থক্য ছিল। প্রধান পার্থক্য এইখানে। ঋজু-কঠিন বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে শুধু আবেগের ফানুস রূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। একটা বিশেষ ধরণের চারিত্র্য-ধর্মই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল। চারিত্র্যের সঙ্গে মানবিকতার সংঘর্ষ বাধলে তিনি স্বচ্ছন্দে আবেগের কণ্ঠরোধ করতে পারতেন। সুতরাং যে নর-নারী চিত্তসংযমে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, তাদের প্রতি দ্বিতীয়-বিধাতা বঙ্কিম-চন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র জেগে উঠতেন, যেমন প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্ক, অমর-নাথ-লবঙ্গলতার কাহিনী। এখানে বারেকের জন্য শিল্পী বঙ্কিম চারিত্র্যমাহাত্ম্য ও মানবনীতির জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে তার পশ্চাদবর্তী ঘনস্তু বেদনাময় ঘন বর্ষানিকার তমসাচ্ছন্ন প্রান্তটি দেখতে পেয়েছেন।

রমেশচন্দ্র ইতিহাস অবলম্বন করে কয়েক-খানি রোমান্স লিখেছিলেন, বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে। এগুলিতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আয়োজন এত বেশী হয়েছে যে, চলচ্ছক্তি প্রতিমাকে ঢেকে ফেলেছে অধিকতর ঐতি-হাসিক আনুগত্যের জন্য তিনি মানব জীবনের হৃদ্‌স্পন্দন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর দুখানি উপন্যাস, 'সমাজ' ও 'সংসার'-এ বাঙালীর ঘরোয়া জীবন ও পারি-বারিক সমস্যাই চিত্রিত হয়েছে। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সমাজ ও পরিবারের পক্ষে শুভ-সূচক, একথা উপন্যাসে প্রচার করার মতো দুঃ-সাহস তাঁর ছিল অবশ্য উক্ত উপন্যাস দুখানি শিল্পবস্তু হিসেবে যে বিশেষ সার্থক হয়নি তাও স্বীকার করতে হবে। এ-সব ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু রক্ষণশীল হলেও তাঁর কলমে ছিল সর-স্বতীর অকৃপণ আশীর্বাদ। তাই একালের প্রগতি-বাদী পাঠক তাঁর কোন কোন অভিমত মানতে না পারলেও তাঁর সাহিত্যের মধ্যে নিতাই মনের আরাম খুঁজে পান।* রমেশচন্দ্রের ততটা শিল্প-সৃষ্টিক্ষমতা ছিল না। তবু দেখা যাচ্ছে, সেকালে সামাজিক মানসের প্রবল প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে রমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষেই উপন্যাস লিখেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন না করলেও আন্তঃপ্রাদেশিক কিন্তু সবর্ণ বিবাহ তাঁর মনোমত ছিল। মারাঠী ব্রাহ্মণ ও বাঙালী ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্পর্ক তাঁর অনভিপ্রেত ছিল না। সে

যাই হোক, রমেশচন্দ্রই উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম বাঙালীর একটি পারিবারিক সমস্যা, আর একটি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিম যুগে আবির্ভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যশের খানিকটা আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর 'স্বর্ণলতা' ও 'হরিষে বিষাদে' বাঙালীর ঘরোয়া কাহিনী অসাধারণভাবে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি অতোটা ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে বাঙালীর ঘরের কথাকে চিত্রিত করেছিলেন, বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ততটা পারেননি। প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য তারকনাথের অঙ্কিত চরিত্রগুলি যেন পূর্বপরিচিত বলে মনে হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ, সূর্যমুখী, ভ্রমর, লবঙ্গলতা- এদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে হয়। তবে রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি, তারকনাথ সম্পর্কেও তার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। তারকনাথের প্রতিভায় সেই যাদুস্পর্শ ছিল না, এবং বঙ্কিমচন্দ্রে যা অপরিমিত ছিল, যাতে রাঙ-তামাও সোনা হয়ে যায়। সে যাই হোক, তারকনাথ প্যারীচাঁদের মতোই ঘরোয়া চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল সরল ও বেদনাময়, প্যারীচাঁদের মতো রঙ্গ ও কৌতুকময় নয়।

শরৎ সাহিত্যে প্রচ্ছন্নভাবে 'সমাজ', 'সংসার' ও 'স্বর্ণলতা'র কিছু ইঙ্গিত আছে। কারণ তিনি প্রধানতঃ বাঙালী পরিবারের কাহিনী লিখেছেন। অবশ্য রমেশচন্দ্র ও তারকনাথ যে-সমাজকে অবলম্বন করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের সময়ে সে-সমাজের আরও অধোগতি হয়েছিল, নারীর মূল্য তখন প্রায় ভেঙে পড়েছিল। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গী যে একান্ত অভিনব ব্যাপার নয়, তার বীজ উনবিংশ শতাব্দীতেই নিহিত ছিল তা ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাঁর মতে উনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর পার্থক্য ছিল। শরৎচন্দ্র যে সমাজকে পেয়েছিলেন, সে সমাজ তখন রোগজীর্ণ, যে একান্নবর্তী পরিবারকে পেয়েছিলেন, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে এবং সেই শূন্যস্থানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক monolithic পরিবারের গড়ন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সর্বোপরি শরৎচন্দ্রের মানসিকতায় খানিকটা বিদ্যাসাগরের লক্ষণ ছিল। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধকল্পে প্রচুর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু আসলে জীবন্ত শাস্ত্র ছিল তাঁর পরবেদনা-পরবশ বিশাল উদার মহৎ হৃদয়। শরৎচন্দ্র পঙ্কিধার, সমাজ ও নীতিঘটিত অনেক গুরুতর কথা বললেও তাঁরও প্রধান অস্ত্র ছিল বেদনা, করুণা, অশ্রু। নারীর দুঃখকে পোষাকী সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে তাকে বাস্তব, নির্মম ও কঠিন সত্যরূপে উপস্থাপিত করে তিনি যে আবেগতন্ত্র কেতন উড়িয়েছিলেন, তা বিশ শতকের ব্যাপার হলেও উনিশ শতকের ৭ম-৮ম দশক থেকে তার সূচনা হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের স্বচ্ছন্দে মিত্রতা হতে পারত। নির্মমতা ও বেদনা এবং তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের রোমান্স সঞ্জীবচন্দ্রের দু-একটি রচনায় চমৎকার ফুটতে পারত, এবং তিনি শরৎচন্দ্রকে ত্বরান্বিত করতে পারতেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য একটি অসমাপ্ত লীরিকের মতো, অর্ধস্ফুট কোরকের মতো। প্রতিভা তাঁকে ধনী করতে পারত, কিন্তু উদাসীনতা তাঁকে সাহিত্যগত নিষ্ঠা, একব্রত, অনুরক্তি ও খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এদিক থেকে তিনি অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের ঠিক যেন বিপরীত। কোন কোন ফলে রং ধরলেও পরিপক্ব হবার পূর্বে ঝরে পড়ে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা কতকটা সেইজাতীয়।* প্রতিভার উদাসীনতা বাদ দিলে, তাঁর মানসিকতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গোত্রগত মিল, একটু অনুসন্ধান করলেই চোখে পড়বে। একমাত্র পার্থক্য, শরৎচন্দ্র প্রবলভাবে জীবনের প্রতি অনুরক্ত, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম, অসাড় অনড় সামাজিক অবক্ষয়ে বজ্রনিক্ষেপে বদ্ধপরিকর। সেদিক থেকে সঞ্জীবচন্দ্র উদাসীন।

With Best Compliments of

BENGAL IRON & STEEL CORPORATION

★

169. VIVEKANANDA ROAD
CALCUTTA-700006

With best Compliments of

Bhagwati Prasad Jaiswal

★

12/1 LINDSAY STREET

ROOM NO. 5

CALCUTTA-700016

তবে উনিশ শতকের উল্লিখিত কথাকারদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সেই পার্থক্য, উনিশ শতকের সঙ্গে বিশ শতকের যে পার্থক্য। উনিশ শতক মোটামুটিভাবে এসট্যাবলিশমেন্টের প্রতি আসক্ত। বিশ শতক ভাঙচুর করে নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায়, অসংখ্য প্রশ্ন করতে চায়, সে প্রশ্নের জবাব না পেলে পরিপার্শ্বকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। শরৎচন্দ্রের আগমন হল তারই নান্দী-পাঠ করে। তিনি সমাজ পরিবার, নীতি, আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু সর্বস্থলে জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। আবেগের বশে তিনি দিদি অনিলা দেবীর বকলমে 'নারীর মূল্য' লিখেছিলেন বটে, কিন্তু এটি প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য ও গবেষণাধর্মী হলেও ঠিক জন-স্টুয়ার্ট মিল সাহেবের The Subjection of women জাতীয় প্রচারপুস্তক নয়, তিনি Suffrage the আন্দোলনও সৃষ্টি করতে চাননি। তিনি প্রধানতঃ বেদনাকে মূল নিয়ন্ত্রীশক্তি বলে মেনেছেন, মানুষকে সমাজ ও সদাচারের বাঁধাছাঁদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাননি। মানুষের জন্যই সমাজ ও পরিবার, সেই সমাজ ও পরিবার যখন মানুষের স্বাভাবিক বাস্তিত্বকে পিষে মারতে চায়, সেখানে তিনি মানুষেরই পক্ষ নিয়েছেন। এইখানে তিনি উনিশ শতকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং আধুনিক মানসিকতার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র থেকেই কথাসাহিত্যের যথার্থ আধুনিকতা শুরু হল। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা আনতে চাই না। কারণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নরনারী একালের হলেও তাদের কোনও ভূগোল-ইতিহাস নেই, তারা নিত্যকালের এবং "দ্যাবাপৃথিবীর" কুশীলব।

তবু শরৎচন্দ্রকে গ্রন্থান্তরের জীব বলা যাবে না, উনিশ শতকের চিত্তাভস্ম থেকেই তাঁর পুনর্জন্ম, একথা মানলে উনিশ শতকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অধিকতর স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

With best compliments of :-

●

Messrs Eastern Distilleries Pvt. Ltd.

B. L. SAHA ROAD, TOLLYGUNGE, CALCUTTA-53

45-0473

Prices are falling

make sure you get the RIGHT WEIGHT/ MEASURE of what you buy

Several essential commodities come in packaged form. Besides price tags they carry lables of the net weight (or measure) also. Look for this label on the container. The label that shows the right quantity for the price you pay.

Under filling and erroneous markings on containers are offences under the Weights and Measures Act.

Laws on Metric Weights and Measures
Protect the Consumer

শিকারী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ছিল বৈচিত্র্য ভরা। সে জীবনের গতি কখনই সরলরেখা অনুসরণ করেনি। প্রচুর বাঁক আর খানাখন্দ নিয়ে অসংখ্য ভাঙচুর ছিল সে জীবনে। আর সে সমস্ত ছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে যে জীবন প্রতিফলিত তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। হরেক রকম মানুষ আর তাদের সমস্যা, সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্খার ছবিতে তাঁর সৃষ্টিলোক পরিপূর্ণ। সুশৃংখল, শান্ত, নিরুত্তাপ জীবন শরৎবাবুর কোনদিনই ছিল না। এমনকি ছেলেবেলাতেও নয়। আর সম্ভবতঃ তিনি সেটা চানও নি। বরং একটা অ্যাডভেঞ্চারাস মন একটা বোহেমিয়ান ভাব যেন তাঁর জন্ম থেকেই রক্তে ঠাঁই নিয়েছিল।

ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসে বর্ণিত একাধিক চরিত্র এবং ঘটনা থেকে কেন জানি না মনে হয় শরৎবাবু নিজেও শিকারী ছিলেন অথবা শিকার ভালবাসতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে বোধকরি এ সব লেখা সম্ভব হত না।

এ অনুমান মিথ্যে নয়। শরৎচন্দ্রের বহু-বিচিত্র জীবনের অসংখ্য ঘটনার ভিড় সরিয়ে খুঁজে পেতে দেখলে অনুমান পাকা করার রসদ মেলে। পুরোদস্তুর শিকারী না হলেও তিনি যে শিকার ভাল বাসতেন এবং শিকারে যেতেন এমন তথ্য তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জীর এখানে ওখানে উল্লেখিত রয়েছে।

মাছ ধরা শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেক প্রিয় শখের মধ্যে একটি ছিল। ছিপ হাতে প্রায়ই তিনি মাছ ধরতে বসতেন। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের এক জায়গায় শ্রীকান্তের মাছ ধরার ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে মনে পড়ে যায়, "সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সন্ধানে একটা নালার ধারে বসিয়া; ছিপ দিয়া টাংরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি।" নয়ন বাগ্দীর সঙ্গে বসন্তপুরে ভাল ছিপের সন্ধানে গিয়ে ফেরার সময় পথে ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়ার ঘটনা তো পাঠকদের কাছে অজানা নয়।

শরৎচন্দ্রের মাছ শিকারের অন্যতম সঙ্গী ছিল ছেলেবেলার অত্যন্ত কাছের সঙ্গী কালিদাসী, ছিপ ফেলতে বসলো দু'জনে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ফায় ফরমাসের অভাব নেই। এই কালিদাসী তামাক সাজ! চার ফেল্—তোর বেশ খাচ্ছে—আমার খাচ্ছেনা কেন? কটা ধরলি? বেটাচ্ছেলে মাছগুলো বড় চালাক হ'য়ে গেছে। একবার ঠুকরেই সরে পড়ছে বারে বারে! যাই বল তোর হাত যশ আছে! কটা ধরলি? বলিস কি? বারোটা—আমার যে তিনটে!"

শরৎচন্দ্রের মাছ শিকারের বাতিক ব্রহ্মদেশে বাসকালেও যে বেশ জোরালো ছিল তাঁর বিভিন্ন অন্তরঙ্গজনের লেখা ব্রহ্মদেশের জীবন সম্পর্কিত রচনা থেকেই জানা যায়। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেংগুন থেকে কোলকাতায় লেখা একখানি চিঠিতে মাছ ধরার সরঞ্জাম পাঠানোর অনুরোধ ছিল, 'আর একটা কথা। গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড় সাইজের ৪।৫ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সুতো ভাই নিশ্চয় দিয়ো।'

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে চাকরী হারিয়ে শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই সময় শরৎবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং পরিচিত শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দে সরকার (ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের লেখক) পেগু যাচ্ছিলেন। কারণ পেগুর পুকুরে প্রচুর মাছ, কাছাকাছি জংগলে ছোট হরিণ এবং নানা রকমের পাখি শিকারের বিস্তর সুযোগ ছিল। এইসব শুনে শরৎবাবুও একপায়ে খাড়া। পেগু যাবেন্। শিকার সম্পর্কে নিজের প্রচুর আকর্ষণ ইত্যাদি ব্যক্ত করতে লাগলেন

গিরীণবাবুর কাছে। ফলে পেগুর পথে শরৎবাবুও সঙ্গে চললেন গিরীণবাবুর।

মাছ শিকারের শরৎবাবুর যতখানি সাধ ছিল—সাধ্য ছিলনা ততখানি। মাছ শিকারের দক্ষতার পুঁজিতে অনিবার্যভাবেই বেশখানিক ঘাটতি ছিল। একদিন রসুলবক্সের পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে। বড়মাছ ধরার জন্যে ফাতনার দিকে স্থির চোখ রেখে অপেক্ষা করার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা শরৎচন্দ্রের না থাকায় গিরীণবাবু তাঁর হাতে একটা ছোট ছিপ ধরিয়ে দিলেন। পরামর্শ দিলেন পুঁটিমাছ শিকারের। অগত্যা শরৎবাবু মিনি মাছ শিকারে বসলেন। কোনবারে একটি কোনবারে একসঙ্গে দুটি পুঁটি শিকার করে পাশে রাখা টিনের বাক্সখানা ভরিয়ে তুললেন।

অন্য আর একদিন শরৎচন্দ্র হুইলের ছিপ নিয়ে বসে ঐ রসুলবক্সের পুকুর থেকেই পাকা মাছ শিকারীর মত অল্পক্ষণের মধ্যেই একখানা প্রমাণ সাইজের মাছ ডাঙ্গায় তুললেন।

মাছ ধরার শখ মিটলে একদিন শরৎচন্দ্র পেগুর উকিল মিঃ চ্যাটার্জীর বন্দুক নিয়ে কাছের জঙ্গলে গিরীণবাবুর সঙ্গেই শিকারের সন্ধানে বের হলেন। জঙ্গলের ভেতর মহলে প্রবেশ করে হরিণ শিশুর জন্যে প্রতীক্ষা করার সময় কাছেই একটা ফোঁস ফোঁস শব্দে চমকে গিয়ে গিরীণবাবু দেখলেন কাছেই একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ। বন্দুকের বাট দিয়ে সজোরে সাপটার মাথায় একটা ঘা বসিয়েই চীৎকার জুড়লেন, শরৎদা সাপ! পালাও! পালাও! দুজনেই সেদিন নিরাপদে প্রাণ-পণে দৌড়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে-ছিলেন।

একদিন পেগু মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী মিঃ রেন কাউন্টার, মিঃ প্যাথাম, মিঃ চ্যাটার্জী, গিরীণবাবু এবং শরৎচন্দ্র শিকারে বেরিয়েছিলেন। বেরোনোর মুখে শরৎচন্দ্রের আস্ফালন ছিল প্রচুর। যেন আজ একটা বাঘ না মেরেই তিনি ছাড়বেন না! জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র একা অনেকটা ভেতরে গিয়ে পড়েছিলেন। দূরে গাছ-পালায় বিচিত্র পাখির ডাক। হরিণ শিশুর নির্ভয় যাতায়াত। শরৎচন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে জঙ্গলের পেটের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী সাথীরা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। হঠাৎ গিরীণবাবু জঙ্গলের ভেতরে গুলির শব্দ শুনে সচকিত হলেন। ছুটলেন শব্দ লক্ষ্য করে। অন্যেরাও এসে পড়লেন। দেখা গেল খানিক আগের প্রচণ্ড গুলির শব্দ একটা মোটা চিলকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। শিকারী শরৎচন্দ্র। কাছা-কাছি মাটিতে কোন শিকারের হদিশ না পেয়ে অধৈর্য শিকারী আকাশে একরাশ উড়ন্ত বকের দিকে বন্দুক চালিয়েছিলেন। মাটিতে এসে পড়ল মোটা চিলটা। পরীক্ষা করে দেখা গেল গুলি লেগে নয়। গুলির শব্দেই চিলটা হার্টফেল করেছে। বকেরা নির্বিঘ্নে উড়ে গেছে লক্ষ্য পথেই। এই রকম শিকারের নমুনা দেখে মনে হয় শিকারের অ্যাডভেন্চার শরৎবাবুকে যতখানি আকর্ষণ করত সেই পরিমাণ খাঁটি শিকারীর দক্ষতা তাঁর ছিল না। অ্যাডভেন্চারের আকর্ষণেই সম্ভবতঃ তিনি শিকারে বেরুতেন।

সামতাবেড়ে ফিরেও শরৎচন্দ্রের শিকারের নেশা যায়নি। মাছ শিকারের নেশায় সামতাবেড়ের বাড়ির সামনে পুকুর কাটিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। সামতাবেড়ে এসে একটা দোনলা বন্দুকও কিনেছিলেন। উদ্দেশ্য বাড়িতে বন্দুক আছে জানলে ধারে কাছে চোর ডাকাত ঘেঁসবে না। এছাড়া শরৎবাবুর একটা রিভলবারও ছিল। রাত বিরেতে কোথাও বেরোনোর দরকার হলে ঐ অস্ত্রটা পকেটে ফেলে বেরোতেন।

একবার এক গরমকালের রাতে শরৎবাবু দিদির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে হ্যারিকেন হাতে কয়েকজন লোককে জটলা করতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন। কাছেই একটা গাছের গোড়ার কোটরে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ রয়েছে। শরৎচন্দ্র হ্যারিকেনটার আলোয় ব্যাপারটা দেখলেন তারপর পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে সাপটার

জীবন শেষ করলেন। শরৎচন্দ্র নিজে সাপ ধরতেও পারতেন। বাজে শিবপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের একটা গোখরো সাপ ধরার ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "নিজের চোখে তাঁহাকে (শরৎচন্দ্রকে) গোখুরা সাপ ধরিতে দেখিয়া, ইন্দ্রনাথের সাপ খেলাইবার কথা মনে পড়িয়াছে।"

শরৎচন্দ্র যদিও চোর-ডাকাত থেকে সাবধান থাকার প্রয়োজনে দোনলা বন্দুক আর রিভলবারটা কিনেছিলেন, তবু মাঝে মাঝেই সেই দোনলা আগ্নেয় অস্ত্রটাকে বগলদাবা করে তিনি রূপনারায়ণের চরে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। অধিকাংশ সময়েই অবশ্য এই শিকার যাত্রা ভাগনে ব্রজদুলাল আর নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের উৎপীড়নেই করতে হত। কেননা এই শিকার করা পাখি শরৎবাবু কোনদিনই খেতেন না; মাছ মাংস অবশ্য খেতেন যদিচ রুচি করে নয়।

রূপনারায়ণের ধু ধু করা চরে শীতকালে দূর দূরান্ত থেকে উড়ে আসা পাখির যেন মেলা বসে যেত। শরৎবাবুর ভাগনে শ্রীনন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি শরৎবাবু নাকি পাকা শিকারী ছিলেন। তাঁর দোনলার নল-ছুট গুলি সটান ছুটতো উড়ন্ত পাখির বুক তাক করে। এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘায়েলও করতো।

একবার নৌকোয় করে নন্দবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলেন। স্রোতের টানে নৌকো ছুটছে বই বাই করে। হঠাৎ নন্দবাবুর নজরে পড়লো একটা উড়ন্ত বেগড়ি পাখি। পাখিটা ডানা কাপটিয়ে সেদিকেই আসছিল। ভাগনে নন্দলালের আব্দার শুরু হল, আকাশ থেকে বেগড়িটাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে হবে। চলন্ত নৌকোয় দাঁড়িয়ে ছুটন্ত বেগড়ির দিকে বন্দুক তাক করলেন শরৎচন্দ্র শব্দ করে গুলি ছুটলো ঠিক-ঠিকানায়। আকাশ থেকে ডানা গুটিয়ে বেগড়ি ধুলোয় পড়ল মুখ থুবড়ে। এমনি অব্যর্থ ছিল নাকি শিকারী শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য।

আর একবার পাখি শিকার করতে গিয়ে যে বিপত্তি ঘটতে বসেছিল সেটুকুর উল্লেখ না করলে এই শিকার প্রসঙ্গের ইতি টানা উচিৎ হবে না কেননা শিকারী শরৎচন্দ্রের জীবনে সেটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই শিকার অভিযানের উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎবাবুর বড়ো ভাগনে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায়—নন্দবাবুর অগ্রজ। বন্দুক পায়ের কাছে রেখে বসে রয়েছেন শরৎবাবু। নৌকো ছুটছে স্রোতের টানে। ব্রজবাবু পা ঝুলিয়ে বসেছেন মাঝির কাছাকাছি নৌকোর ধারে। বন্দুকের নলের মুখটা ব্রজবাবুর দিকেই। হঠাৎ শোয়ানো বন্দুক থেকে শব্দ উঠলো গুড়ুম। ব্রজদুর্লভের প্রায় কানের লতি ছুঁয়ে গুলি বেরিয়ে গেল। ভীত ব্রজদুর্লভ পড়ে গেল নদীতে। সমস্ত নৌকোতে যেন মুহূর্তেই মুহ্যমান নিস্তব্ধতা নেমে এল। শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে অবশিষ্ট গুলি ভরা বন্দুকের নলটা নিজের বুকে লাগিয়ে জলের দিকে সন্ধানী চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ ছাই সাদা কাগজের মতো। এমন সময় ব্রজদুর্লভের মাথা ভেসে উঠলো জলে। নৌকোয় তুলে নেওয়া হল তাঁকে। শরৎচন্দ্রের নির্দেশে নৌকোর মুখ ঘুরলো উল্টো মুখো। বাড়ির দিকে। আর শিকার নয়। শরৎবাবু এইভাবে বুকে বন্দুকের নল ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, 'ব্রজর গায়ে যদি গুলি লাগত, সে যদি আর জল থেকে না উঠতো তাহলে বাকি গুলিটায় আমি নিজেকেই শেষ করতাম। তাহলে ব্রজর মায় কাছে, ব্রজকে আমি গুলি করে মেরেছি' এমন নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ করতে হত না। নেহাৎ দুর্ঘটনার মতই সেদিন কোনভাবে শরৎবাবুর পায়ের চাপ লেগে ব্রজদুর্লভের দিকে মুখ করে রাখা বন্দুক থেকে গুলি ছুটে ছিল। বরাত জোরে ব্রজ সেদিন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু সেদিনই শিকারে ইস্তফা দিয়ে বন্দুককে চিরকালের জন্য বিদায় করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

294872

BIG NEWS FOR NATIONAL SAVINGS INVESTORS

※ NEW 10-YEAR ANNUITY CERTIFICATES

provide for

Monthly interest payments for 84 months to meet recurring liabilities of the depositor like children's higher education.

Refund of capital on maturity with handsome premium (Deposits earn interest at 10.25% compound).

※ ENHANCED LIMIT ON HOLDINGS OF TAX-FREE NATIONAL SAVINGS CERTIFICATES

	Earlier Limit	*Enhanced Limit*
For an Adult	Rs. 50,000	Rs. 75,000
For two Adults Jointly	Rs. 1,00,000	Rs. 1,50,000

(The Certificates carry tax-free interest at 6% per annum)

※ 5-YEAR RECURRING DEPOSIT ACCOUNTS ADDED ATTRACTIONS

Contributions can be continued beyond 5 years or Maturity amount can be further kept with Government (Interest at 9.25% compound for each completed year allowed in such cases).

Benefit of Protected Savings now available on accounts of Rs. denomination also.

For further details, write to :

NATIONAL SAVINGS COMMISSIONER

POST BOX NO. 96, NAGPUR

ভাঙা মিছিলের স্মৃতিমালা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আবার কী ফিরে পাব প্রথম ফাল্গুন ?
সমুদ্র, সবুজ পাতা, দক্ষিণ বাতাস ?
উন্মন মঞ্জরীর ব্যাকুল প্রত্যাশা ?

নৃত্যছন্দে ছন্দপাতে ঋতুরঙ্গে উজ্জ্বলে ধূসরে
এসেছিল, গিয়েছিল চলে,
গিয়ে ফিরে এসেছিল,
ফিরে ফিরে আসে আর যায়
দিন-রাত
রৌদ্র আর ছায়ার মিছিল।

সুমুখের ভীড় যেন কমে আসে ক্রমে
মিছিলের শেষ যেন ছায়ায় বিলীন ;
উত্তরের অধিকজিজ্ঞাসায় দিগন্ত ঘুমায়।

এখন পেছনে তাকাই
অনেক অনেক মুখ
বন্ধুর দীর্ঘায়ু মুখ
ক্ষণেক দেখার মুখ
চেনা মুখ নাই।

রৌদ্র নাই।
ছায়ার আড়ালে
ভেঙে যাওয়া মিছিলের মুখগুলি
কণ্ঠহীন প্রেতাত্মার মতো
দিক্‌ভ্রান্ত পরাভূত সেনা
ছত্রখান পৃথিবীর সবুজ প্রান্তরে।

কথা বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে
চোখের বাষ্পে আত্মীয়কে চেনা যায়
সন্দেহের শত প্রশ্নে প্রতিজ্ঞার স্থির নক্ষত্রও কাঁপে
"কে তুমি ?"
"কাকে চাও ?"
"ঘৃণা কর কাকে ?"
"কার মৃত্যু তোমার প্রার্থনা ?"

অথচ বৈশাখ ছিল
নবীন প্রেমের শিখা
নিশ্চিত নির্ভর
আনন্দ মঞ্জরী।

অথচ আষাঢ় ছিল
ক্ষুধার্ত নির্বাক চোখ মেখে
ধরাময়ী পৃথিবীর প্রথম সম্ভাষ
অপরূপ ফুটেছিল সত্যের শিখরে

পৌষের সোনার মাঠে
আমরা সবাই মিলেছিলাম
ফসল কাটার গানে।

ঘরে ফেরার পথে
অন্ধকারে কুজ্ঝটিকায়
আমরা পথ ভুলে গেলাম।

ভেঙে-যাওয়া মিছিলের মুখগুলি
কণ্ঠহীন প্রেতাত্মার মতো
দিক্‌ভ্রান্ত পরাভূত সেনা
ছত্রখান পৃথিবীর সহস্র প্রান্তরে ॥

পাখি এক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এ এক বিবাগী পাখি
কোনোখানে কুলায় বাঁধে না ;
শুধু শূন্যে ডানা মেলে
দিন রাত্রি পার হয়ে যায়।

কে জানে কি যে সে খোঁজে !
জনপদে, অরণ্যে, প্রান্তরে,
দুটি তার ব্যগ্র চোখ
কি সন্ধানে চিরনিদ্রাহীন ?

সে কি প্রেম ?
হিংসা সে কি ?
সে কি কোনো অলীক দুরাশা,
যা তার ডানার ক্লান্তি
অবিরাম মুছে মুছে দেয় ?

কিছুই জানি না, তবু,
মাপা দিন রাত্রির নিগড়ে
সে পাখির পক্ষধ্বনি
থেকে থেকে হৃৎস্পন্দনে শুনি।

সূচি-তীক্ষ্ণ স্বর তার
বিদ্ধ করে' সত্তা সপ্ততল
জানায় অভীপ্সা কি যে
জন্মমৃত্যু নিয়তি-ভোলানো।

পাবলো নেরুদা আর কিছু নয়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি সত্যের সঙ্গে কড়ার করেছিলাম
দুনিয়ায় আবার এনে দেব রোশনাই।

আমি হতে চেয়েছিলাম অন্যের মতন।
সংগ্রামে আমি নেই এমন কখনও হয়নি।

আর যা ভালবাসতাম তাকে এখন তার ঠাঁইতে,
আমার হারানো নির্জনতার মাঝখানে।
এই পাথরের কোলে আমার ঘুম নেই।

আমার নীরবতার মধ্যে সমানে বেটে চলেছে সমুদ্র।

মহাকবি কালিদাস স্মরণে

দিনেশ দাস

প্রথম মেঘের ডাকে
পৃথিবী হঠাৎ জেগে রেখেছিল আকাশের দিকে
বিরাট জিজ্ঞাসা।
তুমি মেঘদূতের আকাশ,
তোমার উপমাগুলি সে আকাশে তারা হ'য়ে জ্বলে,
কখনো বা মেঘ হ'য়ে, বৃষ্টি হ'য়ে
ঝ'রে পড়ে আষাঢ়ের তৃষ্ণার্ত মাটিতে।

□

হে কবি তোমার মেঘে এখনো তো বৃষ্টি ঝরে,
আমরা পা'রি না সেই রূপোলী ধারায়
হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে নেমে যেতে,
স্নান ক'রে, পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে,
ধুয়ে-মুছে প্রত্যহের গ্লানি।

তোমার কাব্যের বনস্পতি
পত্রে পুষ্পে বিস্ফোরিত হ'য়ে আছে আকাশের দিকে,
আমরা বসতি করি সে-বিশাল গাছের ছায়ায়,
মৌমাছিরা ছড়ায় সুরভি
দিকে দিকে দেশে দেশান্তরে।

□

হে কবি তোমার নামে
মাটির কুয়াশা আজ দেবতার ভূত হ'য়ে ফোটে,
দেবতার হিম হয় মাটির গোলাপ।
আমাদের জীবনেতে
সকাল আসেনা কোনো মানে,
নিয়ে আসে শুধু জটিলতা :
আমাদের দেবতাও বেচে নামে কার্তিকের হিম—
অস্ত্রানের গাঢ় অন্ধকার,
ইস্পাতের পৃথিবীতে মাঝে মাঝে লোহার আওয়াজ।
কোথা পাব রাজকবি তোমার ভাবনা—
হীরে, মুক্তো, রত্ন, জহরৎ?

□

ক্ষমা কর মহাকবি—কবিদের কবি,
আমাদের কাছে কাব্য জন্মের বিশ্বাস নহে তো,
কবিতা পণ্যের মত বিকোয় বাজারে।
আমাদের স্বপ্ন আজ ক্ষত-বিক্ষত,
সামান্য আশাও যেন যাপনত কাটা ঘায় মাখো,
প্রতিদিন সৃষ্টি হয় আমার অতুলনীয়ার।

□

এ কালের কথা তুমি ঋষি কবি
হয়তো অনেক আগে জেনেছিলে,
তাই মহাকালের মন্দিরে
রেখে গেছ শেষ প্রার্থনা
"হে নীল লোহিত,
আর যেন আসি নাকো এই পৃথিবীতে।"

চোখ না-তুলেও

শীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কে কোথায় পীড়িতের কথা বলছে,
তোমরা দেখতে যেও না।
শুধু কে কী বলছে, শোনো।

এখানে খানা, ওখানে খন্দ ;
তার মধ্যে, রাত্তিরে তো বৃষ্টি হয়েছিল, জল জমেছে ;
জলের উপরে পেলে যাচ্ছে নীলচে একটা আভা।

এখন আর চোখ তুলবার দরকার করে না,
জলের দিকে তাকিয়েই তোমরা বলতে পারো যে,
আকাশটা আজ নীল।

আমরা যেখান থেকেই কথা বলি না কেন,
উপরের দিকে চোখ না-তুলেও ওই
নীল আকাশের কথাই আমরা বলব।

শিকড়ের মত

মণীন্দ্র রায়

তোমাদের কথা আমি অনেক শুনেছি।

দেখেছি তোমাদের বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত রজনীগন্ধা
লুটিয়ে পড়ে কেমন কাদায় ;
কক্‌টেল পার্টির এলোমেলো উল্লাস
চতুর কিংবা মতো শূন্যে ঝোল খেয়ে
মিলিয়ে যায় কেমন শূন্যে ;
হাওয়াহীন নিরুদ্যম পালের মতো
ঝুলে পড়ে তোমাদের হতাশার মুখ।

শিশুর হাতে দেয়ালে আঁকা ঐ
কাঠকয়লার ছবির মতো জগৎ ছেড়ে তাই
বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমি দাঁড়াতে চাই প্রথম গিয়ে
মাঠের মধ্যে, মাটির রাজ্যে।
আমার পায়ের তলায় আমি অনুভব করতে চাই
কোটি কোটি বছরের বৃক্ষগুল্ম, পশু ও পতঙ্গের দায়ভার,
আমি শুনতে চাই আমার রক্তের মধ্যে সেই আহ্বান
যা মানুষকে জন্ম নিতে বলে বীজক্ষেতের মধ্যে;
আমার সমস্ত মন অপেক্ষা করছে এখন সেই
আলোর নিঃশব্দ অভ্যর্থনার জন্যে
যে আমার হৃৎপিণ্ডের শিরা-উপশিরাকে
চালিত করবে মাটির দিকে
শিকড়ের মতো॥

হৃদয়, স্মৃতি, স্বদেশ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ঘড়া পোড়ার গন্ধ নাকে আসছে
হাওয়ার আঙুলিছু ঘাওয়াও বন্ধ
দালার ছেঁড়া ফুল নদীতে ভাসছে
না বুঝে ভালবাসার সুখে অন্ধ
প্রবাসী পরবাসিনী ভালোবাসছে
হৃদয়, স্মৃতি, স্বদেশ, বনগন্ধ।

ফুলের বোঝা করছে অড়ো, তুচ্ছ
কাপড় কাচি সোনা রূপার সঙ্গে
আগলছোলা ঘরের কাঁধে কুব্জ
রাজহাঁসের গরব ফুলস্তনি
এমন করে মানুষ ভালোবাসছে
যেমন বাসে অমল পুতপাখী।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে

শক্তিব্রত চৌধুরী

ঈশ্বর! তুমি আজ সাধারণ মানুষের মত
দানবীয় শক্তির কাছে হয়েছ পরাজিত।
তোমার শাণিত বজ্র শত্রু নিধনে
হয়না আন্দোলিত।
ডানা ভাঙ্গা পাখীটির মত
নিরালায় নির্জনে নিয়েছে আশ্রয়।
চারিদিক অন্ধকার থমথমে
পৃথিবীতে কি ভীষণ ভয়।
হে ঈশ্বর! তুমি আজ পরাজিত
সাধারণ মানুষের মত।
নহে কেহ আনন্দমুখর; তোমার ধরণীতে
শিশু কে জননী শঙ্কিত।
কোথা আলো কোথা পথ! হে বিশ্বারী,
দূর কর শঙ্কা ভয়!
আছে আলো আছে পথ—কে শোনালো বেদ মন্ত্র,
পৃথিবীটা মানবের দানবের নয়।

আমি

মুকুল দত্ত (গীতিকার)

অবকাশের ছায়ায় এসে বসেছিলাম আমি
মনে হোলো তুমি
কেন অনেক অনেক দূরে
কোন বাতায়নের আড়াল থেকে
ডেকে আছো আরো অনেক দূরে।

আকাশ ছেয়ে রেশমী আলোর ঝাঁক
নামলো এসে আরেক ফোটা কৃষ্ণচূড়ার বুকে
তোমার মতোই নিজের মনের আরে
দূরের আকাশ নদীর বুকে পড়লো কখন ঝুঁকে
ছুরিয়ে যাওয়া অনেক কথার রেশ আবার ভেসে
এলো মনে ফিরে।

দুলকে গেলো মন,
চোখের পাতায় স্বপ্ন এলো নেমে,
প্রাণের মাঝে কিসের দুরু দুরু
এবার বুঝি ফাগুন মাসেই বর্ষা হবে শুরু।

নাম না জানা পাখীর ডাকের মতো
নাম না জানা কোন বেদনায় ভরা,
কোথা থেকে নিয়ে এলো পথিক বা
যতো দূরেই থাকো এইটুকু তো জানি
তোমার হাতেই লেখা আছে আমার সর্বনাশ

উড়ে গেলো আলোর প্রজাপতি আঁধার ভেজে অন্য
ফুলের দেশে
যে ছায়াটি ছিল পিছে পিছে ফিরছি ঘরে
পথের মাঝে তারে ফেলে রেখে।

ঘুম

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের দিকে অবিরাম—অবিরাম তারে
নত
হয়ে
পড়ে
শরীরময় সমস্ত জীবন
জীবনের সরল সত্য—বা একমাত্র দর্শন
মনে
হয়
ঘুম
স্তরে···স্তরান্তর ঘুর্ণিঘুমের ভিতর
স্বপ্ন ও নীবিবন্ধহরা ঘুম
যা
ঢলে
পড়ছে
ঘুমেরই পরে।

সে আছে এখনও

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

যেখায় শুনি ঢাকল সে
থাকির গান—
এখনও শহীদ মিনারে দেখি রক্তে লেখা নাম একুশে
ফেব্রুয়ারী,
এখনও প্রভাত রমনার ঘাসে ঘাসে শুকে দেখি
মিছিলের ঘ্রাণ।
কিন্তু এখন একজন নেই—
নেই সে পল্লায়, রমনায় অথবা ঢাকার প্রশস্ত রাজপথে,
অথবা মুক্তিযোদ্ধার দুর্গে সৈনিক বেশে।
তবুও কোথায় যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস—
বাংলার বাঙালীর একান্ত বিশ্বাস,
সে আছে এখনও এই সমুদ্রের কাছে।
দুঃখ, দৈন্য, মহামারীর পাশে পাশে
হেঁটে যাবে, যতকাল সংগ্রামের ফৌজ,
ততকাল বেঁচে রবে ধানক্ষেতে, ঝিতেকালে—
সৈনিকের চোখের মণিতে সেই নাম,
বঙ্গবন্ধু মুজিবর আত্মীয় সমান ॥

With the Best Wishes from :—

G. B. I. GROUP OF INDUSTRIES

G. B. I. Group (Engineering Division)

Manufacturers of TOOLS & GANGES

Regd. Office—1 KYD STREET (Palace Court)
Suit No. 32 CALCUTTA-16

Factory—155 BIREN ROY ROAD, WEST.
BEHALA, CALCUTTA-61
Phone—45-7932

2, G. B. Industries
LICENSEE CALCUTTA CORPORATION
(Car Parking Contractor)

Regd. Office—1 KYD STREET (Palace Court)
SUIT No. 32, CALCUTTA-16

City Office— (i) 5A NARENDRA DUTTA SARANI
1st Floor, Calcutta-1
(for Dalhousie & Misson Row area)
(ii) 12 LINDSAY STREET, CALCUTTA-16
(for New Market area)

পাণিত্রাস – শামতা – শরৎচন্দ্র

প্রস্তুতি ছিল না, ছিল না কোন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী, কিছুটা মনের তাগিদ, অল্পবিস্তর সংবেদের আশায় আর অনেকটাই খানখেয়ালী স্বভাবের তাড়নায়, আশা-নিরাশার টানা-পোড়েনের মধ্যে হাজির হলাম "দেউলটি স্টেশনে"। সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে শামতা গ্রামে শরৎচন্দ্রের বাস-ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রিক্সাচালক কখনও নেবে, কখনও উঠে, টেনে নিয়ে চলেছে...শরৎ সড়ক,...এগিয়ে চলেছি ঢিমেতালে...পথের দুপাশের সারি সারি তাল, খেজুর গাছ, পুকুর, ডোবা...মাঝে মাঝে কাদামাটির সড়ক..প্রচুর একচালা, দোচালা টালির ঘর বা কোথাও খড়ের ছাউনি, কিছু দোকান-পাট..আবার এরই মধ্যে কয়েকটি ঝকঝকে, চকচকে পাকা দোতলা-তিনতলা বাড়ী সগর্বে মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্বকে জাহির করছে,..মৃদু মন্থর গতিতে মন সবুজের সমারোহ আমার দুপাশ দিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে..পিছনে আর ফিরে দেখছি না.. একটানা সাইকেল রিক্সার একঘেয়ে আওয়াজ.. হারিয়ে যাচ্ছি নিজের মধ্যে চেতনার অন্ধকারে.. 'বাবু এসে গেছি' চমকে তাকিয়ে দেখি ভাঙাচোরা কাদামাটির কাঁচা সড়কের শুরু, রিক্সা আর যাবে না। মনে মনে ভাবলাম এই ভালো, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাতের ব্রীফকেসটিকে শক্ত মুঠোয় ধরে শামতা গ্রামের মাটিকে স্পর্শ করলাম, এগিয়ে গেলাম অদূরবর্তী শরৎ কুটির উদ্দেশ্যে। ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে চাঙ্গা করে দু-এক পা এগুতেই এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন, বেশ কিছুটা অনুসন্ধিৎসা আর স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়? অল্প হেসে বললাম, আসছি কলকাতা থেকে—উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই মুহূর্তে শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যেতে চাই আর আশা করছি আপনাকে সাথে পাবার—আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এক গাল হেসে ভদ্রলোক সাদরে আহ্বান জানালেন, আসুন আমার সঙ্গে—পথচলতি অনেক কথাই হোল ভদ্রলোকের সাথে, নাম জিজ্ঞাসা করতে বললেন পতাকি ব্যানার্জী, চলার মাঝেই শুনলাম এখানে যারাই আসেন তাঁরাই নন্দদুলাল-বাবুর খোঁজ করেন এবং সবকিছুর বন্দোবস্ত তাঁর দ্বারাই হয়ে থাকে। উনি এখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান ও স্থানীয় ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি—বুঝলাম পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে খ্যাতনামা শ্রীনন্দ-দুলাল বাবু এখানে স্থানীয় এলাকায় ব্যক্তিগত জীবনেও প্রচণ্ড পরিচিত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কথা বলায় ফাঁকে কখন যে নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী পৌঁছে গেলাম বলতে পারব না—বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে—নন্দদুলালবাবু তখন সেইমাত্র দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠেছেন। এক নজরে বাড়ীটিকে দেখে নিলাম—রিবাট বাড়ী, ঘরের সংলগ্ন বড় বড় দালান, ছিম-ছাম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একটি নিটোল একান্ন-বর্তী পরিবার। সদা হাস্যময় নন্দদুলালবাবুর আন্তরিক অভ্যর্থনা অপরিচিতের স্বাভাবিক আড়ষ্টতা ও লজ্জাকে নিমেষের মধ্যে দূর করে দিল। পরিচয় পর্ব শেষ করে বললাম, আপনার কাছে এসেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জানতে বুঝতে আর শুনতে অর্থাৎ আপনি তাঁকে যে ভাবে দেখেছেন সেই উপলব্ধির কথা জানতে চাই, এবং আশা করি আপনার বলা হতে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নেই। কিছু মুহূর্ত চুপ করে

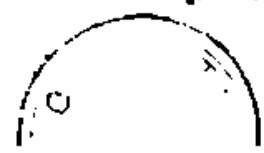

তাকিয়ে থেকে নন্দদুলালবাবু বললেন যতদূর সম্ভব জানাব, বলবো; পরক্ষণেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তবে আগে বিশ্রাম—খাওয়া-দাওয়া ওপরে আলোচনা। আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম, বললাম অতি উত্তম প্রস্তাব তবে অনাহূত আমি তাই খাওয়া-দাওয়ার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই সময়সাপেক্ষ যদি সেই ফাঁকে আমরা যদি কিছুটা আলোচনায় এগোতে পারি আমার মনে হয় আপনার অসুবিধা

বোন ছিলেন। বড়ভাই শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্তমানে স্বামীবেদানন্দ ও ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বোনেরা যথাক্রমে অনিলাদেবী ও নীলিমাদেবী। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী আমার নিজের জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশাই পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সেজভাই পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ছেলে আমি। জ্যাঠাইমার তিন মেয়ে, ছেলে নেই তাই কৈশোরকাল থেকেই

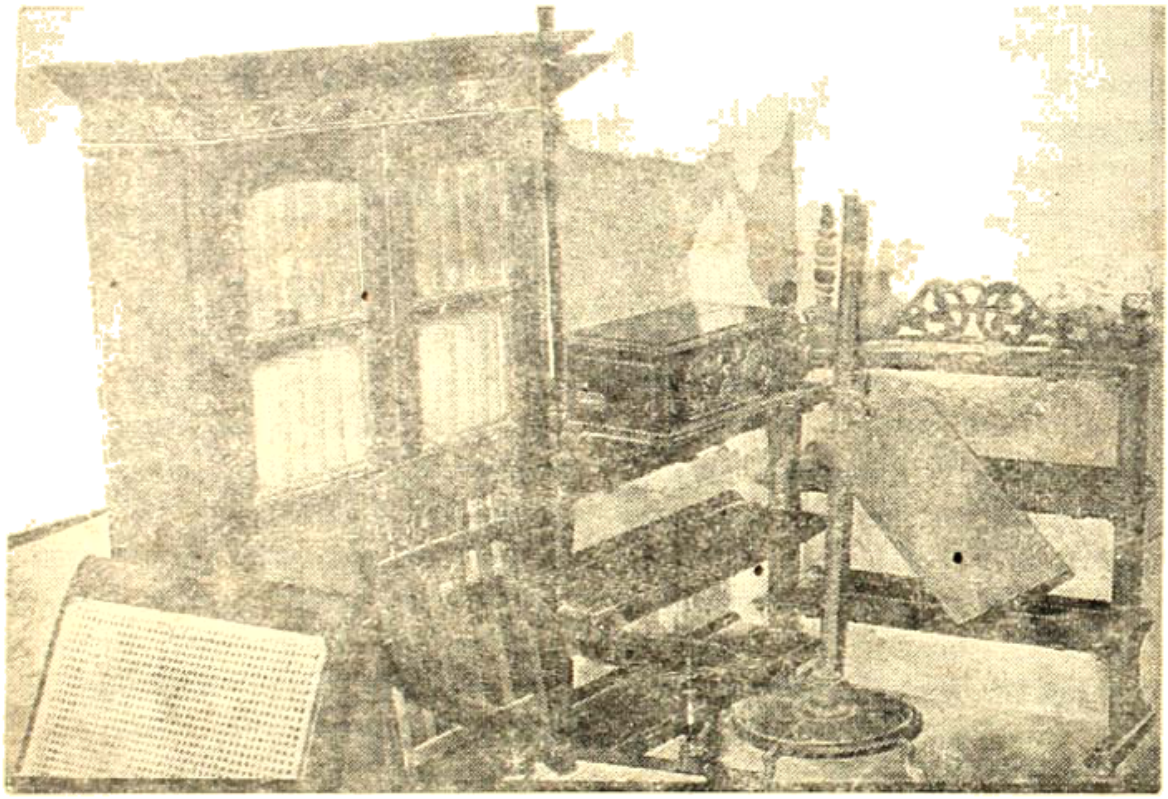

শরৎবাবুর বৈঠকখানা

নেই। বিন্দুমাত্র না বলে আমাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন, ইতিমধ্যে ধূমায়িত চায়ের কাপের আবির্ভাব ও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বললাম নিন শুরু করুন। চোখ বন্ধ করে নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন নন্দদুলালবাবু..অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের পালা শুরু..আমি শ্রোতা, শুনছি॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরা তিন ভাই ও দুই

শরৎচন্দ্রকে আমাদের আপন মামা বলেই জেনে এসেছি। ১৯১৬ রেংগুন থেকে শরৎচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন, হাওড়া শহরে শিবপুরে বাড়ীভাড়া করে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। দেবানন্দপুরে পৈত্রিক ভিটে উদ্ধার করার মনোবাসনা তাঁর ছিল কিন্তু জ্ঞাতিদের সাথে বিবাদ-বিসংবাদ মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন বলে আশা ব্যর্থ হল। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের কোন

এক সময়ে শরৎচন্দ্র দিদি অনিলাদেবীর শ্বশুর-বাড়ী হাওড়া জেলার প্রান্তে রূপনারায়ণ নদের তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে এসেছিলেন, ভাল লাগল এখানকার শান্ত গ্রামীণ সৌন্দর্য, পল্লীবাসীদের অকৃত্রিম সরলতা আর প্রাণোচ্ছল রূপবান রূপ-নারায়ণকে। নদীর তীরে শমতা গ্রামের শেষ সীমায় দিদি অনিলাদেবীর বাড়ীর অনতিদূরেই আপন খেয়ালে গড়ে তুললেন তার পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। পাণ্ডিত্যাস শাহতাবেড়ের বাড়ীতে মামা যখন বসবাস শুরু করলেন তখন আমার দশ-বারো বছর বয়েস হবে আর সেই থেকে ১৯০৮ সাল

নন্দদুলালবাবু

পর্যন্ত আমি তাঁর নিত্য সহচর হয়ে ছায়ার মতো ঘুরেছি। প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা নন্দদুলালবাবু হঠাৎ কি ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এইখানে বসবাস করবার জন্য মনস্থির করেছিলেন, একটু চিন্তা করে বললেন, প্রথমতঃ মনে হয় দেবানন্দ-পুরের সৈতিক ভিটে পুনরুদ্ধার করতে পারা আর দ্বিতীয়তঃ মামা মনেপ্রাণে বিপ্লবী ছিলেন বোধ হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে সাংগঠনিক কার্যকলাপের সুবিধা হেতু তাঁর এই অবস্থান। একটু থেমে বললেন, তখনকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে বলি-শুনবে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি বাইরে মামাকে খুব গম্ভীর দেখালেও স্বভাবে কিন্তু তিনি খুব রসিক ছিলেন। একদিন কিন্তু মামাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিতে দেখলাম, কাছে ঘেঁসতে ভয় করতে লাগল, লক্ষ্য করলাম তিনি অস্থির পদক্ষেপে বারম্বার এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করছেন আর মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রূপ-নারায়ণের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—এতক্ষণ এভাবে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম জানি না কিন্তু হঠাৎ দেখি তিনি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেই প্রায় দৌড়ে বাড়ীর গেটের দিকে গেলেন, গেটের মুখে তখন দেখি এক দীর্ঘকায় সুঠাম এক অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ, প্রচণ্ড আনন্দে, আবেগে মামা তাঁকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরলেন, তারপর দ্রুত পায়ে তাঁকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার ভীষণ কৌতূহল হল, আমি পা টিপে টিপে ঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতলাম, এক-ঘণ্টা ধরে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন হলো। তার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হল না, এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে ধীরে বাড়ীর বাইরে চলে গেলেন। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম, এক সময় দেখি মামা ফিরে আসছেন, আমার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, এইবার দেখব সাদা চামড়াগুলি কি রকম জব্দ হয়। কে ঐ ব্যক্তি, কি জন্যই বা এলেন, তাঁর সাথে কিসের সম্পর্ক এইসব জটিল ব্যাপারের কিছুই বুঝতে না পারার দরুণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। ঠিক এর দিন-দুই পরেই সংবাদপত্রের শিরোনামায় দেখলাম চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আর ঘটনার দিন-তিন বাদেই একদিন সকালবেলা ফিরিঙ্গি পুলিশেরা শরৎচন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করে তাঁর বন্দুক ও রিভলবার লাইসেন্স বাতিল করে দিয়ে নিয়ে গেল, অথচ আশ্চর্য এতটুকু গ্লানি নেই, পরিবর্তে দেখে মুখে কি গভীর আত্মপ্রসাদ, প্রশান্তি। পরে জেনেছিলাম সেই দিনকার সেই ভদ্রলোক ছিলেন সূর্য সেন। এরই সাথে আমার আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ছে, মামা তখন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন, রূপনারায়ণের বাঁকের হাত থেকে বাড়ী

পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি...

চলতি হাওয়ার পন্থি
জহরের মনে নীড়-বিহংগী
শ্রীমতীর শিকল পরানোর
রমনীয় চিত্রকথা

সুচিত্রা
উত্তম
অভিনীত

প্রিয় বান্ধবী

সহ ভূমিকায়•দিলীপ•তরুণ•জ্ঞানেশ•পদ্মা
ভানু•নৃপতি•হরিধন•গীতা•সুলতা ও সুশীল মজুমদার
কাহিনী•প্রবোধ কুমার সান্যাল
পরিচালনা•হীরেন নাগ • সুর•রচিকেতা ঘোষ
প্রম•প্র•প্রোডাকসন্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত

শুভ মুক্তি ৩রা অক্টোবর

রাধা :: পূর্ণ প্রাচী

বাচাবার জন্য নদীর ধার ধরে একটা বড় পাঁচিল দিচ্ছেন, এমনি-একদিন সকালের দিকে একটা সাদা লঞ্চ যেখানে মিস্ত্রিরা কাজ করছে সেখানে এসে থামল। উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারী ও বন্দুকধারী আর্দালি দেখে মিস্ত্রিরা সব কাজ বন্ধ করে বসে রইল। মামার কানে যখন খবরটা পৌঁছল তিনি চুপচাপ বসে রইলেন যেন কিছুই হয়নি। তিনি লেখায় ভান শুরু করলেন, সাহেবরা ওকে ঘিরে সার দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, লেখককে কোন রকম অসুবিধায় ফেলতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, আমি তখন ওখানে বসে, ভয়ে কাঁপছি, ঠিক একঘণ্টা খানেক পর তিনি মুখ তুললেন আর যেন কি প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেছেন, ওদের দেখে এইভাবে কথা বলা শুরু করলেন, কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর বোঝা গেল ইরিগেশন বিভাগকে না জানিয়ে পাঁচিল তোলা অন্যায় তাই তাঁরা ওঁকে পাঁচিল গাঁথার জন্য ব্যাকডেটে একটি আবেদনপত্র লিখে দিতে অনুরোধ করছেন। শরৎচন্দ্র কিছুতেই রাজী নন এবং সেই দিনের তারিখেই তিনি একটি চিঠি লিখে দিলেন। আজ ভাবি, কি ভীষণ জেদী আর একগুয়ে মনোভাব ছিল যা কোনদিন কোন সময়ে অন্যায় অবিচারকে ক্ষণিকের জন্য প্রশ্রয় দেয়নি। নন্দবাবুর কথা শেষ হতেই অন্দর মহল থেকে খাবারের ডাক পড়ল, আমি তখন প্রশ্নের কৌতূহল মেটানোর ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত, বললাম একটু পরে যাচ্ছি। আচ্ছা এই শামতা ও তার আশপাশের গ্রামের মানুষদের কাছে শরৎচন্দ্র কি রকম ছিলেন, কিভাবে তারা তাঁকে পেয়েছিলো। শুনলাম, ওদের কাছে শরৎচন্দ্র অতি আদরের দাদ ঠাকুর ছিলেন, এই জেলে, বাগদী প্রভৃতি জাতের লোকেরা তাঁর কাছে নিকট আত্মীয়ের মতই ছিলেন, এদের অসুখ-বিসুখে নিজেই ওষুধ দিয়ে, পথ্য দিয়ে ও সর্বোপরি শরীর দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এখানে মানুষ শরৎচন্দ্র তাঁর সংবেদনশীল মন নিয়ে এদের সুখ-দুঃখের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছলেন। শরৎচন্দ্রের বিবাহ ও হিরন্ময়ী দেবীর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বললেন, হিরন্ময়ী দেবীকে মামা রেংগুণ থেকে বিয়ে করেই ঘরে এনেছিলেন। হিরন্ময়ীদেবীর বাড়ী ছিল রাজহাটী নন্দাপুরে, বিয়ের আগে তিনি বাবা-মার সাথে রেংগুনে থাকতেন আর সেইখানেই মামার সাথে যোগাযোগ ও বিবাহ হয়। মামীমা লেখাপড়া জানতেন না তবে তাঁর মনোটা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সরল ছিল এবং সহৃদয়তার পরিচয় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছি। প্রসংগত বলতে পারা যায় এই হিরন্ময়ী দেবীকে কেন্দ্র করেই প্রধানত শরৎচন্দ্র এই গ্রামে আসার পর একঘরে হয়েছিলেন, সমাজপতিদের বিষ নজরে পড়েছিলেন কিন্তু অন্য ধাতুতে তৈরি শরৎচন্দ্রের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন অবশ্য তখনকার শিক্ষিত যুবসমাজ মামার পক্ষে ছিল বলে তেজস্বী শরৎচন্দ্রের এ গ্রামে প্রেম, ভালবাসা প্রতিষ্ঠা পেতে একটুও অসুবিধা হয়নি। এক টানা কথা বলার পর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন নন্দদুলালবাবু, আমিও প্রশ্ন শেষ করে উঠে পড়লাম, এখনও অনেক কাজ বাকী তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নন্দবাবুকে নিয়ে কাঁচা মাটির সড়ক ধরে হাজির হলাম শরৎচন্দ্রের বাসস্থলে। রূপনারায়ণের কোল ঘেঁসে শামতা গ্রামের শেষ সীমায় মনের মতন তৈরী করেছিলেন তাঁর শান্ত, মুক্ত, স্বচ্ছ, সমাহিত তপোবন। আটচালা গরনের মাটির লোতলা বাড়ী। টালির চাল। মাজা দেওয়াল, বাড়ীর চতুর্দিকে ঘেরা বারান্দা, সামনেই সাজান বাগান, বিরাট পুকুর, পরিষ্কার স্বচ্ছ কাচের মতন জল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপহার দেওয়া রাধাকৃষ্ণের জন্য মনোরম শান্ত পরিবেশযুক্ত ঠাকুর ঘর। সমৃদ্ধ পাঠাগার। নদীর ধারেই কয়েক সারি দেওয়া লেখার ঘর যেখানে ইতিহাস জমুক হয়ে গেছে, আপন খেয়ালে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের উদার বিস্তৃতিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত মনোরম শান্ত পরিবেশে পথ ক্লান্ত পাখিদের এক নিশ্চিন্ত আশ্রম।

সময় স্বল্প, অন্ধকার ক্রমশই চতুর্দিক গ্রাস

করছে তারপরে টিপ টিপ করে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়েই চলেছে তাই কাল বিলম্ব না করে হাজির হলাম শরৎচন্দ্রের ভৃত্য গোপাল হাজরার বাড়ীতে। ভৃত্য গোপাল হাজরা জানাল, দা-ঠাকুরের মতন মানুষ আর জন্মাবেনা, একটানা ২৩ বছর কাজ করেছি বাবু, অনেক ভালবাসা অনেক বকা-ঝকা আমার উপর দিয়ে গেছে বাবু, সেসব তো ভুলতে পারিনা, বড়মাও আমাকে খুব ভালবাসতেন, বাবু মাকে খুব ভয়ও করতেন আবার তেমনি ভালবাসতেন। প্রশ্ন করলাম তোমার বাবু কি খেতে ভালবাসতেন গোপাল। উত্তর পেলাম, বাবু সবই ভালবাসতেন তবে সবচেয়ে ভালবাসতেন তামাক, প্রায় আড়াইপো তামাক রোজ খেতেন, আর চালামাছ ও ঘুগো মাছের ঝড়া খেতে খুব ভালবাসতেন। জিজ্ঞাসা করলাম, বাবু যখন মারা যান তখন তুমি কোথায়। মৃত্যুর পর তুমি কিছু পাওনি। উত্তর এল, বাবুতো কলকাতাতে মারা যান, মারা যাবার কিছুদিন আগে বাবু আমাকে ডেকে বললেন, গোপাল আমি না থাকলে তোর মাইনে ছোটবাবু আর বড়মার কাজ থেকে নিয়ে নিবি। বাবু একটা খাতা আমাকে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, এই খাতাটা তোর কাছে রেখেদে, এতে সবলেখা আছে সেইমতো টাকা পাবি, ভয় নেইরে তোর কোন দুঃখ কষ্ট হবেনা। সেই খাতা ছোটবাবু আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, আর পাইনি, একটু থেমে কপাল চাপড়ে গোপাল বলল যাকগে বাবুই যখন চলে গেলেন আর ওসব দিয়ে কি হবে। ওপর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে তার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে গোপাল হাজরা থামল।

রাত বাড়ল, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, ধীরে ধীরে উঠে দাড়ালাম, গুছিয়ে নিলাম কাগজপত্র... ফিরে যাচ্ছি...এসেছিলাম সাদা কাগজ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি পরিপূর্ণ হৃদয়ে..আমার ভিক্ষের ঝুলি

অকৃপনহস্তে ভরে দিয়েছেন নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় আর স্বল্প-সময়ে গোপাল হাজরা...মনে পড়ছে পঞ্চাশ বছর আগে এখানে একটি আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ এসেছিলেন রূপনারায়ণের তীরে শামতা গ্রামে ঘর বাঁধতে, মানুষটি ছিলেন রসিক

গোপাল হাজরা

ভবঘুরে এলো মেলো, স্বভাবে বিপরীত-ভয়ংকর জেদী, একগুয়ে—প্রত্যেকের আপনজন শরৎচন্দ্র —আচার ব্যবহারে অনমনীয় বলিষ্ঠতা—প্রাণোচ্ছল রূপনারায়ণের কূলে দাঁড়িয়ে অসীমের প্রান্তে তাকিয়ে থাকত সেই আশ্চর্য নিরুদ্যম কথাশিল্পী যাঁর কাছে পাণ্ডিত্যাস শামতাবেড় অঞ্চল শান্তির আশ্রয় হিসাবেই কাম্য হয়েছিলো।

উন্মাদটিকে অনেক কাল ধরেই চিনতাম। বদ্ধ উন্মাদ বা ক্ষ্যাপা পাগল বলতে যা বোঝায় এ মানুষটা ঠিক সেইরকম না। ঠিক মতো বলতে গেলে, আমাদের এই ছোট-খাটো শিল্প শহরে, বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায়, স্টেশন দোকান বাজার অঞ্চলে, অনেক সময়েই যেমন নানা পাগলের দেখা মেলে, আমি যার কথা বলছি, তাকে ঠিক সেই বিভাগেও ফেলা যায় না।

যখন স্টেশনের সামনে, আমাদের প্রিয় আড্ডার জায়গাগুলোতে বসে আমরা বন্ধুরা আড্ডা দিই, ডবল হাফের পর ডবল হাফ (চা) চলতে থাকে, তৎসঙ্গে সিগারেটের ভস্মনাশ, এবং নানাবিধ আলোচনা, যেসব আলোচনার কোনো নির্ধারিত সীমা নেই, বা প্রসঙ্গের কোনো বিধি-নিষেধ নেই, কারণ হয়তো লেনিনের রাজনৈতিক চিন্তার থেকে অনায়াসেই ব্যালেরিনা উলিয়ানোভার কথা উঠে পড়তে পারে, কিংবা গান্ধী-দার্শনিকতা থেকে হয়তো কোনো চিত্রনটীর প্রসঙ্গ, অথবা শহরের কোনো প্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রসঙ্গ থেকে কোনো চটুল মেয়ের চুটকিতে—অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই প্রায় খৈ ভাজার মতো, (নেই কাজ তো!) তখন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যেন পাগলের মিছিল চলে যেতে থাকে।

বিষয়টা ভাবার মতো নয় কী? আমাদের আলোচনার এটাও একটা প্রসঙ্গ. এতো পাগল আসে কোথা থেকে, যায়-ই বা কোথায়? কারণ এই সব পাগলদের কখনোই বেশি দিন দেখা যায় না। আমাদের শহরের জংশন স্টেশনটা যেন জীবনেরই একটা প্রতীক। এখানে যে কেবল সুস্থ মস্তিষ্ক যাত্রীরাই কেবল, ভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য ট্রেন বদল করেন, তা নয়। ভাসমান পাগল সমাজও, ভাসতে ভাসতে কিছুদিনের জন্য আমাদের এই শহরে ঘুরে বেড়ায়, তারপরে আবার এক সময়ে উধাও হয়ে যায়। পুরনো মুখের জায়গায় নতুন মুখ দেখা দেয়।

সেই সব পাগল, এবং অবিশ্যিই পাগলিও, তাদের প্রত্যেকের বেশভূষা আচার আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ হয় তো আকাশের দিকে তাকিয়ে অনবরত বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে আঙুল নেড়ে নেড়ে নানা সংকেত করে। যেন গোটা আকাশটাই তার কাছে একটা অঙ্কের খাতা, আর সে নিঃশব্দে জটিল অঙ্ক নানাভাবে কাটাকুটি করে ফল মেলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সীমাহীন সেই সংখ্যাতত্ত্বের ফল কোনো দিন মিলবে বলে মনে হয় না। কেউ বা ক্ষ্যাপা কাপালিকের মতো রুক্ষ চুলের গোছা, গায়ে নোংরা মেখে, বিকট চোখ মুখ করে, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শাসিয়ে চলেছে। আর সে সব ভাষারই কী বৈচিত্র্য। খবরের কাগজে

তো আপনারা রোজই পড়ছেন, কোন্ অসাধু ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছে, জনসাধারণকে শুষে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। কিন্তু আপনি হয় তো দেখলেন, চোখ মুখ পাকিয়ে একটা পাগল চিৎকার করে বলে চলেছে, 'ভেবেছ এমনি এমনি পার পাবে? আমার লাখ টাকায় ঘা দিয়েছ, ঠাকুরের দেড়শো ভরি সোনা পাচার করেছ। শালা তোমার কলজে আমি তেল নুন দিয়ে ভেজে খাবো। না না, ছেড়ে দাও' শালাকে আজ দেখে নিচ্ছি। মার শালাকে, মার মার মার। কে ডাকছে? ওখানে বেড়ার ফাঁকে কে দাঁড়িয়ে? আমি এসেছি গো, ও মা, আমি এসেছি।' ...পাগলের প্রলাপ ছাড়া এসব কিছুই না। যদি সন্দেহ করেন, তা হলে তদন্ত করা যায়। কথাগুলো শুনলে মনে হয়, এ নিতান্তই হয়তো প্রলাপ নয়। কিন্তু এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। কথায় আছে, পাগলে কী না বলে। ধরুন, আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছেন, হঠাৎ একজন ভদ্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত চোখ লোক আপনার সমুখে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'রমাকে দেখেছেন, রমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, ফরসা, ফরসা, চোখ মুখ সুশ্রী, বয়স সাতাশ আটাশ, দোষের মধ্যে ফিক ফিক করে হেসে ওঠে, আর তাই দেখেই লোকেরা যা খুশি তাই ভেবে নেয়। এবার বুঝেছেন তো, কোন্ রমার কথা বলছি?'

আপনি নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যাবেন, অবাক চোখে ভদ্রলোকের উদ্বেগ ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলতে উদ্যত হবেন, 'না তো, এরকম কোনো মহিলাকে—' কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি সেকথা বলবার সুযোগ পাবেন না, তার আগেই দেখবেন, সেই উদ্বেগ ব্যাকুল মুখ আর চোখ তীব্র সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে, আর চিৎকার করে বলছে, 'তবে রে স্কাউণ্ড্রেল, মনে করেছ ওরকম চাঁদপানা মুখ করে থাকলেই হবে? সিম্পলি আই উইল চেঞ্জ দ্য জুরোগ্রাফি অব য়োর ফেস।'

কী রকম বুঝলেন? এ্যাণ্টি ক্লাইমেকস্! না, লোকটি আপনার মুখের ভৌগোলিক আকারের কোনো পরিবর্তন করবে না, কেবল তর্জনী তুলে এই বলে শাসিয়ে চলে যাবে, 'ওয়েইট, আই উইল গিভ য়ু দ্য লেসন।'..

আপনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, আশেপাশের লোকেরা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে, এবং বুঝতে পারলেন, আপনি একটি পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন।

পাগলদের এরকম বিবরণ দিতে গেলে, তার শেষ পাওয়া কঠিন। তা হলে একটা পাগলের মহাভারত লিখতে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে কোনোদিনই সেরকম একটি মহাপাগল বেদব্যাস হওয়া সম্ভব না। পাগল নিয়ে কেউ যদি কখনো রিসার্চ করেন, সে-কথা নিশ্চয়ই আলাদা। রিসার্চ যে করা হচ্ছে না, তাও আমি বলছি না। মনোবিকলনের নানা চর্চাই তো হচ্ছে।

সে রকম কোনো পাণ্ডিত্যের বিষয়ে আলোচনায় আমার অভিরুচি নেই। কারণ, আমার অযোগ্যতা। গাইয়ে বকিয়ে হাসকুটে ক্রুদ্ধ, পাহাড়ের মতোই স্তব্ধ নির্বাক, শান্ত, গম্ভীর কামুক, নানা শ্রেণীর পাগল আমরা সকলেই দেখে থাকি। এমন কি অতি তাদড় হাড়ে হারামজাদা পাগলের সাক্ষাৎও অনেক সময়েই পাওয়া যায়। এরকম একটি পাগলের কথা, কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি একবার লিখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জন্য অশ্রুপাত না করে পারা যায় নি। তার মৃত্যুর পরে আমার মনে হয়েছিল, আমাদের মফস্বল শহরের সমাজ চরিত্রের একটা স্থান চিরকালের জন্য শূন্য হয়ে গেল, যা আর কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। হয় নি।

আপাততঃ এসব ভূমিকা থাক। আমি যে-পাগলটির কথা বলতে চাইছিলাম, তার কথাই বলা যাক। আমাদের পাড়ার কাছেই। এক নাম করা ডাক্তারের বাড়িতে একটি পাগলকে রোজই প্রায়

দেখতে পাই। পাগলটির সঙ্গে ডাক্তার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের বিরাট বাড়ি। ভিতর বাড়ি, বাইরের বাড়ি, ডিসপেন্সারি, গ্যারেজ, সব মিলিয়ে এতো জায়গা, পাগলটির পক্ষে এক কোণে পড়ে থাকার কোনো অসুবিধা নেই।

অন্যান্য বিষয় বলার আগে, পাগলটির চেহারার বর্ণনাটা দেওয়া যাক। জাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ তার গড়ন, শক্ত পেটানো পেশিবহুল চেহারা। বয়স তার কতো, অনুমান করা কঠিন। মাথার চুলে পাক ধরেছে অনেক দিন। শক্ত চৌকো মুখে বেশ কিছু ভাজ পড়েছে। কপাল বেশ চওড়া, ভুরুতে বিশেষ চুল নেই, চোখ দুটো ছোট, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ. সব সময়েই প্রায় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। খাড়া নাসা, এবং তার চিবুকে একটি ভাজ আছে। এক এক সময় মনে হয়, তার বয়স চল্লিশ হতে পারে, কখনো মনে হয়, ষাট হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র না। কম পক্ষে দশ বারো বছরের ওপর তাকে দেখছি, চেহারার পরিবর্তন বিশেষ দেখি নি। কখনো হয় তো মাথা ভর্তি চুল জমে ঘাড় বেয়ে নামে। তার-পরেই আবার দেখা যায় একেবারে কদম ছাট। চুল কাটা বোধহয় ষান্মাসিক ব্যবস্থা। গোঁফ দাড়ি এক সপ্তাহ থেকে পক্ষকালের মধ্যে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ বাদ দিলে, বছরের ন'মাসের পোশাক ছেঁড়া ঝুলি বেঢপ বেমাপের বিবর্ণ ফুল প্যান্ট আর বহু ছিদ্র বিশিষ্ট গেঞ্জি। শীতের সময় মোটা, বহু সেলাই তাপ্পি মারা একটি হাফসার্ট। তার কোনো নাম আছে কী না আমি জানি না, শুনি নি কখনো। পাগলা বলেই তাকে লোকে ডাকে। অথবা শুধুই পাগল। এটা হলো বাড়ির লোকের ডাক।

বাইরে লোকেরা ওকে নানা নামে ডাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'লাট।' এই ডাকের মধ্যে তার আবরণের কিছুটা মিল আছে, যারা ডাকে, তাদের কিছু কৃপাও আছে। আর একটি নাম 'গরু চোর।' কী করে এই নামের উৎপত্তি, আমি তার কোনো হদিস জানি না। পাড়ার ছোট ছেলেরা যখন তার পিছনে লাগে, তখন চিৎকার করে তারা এই নামে ডাকে, আর লাগাতার চেঁচাতে থাকে। তখন কেবল 'গরু চোর' না, 'আলু চোর' পটল চোর, বেগুন চোর, কপি চোর' নানান কিছু শোনা যেতে থাকে।

পাগলের চেহারা তখন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। দাঁতে দাঁতে চেপে, মুখটা কার্তিকের মতো শক্ত করে, ক্ষ্যাপা মাহুতের মতো তেড়ে আসে। হুংকারে আশেপাশের বাড়ির দরজাজানালা কেঁপে ওঠে। রাস্তার কুকুরটা পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যে সব কুচো-কাচাগুলো তার পিছনে লাগে, সেগুলো অমিত সাহসী বিচ্ছুর দল। তাড়া খেয়ে ওরা পিঠটান দেয় বটে, একেবারে চলে যায় না। বরং ওদের মজার সমুদ্রে জোয়ার লাগে। ওরা আরো চেঁচাতে থাকে। কেবল যে চেঁচায়, তা নয়, রাস্তার থেকে ইঁট পাটকেল নিয়ে ছুঁড়তে থাকে। তাও বেশ মোক্ষম। পাগলের গায়ে মাথায় লাগে। সেও তখন খান ইঁট নিয়ে তাড়া করে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই খান ইঁট যদি কাঁচ কাচাগুলোর মাথায় কোনো দিন পড়ে, আর রক্ষে নেই। একটা খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভরসার কথা, পাগলের হাত থেকে কোনো দিনই খান ইঁট ছুটে আসে নি, কারোর মাথাও ফাটে নি। সে কেবল প্রাণ চমকানো হুংকার দিতে থাকে। আর হুংকার দিতে দিতেই গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

পাগলের আচরণ এমনিতে খুব একটা ক্ষ্যাপাটে নয়, তবে রোখাচোখা। হয় তো বাড়ির গিন্নি ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ' ও বাবা পাগল, বেচনকে একবারটি ডেকে দে।

পাগল খিঁচিয়ে মিঁচিয়ে বলে ওঠে, 'বেচন কে, আমি তা জানি না।'

গিন্নিও তখন ধমকিয়ে বলেন, 'মুখপোড়া বেচন কে তুই জানিস না? ড্রাইভারকে ডাকতে বলছি।'

পাগল তেমনি মেজাজ নিয়েই বলে, 'সে

কথা বললেই হয়।' বলে বকবক করতে করতে চলে যায়, 'বেচন! ব্যাটা আর নাম খুঁজে পায় নি। বেচন! ড্রাইভার বললেই তো হয়। বেচন আবার কিসের নাম?

এরকম উত্তেজিত ভাবে বকবক তাকে প্রায়ই করতে দেখা যায় যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। হয়তো গেটটা বন্ধ, স্বয়ং ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসে, পাগলকে দেখে বললেন, 'এই, গেটটা খুলে দেতো।'

পাগল বলে উঠলো, 'কেন, এখন আবার গেট খোলার কী দরকার?'

অবস্থাটা অনুমান করতে পারেন। ডাক্তার-বাবু খাপ্পা হয়ে চিৎকার করেন, 'হারামজাদা কেন গেট খুলতে হবে, সে কৈফিয়ৎ কী তোকে দিতে হবে? খোল্ আগে।

ততোক্ষণে কিন্তু দরজা খোলা হয়ে গিয়েছে। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই পাগলের বিড়বিড় শুরু হয়ে যায়, খালি গাড়ি চড়ে বেড়ানো, আর গেট খোল্ গেট খোল্। খুলব না, দেখি আমাকে কে কী করতে পারে। আমার খুশি আমি খুলব না।

নিতান্তই পাগলের প্রলাপ। ডাক্তারবাড়ি যে পাগলের এই পাগলামি মেনে নিয়েছে, তার প্রমাণ, আশ্রয় আর খাওয়া। তার পরিবর্তে, এমন না যে, পাগলকে বিশেষ কোনো দায়িত্বের কাজকর্ম করতে হয়। পাগলকে দিয়ে তা সম্ভব না, কেউ তা আশাও করে না। ধরে নেওয়া যায় করুণাবশতই পাগলকে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন, দুবেলা খেতেও দেন।

কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, পাগলটি একটু মুডিও আছে। বিড়ি সে প্রায় সব সময়েই টানে। তার চোর দুর্নাম কখনো শুনি নি। তা হলে ধরে নিতে হয়, কিছু পয়সাও সে পায়। বিড়ি নিশ্চয়ই দোকানদারের কাছে চেয়ে পায় না। আমি দেখেছি, বিড়ি টানতে টানতে সে কখনো কখনো যেন গভীর কোনো চিন্তায় নিমগ্ন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন ভাবে। যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছে, এরকম একটি ভাব। তখন আমাকেও ভাবনায় পেয়ে বসে, এমন গভীর ভাবে সে কী চিন্তা করতে পারে? তার কি বিশেষ কোনো অতীত আছে? সে সব কি তার মনে আছে? সে কি সেসব ভাবে? কী অতীত তার থাকতে পারে?

আমারই পাগল হওয়ার অবস্থা। কারণ একজন পাগলকে নিয়ে এসব ভাবার কোনো মানেই হয় না। পাগল পাগলই। তার ভাবনা চিন্তাও একটা পাগলামী। কিন্তু মাঝে মাঝে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী খোঁজে? এমনভাবে মুখ তুলে নিরীক্ষণ করে, যেন সে অন্য কোনো গ্রহের জীবদের দেখতে পেয়েছে, এমনই অনুসন্ধিৎসা তার চোখে। তারপরেই হয় তো দেখা যায়, সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে।

লক্ষণীয় একটা বিষয়, সে মাঝে মাঝে ভীষণ ক্ষেপে যায়। কারোকে ক্ষ্যাপাতে হয় না। সে নিজে নিজেই ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। যেন সে দারুণ আক্রোশে, কারোকে শাসায় বা ধমকায়। মুখ বিকৃত করে দাঁত খিচোয়, পাড়ার কচি কাচারা তার এই ক্ষ্যাপামির সুযোগ নেয়।

দেখেছি, সে নিজে থেকে যখন ক্ষেপে যায়, বা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে—যা অনেকটা দার্শনিকের মতোই, তখন কেউ কিছু বললেও সে খেয়াল করে না। এমন কি দু একটা ঢিল পাটকেল ছুঁড়লেও সে কিছু বলে না। সে যেন টেরই পায় না। কেন আমি এই পাগলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, এবার সে-কথাতেই আসা যাক। সম্ভবতঃ আমারও এটা এক ধরনের মানসিক গোলযোগ বা পাগলামি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, একটা পাগলকে ভয় পাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে আমার বিশ্বাস, পাগলদের বোধ হয় সকলেই কম বেশি ভয় পান। আমি একটু বেশি পাই। এই পাগলটিকেও আমি ভয় পাই। বিশেষ করে তার ক্ষ্যাপা মূর্তির তো কথাই নেই, এমনি-

তেও তাকে আমি ভয় পাই। তার চাউনি ভঙ্গি সবই এমন রোখ পাক করা, ভয় হয় ঠাই করে সে হয়তো আমাকে একটা ঘুষি কষিয়ে দেবে, বা হয় তো একটা থান ইট ছুঁড়ে মারবে।

অনেকদিন এমন হয়েছে, হয়তো নিঝুম দুপুরে, বা একটু বেশি রাত্রে একলা বাড়ি ফিরছি, আর পাগলটাকে দেখতে পেলাম, পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বা সামনে কোনো রকে বসে আছে, আমার পা আর উঠতে চায় না। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ি, তারপর আস্তে আস্তে পেছনে হাঁটা দিই। কী লজ্জার কথা! একজন সঙ্গী না জোটা পর্যন্ত। আমি একলা নির্জনে সেই পাগলের সামনে দিয়ে যেতে পারি না। মনে হয়, চোখে চোখ পড়লেই সে ভল্লুকের মতো আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর চোখ ঠিক পড়বেই। ভয়ের মনস্তত্ত্বটাই এই রকম। কিন্তু আমার এই ভয়ের কথাটা কারোকে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি নি। নিজেরই লজ্জা করে।

এক বর্ষার রাত্রে, আড্ডা দিয়ে ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। দেরি মানে, রাত্রি এগারোটা বেজে গিয়েছিল। সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। ইলশেগুড়ির ছাট, তার সঙ্গে পুবে বাতাসের ঝাপটা। রাত্রেও তার কামাই ছিল না। এমন দুর্যোগে, আমি একটা ছাতা পর্যন্ত নিয়ে বেরোই নি। সন্ধেবেলায় একটু ধরন দেখে, আশা করেছিলাম, রাত্রের দিকে বৃষ্টি নেমে যাবে। কিন্তু থেমে যাওয়া তো দূরের কথা, আরো যেন বাড়ছিল। লোকজন বা সাইকেল রিকশা খুব কম চলছিল। রাস্তার কুকুর পর্যন্ত এমন দুর্যোগে বাইরে থাকতে চায় না। মানুষ কোন্ ছার। একমাত্র আমার মতো আড্ডাধারী জীবের পক্ষেই এসব সম্ভব।

আমি হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম। কলকাতা শহর না, রাস্তার আলোগুলো এমনিতেই টিমটিমে। তার ওপরে অনেক গুলো আলো জ্বলছিল না। বৃষ্টির রাতের রাস্তাটা রীতিমতো ভৌতিক মনে হচ্ছিল। আমার তখন একটি মাত্র চিন্তা। সেই পাগল! কিন্তু বাড়ি তো ফিরতেই হবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই চলছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার পিছনে পিছনেই আরো কেউ আসছে। একবার তাকিয়েও দেখেছি। সারা মাথায় গায়ে চটের মতো জড়িয়ে কেউ আসছে। কোনো গরীব শ্রমজীবী কোনো মানুষ হবে, ধরেই নিয়েছিলাম।

বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যখন আমাদের গলির মোড়ে এলাম, আগেই লক্ষ করলাম, সেই পাগল কোথাও আছে কী না। সেই অবকাশে আমার পিছনের লোকটিও আমার পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকতে গিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথার থেকে চটের ঢাকনা সরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমার বুকে ধক্ করে উঠলো না, কেবল, মনে হলো আমি মারা গিয়েছি। চটের ঢাকা দিয়ে সেই পাগল আমার সামনে। মনে হলো সাক্ষাৎ যমদূত, আমাকে পিছন থেকে অনুসরণ করে আসছে।

আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে পিছন ফিরে কোড়ে দৌড় দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম, অতি বিনীত ভদ্র অমায়িক ভাষণ, 'আহা, একেবারে ভিজে গেছেন যে! এরকম বর্ষায় একটা ছাতাও নিয়ে বেরোননি?'

অবাক যেমন হলাম, ভয় তার চেয়ে আরো বেশি পেলাম। পাগল, এরকম অভাবিত কথা বলে! নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক ব্যাপার, অথবা মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, এই ভদ্র অমায়িক মিষ্ট ভাষণ হয়তো তাই। আমি কোনো জবাবই দিতে পারলাম না।

পাগল যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের থেকেও সুস্থ ভাবে, অতি ভদ্রলোকের মতো আবার বললো, 'খুবই অবাক হয়েছেন। বুঝতে পারছি।

আপনাকে আমি চিনি। এভাবে জলে ভিজে অসুখ বিসুখ করবেন না। আপনাদের জীবনের দাম আছে।'

আমার মাথা ভালো থাকবার কথা না, সাঁতা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। অবাক ভয়, সব কিছুর স্তর আমি তখন অতিক্রম করে গিয়েছি। কিন্তু কথা? আমার স্বর বলে কিছু ছিল না।

পাগল দু পা এগিয়ে গিয়ে, আবার ফিরে এলো। তার সেই বিকট মুখে একটি করুণ বিস্তৃত হাসি। বললো, 'আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বললাম, এ কথা কাউকে বলবেন না। পাগল হয়ে আছি, সব হারিয়ে তবু দুটি খেয়ে বেঁচে আছি। একটা জীবিকাই বলতে পারেন। আমি জানি, আপনি কাউকে বলবেন না। চলি। আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

বলে সে মোড়ের আলোয় বিশাল ছায়া ফেলে দ্রুত চলে গেল। আমি ভূতগ্রস্তের মতো বৃষ্টিতে রইলাম। পাগল অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমি কি সত্যি ব্যাপারটা দেখলাম? কথাগুলো শুনলাম? বিশ্বাস করতে পারছি না। হঠাৎ একটা বাসের কাপটায় আমি শীতে কেঁপে উঠলাম। আর আমার কানে বেজে উঠলো, 'আপনি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না।'

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

তারপরেও আজ পর্যন্ত সেই পাগলকে দেখি। তার উন্মাদ চোখের দৃষ্টিতে, আমাকে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ কখনো দেখি না। অথচ তার সেই কথাগুলো আমি কখনো ভুলতে পারি না, 'একটা জীবিকা বলতে পারেন।'...

আমি আজকাল আর তাকে ভয় পাই না। আমি তার কথা কখনো কারোকে বলিনি। আমার মনে বহু জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও, তাকে আমি কেন কখনো কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষ—হ্যাঁ, মানুষ যে কতো ভাবে বাঁচে।

With best compliments from :

Sk. ANWAR ALI M. L. A.

CALCUTTA-700017

Phone :
Residence : 44-7483
Office : 23-1583
22-2810
45-7545
Village : AMTA 33

কেবলি স্বপন করেছি বপন

অন্নদাশঙ্কর রায়

এবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে স্থির করি যে অন্যানদের দিয়ে লেখাব, নিজে কিছু লিখব না। লিখলে আমার যা স্বভাব সাহিত্যের ধান ভানতে রাজনীতির শিবের গীত গাইব। তাতে ভুল বোঝাবুঝি কমবে না বাড়বে কে বলতে পারে! আমি আর যাই করি ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে দেব না। তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু যে আনন্দ এবার আমি পেয়েছি তা কি তা বলে অব্যক্ত থেকে যাবে? না, আমাকে বলতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমি দীর্ঘজীবন চাইনি। এটা তাঁর অযাচিত দান। কে জানে কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল! হতেও পারে। তান শ্রীমাকে লেখাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের সব চেষ্টা বৃথা যায় না, আজ যেটা ব্যর্থ সেটা আপাত ব্যর্থ, পরে সেটা সফল হবে, যদি সত্য হয়ে থাকে। আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তা বলে হাহুতাশ করে আকাশকুসুম চয়ন করব কেন? বীজ থেকে গাছ জন্মাবে, গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে। আমাকে দিয়ে নয়। তাতে কী আসে যায়! আমি নিমিত্তমাত্র।

টলস্টয়ের প্রভাবে পড়ে আমার আদর্শ ছিল আত্মসম্মানসম্পন্ন শিক্ষিত কৃষক। যাকে কেউ শোষণ করতে সাহস পাবে না। শাসক যাঁরা তাঁরাও সমীহ করবেন। তাই আমার হাতে যখন পরিচালনা এল তখন আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার গাঙ্গা-মহালের হাইস্কুলকে করতে গেলুম সাধারণ হাইস্কুলের থেকে ভিন্ন প্রকার। জুড়ে দিলুম উপরের দিকে চাষের ক্লাস। ছাত্ররা পড়াশুনাও করবে, চাষবাসও করবে। চাষবাসের শিক্ষা দেবেন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত একজন ডেমনস্ট্রেটর। স্কুলের অবস্থান শহর থেকে দূর। চারদিকে গ্রাম। ছাত্ররা কৃষির ছেলে। সকলেরই ক্ষেতখামার আছে। আধুনিক পদ্ধতিতে আবাদ করলে অনায়াসেই ভালো ফসল পাবে। চাকরি করতে যাবে কেন? চাকরির উপর থেকে চাপ কমবে। শহরের উপর চাপ পড়বে কম।

কালচার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচার। এই ছিল আমার মতো। আমি নিজেও একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাই নিয়ে থাকব। টলস্টয়ের অনুসরণে। কী দরকার কারো দাসত্ব করার! আমি যত বড়োই হই না কেন চাকুরে বলেই গণ্য হব। সাভিস মেন্টালিটি স্লেভ মেন্টালিটিরই ভদ্র নাম। স্বরাজ মানে কি আরো বেশী চাকরি? আরো বড়ো বড়ো চাকরি? না, স্বরাজ মানে আত্মসম্মানসম্পন্ন কৃষক ও শিল্পী।

কিন্তু দেখা গেল যাদের জন্যে স্কুল তারা অর্থাৎ গাঙ্গামহালের চাষী মুসলমানরা তাদের ছেলেদের চাষী করবে না, চাকুরে করবে। স্কুলের কৃষি ক্লাসে একটির বেশী ছাত্র নেই। সেটিও বামুনের ছেলে। পাশ করে চাষ করবে না, পড়াশুনায় কাঁচা বলে তার অভি-ভাবক তাকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছেন। সে পাশ করে বেরোলে ডেমনস্ট্রেটর হবে। এই একটি ছাত্রের জন্যে এত বড়ো আয়োজন! আমি দমে যাই। ওদিকে একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্কুলটাকে উঠিয়ে দিতে। আমার বদলীর পর সেটা বোধহয় দু'বছর বাদে উঠে যায়। আমার উৎসাহ চলে যায়।

ঢাকার অধ্যাপক শহীদুল্লাহ ছিলেন আমার পারি-সের আলাপী। আবার নতুন করে আলাপ জমে ওঠে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি যা বলেন তাঁর মর্ম চাষীর ছেলেরা তো বাপের সঙ্গে মাঠে গিয়েই চাষ শেখে। স্কুলে গিয়ে আর নতুন কী শিখবে! জমির উপরে চাপ খুব বেশী। চাষীর সব কটি ছেলের জন্যে এত জমিই বা কোথায়! সেইজন্যে চাষী তার ছেলেদের অন্তত একজনকে পাঠায় স্কুলে পড়াশুনা করতে। পাশ করে চাকরি নিয়ে শহরে যেতে।

তার মানে গ্রামের উপর চাপ কমবে। শহরে ভিড় বাড়বে। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা। বোঝা গেল কেউ চাষ করবে না। না হিন্দুর ছেলে, না মুসলমানের ছেলে। সবাই করবে চাকরি। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মারামারি। ভাগাভাগি। তখনো মালুম হয়নি যে ভাগাভাগি করতে করতে ঘটবে ভারতভাগ ও দেশভাগ।

এই ভেবে আমার দুঃখ হয় যে চাষীরা শিক্ষিত হলে চাষ করবে না, চাকরি করবে। আর অশিক্ষিত থাকলে শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, বাবুদের কাছে সম্মান পাবে না। পশ্চাদপদ থেকে যাবে। আমি ও প্রসঙ্গ ভুলে যাই। অন্য কাজে মন দিই।

বদলী হতে হতে একদিন যাই নদীয়া জেলায়। ভ্রমণসঙ্গী হই সার নাজিউদ্দীনের। তিনি তখন সার জন আণ্ডারসনের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার। ডিনার টেবলে বসে আমাকে চমকে দিয়ে বলেন, "আপনি শুনে সুখী হবেন যে গভর্ণমেণ্ট এতকাল পরে আপনার পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছেন। সেই যে গাজামহালের স্কুল।" ততদিনে আমার মন ভেঙে গেছে। গাজামহাল কোথায় আর আমি কোথায়! পরে আবার রাজশাহী জেলায় বদলী হই। কিন্তু আর বেলতলায় যাইনে।

দেশ প্রস্তুত ছিল না। কাল উপযোগী ছিল না। পাত্র বলতে যদি আমাকেই বোঝায় তো আমি সাতঘাটে বদলী হতে হতে বদলে যাই। অসময়ে চাকরিও ছেড়ে দিই।

নওগাঁর পর কতকাল কেটে গেছে। এক প্রদেশ দুই প্রদেশ হয়েছে। এক দেশ দুই দেশ হয়েছে। পরে আবার তিন দেশ। যোগাযোগ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের খোঁজখবর কতকটা রাখি। শিক্ষার খোঁজ-খবর রাখিনে। তবে মুক্তিযুদ্ধের পর বার বার তিনবার বাংলাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে শিক্ষার সমাচারও একটু আধটু পাই। সুযোগ পেলে মুখ ফুটেও দুটি একটি কথা বলি। গতবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা জমি তেপান্তরের মাঠের মতো ধূ ধূ করছে দেখে বলি, এখানে চাষ করা উচিত। ছেলেরাই করবে চাষ। কে কার কথা শোনে! সবাই চায় শহুরে শিক্ষা।

এবার সাভারের শহীদ মিনার দর্শন করে ওই পথ দিয়েই ফিরছি। সহযাত্রী এক ভদ্রলোক বলেন বাংলাদেশে এখন অগণিত কলেজ, কোনোটারই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, সরকার থেকে যা পাওয়া যায় তা মুষ্টিভিক্ষা। তাই কলেজের সংখ্যা কমিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠেছে। সেইসব কলেজই সাহায্য পাবে যাদের নিজেদের আয় আশাপ্রদ। তিনি যে কলেজের সঙ্গে সম্বন্ধ তার কর্মকর্তারা আশে পাশের সব জমি কিনে নিয়েছেন। সেখানে চাষ হবে। চাষে লাভ হবে। লাভের টাকা হবে কলেজের প্রধান আয়। সরকারী সাহায্য না মিললেও কলেজ দাঁড়িয়ে থাকবে নিজের পায়ে।

দিন দুই বাদে শিক্ষাসচিব আমাদের ডিনার দেন। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, সরকার স্থির করেছেন এখন থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হাইস্কুলেই কৃষি হবে একটি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়।

আমি চমৎকৃত হই। বলি, "আচ্ছা, আপনি কি জানেন এর প্রবর্তক কে?"

তাঁর জানার কথা নয়, কারণ আমি যখন নওগাঁয় তখন তিনি নবজাতক।

তিনি আমাকে সেদিন যে আনন্দ দেন তার তুলনা নেই। বলেন, "আপনিই। আপনার স্কীমের কাগজপত্র আমি দেখেছি।"

তিনবারের পর ভাষণ দিতে গিয়ে আমি প্রাণ ভরে ধন্যবাদ জানাই তাঁকে, তাঁর সরকারের শিক্ষা-বিভাগকে। কালচার আর আগ্রিকালচার ছিল আমার লক্ষ্য। এখন তাঁদেরও। আমার হাতে ক্ষমতা নেই। তাঁদের হাতে আছে। আমি বিশ্বাস করি তাঁরা সফল হবেন। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকেন। দেশকালপাত্র ভুলে গিয়ে আবেগের সঙ্গে বলি, "আমি কৃতার্থ। আমার জীবন ধন্য।"

---

* উপন্যাস

শক্তিপদ রাজগুরু

দেহ মন

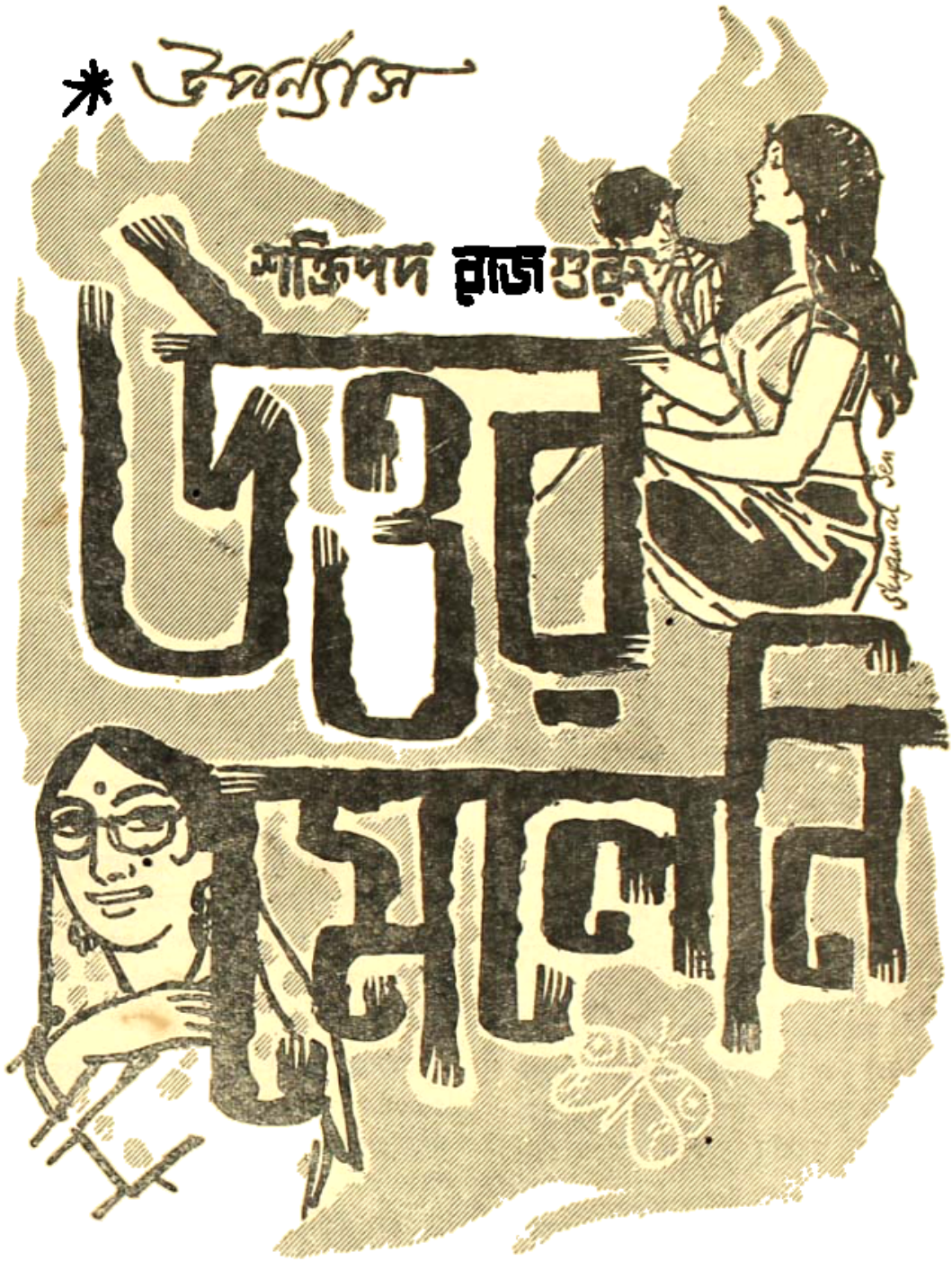

বিয়ে বাড়ির সানাই-এর নিজস্ব একটা সুর আর ছন্দ আছে যার বৈশিষ্ট্য সারা মনের অতলে একটা সাড়া আনে। অণিমার কাছে এই সুর এনেছে শুভেচ্ছা। একদিনের পরিচয়ের এই সুন্দর পরিণতিটা সেও সারা মন দিয়ে চেয়েছিল। তাই আজ অনুতোষ আর অণিমা ঘর বেঁধেছে। অবশ্য অনুতোষের বাবা সরশীবাবু গোঁড়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এককালে সংস্কৃতের মাষ্টার ছিলেন স্কুলে। প্রবীণ শ্রদ্ধেয় বাড়ি, বড়ছেলে

প্রাণতোষ মোটামুটি ভালো চাকরী করে, অনুতোষও এম-এ পাশ করে একটা পাবলিসিটি ফার্মে রয়েছে, ছোট ছেলে ভবতোষ এখন ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, আর ছোট মেয়ে করবী এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। মোটামুটি সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসার। সরসীবাবু অনেক কষ্ট আর অভাবের মধ্যেই সেদিন ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিলেন। আজ একটু সুদিনের মুখ দেখতে চলেছেন।

এমন সময় অনুতোষের খবরটা পান। স্ত্রী সরমাদেবীও দেখেছে অণিমাকে। অনুতোষের সঙ্গে ওদের অনেক দিনের পরিচয়।

অণিমার বাবা রতনবাবু ছিলেন ওদের অধ্যাপক, সেই সুবাদেই যাতায়াত ছিল। ছাত্রী হিসাবে অণিমাও ছিল কৃতী। আর এম-কম এ ভালো রেজাল্ট করে। রতনবাবুর বন্ধু মিঃ বোস-এর অনুরোধেই ওদের ব্যাঙ্কে চাকরী নেয়। আর অণিমা সেখানে আজ প্রতিষ্ঠিত।

রতনবাবু মারা যাবার পর অণিমা আর ওর ছোট ভাই নীলেশ দুজনের কিছুটা ভার যেন অনুতোষের উপরই এসে পড়ে। অণিমাও বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে অসহায় বোধ করে নিজেকে। তাই যেন অনুতোষের এই সাহায্যটুকুকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করে। নীলেশ তখন কলেজে ঢুকেছে।

অণিমার জীবনে অনুতোষও এমনি করে অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিল। দুজনে স্বপ্ন দেখেছিল—নোতুন একটি স্বপ্ন।

আর সেই খবরটা এ বাড়িতে আসার পর থেকেই সরসীবাবু চটে ওঠেন। তিনি জানান—এবাড়িতে এভাবে কোন বৌ আসেনি। আমি থাকতে সেটা সম্ভব নয়।

সরমা জানে কত্তাকে। এদিকে অনুতোষও কথাটা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে তারা বিয়ে করবে। সরমাও শুনেছে ব্যাঙ্কের অফিসার, মোটা মাইনের চাকরী করে। তাই সংসারে কিছু টাকার সাশ্রয় হবে। করবীও শোনায়, বিরাট চাকরী করে মা, ওই মেয়েটি। আমার সঙ্গে পড়ে।

মল্লিকার দিদিও বলছিল, সেও ওর আপিসে কাজ করে।

সরমা বড়ছেলে প্রাণতোষকে রাজী করিয়েছে। নইলে অনুতোষ হয়তো এ সংসারের বাইরে গিয়েই বিয়ে থা করবে। শেষ অবধি সরসীবাবুও সকলের কথায় বলেন,—জানি তোমরাই এতে মত দিয়েছো। তবে যা ভালো বোঝ করো প্রাণতোষ। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না।

অণিমাও কানাঘুসোয় কথাটা শুনেছিল। তবু অনুতোষের কথাতেই মত দেয় অণিমা। অনুতোষ বলে, সব ঠিক হয়ে যাবে অণিমা। জানি তুমি সকলকেই আপন করে নিতে পারো।

তাই এ বিয়েতে যেন অণিমার দায়িত্বই বেড়েছে অনেকখানি, তবু অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নি। সরসীবাবুও ছেলের বৌভাতের উৎসবে অতিথি অভ্যাগতদের মাঝে দাঁড়িয়েছেন, বড়ছেলে প্রাণতোষও রয়েছে। ছোটছেলে ভবতোষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তদারক করছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব মায় অণিমার ব্যাঙ্কের কিছু সহকর্মী অফিসার মায় জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বোসও এসেছেন।

তবু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কথাটা ফিসফিসিয়ে ওঠে। পিসীমা সাবধানী হিসেবী মহিলা, নাতিনাতনীদের নিয়ে সদলবলে এসেছেন। পুরোনো আত্মীয়দের সঙ্গেও দেখা হয়। আর ওদের কথাগুলো গুনগুনিয়ে ওঠে বিয়ের কনেকে দেখে।

সরমা ওকে আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালো, বড় বৌ সুতপাও দেখাশোনা করছে। পিসীমা এই ফাঁকে ছোট বোন লবঙ্গকে বলে।

ওমা! অনুর এই বৌ হল শেষকালে? বয়সের যে গাছপাথর নাই। তা দাদা শুনলাম রাজী হয় নি, দেখলাম মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট বোনও মন্তব্য করে—এসব কাণ্ড এবার হবে দিদি। শুনছি বৌ এর নাকি মোটা মাইনে দেখে বড়বৌদি হামলে পড়েছিল। দাদা আর কি বলবে? বললে শুনবে বৌদি? ওটিকে তো চেনো।

পিসীমা বলে—তা জাতে হচ্ছে না অজাতে রে ? পাতপেড়ে জাত খোয়াবো না তো ?

আলোচনাটা সরসভাবে জমে উঠেছে। হঠাৎ খাবার ডাক পড়তেই আসর ভেঙে গেল. কলরব ওঠে। পিসীমা উঠে নাতি নাতনীসহ স্বয়ং চাদর জড়ানো কত্তাকে বগলদাবা করে টানতে টানতে ছাদের খাবার জায়গার দিকেই পাতের সন্ধানে ছুটলো। গজগজ করে ছোট বোন।

এতদূর যেতে হবে. এই ব্যাচে না বসলে বাস পাবো না। পাতা দখলের জন্য তখন ছাদে মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলা সুরু হয়ে গেছে।

অণিমা ঠিক জানে না ওর অন্তরালের এই গুঞ্জনগুলো। বিয়েবাড়ির আলো আর উৎসবমুখর পরিবেশে আজ এগুলো অর্থহীন বলে মনে হয়। মিঃ বোসও এসেছেন। প্রবীণ সৌম্য চেহারা। অফিসের ক য়ে ক জ ন মেয়ে নিবেদিতা-লতা-মলিনা-স্বাতীও এসেছে। অণিমা খুশী হয়। সে উঠে এসে পিতৃবন্ধু মিঃ বোসকে প্রণাম করে—আপনি এসেছেন স্যার !

মিঃ বোস বলেন—রতন আজ নেই। তার মেয়ের বিয়ে, আজ আমি আসবো না ?

অনুতোষও পাশেই রয়েছে। অণিমার ইঙ্গিতে অনুতোষ কিছু বলার আগেই মিঃ বোস বলেন—তুমি ব্যস্ত হয়োনা অণিমা। জানোই তো আমার ওসব চলে না। অনুতোষ আছে নিবেদিতাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিক।

অনুতোষ ওদের নিয়ে চলে গেল। ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড় জমেছে। কলরবই জানায়—বৌদির ব্যাঙ্কের বড় সাহেব। বৌদিও ওখানের অফিসার কি না !

আলোচনা এইভাবেই হয় এদিকে ওদিকে। কেউ বলে,—লক্ষ্মী সরস্বতীকে একসঙ্গে ঘরে এনেছে ছোট কাকী। সরমা এসব কথা শোনে মাত্র। জানে সে এ বাড়ির কত্তার সেই নীরব প্রতিবাদকে। আজও তাই কাজের ফাঁকে সরমা স্বামীকে বলে—একটু দেখা-শোনা করো, ওপারে ওরা খেতে বসেছে, যাও একটু।

সরসীবাবু ক্লান্ত মলিন স্বরে বলে,—ওসব তো তোমরাই দেখছো। আমাকে আবার কেন ?

অনুতোষও দেখেছে এ বাড়ির মানুষগুলোর মনের অতলের সেই নীরব অসহযোগিতাকে। তারও কোথাও ভয় হয়। তবু উৎসবের সেই ঝড়টা কেটে গেছে। রাত্রি নেমেছে উৎসবক্লান্ত বাড়িতে। এদিক ওদিকে ছড়ানো—চেয়ার, গালচে আর ফুলের সাজ। ক্লান্ত মানুষগুলোর চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে।

ওদের আজ ফুলশয্যার রাত্রি। অণিমার জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত এই লগ্ন ! ঘরটাকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। কর্মব্যস্ত অণিমা এই নোতুন সাজে যেন অভ্যস্ত নয়, তাই এতক্ষণ ওইভাবে ঘরে সেজেগুজে বসে থাকার পর সেই সাজ পোষাকগুলোকে হালকা করেছে। মনে হয় ওর ছোট ভাইএর কথা। নীলেশও এসেছিল আজ। এতদিন ভাইবোন ছিল সেই বাড়িটায়। আজ সে চলে এসেছে নিজের ঘরে, নীলেশ রয়ে গেছে পুরোনো চাকর বহুর হেপাজতে। বাড়িটা শূন্য হয়ে গেছে। কথাটা নীলেশকে জানাতে, আজ নীলেশ উত্তর দিয়েছিল অণিমাকে-তোর সংসারের কথা এবার ভাব। আমার দিন ঠিক চলে যাবে ছোড়দি।

তবু বোনের উৎকণ্ঠা যায় না। অণিমা বলে—সাবধানে থাকবি। বিয়ের কনের বোধহয় ভাইএর সঙ্গে কথা বলার অধিকারও নেই আজ। সরমার নজর সবদিকে। নোতুন বৌকে বসার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাই-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখে সরমা বলে।

—ভাই তো পরেও আসবে বৌমা। আজ লোকজন আসছে—দেখবার জন্য, ওখানে বসোগে।

কথাটায় শাসনের কাঠিন্যও রয়ে গেছে সেটা নীলেশ অণিমারও নজর এড়ায় না। তাই নীলেশ বলে,

—তোর শালুড়ী—না রে ? ভেরি হার্ড ন্যাট্ টু ক্র্যাক : যা বসগে—পরে দেখা হবে। চলি অনুদা।

নীলেশ ফিরে গেছে।

অণিমার মনে হয় নোতুন পরিবেশে তার সেই স্বাধীন সত্তাটার এখানে প্রকাশ সঙ্কুচিত,সীমিতই হয়ে উঠবে। তবু এই জীবনকেই মেনে নেবার চেষ্টা করবে সে।

কি ভাবছো অনুতোষের কথায় চাইল অণিমা।

অনুতোষ বলে—এ বাড়ির মানুষগুলোকে কেমন লাগলো

অণিমা ছোট্ট জবাব দেয়—ভালোই।

অনুতোষ চেনে অণিমাকে। তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এবাড়ির অনেকেরই অমিল হতে পারে। তাই বলে।

—হয়তো ঠিক অন্য রকমও ঠেকতে পারে অণিমা। কিন্তু জানি তুমি সবাইকে আপন করে নিতে পারবে।

অণিমা অনুতোষের দিকে চেয়ে থাকে। তার শূন্য জীবনে অনুতোষ অনেক কিছু। এই একজনের মুখচেয়েই অণিমা সবকিছুকে মেনে নেবার চেষ্টা করবে, সুখী করতে চাইবে ওকে, নিজেকে। তাই অণিমাও আশ্বাস দেয়—তাই করবো।

অনুতোষ খাটের নীচে, আলমারির ওদিকে কি দেখে জানলাগুলো বন্ধ করতে থাকে। অণিমা অবাক হয়!

—কি দেখছো?

—উহুঁ জানোনা—এ সব অনেক করেছি। আজ ওরাও হয়তো কেউ আড়ি পেতে থাকতে পারে।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আলোটা নিভিয়ে অণিমাকে কাছে টেনে নেয়। অনুতোষ বলে—এবার ওই পথে গঙ্গার ধারে—বোটানিকস্-এ ঘোরাফেরার কামেলাটা কমলো। কম ঝকমারি গেছে তোমার জন্যে। মনে পড়ে নৌকায় দোলের দিন সেই আবীর দেবার কথাটা।

অণিমার মনে পড়ে পূর্ণিমার রাত্রি। জোয়ারে ফুলে উঠেছে গঙ্গার জল। নৌকার উপর তারা দুজনে। অনুতোষ সেদিন কাছে টেনে নিয়ে আবীরে মুখ মাখা ভরিয়ে দিতে চমকে ওঠে অণিমা।

—একি করলে? সারা সিঁথিটা যে ভরে গেল?

হাসছে অনুতোষ। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—সিঁথিটুকু এবার পাকাপাকি রাঙ্গিয়ে তুলতে চাই অণিমা।

কি এক স্বপ্নশিহর জাগে অণিমার মনে।

আজ সেই স্পর্শটুকুর মাঝে অণিমার শূন্যমন কি সার্থকতার স্বপ্ন দেখে?

তাই এবাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সুরু করেছে অণিমা। দিনকতক তার নিজের অফিসের ঝামেলা নেই। ছুটিতেই রয়েছে। অণিমা ভেবেছিল বিয়ের পর সে আর অনুতোষ দুজনে পুরী কিংবা দার্জিলিং কোথায় একটু নিরিবিলিতে ক'টা

কি ভাবছো? অনুতোষের কথায় চাইল অণিমা। (ফুলশয্যার রাত্রি)

দিন কাটিয়ে আসবে। কিন্তু বিয়ের সময় থেকেই অণিমা বুঝেছে এবাড়িতে এখনও সাবেকিআনাটা রয়েছে। পাঁচজনকে নিয়ে সংসার। তাই ওদের দুজনের এভাবে মধুচন্দ্রিমা যাপন করার ব্যাপারটা এখানে বেমানান।

তবু অনুতোষ বলেছিল—দোষ কি ?

অণিমা বলে—না, শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর বড়জা-ননদ-দেওর সবাই আছে, ওদের ফেলে রেখে দুজনের যাওয়া চলে না।

অনুতোষ হতাশ হয়ে বলে—সুরু হল সেই সাবিত্রীমার্কা ব্যাপার।

অণিমা হাসে। অনুতোষ তাই বলে—তাহলে দিনরাত বাড়িতে বসে কি করবো ? অপিসেই জয়েন করি।

একটু ক্ষুণ্ণ মনেই অনুতোষ অপিসে জয়েন করেছে ছুটি ক্যানসেল করে। সকাল থেকেই দেখছে অণিমা বিছানা হতে উঠে রান্নাঘরের দিকে যায়। বড়জা সুতপার কাজ সুরু হয়ে গেছে, এতগুলো মানুষের চা পর্ব আছে—সেসব শেষ হতে না হতেই অপিসের ভাতের পর্ব সুরু হয়। কলম বি উনোন ধরিয়ে বাসনের গোছ মাজতে মাজতে গজগজ করে—বাড়িতে লোকই বাড়ছে, আর কলমের মাইনে বাড়াতে গেলেই চোখ টাটায়।

সুতপার এইসময় অবকাশ নেই। করবী পড়াশোনার কেমন ঠিক এখনও জানে না অণিমা। তবে দেখেছে চা জলখাবার এইসময় সেও পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর শাশুড়ী শ্বশুরমশায়ের পুজোর যোগাড়, ওর জলখাবারের ছোলা ভিজে, আদাকুচি, কাঁচা হলুদের কুচি—আখের গুড় এই সবের যোগাড় করে, তবু হাত লাগাতেও হয় এদিকে। বাজার থেকে প্রাণতোষ বাজার-এর থলি নামিয়েই তাড়া দেয়।

—টাইম হয়ে আসছে।

সুতপা জবাব দেয়—আমার কি চারটে হাত ? সবুর করো ?

অণিমাই দেখে শুনে এগিয়ে আসে। এসব কাজ করা অভ্যাস নেই। তবু নিজেই তরকারি ধুয়ে কুটনো কুটতে বসে। সুতপা বলে,—মাছটা আলাদা রাখো অণিমা। কলমকে বলো কুটে দেবে।

অণিমার মনে হয়, তবু কিছুটা ওদের কাজে লেগে খুশী হয়েছে সে। সুতপা কোনরকমে রান্না সামলে বলে।

—তবু মেজো হাত লাগালে তাই হলো, একা তো দিশে বিশে পাই না।

অণিমা বলে—এসব তো করিনি এর আগে !

সুতপা একটু যেন অপমানিত বোধ করে অণিমার কথায়, তাই বলে,

—বাপের জন্মে এসব আমিও করিনি। এ বাড়িতে এসে এই করছি।

প্রাণতোষ সেজেগুজে অপিস বের হয়ে গেছে। অনুতোষ অপিস বের হবার মুখে অণিমাকে রান্নাঘরের সামনে তখন বাকী রান্নার কুটনো কুটতে দেখে এগিয়ে আসে।

অনুতোষ বলে—আরে বাব্বাঃ, এ যে সংসারের কাজে লেগেছো রীতিমত।

অণিমা হাসছে। হঠাৎ সরমা এপথ দিয়ে যাচ্ছিল, নোতুন বৌকে দেখে দাঁড়ালো, কোথাও নব-বধূর জড়তা-সংকোচ নেই। মাথার কাপড়টুকুও দেয় নি। সরমা বলে ওঠে।

—মাথার ঘোমটাটুকু দিতে হয় বাছা। এটুকুও শেখোনি।

না কথাগুলো বলে চলে গেল। অণিমা একটু বিব্রত বোধ করে, কিন্তু ঘোমটা দিতে গিয়ে মুখটাই ঢেকে ফেলে সে।

অনুতোষ বলে, এসব শিখতে হবে বুঝলে ?

অণিমা জানায়—হুঁ। তা অপিস থেকে দেরী করে ফিরো না। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসবে।

অনুতোষএর ক্লাব আড্ডার বাতিক ছিল। এবার যেন সেগুলোকেও শিকেয় তুলতে হবে। তাই অনুতোষ বলে—বিয়ে হতে না হতেই শাসন ! প্রথমে প্রেয়সী তারপর দারোগা ! কি বলো বৌদি। সুতপা এসে পড়েছে। তাকেই মধ্যস্থ মানে অনুতোষ। সুতপার যেন ব্যাপার ভালো লাগে নি। অনুতোষ চলে যেতে সুতপা বলে—এবাড়িতে যেখানে সেখানে নোতুন বৌএর বরের সঙ্গে কথা বলা মানায় না অণিমা।

অণিমা একটু বিব্রত বোধ করে—সত্যি কথাটা জানতাম না দিদি। সুতপা শোনায়—এবার থেকে জানার চেষ্টা করো।

কথাগুলো বলে সুতপা নীচে কদমের ডাকে নেমে গেল। মাছ কোটা হবে হিসেব মত, দেখিয়ে দিতে হবে কদমকে। না হলে গুণতিতে ভুলোবে না। অণিমা চুপ করে ভাবছে এবাড়ির নিয়মের কথা, এমন সময় সরমার ডাকে চাইল।

—উনুনে ডালটা ধরে গেল বোধ হয় বৌমা, গন্ধ পাচ্ছো না?

অণিমা তাড়াতাড়ি উঠে ডালে জল দিতে যাবে, শাশুড়ীর ধমকে বসলো জড়সড় হয়ে।

—বিয়ানা কাপড়ে ডালে জল দেবে? ওমা—জাতজেন্মো আচার বিচারও জানো না?

সবই আমার বরাত। যাক—আমি দেখছি।

সরমা ডালে জল দিতে দিতে বলে—যাও, চান টান করে কাপড় ছেড়ে ঠাকুর প্রণাম করে তবে জল খাবে।

অণিমা অপরাধীর মত উঠে গেল নিজের ঘরের দিকে।

সরসীবাবু মনোহর চাটুয্যের কাছে ঋণী রয়ে গেছে এখনও। অনেকদিনের বন্ধু ওই মনোহর। সামান্য ব্যবসা থেকে ধাপে ধাপে মনোহর এখন অনেক উপরে উঠেছে। অবশ্য মন্দলোকে দুচার কথা বলে তার সম্বন্ধে। সরসীবাবু তবু তার কাছে উপকৃত এটা সে নিজেও স্বীকার করে। অভীতে ছোট মেয়ের বিয়ের সময় সরসীবাবুর হাতে পয়সা নেই, অথচ সুপাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে, তখন মনোহরবাবুই বলেন,

—টাকা আমি দিচ্ছি সরসীদা।

সরসী অবাক হন্। বলেন—টাকা আমি শুধু-হাতে নোব না মনোহর, বরং আমি বাড়িটা বন্ধক রেখেই নিচ্ছি। আর বন্ধক থাকলে ছেলেদের টাকাটা শোধ দেবার চেষ্টা থাকবে হে।

মনোহরবাবু অবশ্যি আপত্তি করে নি। তবু ব্যাপারটা ওইভাবেই চলে আসছে। দুজনের বন্ধুত্ব রয়েছে, ছেলেরাও তখন রোজগার বাড়াতে পারে নি, ব্যাপারটা ওই গজেমজেই রয়ে গেছে।

মনোহরবাবুকে সব কাজেই আসতে হয় এবাড়িতে, কিন্তু অনুতোষের বিয়ের সময় বোম্বাই-এ জরুরী কাজে আটকে পড়েছিল মনোহরবাবু, তাই আসতে পারে নি, তবু ক'দিন পর ফিরেই নোতুন বউকে দেখতে এসেছে মনোহর এবাড়িতে।

অণিমা সবে স্নান সেরে অল্প প্রসাধনটুকু সারছে এমনসময় করবীকে ঢুকতে দেখে চাইল। করবীই জানায়।

—বৌদি একটু তৈরী হয়ে নীচে এসো, মনোহর কাকা এসেছেন।

অণিমা ঠিক চেনে না তাকে।

মনোহরকাকা—

করবী এবাড়ির ট্রেনিং মতই অবাক হবার ভান করে বলে—

ওমা! গুরুজনদের নাম করছো? যা বলেছো বলেছো। বাবা মার সামনে ওভাবে নাম ধরলে স্রেফ গর্দান চলে যাবে।

নীচে এসো! বাবার ঘরে। মনোহর কাকা বিরাট বিজনেসম্যান, বাবার বন্ধু। বিয়েতে আসতে পারে নি, তাই আজ এসেছেন। করবী খবরটা শুনিয়ে বের হয়ে গেল।

অণিমা এরই মধ্যে তৈরী হয়ে নীচে নেমে এসে শ্বশুরমশায়ের ঘরে ঢুকলো।

এগুলো এখন কষ্ট করেও রপ্ত করতে চেষ্টা করে। মনোহরবাবুকে প্রণাম করে—শাশুড়ীও একটু অবাক হয়ে চাইতে খেয়াল হয়, শ্বশুরমশায় আর শাশুড়ীকেও প্রণাম করে। মনোহরবাবু অণিমার হাতে দামী শাড়ির প্যাকেটটা দিয়ে আশীর্বাদ করে—সুখী হও মা। খাসা বৌমা হয়েছে সরসীদা!

অণিমাই বলে—সেদিন আসতে পারেননি, আজ মিষ্টিমুখ না করে যেতে পারবেন না কাকাবাবু।

মনোহরবাবু জানায়—আমাকে খর্চার খাতায় লিখে রাখো মা। তখন তো পড়ে রইলাম বোম্বাই-এ, ব্যবসার ঘানি টানছি।

তবু অণিমা এরই মধ্যে খাবার দাবার এনেছে। মনোহরবাবু চমকে ওঠেন—এতো কি খাবো মা?

...অণিমা তবু এবাড়ির রীতিনীতিগুলোকে মানতে চেষ্টা করে। মনোহরবাবুও দেখেছে মেয়েটিকে। অণিমা ভিতরে এসে কাজে মন দেয়। সরসীবাবুকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে মনোহরবাবু বলে—এখনও এটাকে মেনে নিতে পারো নি সরসীদা? বি লিবারেল, তাছাড়া বৌমাও বেশ ভালো মেয়ে।

সরসী বলে—সুখে থাক ভাই যে যার সংসার নিয়ে। আমার কি! তবে কি জানো ভেবেছিলাম তোমার ঋণটা শোধ দোব। তা হয়ে উঠলো না, ঋণীই রয়ে গেলাম। মনোহরবাবু ব্যাপারটাকে হালকা ভাবেই দেখে। তাই বলে—ওসব হবে। এ নিয়ে এত ভাবছো কেন।

সরসীবাবু ব্যাপারটাতে ভাবনাতেই পড়েছেন। অবশ্য মনোহরবাবুর কাছে এগুলো তেমন কিছু নয়। তার অনেক কাজ। তাই বলে—আজ চলি দাদা। পরে আসবো বৌঠান।

সরসীবাবুর মনে অনুতোষের এই প্রতিবাদের ব্যাপারটা কেমন অশান্তির সৃষ্টি করেছে। তাই যেন সংসারের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি মুক্ত থাকতে চান। সরমাও বলে, তোমার সব বাজে ভাবনা কেবল।

তবু এ সংসারের মানুষগুলোর দিন কেটে যায়। অণিমারও ছুটি ফুরিয়ে গেছে। এবার তাকেও অপিসে বের হতে হচ্ছে, আর এতদিন এ বাড়ির বৌ-এর মতই ছিল সংসারের কাজ নিয়ে—হঠাৎ সেই রূপটাও বদলে গেছে। আর এটা চোখে পড়ে এ বাড়ির সুতপা, শাশুড়ী সরমা, এমন কি কদম ঝিয়েরও।

অনুতোষের একটু বেলায় ওঠা অভ্যাস। আর উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে চায়ের কাপটা নিয়ে বসে কাগজও শেষ করতে সময় লাগে। তাই দেরী হয়ে যায় অপিসে, আজ অণিমাই তাড়া দিয়ে তোলে অনুতোষকে।

দেরী হয়ে যাচ্ছে, ওঠো। অনুতোষ অবাক হয়—আমাকেও বেরুতে হবে তোমার সঙ্গে?

অণিমার অসুবিধা বোধ হয়। নোতুন বউ অথচ বেরুতেও হবে তাকে। রক্ষণশীল পরিবারের চিন্তা ভাবনা সংস্কারের মাঝে অণিমা যেন একটা আলোড়ন এনেছে, তাই অণিমা বলে—তোমার খাওয়া হল না, আমি ফেরে অপিস বেরুবো এটা বিশ্রী ঠেকবে, প্লিজ—

অনুতোষও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উঠলো।

দুজনেই খেতে বসেছে, সুতপার মুখটা ভারি হয়ে আসে। কদিন তবু অণিমা হাতে হাতে ওকে সাহায্য করছিল, আজ থেকে সে যে ভিন্ন জাতের তার থেকে এটা যেন বুঝিয়ে দিয়েছে সুতপাকে। তবু সুতপা পরিবেশন করছে, সরমা ছেলেদের খাওয়ার সময় এসে থমকে দাঁড়ালো। এ দৃশ্য এ বাড়িতে নোতুন। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে খেতে বসেছে এটা দেখতে তারও খারাপ লাগে, তবু কোন রকমে বলে অনু, সারাদিনের খাওয়া, মাছ দিয়ে ভাত একটু ভালো।

অণিমা মাথা নীচু করে খেয়ে উঠলো। তারও অস্বস্তি বোধ হয়। কদম ঝি এবাড়ির পুরোনো লোক। সুতপা বলে—জায়গাটা মুক্ত করে নে কদম।

বুড়িও ব্যাপারটা দেখেছিল, তাই বলে—

—এ কেমন ধারা গো বড়দি! স্বশুর শাশুড়ী খেতে বইল, আর নোতুন বউ চললো খেয়ে দেয়ে জুতো পরে—

সুতপা তিক্ত স্বরে জানায়—তোর এসবে দরকার কী বাপু, অপিসের চাকরী মেজবৌ-এর টাইম মত যেতে হবে তো! কদম এঁটো তুলতে তুলতে গজগজ করে, ঘরের বৌও চল্লো চাকরীতে? মরণ দশা।

সরমার কানেও কথাটা গেছে, শুনেছেন সরসীবাবুও, তাই পুজোর ঘরে বসে কথাটা শুনে সরমার দিকে চাইলেন।

শুনেছো কথাটা?

সরমা বলে, তা কি করবো বলো? ছেলেকেও তুমি বলে দেখো। আমার হয়েছে জ্বালা।

সরমা নীরব রাগে জ্বলছে স্বামীর ওই কথাগুলো শুনে। নীচের রান্নাঘরের বারান্দায় এসে সুতপাকে করবীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওই চাপা রাগটা যেন বৌমার উপরই ফুটে ওঠে! সরমা বিষ কণ্ঠে বলে।

—আঁচ বয়ে যাচ্ছে বাছা। রান্নাবান্না সারো। কয়লার দর তো দেখছো, অপচয় করলে চলবে? যাও ভালটা চাপিয়ে দাও গে। আমি চান করে এসে ওঁর ভাতটা চাপাবো। সরমা আবার চলে যায়। এ বাড়িতে সেই যে সব এটা প্রচার করার জন্যই কাজের চেয়ে হাঁক ডাকই তাকে করতে দেখা যায়। সুতপা চলে করবীকে।

—একজন তো সেজে গুজে চাকরী করতে গেলো, আমি মরছি হেঁসেল ঠেলে। তাই বলছিলাম করবী পড়াশোনা কর, পাশ করলে চাকরী হবে, শ্বশুর বাড়িতেও দাম বাড়বে। নইলে আমার মত হেঁসেল ঠেলেই মরবি।

অণিমার কাছে এতদিন এই অফিসটাই ছিল আপনার ঠাঁই, অফিসের বেয়ারা থেকে সুরু করে বাবু, অনেক মহিলাকর্মীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়, আপার ডিভিশনের কেরাণী থেকে নিজের চেষ্টায় আর মিঃ বোসের সহযোগিতায় অণিমা আজ উপরে উঠলেও ওদের ভোলেনি। মহিলা অফিসার একজনই। তাই সাধারণ কেরাণী মহিলা-দের সঙ্গেও মেলা মেশা করে, সাবিত্রী প্রবীণা একটু বয়সে বড় হলেও অণিমার, সঙ্গে তার পরিচয়ের নিবিড়তা আছে। তাই বেশ কয়েকদিন ছুটির পর অফিসে ঢুকে অণিমা ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়। মহেশ তার নিজস্ব বেয়ারা, বয়স্ক লোকটাকে একটু সম্মান দেয় অণিমা, মহেশও তাই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে অণিমাকে।

কদিনেই বাঙ্কের উপর মহলে বেশ কিছুটা আলোড়ন উঠেছে, মিঃ বোস-এর নজর চারি দিকে। তরুণ কিছু অফিসারদের মধ্যে অভিজিৎকে তিনি পছন্দ করেন, ছেলেটি মার্জিত রুচি আর কাজের তাই তাকেই ওই বিশেষ কাজের ভার দিয়েছিলেন, অণিমা জয়েন করে বড় সাহেবের চেম্বারে যেতে মিঃ বোসও খুশী হন।

—এসেছো তাহলে? যাক খুশী হয়েছি অণিমা। বারবার রতনের কথাই বলে। ও বলতো—অণিমার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না বোস, তা আজ সবই হোল, সেইই রইল না।

অণিমা চুপ করে ওঁর কথাগুলো শুনছে। মিঃ বোস যেন একদিক থেকে মুক্ত মনের মানুষ, সহজভাবেই তিনি শুধোন।

—নোতুন শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে বলো? তবে নোতুন জায়গা এক আধটু মানিয়ে নিতে হবে।

অণিমাও যেন ওই লোকটিকে শ্রদ্ধা করে। তাই বলে।

—সেই চেষ্টাই করছি।

মিঃ বোস হাসেন, গুড। তবে কি জানো সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে তোমাকে শুধু দিয়ে যেতে হবে সকলের জন্য। কিন্তু নিজের জন্য চাইতে গেলে শুধু দুঃখই পাবে। অণিমা সেটা বোঝবার চেষ্টা করছে এবার। মিঃ বোস বলেন, এ ব্যাপারে চণ্ডীদাসের কথাটা করেছে।

সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

সকলের জন্য ভালোবেসে যা কিছু করতে হবে নিঃস্বার্থভাবেই। বিনিময়ে কিছু চাইলেই বিপদ, দুঃখই বাড়বে তাতে। কথাটা ক্রমশঃ বুঝছি এখন অণিমা।

অণিমা চুপ করে ওঁর কথাগুলো শুনছে, হঠাৎ অভিজিৎবাবুকে দেখে চাইল। অভিজিৎ দেখছে ওকে। অণিমা একটু যেন বিব্রত বোধ করে। মনে হয় সিঁথির সিন্দুর ওর মুখের ভাবটাকেই বদলে দিয়েছে। মিঃ বোস বলে ওঠেন, এসো

অভিজিৎ, এগুলো হয়েছে?

ফাইল-পত্র নিয়েই এসেছে অভিজিৎ। মিঃ বোস বলেন

—বুঝলে অণিমা, অভিজিৎ ইজ অলওয়েজ আফটার বিজনেস।

ব্যাপারটা জটিলতর হয়ে দেখা যায়। ক'দিন পরিশ্রম করে অভিজিৎ অনেক কিছুই বের করেছে, অনেক পার্টি ব্যাঙ্ক থেকে নানা ভাবে অনেক টাকা লোন নিয়ে সে সব শোধ দিচ্ছে না। মিঃ বোস বলেন—ওদের নোটিস করো। দরকার হয় কোর্টেই যেতে হবে। ব্যাঙ্কের টাকা এভাবে লোকসান দিতে পারি না। আর দরকার হয় এ ব্যাপারে অণিমাই তোমাকে সাহায্য করবে। অণিমা মিঃ বোসের দিকে চাইল। মিঃ বোস বলেন।

—একটা সেকশনের চার্জই নাও অণিমা। মানে সংসার পাতলে বেশী টাকারও দরকার। আর আমি জানি, যোগ্য হাতেই সেই চার্জ দিচ্ছি।

অণিমা তবু যেন ইতস্ততঃ করে—আমি কি পারবো স্যার!

হাসেন মিঃ বোস—পারবে। এনি ডিফিক্যালটি আই এম হিয়ার।

•

মেয়েদের রিটায়ারিং রুমেও খবরটা এসে পড়ে। অণিমার পদোন্নতির খবর। সাবিত্রীর বয়স হয়েছে, তবু প্রসাধনে সেই বয়সের ছাপটাকে ঢাকবার চেষ্টাও করেছে সে। আপন মনে একটা সোয়েটার বুনে চলেছে। ওদিকে নিবেদিতা—মলিনা—ইরা আরও কয়েকজন বলে—অণিমাদির প্রমোশন হল আবার!

ইরা বলে—স্বামী ভাগ্যে ওর পদোন্নতি। মিঃ বোস আছেন—

সাবিত্রী বলে—সি ডিজার্ভস্ ইট! যোগ্য সে।

ওরা সাবিত্রীর দিকে চাইল। ওর সোয়েটার বোনার একটা ইতিহাস আছে। মেয়েরা বলে—অফিসের ছেলে দু-একজনের সঙ্গে সাবিত্রী ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার জন্যই ওসব হয়। আবার সেই ছেলেটি সরে পড়লে ওই সোয়েটার বোনাও বন্ধ থাকবে কিছুদিন।

তাই ওকে আবার সোয়েটার বুনতে দেখে মেয়েরা হাসাহাসি করে আড়ালে। নিবেদিতাই খবরটা আনে—ডেসপ্যাচ-এর শীতল সেনকে নাকি ওর সঙ্গে ইদানীং দেখা যাচ্ছে।

সাবিত্রীর ওই মন্তব্যে তাই মেয়েরা চুপ করে যায়। কে জানে অণিমাদির কানেও তুলবে বোধহয় কথাটা। হঠাৎ ওরা অণিমাকে আসতে দেখে পরিবেশটাকে হালকা করে নেয়।

—এসো অণিমাদি। আর একটা খাওয়া পাওনা হল।

—কেন রে? অণিমা ওদের কথায় প্রশ্ন করে।

—কেন আবার নাকি প্রমোশন হল!

হাসছে ওরা। অণিমার প্রমোশনে ওরা তবু খুশী। কারণ মেয়েদের মধ্যে তবু ওই-ই এখানে তাদের সুবিধে-অসুবিধে দেখে কর্তৃপক্ষকেও বলে তাদের ব্যাপারে। চা এসে গেছে। ওদের কলরব শোনা যায়। ইরা বলে।

—কত্তা কি বল্লো অণিমাদি? বিয়ের পর বেশ জমেছে মনে হয়—হৈ হৈ করছে ওরা। সাবিত্রী গোলমাল যেন এড়াতে চায়। তাই সোয়েটারটা ব্যাগে পুরে সেকশনের দিকে চলে গেল। ওরাও হাসছে।

বাড়ির পরিবেশটা যেন এর তুলনায় অনেক গম্ভীর আর থমথমে। অণিমা আর অনুতোষ ফিরছে। বাড়ির কাছে এসে অণিমাকে খেয়াল করিয়ে দেয় অনুতোষ—এাই! দ্যাট ঘোমটা—অণিমা হাসতে হাসতে মাথার ঘোমটা তুলে অনুতোষকে বলে—তুমি পরে বাড়িতে আসবে।

—কেন? অনুতোষ অবাক হয়। অণিমা বলে—বাঃ রে, দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ঢুকবো, কেউ দেখলে কি ভাববে না?

•

অনুতোষও দেখেছে অণিমার এই অসুবিধে-গুলো। বাড়ির দু-চারটে মন্তব্যও কানে আসে তার। তাই অনুতোষ বলে।

—ওদের ভাবনা থামানো মুস্কিল।

—তবু চেষ্টা করতে হবে। অণিমা নিজেকে এসব সইয়ে নিতে চায়, তাই এগিয়ে গেল একাই বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা নেমেছে শহরতলীর বাড়িগুলোয়. দু-চারটে গাছগাছালি এখনও টিকে আছে। কিছু পাখীও কলরব করে। শঙ্খ বাজছে। সরমা কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। অণিমাকে দোতালায় উঠে আসতে দেখে চাইল। সরমা আপন-মনে গজগজ করে—সাঁঝ পিদীম জেলে ঘরের বৌ সংসারের কল্যাণ করবে, দেবতাকে প্রণাম করবে, তা নয় দিনকাল সব যেন বদলে গেলো।

হঠাৎ সরমা অণিমাকে দেখেছে ঠাকুর ঘর থেকে বের হয়েই আর আপাদমস্তক ওকে দেখে সরমা চমকে উঠে আর্তনাদ করে—ও মা। জুতো পরে সাতজাতের ছোঁয়া কাপড়ে ঠাকুর ঘর অবধি ঠেলে এসেছো? ওসব জুতো নীচে ছেড়ে ওদিক দিয়ে ঘরে যাবে। এদিকে নয়। যাও—হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে তবে এদিকে আসবে।

অণিমা মাথা নীচু করে নেমে এল। সেই অপিসের কর্তা স্থানীয় মেয়েটি এ বাড়িতে ঢুকে বদলে গেছে, শান্ত নিরীহ বউ-ই হয়ে থাকতে চায় তবু।

ভবতোষ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র, করবী এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। দুজনে পড়ার ঘরে হৈ-চৈ করছে। করবী কোত্থেকে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন এনে তাই খুলে ছবি দেখছে, ভবতোষ-এর সামনে বই-পত্র ছড়ানো। হঠাৎ বড়দাদা প্রাণতোষ ওদের ঘরে ঢুকে পড়েই ওদের ওই পড়ার নমুনা দেখে অবাক হয়। ভবতোষ অবশ্যি কোনরকমে সামলে নিয়েছে, আর হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে করবী। প্রাণতোষের দাদাগিরি ফলানো অভ্যেস। তাই বেশ কড়া স্বরেই বলে করবীকে।

—এই তোর পড়া হচ্ছে?

বইখানা কেড়ে নিয়ে প্রাণতোষ ধমকায়—পড়ার বই বের কর। কমাস পর পরীক্ষা, সে খেয়াল নেই।

প্রাণতোষও কদিন ধরে শুনেছে তার স্ত্রী সুতপার কথাগুলো। এতদিন এ সংসারে সুতপা একাই বৌ ছিল। এখন অণিমা এসেছে আর তার চালচলন আলাদা, বেশ হতে হয় তাকে। সুতপা তাই স্বামীকেও শোনায়—কি-গিরি করতে হবে আমাকে চিরকাল?

সুতপার কথাগুলোয় প্রাণতোষ চটেছিল, তাই বাবার ঘরে ঢুকেই শোনায়—এবারও করবী ফেল করবে। তাই বলছিলাম মা, মেজবৌমা তবু অপিস থেকে ফিরে করবীকে নিয়ে একটু বসতে পারে তো? সংসারের এ কাজটুকু অন্ততঃ দেখুক।

সরসীবাবু চুপ করে থাকেন। সরমাই বলে, —তাহলে তো অনেক কিছুই হতো বাবা।

সুতপা স্বল্পুরমশায়ের রাতের খাবারটা ঘরে এনেছে, রাতে সরসীবাবু একটু দুধ আর মিষ্টি খান। সেগুলো রাখতে থাকে। স্বামীর কথায় সুতপা যেন ফোড়ন দেবার জন্যই বলে—পারো তো একজন মাষ্টার রাখো!

প্রাণতোষ জ্বলে উঠে শোনায়—তোমার তো ফর্দ দিয়েই খালাস। এসব জোটে কোত্থেকে তা ভেবেছো?

কথাগুলো একটু জোর করেই বলেছে ওরা। অণিমা অপিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে একটু বিশ্রাম নেয়। বাতারাতের ধকলও কম নয়। অনু-তোষ একটা বই পড়ছিল, সেও শুনেছে অণিমাকে জড়িয়ে ওই কথাগুলো। তাই চেয়ে থাকে অণিমার দিকে। অণিমার মুখে বিবর্ণ বেদনার ছায়া। অনু-তোষ বলে—এ নিয়ে মনখারাপ করোনা অণিমা।

অণিমা চুপ করে কি ভাবছে। অনুতোষের মনে হয় সে নিজেই অপরাধী। অণিমা বলে—না, না। যা হয়, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে, দেখো।

পিসীমা বিয়েবাড়ির পর আবার বেড়াতে

এসেছে। আর এটাও বুঝেছে যে নতুন বৌ-এর উপর সরমা, সুতপাও খুশী নয়। এদের সংসারের ধুমায়িত অশান্তির খবরে পিসীমা মনে মনে খুশী হয়েছে। তবু মুখে বলে সরমাকে।

"পারো তো একজন মাস্টার রাখো।"

—এই তো আজকালের ব্যাপার বৌ। দুঃখ করে আর লাভ কি! সরমা বলে—তাইতো জ্বলছি ঠাকুরঝি। তবে কি জানো এ চোরের মায়ের কান্না, বলবারও কেউ নেই। চুপ করে সইছি, ছেলের বৌ—

পিসীমা তাক বুঝে তাই উসকে দেয়—না ভাই, চুপ করে ঘরে থাকলে জ্বালা বাড়বে আরও। সোজা কথা বলাই ভালো—না পোষায়—

হঠাৎ অণিমাকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল পিসীমা। দেখছে তাকে। অণিমার হাতে বগলে ব্যাগে কয়েকটা ছোট-বড় প্যাকেট। শাড়ি—সুতপার করবীর শাড়ি এনেছে। শ্বশুর শাশুড়ীর জন্যে এনেছে গরদের ধুতি আর শাড়ি। অণিমা গরদের ধুতিটা বের করে বলে—দেখুন তো মা, ঠকলাম কিনা। আশি টাকা দাম নিলে। বাবার—আপনার পুজোর ধুতি শাড়ি আনলাম। এগুলো দিদি-করবীর। এটা ছোট ঠাকুরপোর প্যান্টের কাপড়। মাইনে পেলাম, ভাবলাম নিয়ে যাই—সন্দেশের প্যাকেটটা রাখুন বড়দি।

সরমা অবাক হয়ে দেখছে অণিমাকে। বলে সে।

—আবার এসব কেন বাছা?

অণিমা সরমার হাতে টাকার একটা খাম দিয়ে বলে—সংসারের খরচ এটা রাখুন। আর করবীর জন্যে আমাদের পুরোনো মাস্টারমশাইকে বলেছি। কাল থেকে আসবেন বাড়িতে পড়াতে।

সরমা অবাক হয়ে শুনছে। জিনিষগুলো—টাকার খামটা হাতে নিয়ে বলে—যাও বাছা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বড় বৌমা—চা খাবার পাঠিয়ে দাও ওর ঘরে। উঃ, যাতায়াতের কি কম ধকল বাছা?

অণিমা জানায়, অপিসে প্রমোশন হল মা। এবার একটা গাড়িও ব্যবহার করতে দেবে। বাড়িতে ফোনও পাবো। করবী খুশী হয়—তাই নাকি!

সরমা বলে—যাও বাছা একটু জিরোও গে। ঠাকুরঝি একটু বসো ভাই, আমি এগুলো রেখে আসছি।

অণিমা উপরে চলে গেল। মনে হয়—এ বাড়ির হাওয়া বদলে গেছে। আর পিসীমাও দেখছে সেটা। সুতপা একটু অবাকই নয়—মনে মনে হিংসাও বোধ করে। আজ অণিমা কোন মন্ত্র-বলে যেন এ বাড়ির হাওয়াটাকে বদলে তার স্বপথে এনেছে। সুতপার এখানে কোন ঠাঁই নেই।

পিসীমা বলে ক্ষুণ্ণমনে—আজ চলি বাছা।

সরসীবাবু চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছিলেন। আজকাল বাইরে বের হন কম। শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে। করবীর বিয়েরও কিছু করতে পারেন নি। বাড়িটাও বন্ধকই রয়ে গেল। কোন কাজের কাজ

কিছুই হয় নি, ছেলেদের টাকা সংসারের ঠাট-বাট বজায় রাখতেই ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ সরমাকে ওই সব রাজ্যের জিনিষ নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইলেন তিনি। সরমা বলে—মেজবৌমা নিয়ে এল মাইনে পেয়ে, তোমার জন্যে গরদের ধুতি—আমার শাড়ি। বৌমা—করবীর জন্যে শাড়ি—ভবতোষের জন্যে প্যান্ট-এর কাপড়ও এনেছে। আর সংসারের খরচও দিয়েছে তিনশো টাকা।

সরসীবাবু চাইলেন স্ত্রীর দিকে। বলেন তিনি,—খুব খুশী হয়েছো দেখছি।

সরমা বলে—এবার নাকি গাড়িও পাবে। ফোন আসছে বাড়িতে।

সরসীবাবু বলেন—এসব আমি পছন্দ করি না বড়বৌ! কেমন বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

সরমা জীবনে এই সবই চেয়েছিল। তাই মনে হয় আজ ওর এই পাওয়ার ভাগ্যটাকে স্বামীও হিংসে করে। ওর এই এক বগগো মেজাজটাও ভালো লাগে না সরমার। তাই বলে—

—বাড়াবাড়ি কোথায় দেখলে বাপু! আর বলি—মেজবৌমাকে তুমি যেন দেখতে পারো নি। তাকে কি ফেলে দোব? সেও তো ছেলের বৌ।

একটা তেজের সঙ্গেই কথাটা জানিয়ে বের হয়ে গেল সরমা। সরসীবাবুর মনে হয় সরমার মনের জোরও কোথায় বাড়ছে। বেড়েছে প্রতিবাদের কাঠিন্য। চুপ করে থাকেন তিনি।

সরসীবাবু ভাবনায় পড়েছেন—কারণ জানেন বড় বৌমার মনেও এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাই নিয়ে হয়তো সংসারে অশান্তি আসাও বিচিত্র নয়। তাই ছোটটা যেন প্রাণতোষের উপর প্রথম পড়ে।

প্রাণতোষ দেখেছে সুতপাকে। সংসারের চাকাটাকে সেই-ই সবল রেখেছে। স্বামী হিসেবে তাকে কোন সহায়তাও করতে পারে নি। তাই সুতপার কথাগুলোকে মিথ্যা বলতে পারে না। এ বাড়িতে করবীর পড়ানোর জন্যে মাস্টার এসেছে। কিন্তু সংসারের রান্নার জন্য ঠাকুরও নেই। সুতপা বলে স্বামীকে,

—এ জোয়াল টানতে আর পারবো না। যা হয়, ব্যবস্থা দেখো।

অণিমাই তবু এ বাড়ির হালটা কিছু বদলেছে। ঠাকুর চাকরও এসেছে। তবু অণিমাও ছুটির দিন বড় জায়ের সঙ্গে বসে তরকারি কোটে, ঘরের কাজ দেখে। সরমা যেন নিষ্কৃতি পেয়েছে।

সেদিন সকালে অণিমা কাজকর্ম করছে সংসারের। মাসকাবারি বাজারের ডাল-মশলা বেছে রাখছে, করবী এসে শোনায়—বাবার বসার ঘরে একজন লোক এসেছেন বৌদি, তোমাকে খুঁজছেন। লোকটা বিরাট গাড়ি থেকে নামলো। অণিমা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে বলে—ছুটির দিন আবার কে এল? চলতো! করবীর সঙ্গেই এগিয়ে গিয়ে বসার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো অণিমা। —আপনি! এখানে?

সরসীবাবুই ভদ্রলোককে বসিয়েছেন। আর বাইরের লোক এসে এ বাড়ির বৌ-এর দেখা করতে চাইবে এটা ভাবতেও পারেন নি তিনি। লোকটার সঙ্গে একজন বাহক বিরাট একটা ডালি সাজিয়ে এনেছে। রকমারী ফল, জিনিষপত্র, দামী শাড়ির প্যাকেট দেখে অণিমা বলে ওঠে—ওসব কেন এনেছেন?

শেঠজী বিপদে পড়েই এসেছে। ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট-এর টাকার নোটিস গেছে তাই ভেট দিয়ে খুশী করতে এসেছে এখানে। অণিমা কড়া-স্বরে বলে—ওগুলো উঠিয়ে নিয়ে যান।

শেঠজী বলবার চেষ্টা করে—মানে নিয়ে এলাম!

—না! অফিসের ব্যাপারে বাড়িতে দয়া করে আসবেন না। আর ওই ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

অণিমা যেন কঠিন তেজস্বী একটি মেয়েতে পরিণত হয়েছে। ভদ্রলোক চুপে চুপে সরে গেল।

করবীই বলে।—বাড়িতে এত এত জিনিষ এনেছিল মা। বৌদি দাবড়ে তাকে ফিরিয়ে দিলে। ইয়া আম—আনারস—আপেল—লাড়ি—সন্দেশ।

সরমা বলে—বাড়ি থেকে লোককে এভাবে যেতে বলো কেন বৌমা? অণিমা এসব পছন্দ করে না। তাই বলে—লোকটা অনেক টাকা ঠকিয়েছে।

অণিমার খেয়াল হয়, সরমা সরসীবাবুকে নিয়ে ওর গুরুদেবের কাছে যাবে—অণিমাই অফিসের গাড়ি বলে দিয়েছে। সরমা আজকাল প্রায়ই বের হয়। অবশ্য সরসীবাবু আপত্তি করেন। —এসবে কি দরকার?

সরমা বলে—বেরুতে পারবে নাহলে? তাই বলি একটু চুপ করে থাকো। আজকাল দিন বদলেছে, এটাকে মেনে নিয়ে শান্তিতে থাকতে দাও।

কিন্তু অশান্তির কালো মেঘটা কোথায় আকাশে জমা হচ্ছিল তা কেউ ভাবে নি। সেদিন সকালে ফোনটা বাজছে। সরসীবাবু ধরেন, মনোহরবাবু কথা বলছে। একথা সেকথার পর মনোহরবাবু বলে—একটু মেজ বৌমাকে ডেকে দাও সরসীদা।

অণিমার অফিসে যাবার তাড়া সুরু হয়েছে। ওদিকে অনুতোষের স্নান হয়ে গেছে। অণিমা কোনরকমে স্নান সেরে বেরুতেই করবী খবর দেয় —মনোহরকাকা ফোন করছে বৌদি।

চমকে ওঠে অণিমা—উনি! এখন তো অফিস বের হচ্ছি—যেন এড়াতে চায় সে। তবু সরমার কথায় যেতে হয়। সরমা বলে—একবার দাখো না—কি বলছে।

অণিমা জানে কেন তিনি ফোন করছেন। তাই এড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু না পেরে বাধ্য হয়েই ফোন ধরে জানায় অণিমা। —এখন তো সময় নেই, না—না। বাড়ীতে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলার নেই! না—

ফোনটা নামিয়ে দেয় অণিমা। সরসীবাবু দেখেছেন ব্যাপারটা—অণিমাও হঠাৎ যেন কঠিন-ভাবেই মনোহরের সব কথা না শুনে জোর করে অভদ্রর মত ফোনটা নামিয়ে দিয়েছে। সরসীবাবু বলেন—ফোনটা কেটে দিলে?

অণিমা ওর দিকে চাইল। সরসীবাবু বলেন কঠিন স্বরে। —এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান তোমার আছে ভেবেছিলাম।

অণিমা কি ভাবছে।

অনুতোষের খাওয়া হয়ে গেছে। ওদিকে অণিমার গাড়ীর হর্ন শোনা যায়। দেরী হয়ে গেছে। দশটা বাজে। অণিমা শাড়িটা বদলে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে এল নিজের ঘর থেকে। খাবারও দেওয়া হয়েছে টেবিলে, কিন্তু সময় নেই। তাই অণিমা সুতপাকে বলে—অনেক দেরী হয়ে গেছে দিদি। অফিস ক্যানটিনেই খেয়ে নোব এখন।

কোনরকমে বের হয়ে গেল। খাবার পড়ে থাকে টেবিলে। ব্যাপারটা করবীও দেখেছিল বাইরের ঘরে। বৌদি ফোনটা নামাতে বাবাও বেশ কড়াভাবেই কথাটা বলেছে বৌদিকে। বৌদি গুম হয়ে ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। সরমা ঠাকুরঘর থেকে বের হয়ে এসে খাবার পড়ে থাকতে দেখে সুতপাকেই বলে—বৌমা না খেয়ে বেরিয়ে গেল? সারাদিন না খেয়ে থাকবে, তুমি বলতে পারলে না? আর বাপু—এতই যা দেরী হয় কেন? ঠাকুর রয়েছে —একটু তাড়া দিতে পারো না, করো কি বাছা?

সুতপা জানার একটু বাঁকানো স্বরে, বাবা কি বলেছেন—না বলেছেন আর অমনি মেজ খাবার ফেলে বের হয়ে গেল।

সরমা অবাক হয়—তাই নাকি?

করবীও কথাটা জানতো। সরমা আজ চটে ওঠে। দেখেছে অণিমা এ বাড়ির ছেলেদের চেয়েও বেশী টাকা দেয়, জিনিষ আনে। তাকে ওই কত্তা দেখতেই পারে না। সরমাও আজ যেন স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে একটা বোঝাপড়া করতে চায়। এমনি ভাব নিয়ে সরসীবাবুর ঘরে ঢুকে মনোহরবাবুকে দেখে থামলো। ওর সামনে এসব কথা বলতে চায় না। বরং মনোহরবাবুর কথা শুনে একটু অবাক হয় সরমা।

মনোহরবাবু কি যেন জরুরী দরকারে মেজ বৌমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তাকে বাড়িতে না পেয়ে মনোহরবাবু বলে—দেখি, ওদিকে তো যাচ্ছি। অপিসেই দেখা করবো। বসার সময়ও তার নেই। মনোহরবাবু অন্য দিন বসে—কথাবার্তা হয়। আজ সে দাঁড়ালো না। বের হয়ে গেল।

সরসীবাবু বলেন—মনোহরকে একটু চঞ্চল দেখলাম। কি যেন হয়েছে ওর?

—কে জানে বাপু! সরমা বলে ওঠে—নিজের সংসারের জ্বালায় জ্বলছি। আর তুমিও হয়েছো তেমনি। কি বলেছো মেজ বৌমাকে—বেচারা না খেয়ে বের হয়ে গেল অপিসে।

সরসীবাবু তবু নোয়াতে চান না। তিনি বলেন, মনোহরকে বৌমা অপমানই করেছে বড় বৌ, তাই বলেছিলাম কথাটা। আর জানোই তো মনোহরকে চটাতে চাই না আমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই।

সরমা ব্যাপারটা জানে। আর মনোহরবাবুর বৌমাকে খোঁজার কারণটাও কেমন যেন ভালো লাগে না তার।

মনোহরবাবু এতদিন নানা কৌশলে ব্যাঙ্কের তাগিদকে এড়িয়ে এসেছে। অপিসেও কিছু একটা ব্যবস্থা করেছিল সে। কিন্তু এতদিন ধরে যেভাবে চলেছে এবার তাতে আর ফল হয় না। ব্যাঙ্ক নোটিশ দিয়েছে কোর্ট থেকে। পনেরো দিনের মধ্যে টাকা মিটিয়ে দিতে হবে—না দিলে বিষয় সম্পত্তি এ্যাটাচ করেই টাকা আদায় করা হবে।

অপিসের হেড ক্লার্ক জানায়—এতকাল জানলে তো এসব করিনি স্যার। যান ওর কাছে। ওরাই তো সব।

মনোহর তাই অনেক আশা নিয়েই অণিমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সাজানো চেম্বার, ঝকঝক করছে বিরাট টেবিল। অণিমা কাজ করছিল—মনোহরবাবুকে দেখে চেয়ে বসতে বলে।

মনোহরবাবু পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে জানায়। —তুমি থাকতে আবার এটা কেন বৌমা?

অণিমা চা আনতে পাঠিয়েছে ওর জন্য। কিন্তু চিঠিখানা দেখে অণিমার মুখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। অণিমা জানায়।

—এতকাল ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ফার্মের নামে প্রায় দেড় লাখ টাকা নিয়ে কিছুই শোধ দেন নি। ব্যাঙ্ক বাধ্য হয়েই কোর্টে গেছে—মনোহরবাবু জানেন ব্যবসার অন্ধকার পথটা তাই বলে।

—একটু সময় দাও বৌমা!

অণিমা জানে এটা ওর অজুহাত মাত্র। এত বছরেও কিছু দেয়নি, এখনও সময় নিয়ে ওটাকে ঝুলিয়ে রাখতে চায়। অণিমা বলে, কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাতে আর নেই।

মনোহর জানে কিভাবে কথা বলতে হয় এ ব্যাপারে। তাই গলা নামিয়ে বলে—তুমি ইচ্ছে করলেই হবে, আর তার জন্য ধরো হাজার পাঁচেক টাকা দিচ্ছি—ওটা তোমাকেই দিচ্ছি বৌমা!

অণিমা চমকে ওঠে ওই টাকার কথায়। এ যেন তাকে অপমানই করতে চায়। তাই বলে অণিমা জ্বালাভরা কণ্ঠে—বৌমা বলবেন না, অপিসে মিসেস চ্যাটার্জিই বলবেন।

চমকে ওঠে মনোহরবাবু। অণিমা যেন রূঢ়-ভাবে তাকে শাসনই করেছে। অণিমা বলে—ওসব আমার স্বারা হবে না।

মনোহর তবু নির্লজ্জের মতো জানায়—না হয় আট হাজারই দেবো।

মনোহর জানে একবার হাতে আনতে পারলে এ টাকা তার উঠে আসবে কদিনেই। অণিমা দেখছে লোকটাকে। ওর ঘৃণ্য স্বভাবের পরিচয়ও পেয়েছে। অণিমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মনোহরের মনে হয় টোপ গিলেছে, তাই একটু বেশী লোভই দেখিয়ে ব্যাপারটাকে পাকা করতে চায়। তাই মনোহর বলে। —বুঝেছি, আরও দু-একজনকে দিতে হবে। তাহলে ওই দশ হাজারই রইল। সপ্তে হাজার চারেক আছে— টাকাটা বের করতে যাবে মনোহর, অণিমার কড়া কণ্ঠস্বরে মুখ

তুলে চাইল। অণিমা উঠে পড়েছে, স্থির কণ্ঠে বলে সে।

—দয়া করে আপনি আসুন! ভেবেছেন ঘুষ দিয়েই সব কাজ করানো যাবে? দয়া করে আসুন আপনি!

মনোহর চমকে ওঠে। ভেবেছিল কাজ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন বিপরীত কথা শুনে মনোহর চটে উঠেছে। লোকটা ধীরে ধীরে উঠে বলে—কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না মিসেস চ্যাটার্জি! চলি—

মহেশ বেয়ারা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে দেখে মনোহরবাবু রাগের সঙ্গেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অণিমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ তাকে কর্তব্যের খাতিরে একটা কঠিন কাজই করতে হয়েছে। ওই ধূর্ত লোকটার জন্য এতটুকু দয়া তার নেই।

সরসীবাবু ভাবতে পারেন নি যে ব্যাপারটা এতদূরে গড়িয়েছে। মনোহরও আজ এখানে নিদারুণভাবে ব্যর্থ আর অপমানিত হয়ে অণিমাদের পরিবারের উপর চরম আঘাত হানার জন্যই তৈরী হয়ে এসেছে।

সরসীবাবু ভাবতে পারেন নি যে এতদিনের বন্ধকী সেই দলিলটাই আজ তাঁদের সর্বনাশের মূল হবে। মনোহরবাবু আজ এসে সেই কথাটাই জানান কঠিনভাবে। সরমা-সরসীবাবু প্রাণতোষও এসে জুটেছে। মনোহরবাবু আজ জানান—ব্যাঙ্ক-এর নোটিশ পাঠিয়েছে তোমার বৌমা, অপিসে গেলাম বলতে, তা সে বলে, বৌমা বলবেন না বলুন মিসেস চ্যাটার্জি। আরও বলে—আমি নাকি জোচ্চোর। জাল কোম্পানীগুলো খাড়া করে ব্যাঙ্ককে দেড় লাখ টাকা ঠকিয়েছি। টাকা না দিলে প্রপার্টি এ্যাটাচ করে নেবে। পথে দাঁড়াতে হবে।

সরসীবাবু অস্ফুট আর্তনাদের স্বরে বলেন—তাই আমাদের পথে দাঁড়াতে হবে? বাড়ি বিক্রি করে দেবে তুমি?

মনোহর বলে—এছাড়া পথ কি? সুদে মূলে তিরিশ হাজার টাকা হয়েছে। দিতে পারো—বাড়ি তোমারই থাকবে। না পারলে দশদিনের মধ্যে টাকা জমা দিতে হলে বিক্রি করা ছাড়া পথ কি সরসীবাবু!

সরসীবাবু আর্তনাদ করেন—এত টাকা কোথায় পাবো?

—তাই বলছি বাড়ি ছেড়েই দিন। মনোহর আজ কঠিন নির্মমভাবেই কথাটা জানিয়ে যায়।

সরমা বলে—এসব কি? এবার—

সরসীবাবু তিক্ত কণ্ঠে বলেন—তখনই বলেছিলাম বড় বৌ, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই ছন্নছাড়া মেয়েকে ঘরে এনো না। এখন বৃদ্ধ বয়সে শেষ আশ্রয়টুকুও হারাতে হবে?

প্রাণতোষ-সুতপাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। সামনে তাদের সর্বনাশা বিপদ। কোনভাবেই নিষ্কৃতির পথ দেখে না তারা। সরসীবাবু আজ এতদিন পর যেন বলার পথ পেয়েছেন, অণিমার জন্যই যে তাদের পরিবারের এই সর্বনাশ এসেছে এইটেই কঠিন সত্য রূপে দেখা দেয়।

সরমারও মনে হয় কথাটা মিথ্যা নয়। একদিনের আঘাতেই মনোহর আজ এদের পরিবারের সামনে অণিমার সব সম্মানকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

সারা বাড়িটায় নেমেছে স্তব্ধতা। আলোগুলো সব জ্বলেনি। কি সর্বনাশা অন্ধকারের ছোঁয়া ঘিরেছে বাড়িটাকে। স্তব্ধতা নেমেছে। অণিমা আর অনুতোষ বাড়ি ফিরে একটু অবাক হয়। আলোও জ্বলেনি। করবীর কলরবও স্তব্ধ। কি বিষাদের অন্ধকারে আর স্তব্ধতায় বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে গেছে।

বারান্দা দিয়ে ওরা দুজনে উঠে আসছে। বাবার ঘরের সামনে আসতে সরসীবাবুর কঠিন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—শোনো।

অণিমা অনুতোষ চাইল ঘরের দিকে। সকলেই চুপ করে রয়েছে।

সরমা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুতপার চোখে কঠিন চাহনি ফুটে ওঠে। অণিমা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। সরসীবাবুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—মেজ বৌমা এ বাড়ির এতবড় সর্বনাশ না করে পারলে না? আমিই তোমার এ বাড়িতে আসার প্রতিবাদ করেছিলাম—তাই কি এভাবে প্রতিশোধ নিলে?

অণিমা চমকে উঠে—কি বলছেন বাবা?

অনুতোষও অবাক হয়েছে। সরসীবাবু বলেন—মনোহরকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো যা তা বলে। ওর কাছে এ বাড়ি বন্ধক ছিল, আজ সে সেই অপমানের জন্যে আমাদের এখান থেকে উৎখাত করে দিতে চায়। তার তিরিশ হাজার টাকা দশদিনের মধ্যে দেবার সাধ্য আমার নেই—তাই বৃদ্ধ বয়সে পথেই দাঁড়াতে হবে তোমারই জন্যে।

অণিমা ব্যাপারটা জানতো না। সবই বুঝতে পারে এবার। মনোহরবাবুর মত লোক এ কাজও করতে পারে সহজেই। তাই অণিমা বেদনাভরা কণ্ঠে বলে—আমি দেখছি বাবা। যেভাবে হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতেই হবে। বিশ্বাস করুন—এসবের কিছুই জানতাম না আমি।

প্রাণতোষ বলে, তাই দ্যাখো—যদি একটা সুরাহা হয়। নাহলে কি যে হবে জানি না।

অণিমা বের হয়ে এল নিজের ঘরে। ও ঘরে তখনও সরসীবাবুর গলা শোনা যায়। আজ লোকটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে স্তব্ধ বাড়িটায়। মানুষগুলোর চোখে যেন ঘুম নেই। অণিমা কি ভাবছে। অনুতোষ-এর ঘুম আসেনি। অণিমার মনে হয় একটা পথ সে বের করতে পারবে। এতদিনে এ বাড়ির একজন হয়ে গেছে সে। সরসীবাবুকেও দোষ দিতে পারে না। কারণ সর্বস্ব হারাবার যন্ত্রণা অনেক। তাই ওরা সকলেই মুষড়ে পড়েছে। অণিমা পারে ওদের হারানো এই আশ্বাসটুকুকে ফিরিয়ে দিতে।

অনুতোষ অণিমার কথায় চাইল, —এ কি বলছো তুমি?

অণিমা বলে—তাই করবো ভাবছি। মনোহরবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিলে এ বাড়ির দলিল তিনি ফিরিয়ে দেবেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুতোষ বলে—কি করে করবে? এতগুলো টাকা!

অণিমা হাসল—দেখা যাক চেষ্টা করে। ব্যাঙ্কে কিছু লোন নোব, আর বাকী হাজার দশেক টাকা নীলেশের ওখান থেকেই নোব। বাবার সব টাকাটাই রয়েছে এখনও।

অনুতোষ অবাক হয়ে দেখছে অণিমাকে—এত বড় ঝুঁকি নেবে একা?

অণিমা হাল্কা স্বরে জানায়, না হয় নিলামই।

কথাটা মিঃ বোসও শুনে অবাক হন। অণিমা ব্যাঙ্কে কুড়ি হাজার টাকার লোন-এর দরখাস্ত করেছে। মিঃ বোসের কথায় অণিমা বলে—বাড়িটা মর্টগেজ ফ্রি করে নিতে চাই। মাসে মাসে সুদ যা লাগে সেটা তো বাঁচবে।

মিঃ বোস বলেন, কিন্তু ওঁরা সকলেই থাকতে—তুমি একা এতগুলো টাকার দায়িত্ব নেবে? ব্যাঙ্ক টাকা লোন দেবে তোমাকে, তোমাকেই মর্টগেজ ফ্রি করে নিতে হবে তোমার নামে—অণিমা জানে ওটা। আর একটা কাগজে ওই আনুষ্ঠানিক নামের ব্যাপারটা থাকবে মাত্র। লোন শোধ হয়ে গেলে ওই কাগজখানাও বাতিল করে দেবে। অণিমা বলে—

—আইন-এর জন্য আমার নামটাই থাকবে, কিন্তু ও বাড়ি ওদের সকলের। আমার একার কোন স্বার্থ, লোভ ওতে নেই।

—তবে কেন একা ঝুঁকি নিতে চাইছো? মিঃ বোস প্রশ্ন করেন।

অণিমার মনে পড়ে ওরই কথাটা। তাই অণিমা বলে—

—আপনার সেই কথাটাই সত্য বলে ভেবেছি। সংসারে সকলের জন্য সবই করতে হবে। বিনিময়ে কোন কিছুর প্রত্যাশা করো না। আমি কোন প্রত্যাশা নিয়েই এটা করছি না সার!

অণিমার কথায় মিঃ বোস অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকেন। ওর ত্যাগ আর সহনশীলতা মিঃ বোসকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেন—ঠিক আছে। তিন-চারদিনের মধ্যেই চেকটা পেয়ে যাবে।

নীলেশও কথাটা শুনে বলে—টাকা নিবি নিয়ে যা ছোড়দি। তবে একটা কথা বলবো?

অণিমা নীলেশের দিকে চেয়ে থাকে। পিঠোপিঠি ভাইবোন। নীলেশ বলে, বরং আরও বেশী কিছু টাকা নিয়ে নিজেরা নতুন একটা বাড়ি করে সরে আয়, ওই মার্কেট-এর মধ্যে কি করে যে বাস করিস তোরা?

হাসছে অণিমা, নীলেশের কথাবার্তা অমনিই। অণিমা বলে—এম-এ দিচ্ছিস, এ জ্ঞানটুকু নেই? সংসার-এর বাইরে কি করে আসি বল?

নীলেশ জানে তার ছোড়দিকে। অনেক সইতে পারে ও। তবু কোন প্রতিবাদ করবে না। সইছেও। তাই নীলেশ বলে—তবু একদিন আসতেই হবে রে। যাক গে—চেকটা নিয়ে যা। দশে হবে তো?

অণিমা বলে—বাকী টাকা ম্যানেজ করেছি। ওতেই হবে।

মনোহরবাবু এর মধ্যে খদ্দেরও পেয়ে গেছে ওই বাড়ির। দরও প্রায় পঞ্চাশ হাজার উঠবে বলে মনে হয়। কর্তক ছিল হাজার কুড়ি টাকায়—সুদে আসলে তিরিশে দাঁড় করিয়েছে, আর বিক্রী করতে পারলে আরও নগদ কিছু টাকা আসবে। কিন্তু অনুতোষ আর অণিমাকে আসতে দেখে চাইল। অনুতোষই বলে—টাকাটা আমরাই দিচ্ছি কাকাবাবু, তিরিশ হাজার টাকা। বাড়িটা আমরাই রাখবো।

মনোহরবাবু রীতিমত ঘাবড়ে যায়। এতগুলো টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তাই বলে—কিন্তু খদ্দেরও আসছে—

অনুতোষ বলে—বন্ধক রেখেছি আমরা, টাকা দোব ছাড়িয়ে নোব। বিক্রীর অধিকার তো দিই নি।

মনোহর অণিমাকে দেখছে। জানে মেয়েটি তাকে আরও বিপদে ফেলতে পারে। তাই ধূর্ত মনোহর আর কথা না বাড়িয়ে বলে—না না। তোমাদের বাড়ি তোমাদেরই থাক। টাকাটার দরকার তাই বলেছিলাম।

অনুতোষ বলে, কালকেই টাকাটা দিয়ে দলিল ফেরৎ নোব। আর ওটা অণিমার নামে করে দিতে হবে।

অণিমাই বলে—ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিচ্ছি, দলিলটা ব্যাঙ্ক দেখতে চাইবে। তাই আইনরক্ষার জন্য ওটা করতে হবে।

মনোহরবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি ভেবে জানায়—তাই দোব। কালই এসো তাহলে।

অনুতোষ বলে, বন্দক রেখেছি আমরা টাকা দেবো ছাড়িয়ে নেবো।

অনুতোষ অণিমা নিশ্চিন্ত মনে বের হয় ওখান থেকে। বাড়িতে ওরা এইভাবে বাড়িটাকে মনোহরবাবুর হাত থেকে মুক্ত করার সব কথা বলেনি। অণিমাই বলেছিল—টাকাকড়ির যোগাড় হয়ে যাক, মনোহরবাবুর সঙ্গে কথা বলে সব ব্যাপার চুকিয়ে একেবারে গিয়ে বলবো মা-বাবাকে। ওদের মনের মেঘটা কেটে যাবে। এ বাড়ির পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। অণিমা এই মিষ্টি স্বপ্নটা দেখছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর আগেই মনোহরবাবু নিজে এসেছে ওই গোপন কথাটা জানাতে। সে চায় না অণিমা বাড়িটা মুক্ত করুক, আবার তাদের সংসারে শান্তি আসুক। মনোহরবাবু অণিমার ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্যই সরসীবাবুর বাড়িতে এসে কথাটা জানায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মনোহরও জানে এই চালে বাজী মাৎ হয়ে যাবে। মানুষের দুর্বলতম ঠাঁইটার সন্ধান সে জানে, আর সুবিধামত সেখানেই চরম আঘাত করে কাজ উদ্ধার করতেও জানে মনোহরবাবু।

সরসীবাবু সরমা প্রাণতোষ সুতপাও এসেছে কথাটা শুনে। সরসীবাবু ভাবতেই পারে না যে মানুষ এত নীচ হতে পারে। মনোহরবাবু বলে চলেছে নিপাট ভালোমানুষের মত।

—তাই কথাটা তোমাকেই জানাতে এলাম সরসীদা। টাকাটা অবশ্য আমি পেতাম, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওই টাকার বদলে তোমার মেজ বৌমা এত বড় বাড়িটা নিজের নামে করে নিয়ে দখল নিতে চায়—তোমাদের উৎখাত করে।

এ চক্রান্তটা ভালো বুঝিনি, তাই কথাটা জানাতে এলাম। প্রাণতোষ, ভবতোষ, তোমার, বৌঠানের কোন দখল থাকবে না এ বাড়িতে?

মনোহরের কণ্ঠস্বর দরদে ভেজা পড়েছে। সরসীবাবু কিছু বলার আগে প্রাণতোষ বলে—এ কেমন কথা বাবা? আমরা কেউ নই, একা মেজ বৌমা দখল নেবে এ বাড়ির ওর ওই টাকা দিয়ে?

সরসীবাবু বলেন—তা হতে পারে না। এর চেয়ে এ বাড়ি বিক্রী হয়ে যাক, পথে দাঁড়াবো—তাও ভালো।

সরমাও খবরটা শুনে চমকে উঠেছে। সরসীবাবু বলেন—কেমন কালসাপ পুষেছিলে দাখো বড় বউ। তাই শেষকথাই জানিয়ে দোব আজ, ঢের হয়েছে। এখানে আর নয়। আর মনোহর, দিন কুড়ি সময় দাও আমায়। দেশের বাড়ি-জমিগুলোয় হাত দিই নি, সেগুলো বিক্রী করে যেভাবে হোক তোমার টাকা দিয়ে দোব ভাই।

প্রাণতোষ বলে—আমিও অফিস থেকে হাজার আট দশ টাকা লোন নোব। তারপর ভবতোষও ফাইনাল দিচ্ছে। চাকরীও হবে একটা।

সরমাও যেন ওই কালসাপিনীর হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই বলে—ওই ভালো গো। কি সর্বনেশে মেয়ে গো—আর অনুকেও বলিহারী দিই! বলি—ছেড়ে দে বাবা ও মেয়েকে!

মনোহরবাবু কাজ সেরেই ফিরেছে। এইটাও চেয়েছিল সে। অণিমার জীবনের সব শান্তিটুকুকে কেড়ে নেবে সে। দেখছে মনোহর এ বাড়ির মানুষগুলোর মনকে সে বিষিয়ে তুলেছে।

রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এইভাবে ঘটবে তা ভাবেনি অনুতোষ। আর এইভাবে যে আক্রমণটা আসবে তাও কল্পনা করেনি তারা। অফিস থেকে ফিরছে দুজনে। অণিমার মনটা অনেকখানি হালকা—কালই সব ব্যবস্থা করতে পারবে। অনুতোষ বলে—ধন্যি মেয়ে যা হোক তুমি।

ওরা বাড়ি ঢুকছে। বাবার ঘরে দাদাকে দেখে দাঁড়ালো অনুতোষ। সরসীবাবু উঠে এসেছেন। অণিমাও অবাক হয়ে যায় ওর কথায়। সরসীবাবু বলেন—মনোহর এসে সব বলে গেল। এর পর আর তোমাকে বিশ্বাস করে এ বাড়িতে ঠাঁই দিতে পারি না। এত নীচ তুমি যে বিপদের সময় কিছু টাকা দিয়ে পুরো বাড়িটা নিজেরা দখল করে নিতে চাও?

অণিমা চমকে ওঠে—কি বলছেন বাবা?

ওকে টাকা দিয়ে মর্টগেজ ফ্রি করে নিতে চাই বাড়িটা।

অনুতোষ বলে—ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে—তাই ব্যাঙ্ককে কাগজখানা শো করতে হবে ওই নামে তাই—

প্রাণতোষ বলে ওঠে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না অনুতোষ। এ বাড়ির আমরাও সরিকান। তোমাদের এত লোভ—

—দাদা! অনুতোষ প্রতিবাদ করে ওঠে ঘৃণাভরা কণ্ঠে—কি যা তা বলছো? এত দায়িত্ব নিয়ে ওই মনোহরকাকার হাত থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল, আর তার জন্য এই কথা তোমাদের!

সরসীবাবু বলেন—এত দয়ার কাজ নেই. তাই বলছিলাম দয়া করে এবার আমাদের নিষ্কৃতি দাও বৌমা। এ বাড়ি থেকে সরে যাও। তুমি এ বাড়ির অকল্যাণ—এ বাড়িতে তাই তোমার স্থান নেই।

—বাবা! অণিমা চমকে ওঠে। ওর দু চোখে নামে অসহায় অশ্রুধারা। —আমাকে ভুল বুঝবেন না—বিশ্বাস করুন. ঈশ্বরের নামে, আমার স্বামীর নামে শপথ করে বলছি—এ আমি চাইনি।

সরমা বাধা দেয়—স্বামীর নামে আর দিব্যি গেলে অকল্যাণ করো না বাছা। ঢের হয়েছে—

অনুতোষ ভাবে নি যে এরা এভাবে অণিমার সব চেষ্টাকে বিকৃত করবে। তাই তার মনও বিষিয়ে উঠেছে। অণিমার উপর এই অবিচারের প্রতিবাদই করবে অনুতোষ। সেই মন নিয়েই অনুতোষ মায়ের কথায় জবাব দেয়—তাই হবে মা। অণিমা এ বাড়ি থেকে চলে যাবে। তবে তোমাদের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি আমি। এ বাড়িতে তাই আমিও থাকবো না।

সরমা চমকে ওঠে—তুইও চলে যাবি?

—হ্যাঁ। এখানে থাকতে আমিও পারবো না।

অণিমার দুচোখে জল নেমেছে। নিজের ঘরে এসে সে কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার সব আন্তরিক চেষ্টা, এদের সাহায্য করার মনোভাবকে যে ওরা এমনি বিকৃত করে দেখবে তা ভাবেনি। সারা মন কি দুঃসহ গ্লানিতে ভরে উঠেছে।

অনুতোষ বলে—এখানে নয়। অন্যত্র নতুন করে ঘর বাঁধবো অণিমা। কেউ পাশে না থাক—আমরা দুজনে জীবনের এই কঠিন পথটা পাড়ি দেব।

অণিমাকে কাছে টেনে নেয় অনুতোষ। সব দুঃখ-কষ্ট-বিপর্যয়ের মাঝে অণিমার শূন্য মন কি আশ্বাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নীলেশও সব শুনেছে। সেই-ই কয়েক দিনের মধ্যে এই ফ্ল্যাটটা দেখে দিয়েছে। তার পাড়াতেই, তাদের বাড়ির কাছাকাছি। নীলেশই বলেছিল যে তার পৈতৃক বাড়িটা প্রায় খালিই হয়েছে, ওখানেই উঠতে পারে অনুতোষরা। কিন্তু অণিমা তা চায় নি। বাধ্য হয়ে নীলেশ এটাকেই খুঁজে বের করেছে। নীলেশের কথায় অণিমা জানিয়েছিল

পাশাপাশিই তো রইলাম. তোকেই সব দেখাশোনা করতে হবে। আবার ও বাড়িটায় কেন?

নীলেশ অণিমাই দুজনে ফ্ল্যাটটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। ইদানীং তারও ফাইনাল পরীক্ষা চলছে তাই বের হয়ে গেছে নীলেশ।

অণিমা আর অনুতোষ নতুন ফ্ল্যাটটাকে গোছাচ্ছে।

অণিমা অনেক দুঃখ নিয়েই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে, আজ তারা দুজনে একে যেন বনেভাসা দুটি জীব, কোনরকমে এখানে এসে পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। তবু এতদিন দুজনে দুজনকে কাছে পায়নি এমনি করে। ওদের মনের মাঝে তাই এত দুঃখের মাঝেও আশ্বাস জাগে।

অনুতোষ হালকা স্বরে বলে—ঘর তো

সাজাচ্ছো? কিন্তু ঘর তবু শূন্যই রয়ে গেল।

হাসছে অণিমা—শূন্য কেন গো?

কথাটা মনে হয় অণিমার। এতদিন ওই সংসারের কলরব-ভিড় আর জটিলতার মাঝে ওদের এই স্বপ্নগুলো মনে জাগেনি। আজ দুজনের নিপুণ নিঃসঙ্গতার মাঝে ওরা ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন দেখে।

অণিমা হালকা স্বরে বলে—এখানে এসে ফ্যাজলামি বেড়েছে দেখেছি।

তবু মনে হয় তাদের জীবনে কোথায় একটা শূন্যতা জেগে ওঠে বারবার। অপিসের কাজ আর সেই বাড়ির একঘেয়ে জীবনের মাঝে আরও কি যেন চায় তারা।

অনুতোষ বলে—বাড়ি থেকে চলে এলাম, তারাও খোঁজ নিল না। সত্যি মনে হয় অণিমা—আমাদের দুজন ছাড়া যেন এত বড় পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

অণিমা জানে অনুতোষের মনের সেই শূন্যতাকে অণিমাও পূর্ণ করতে পারেনি।

হঠাৎ সেদিন অপিসে কেমন অজ্ঞান হয়ে যায় অণিমা। কাজের চাপও পড়েছে খুব। তবু মুখ বুজে খাটে সে। হঠাৎ সেদিন অজ্ঞান হয়ে যেতে মিঃ বোস—অভিজিৎবাবুও এসে পড়েছেন। ডাক্তারও এসেছে। তার মধ্যে অণিমা সামলে নিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বলে—এমন কিছু নয়।

মিঃ বোসই বলেন—না, না। ছুটি তো নাও না। কেবল কাজ আর কাজ। দিনকতক ছুটি নিয়ে ভাল মেডিক্যল চেকআপ করাও। দরকার হয় কোথাও বাইরে ঘুরে এসো। আমিও অনুতোষকে বলবো।

অনুতোষও এসে পড়েছে। বাড়িতে ফেরার পরই নীলেশের কর্মব্যস্ততা বাড়ে। আর যদুপতি—ও বাড়ির বুড়ো চাকর জোর করে তাদের পুরোনো ডাক্তারকেও আনে। তিনিই ব্যাপারটা জেনে বলেন—ভাববার কিছুই নেই। মা হতে চলেছো তুমি। এখন তাই সাবধানে থাকতে হবে।

চমকে ওঠে অণিমা। তার শূন্য মন কি তৃপ্তির আশ্বাসে ভরে ওঠে। মনে হয় আজ তার ঘর ভরে উঠেছে। অনুতোষ কাছে টেনে নেয় ওকে।

কিন্তু এই আনন্দ সংবাদেও অভিনন্দন আশীর্বাদ জানাতে ও বাড়ির মানুষগুলো কেউ আসেনি। অণিমা যেন ওদের আর কেউ নয়। তবু অণিমা বলে—তুমি কেন যাবে না ওখানে? হাজার হোক তোমার মা-বাবা।

অনুতোষ শুকনো স্বরে জানায়—মাস-কাবারে টাকা নেবার সম্পর্ক, ওটা দিয়ে আসি। বাস।

নীলেশও দেখেছে ব্যাপারটা। মানুষ যে কতো নিষ্ঠুর হতে পারে তাও দেখেছে সে। তাই নীলেশ বলে—ওসব ভাবিস না ছোড়দি। নিজের কথা ভাব। যে আসছে তার কথা ভাব। অতীত নেই—আছে ভবিষ্যৎ। বাস।

নীলেশ এমনি সাফ কথাই বলে যখন তখন।

•

কয়েকটা মাস কেটে গেছে। অণিমার এই সময়টা কোন দিকে পার হয়েছে জানে না। ছোট্ট মেয়েটাকে ঘিরেই দিনগুলো কেটেছে। অপিসে এসেছে এত কাজের মধ্যে—মন পড়ে থাকে বাড়িতে। বামুন মেয়ের কাছে সীমাকে রেখে এসেছে।

সাবিত্রীরও জীবনে কোন পূর্ণতা আসেনি। অনেক চেষ্টা করেছে সেও একটি ঘর বাঁধার। ডেসপ্যাচ সেকশনের শীতল সেনও এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু পিতৃভক্ত সন্তান শেষকালে বাবার পছন্দ করা একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে।

সাবিত্রী তবু মাঝে মাঝে অণিমাদের বাড়িতে আসে। সেও বলে—সীমার জন্য অপিসেও এসে ভাবো, না?

অণিমা কাজের ফাঁকে ওর কথার জবাবে জানায়—সত্যিই। এসব ভাবনা আগে ছিল না।

অনুতোষও কোন কোনদিন আগে এসে পড়ে। সীমার সঙ্গী ওই নীলেশই। কোন একটা কলেজে অধ্যাপনা করে, কিন্তু তার ছেলেমানুষি এখনও যায়নি। সীমাকে ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করেছে সে। আর অবসর সময় ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে তারও ভরে থাকে।

তবু সীমার মনে যেন অভিমান ছাপিয়ে ওঠে। মায়ের কাছে তাই অনুযোগ করে। আর এই অনুযোগ শুনে চমকে ওঠে অণিমা। স্কুলের বন্ধুবান্ধবও জুটেছে সীমার। আইডি-মিনা-শীলাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের বাড়ি দিদা-ঠাকুমা-দাদুর গল্পও শুনেছে। তাদের দাদু শীলাকে খুব ভালোবাসে, ইরার দিদা নাকি ইরার জামাও বানিয়ে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরেছে অণিমা, অনুতোষও রয়েছে। সীমার ওই সব কথা শুনে অণিমা স্বামীর দিকে চাইল। দুজনের মধ্যে নীরব দৃষ্টি বিনিময়ও ঘটে। সীমা বলে—আমারও দিদা-দাদু আছে, না মা-মণি?

—একদিন নিয়ে চলো না বাপি? আমিও বলেছি ইরাকে—আমারও দাদু-দিদা-জেঠু সব আছে।

অণিমা মেয়েকে বলে—বেশ তো। সামনের রবিবার ডায়মণ্ডহারবার—তার পরের রবিবার যাচ্ছি চিড়িয়াখানা। তারপর একদিন যাবো।

অনুতোষ ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য বলে—স্কুলের টাস্কগুলো করতে হবে না? যাও—

সীমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলো। অণিমার মনে হয় সীমাকেও ওরা কেউ দেখতে আসেনি। তার প্রাপ্য স্নেহ থেকে ওরাও সীমাকে বঞ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়—বড় জা আর করবীও এসেছিল এ বাড়িতে একদিন। সীমা তখন স্কুলে। সীমার খবরও তারা শুধোয় নি। যেন এ বাড়িতে আর একজন আছে এটা জানতে চায় নি তারা। নীলেশও ছিল তখন। সেও শুনেছে ওদের কথাগুলো। সুতপা জানায়

—দেশের জমিজায়গা বিক্রী করে—আর তোমার দাদার অফিসের টাকা নিয়ে বাড়িটা দুই ভায়ের নামেই করে দিলেন বাবা।

অণিমা চুপ করে কথাটা শোনে। তাদের বাড়িতে আজ অনুতোষেরও কোন অধিকার নেই। অনুতোষ কথাটা বলে, কিন্তু আমরাও তাই চেয়েছিলাম বৌদি!

অণিমাই বাধা দেয়—ওসব কথা থাক।

করবীই জানায়—ছোটদার ভালো চাকরী হয়েছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে। গাড়িও পেয়েছে।

আজ ওদের সংসারের হাল বদলেছে। অণিমা অনুতোষ না থাকলেও তারা যে সুখে আছে—স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে এই কথাটাই যেন ওরা জানাতে এসেছিল।

ও বাড়ি যাবার কথাও বলেনি। ওরা চলে যেতে ঘরে স্তব্ধতা নামে। অণিমার মন কি বেদনায় ভরে ওঠে। নীলেশ জানায়—একটা চাপ্টার তাহলে ক্লোজড্ হয়ে গেল ছোড়দি।

অণিমা জবাব দেয় না। মনে হয় হেরে গেছে সে। তাই সীমাকে নিয়েই তার ছোট্ট ঘরখানাকে কেন্দ্র করেই বাঁচতে চায়। তবু সীমার মনের অতলের এই অতৃপ্তি দেখে চমকে উঠছে অণিমা।

মেয়েটার জিদও মাঝে মাঝে বেড়ে ওঠে নানা ছুতোর-নাতার। সীমা খেলায় নাম করেছে। স্কুলের স্পোর্টসেও, প্রাইজ পায়-নাচ গানও শিখেছে অণিমা। সীমার সেদিন একটা জায়গা ছিট নিয়েই বায়নাটা বেড়ে ওঠে। অণিমাও চটে ওঠে—আর রাগের বশেই বেশ ধমক দিতেই মেয়েটা কেঁদে ফেলে, অণিমা শাসনের স্বরে বলে, এত জেদ কিসের তোর?

মা মেয়ের মাঝে অনুতোষই এগিয়ে আসে। অনুতোষ-এর স্নেহেই সীমা যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারে। অনুতোষ বলে অণিমাকে।

—বকে লাভ কি? কি রে সীমা—ও ছিট পছন্দ না হয়, অন্য ছিট দেখে শুনে আনা যাবে। শোন—এই রবিবার ডায়মণ্ডহারবার, আর জন্মদিনের উৎসবটা এবার বেশ জাঁকিয়ে করতে হবে। কি বল সীমা? কি কি চাই বলে দিবি।

সীমা বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

অণিমারও দুঃখ হয় মেয়েকে এভাবে শাসন করে। রাত্রি নেমেছে। অনুতোষ দেখছে অণিমাকে। ও ঘরে সীমার পড়ার শব্দ শোনা যায়। অনুতোষ-এর কথায় অণিমা ফিরে চাইল—অনুতোষ বলে

—ওকে ভুল বুঝো না অণিমা। জীবনে আমাদের দুজনের স্নেহ আর নীলেশকে ছাড়া ও কিছুই পায়নি। বড় হচ্ছে—ওর-ও নিজের সত্তা তৈরী হবে, সেদিন ওকে ভুল বুঝো না। অন্যায় আঘাত দিয়ো না অণিমা। অণিমা বলে ওঠে—মাঝে মাঝে কেমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে—হাসছে অনুতোষ।

ওদের ছুটির দিনগুলো তাই কেটে যায় ডায়মণ্ডহারবার—কখনও দীঘার সমুদ্র তীরে কাউবনে। বাতাসের সুর ওঠে। সীমার গান শোনা যায়—আজ আমাদের ছুটির ভাই।

অণিমাও যেন তাদের হারানো দিনগুলো খুঁজে পায় এই নীল নির্জনে। অণিমারও সুর জাগে।

তাই সীমার জন্মদিনটাকে তারা উদযাপন করতে চায় বেশ ঘটা করেই। অণিমা অফিসের দু-চারজনকেও বলেছে। অভিজিৎ বাবুও আসবে। আর নীলেশ-এর উপরই যেন সব দায়। অণিমারও সময় নেই।

বাড়ি ঘর সাজানো—অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছাড়া আছে সীমা আর তার বন্ধুদের বায়না। তাদের গানের অনুষ্ঠান আছে। তার সুরগুলো তুলে দিতে হবে।

ওরা আবদার করে—আমাদেরটা একটু দ্যাখো মা মণি! লোকে যে হাসবে সবাই।

অণিমা হাঁপিয়ে উঠেছে। নীলেশ এদিক-ওদিক সামলাচ্ছে। আর এই সময় অনুতোষ অফিস বের হবার জন্য তৈরী হতেই অণিমা বলে—আজও তোমার ছুটি নেই?

অনুতোষের কি একটা জরুরী কাজ পড়েছে অফিসে। তাই বলে—এই যাবো আর আসবো। দুপুরেই যাবো বাড়ি ফিরে! দেরী হবে না।

সীমাও জেদ ধরে—তুমি চলে যাচ্ছো বাপি? হাসে অনুতোষ। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলে। —মা মণির জন্মদিনের উৎসব, আমি কি বাইরে থাকতে পারি? এখুনি আসছি।

তবু অণিমা অনুযোগ করে—এত কাজ-কম্মো পড়ে রইল।

অনুতোষ বলে—আরে নীলেশ তো রয়েছে। বাদার আমার একাই একশো!

নীলেশ গজগজ করে—বাঃ। ওঁর কাজ আর আমার মাথা ব্যথা। আমিও চললাম সিনেমা দেখতে।

—এ্যাই। ধমকে ওঠে অনুতোষ। হাসতে হাসতে বলে—দেরী হবে না নীলেশ, প্লিজ, একটু ম্যানেজ করে দাও ভাই।

উৎসবের আয়োজন সুরু করে ফেলেছে। ওদিকে বেলা গড়িয়ে যায়। তখনও ফেরেনি অনুতোষ। অভিজিৎবাবু এসেছে আগেই। অভিজিৎকে দেখেছে অণিমা অফিসে সং মার্জিত রুচির একটি যুবক। অভিজিৎ বলে—আমার সন্ধ্যায় আসা হবে না, মিঃ বোস দিল্লী যাচ্ছেন জরুরী কাজে। এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

অণিমা বলে—তাই আগেই ডিউটি দিয়ে গেলেন?

কিন্তু অনুতোষ বাবুকে দেখছি না? অভিজিৎই কথাটা তোলে। তখনও ফেরেনি অনুতোষ। নীলেশ বলে—এসে পড়বেন।

ওদিকে গানের রিহার্সেল চলেছে। অণিমাকে হারমোনিয়াম বাজাতে হয়—ওরা গাইছে, নাচের পর্বও চলেছে।

[অবশিষ্টাংশ ১০ পৃষ্ঠায়]

BENGAL DOCKING & ENGINEERING CO.

MARINE ENGINEERS, FABRICATORS AND
GENERAL REPAIR CONTRACTORS

REGISTERED UNDER GOVT. OF WEST BENGAL
S. S. I. UNITE NO. S. S. I./P. V

HOW—6 381 (a) 70

Head Office

169, VIVEKANANDA ROAD, CALCUTTA-6

PHONE No. 35-4699

Branch Office :

121, J. N. MUKHERJEE ROAD, GHUSHURI,
HOWRAH

ALLIED

towards a new horizon

For 15 years Allied has been developing continuously in the field of synthetic resins and chemicals. Today, the product range includes Formaldehyde, Hexamine, Pentaerythritol, Paraform, Synthetic Tanning Agents and a wide range of Phenolics and Urea, Melamine, Epoxy and other Thermosetting Resins. Through foreign know-how and their own research and development work, Allied today stands out as a leading manufacturer of industrial chemicals, adopting highly sophisticated technology. The new Research and Development Section with extensive facilities, will generate new products and product lines.

Allied is also promoting new venture in the joint sector for production of 3000 tonnes per annum of Maleic Anhydride in partnership with West Bengal Industrial Development Corporation.

Allied looks forward to meet
the challenge of the future.

ALLIED RESINS & CHEMICALS LTD.

13, CAMAC STREET, CALCUTTA-700017

আমার নকুড়মামা বলতেন, 'কখনো কারো সম্বন্ধে যাবিনে। বিয়ে কখনো সুখের হয় না। বিবাহিত জীবন অনুতাপ হতে বাধ্য বিয়ের কিছুদিন পরেই। তা প্রেমে পড়েই বিয়ে হোক কি দেখে শুনে সম্বন্ধ করেই বিয়ে হোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে হলে তারা পরস্পরকে সুধবে, আর ঘটকালির ফলে হলে তার সব কালিটা পড়বে গিয়ে ঘটকের গালে। মেয়েটা বলবে তোর জন্যেই তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। তা—বলে তিনি একটু দম নেন—

'তুই কি একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ করতে চাস?' 'না না—' আমি বাধা দিয়ে বলেছি: 'তাহলে ত নিজেই বিয়ে করতাম। একটা মেয়ের জীবন বৃথায় যাবার এমন সুযোগ ছাড়তাম কি?' 'তবে? তাহলে কখনো কোনো ঘটকালি করতে যাস নে।' নকুড়মামার সেই উপদেশ কুড়োবার পর থেকে ঘটক ব্যাপারে আমি এক নম্বরের কুড়ে। কেউ পাত্র-পাত্রী সন্ধানের কথা তুললে আমি একেবারে গা লাগাইনে। কিন্তু আমাদের ঠাকুর মশাই যখন তাঁর বিধবা মেয়ের জন্যে একটি ভালো ছেলে খুঁজে দিতে বললেন তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সোজাসুজি 'না' বলতে আমার আটকালো।

দেখলাম একটি পাত্র পাত্রটির একটি খুঁত ছিল।

হয় যে তেমন খুঁতখুঁতে হলে এ বাজারে পাত্রই মেলে না। নিখুঁতে পাত্র কোথায় বলুন?

'দেখেছি ত পাত্র।' বললাম গিয়ে ঠাকুর মশাইকে: 'কিন্তু পাত্রটির একটু দোষ আছে। খুব সামান্যই একটু দোষ।'

'সামান্য দোষ?

'পেঁয়াজ খায়।' আমি জানালাম।

'পেঁয়াজ খায়।' শুনে তিনি চমকে উঠলেন। ওইপলীর পরম বৈষ্ণব ঠাকুর মশাই আমার কথায় যেন একটা চড় খেলেন। যে পেঁয়াজখোর জামাইয়ের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

'পেঁয়াজ খাওয়া কি সামান্য হল, তুমি বলো পেঁয়াজ কি সামান্য জিনিস?' —

সামান্য নয়, পরমহংসদেব বলতেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে যেমন কিছুই থাকে না তেমনি ব্রহ্মকে ছাড়িয়ে

গেলে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মও লোপাট! এই রকম কী একটা কথা বলতেন, তার মানে ঠিক আমি বুঝতে পারি নি। আসলে পেঁয়াজ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড; ব্রহ্মাণ্ড একটা পেঁয়াজি, অর্থাৎ পেঁয়াজ আসলে মায়া। মায়াই।'

'মায়াই হোক আর যাই হোক, মায়া বলে পেঁয়াজকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমাদের ঠাকুর বংশে তো পেঁয়াজের আমদানী হতে পারে না বাপু!'

'সে কথা আপনি বুঝুন। তবে আমি বলছিলুম কি, পাত্রটি ভালোই। একটু ঐ যা, পেঁয়াজ খায়, তাই বলে কি রোজই খায়? তা নয়, মাঝে মাঝেই খেয়ে থাকে। এই একটু মাংসটাংস হলেই—'

'অ্যাঁ? মাংসও খায় নাকি আবার?'

'রোজ কি? পাচ্ছে কোথায় রোজ রোজ? এই মাঝে-মাঝেই—বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়লেই—' ঘটো পাল্লা সমান করার চেষ্টা আমার। —'বন্ধু-বান্ধবরা ধরলেই খায়।'

'মাংস খায়!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন গোঁসাই ঠাকুর—'আমাদের নিরিমিষ গোস্বামী বংশ। আমাদের বংশে এসে মাংস খাবে!'

'খায় বলে কি আর অ্যাতোঅ্যাতো? পেটঠেসে খায় নাকি? একটু আধটু খেয়ে থাকে—চাটের মুখে।'

'চাটের কথা কী বলছো?' ঠাকুর মশাই আবার যেন এক চোট খান—'চাট তো লোকে...চাট তো লোকে...' কথাটা ভাষায় ব্যক্ত করতে তাঁর আটকায়।

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যা ধরেছেন।' আমি সায় দিয়ে চাট সামলাই। 'শুধু শুধুই কি চাট মারে? গাধা তো নয়। আনুষঙ্গিক হিসেবেই ওটা খেয়ে থাকে।'

'নেশাভাঙ করে নাকি আবার?'

'নেশাভাঙ করে বলে কি গাঁজা আফিঙ খায় নাকি? তা নয়।' আমি সান্ত্বনা করি। এমন ভালো সম্বন্ধটার ভাঙচুর হয় আমি চাই না।—'এমন কি ভাঙও খায় না পাত্র। তবে ঐ যে বলেছি, মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়লে সঙ্গদোষে কী না হয় বলুন!'

'গাঁজা আফিঙ খায় না, তবে কি মদ টানে, বলচ তুমি?'

'এই মাঝে সাঝে। চাট তো মদের মুখেই খায় মানুষ। আর ঐ চাট হিসেবেই এক আধটু মাংস টাংস মুখে তোলে আর কি!'

'মদ খায় মাংস খায় চাট খায়...' ঠাকুর মশায়ের গলায় যেন হায় হায় বাজতে থাকে।

'মাংস আর চাট এক জিনিস।' আমি প্রতিবাদ করি—'আলাদা আলাদা খায় না।'

'একই কথা হল।' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন —'এদিকে মেয়েটিরও বয়স হয়ে যাচ্ছে কি করি।...'

'ভালো পাত্র এনেছি ত! আর কোনো নেশা নেই, বিড়িটিড়ি খায় না।'

'বিড়ি খায় না?'

'না, সিগারেট টানে। পরের পয়সায় পেলে তবেই।'

'শান্ত নয়তো পাত্র? কারণ হিসেবে পান করে না তো?' তিনি সন্দিগ্ধ সুরে শুধান।

'না না, শান্ত ফান্ত নয়। আপনি ভীত হবেন না। গোঁসাই পরিবারে কি আমি শান্ত আমদানী করব, আপনি বলেন কি। কারণ ফারণ নয়।' আমি জানাই: 'তবে হ্যাঁ, একথাও বলতে হয়, অকারণ খায় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাগানে গেলেই—'

'বাগানেও যায় নাকি আবার? বাগান বাড়িতেও গতিবিধি আছে?' আবার তিনি ঘাবড়ান।

'পিকনিক করতে হলে কোথায় যায় মানুষ? বাড়িতে কি পিকনিক জমে? বাগানেই হয়ে থাকে...'

'কিন্তু বাগানে গিয়ে চড়ুই ভাতি করা আর বাগান বাড়িতে যাওয়া এক নয়। বাগানে যাওয়া এক কথা আর বাগান বাড়িতে...'

'তা তো বটেই। তবে কিনা, বাগান থাকলে তার সঙ্গে ছোটখাটো একখানা বাড়ি থাকেই। থাকবেই। তাকেই যদি আপনি বাগানবাড়ি বলেন'

—'আমি কি বলছি? লোকে বলে। বাগান বাড়িতে বাইজি টাইজি যায় বলে শুনেছি।'

'তা তো যায়ই। বন্ধু বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতেই বাগানবাড়িতে যায় লোকে। একটু নাচগান আমোদ-আহ্লাদ হয়েই থাকে।' আমি সাফাই গাই: 'তবে আমি যদ্দুর জানি তাতে একথা বলতে পারি যে আপনার পাত্রের কোন চরিত্র দোষ নেই।'

'দুশ্চরিত্র নয় বলছ?'

'নিশ্চয়। তবে সাধারণ মানুষ সাধারণত যা হয়ে থাকে—নিশ্চরিত্র তাকে বলা যায়।'

'দুশ্চরিত্র আর নিশ্চরিত্র। ওতো কেবল উপসর্গের তফাৎ!' তিনি গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়েন—'বিলক্ষণ উপসর্গ আছে আমি জানি। কিন্তু আমার হবু জামাইয়ের যে কতগুলি উপসর্গ তা এখনো আমি ঠাওর করতে পারছি না ঠিক।'

'ওর বন্ধুরাই হচ্ছে ওর উপসর্গ। তাদের সঙ্গে মিশেই ওর সবকিছু। তাছাড়া আর কোনো দোষ ওর নেই। কেবল ওই সঙ্গদোষই ওকে—' আমার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে বেরয়: 'কিন্তু তাও বলি, বিয়ের পরে এটা কেটে যাবে মনে হয়। তখন তো নতুন সঙ্গী পাবে, মনের মত সঙ্গীই পাবে একজন। পুরণো সঙ্গীদের তখন হয়তো ভুলে যেতে পারে।'

'আর পেরেছে! তার সঙ্গীরা তাকে ভুললে তো!' তিনি যেন তেমন ভরসা পান না: 'তার সঙ্গীরা কি তাকে ছাড়বে ভেবেচ?'

'কতক্ষণ ধরে থাকবে? তাদের নিজেদের কাজকর্ম নেই? নিজেদের বিষয়কর্মেই তো ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের। কাজের তালে কে যে কোথায় চলে যায় পাত্তাই পাওয়া যায় না কারো। অনেকদিন একদম টিকিই দেখা যায় না।'

'ফেরারও হয়ে যায় নাকি?'

'ফেরার হয় কিনা জানিনে তবে তারা ফেরার পরেই মজলিস তাদের জমে ওঠে, তখনই এইসব চোটফাট বাগান ফাগানের কামেলা এসে জোটে...'

'জুটুক গে! চুলোয় যাক। আমি আর ভাবতে পারি না। মদ টানে, অসৎ সঙ্গে মেশে, বাগানে গিয়ে বাইজিদের নিয়ে ফুর্তি করে,...আমি ভাবছি এমন ছেলের হাতে মেয়েকে দিলে সেকি সুখে থাকবে? মদ খেয়ে অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আমার মেয়েকে ধরে ঠেঙাবেই হয়তো। ওর অত্যাচারে আমার মেয়ে হয়তো...'

'কদিন আর করবে অত্যাচার? কদিন সে সুযোগ পাবে বলুন? বছরের মধ্যে এগারো মাস তো তার জেলখানাতেই কাটে। বৌয়ের গায়ে হাত তোলার যো পেলে তো?' আমি ভরসা দিই: 'আপনি কিছু ভাববেন না। জেল থেকে বেরিয়ে তিন চারদিন বাইরে থাকতে না থাকতেই আবার তাকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ!'

——

বাংলা ছবি

বাংলার ছবি

দেখুন

কাবুলিওয়ালা, হারাণো সুর, অপুর সংসার, তিনকন্যা,
সপ্তপদী, উত্তরফাল্গুনী, গৃহদাহ, আপনজন, কমললতা,
আলো আমার আলো, স্ত্রীর পত্র, সোনার কেল্লা

●

—একমাত্র পরিবেশক—

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

৭৭নং লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

রোশনমহলের দখল নিয়েছিলাম ছত্রিশ বছর বয়সে। আমার বয়স এখন আটাত্তর।

ঠাকুর্দা উইল করে রোশন-মহল আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন—আর সবাইকে বঞ্চিত করে। তাতে আমার শত্রুবৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি পরোয়া করিনি।

আমার বাবা নেই। দু'ভাই সরকারী কাজে থাকত ইণ্ডিয়ার বাইরে। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়েছিল দেরাদুনে। প্রত্যেকের কাছ থেকে অভিনন্দন পত্র পেলাম। ওরা খুশী হয়েছে—চটেছে জ্ঞাতিভাইরা। চটুক।

রোশনমহলের দখল নিতে এসে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এত বড় বাগান আর বাড়ীতে কখনো থাকিনি। বাবা প্রবাসেই দেহ রেখেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম আমাদের বংশের নামডাক। বসতবাটি কখনো দেখিনি।

প্রধান তোরণের পর আধমাইল রাস্তা শুধু নুড়ি বিছোনো। খুব চওড়া রাস্তা। দু'পাশে তরুণ ঘাসের পটি। পটির ওপর মাঝে মাঝে বাহারি ফুলের চৌকোণা ক্ষেত্র—ক্রিসানথিমাম, ডালিয়া, রডোড্রেনডন, আরো কত কি।

ঘাসের বর্ডার আর ফুলের বাহারের পাশে উঁচু-উঁচু গাছ। বাউ গাছই বেশী। সব মিলিয়ে সখের জঙ্গল বললেই চলে। মাথার ওপর পাতার চাঁদোয়া—পায়ের তলায় শুকনো পাতার কার্পেট। হাঁটতে ভাল লাগে।

আধমাইল রাস্তার পর প্রকাণ্ড বাড়ীটা। রোশন-মহল। পাঁচতলা উঁচু দু'দুটো খিলেন দু'পাশে। চারটে মোটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে খিলেন দুটো। খিলেনের মাঝে রঙীন কাঁচের জানলা।

রোশন-মহলকে বেষ্টন করে নুড়ি বিছোনো রাস্তা দু'পাশ দিয়ে ফের পেছনে গিয়ে এক হয়েছে। এখানে ফলের বাগান। অতিকায় গ্রীন-

হাউসের মধ্যে আঙুর ইত্যাদি ঝুলছে। পথের দুপাশে আম-জাম-কমলার ছড়াছড়ি।

দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে বাগান আর বাড়ী বাইরের লোকের চোখ থেকে আড়াল করা। পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচ বসানো। তোরণে বন্দুকধারীর পাহারা।

আমাকে অভ্যর্থনা জানালো রোশন-মহলের বুড়ি দাসী হরিলক্ষ্মী। সব চুল পেকে গিয়েছে। ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙ। দাসী বলে মনে হয় না। এ-বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের ভার তারই হাতে।

লোহার পাত মারা কাঠের দেড়তলা উঁচু পাল্লাজোড়া পুরোপুরি খুলে রাখা হয়েছিল আমার খাতিরেই। হরিলক্ষ্মী পিঠ বেঁকিয়ে এল লাঠি ঠুক ঠুক করে। বলল—"এস দাদাভাই, তোমায় বিষয় বুঝে নাও।"

হরিলক্ষ্মীর পেছন পেছন ঢুকলাম হলঘরে। মস্ত খিলেনের ওপর ছাদ দেখা যায় না—এত উঁচু। ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে লম্বাটে জানলার সামনে। দেওয়ালে সারি সারি অয়েল পেন্টিং। বংশের পূর্বপুরুষদের ছবি। একে-একে দেখতে দেখতে সবশেষের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করে উঠল।

ছবিটা একজন তরুণের। প্রদীপ্ত চোখ। হাত-পা-মুখের গড়ন লীর্ণ কিন্তু দৃঢ়। শিবাজী স্টাইলে ছুঁচলো দাড়ি আর গোঁফ। পরণে বুটিদার ঢিলা পাঞ্জাবী আর টাইট চুড়ি পায়জামা। পায়ে নাগড়া। হাতে ছড়ি।

আমার গা ছমছম করল চোখদুটো দেখে। মরা চোখ নয়। যেন জীবন্ত। যেন আমার পেছন পেছন ঘুরছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সমীক্ষা করছে।

ছবির সারি এখানেই শেষ। পাশেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি ওপরতলায় উঠেছে। জায়গাটায় আলো কম। সেই জন্যেই কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে?

হরিলক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলাম—"কার ছবি?"

"তোমার ঠাকুর্দার ছোটকাকার," বলল হরিলক্ষ্মী। তারপর যে ঘটনাটা বলল, তা লোমহর্ষকই বটে।

ছবির মানুষটির নাম বিনয়ভূষণ। বাড়ীর ছোট ছেলে। কিন্তু রাজদ্রোহী। বৃটিশরাজকে সহ্য করতে পারত না। গোপনে হাত মিলিয়েছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে। কর্তা বিনোদভূষণ জানতে পেরে ত্যাজ্যপুত্র করলেন এবং বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের দিকে রোশনমহলের বাইরে ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল। সেপাইদের তাড়া খেয়ে নুড়ি ছাওয়া রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে ঢুকল বিনয়ভূষণ। কালো ঘোড়া। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। অনেক দূর থেকে আসছে নিশ্চয়—প্রাণের ভয়ে ঢুকে পড়েছে রোশনমহলে।

খবর পেয়েই বন্দুক হাতে নেমে এলেন বিনোদভূষণ। কড়া ধাতের মানুষ তিনি। প্রচণ্ড রাগী। বিনয়ভূষণ যখন দু হাত বাড়িয়ে ছুটেছে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে, ঠিক সেই সময়ে তাকে গুলি করলেন বিনোদভূষণ।

সেই দেখে তৎক্ষণাৎ হার্টফেল করলেন বিনয়ভূষণের মা। তার চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফলের বাগানে আমগাছ থেকে ঝুলতে দেখা গেল বিনোদভূষণের গলায় দড়ি দেওয়া মৃতদেহ।

সেই থেকেই এ-বংশে কেউ মারা যাওয়ার ঠিক আগে দেখা দেয় বিনয়ভূষণ।

আমি হেসে উঠে বললাম—"চমৎকার গল্প। ভদ্রলোক কি বাড়ীর মধ্যেও আছেন?"

"না," বললে হরিলক্ষ্মী। "পঞ্চাশ বছর এ-বাড়ীতে কাটালাম আমি। বিনয়ভূষণকে কখনো বাড়ীর মধ্যে দেখিনি।"

একমাস গেল। বিনয়ভূষণের কথা মন থেকে মুছে গেল। ফলের বাগান আর সখের জঙ্গলে সকাল সন্ধ্যে বেড়াতাম। উষার সোনালী কিরণ

আর গোধূলির রক্তাভায় গাছপালাগুলোকে অপরূপ মনে হত। রামধনু রঙের খেলা দেখা যেত রঙীন জানলায় সারিতে। সারাদিন পাখীর গান শুনতাম, রাত্রে ডায়নামো চালিয়ে রোশন-মহলের জলসাঘরে বসে কলের গান শুনতাম।

বিয়ে করলাম তার কিছুদিন পরে। ছেলেমানুষে বউয়ের কলকাকলী আর অকারণ হাসিতে নতুন প্রাণের ঢেউ এল রোশনমহলে। ঝকঝকে সবুজ পাতার নীচে আমরা হাত ধরাধরি করে বেড়াতাম—ইহলোকেই স্বর্গ রচনা করতাম—পরলোকের কথা চিন্তা করতাম না।

পরলোক থেকে বার্তা এল কিন্তু এর পরেই।

সেটা জ্যৈষ্ঠ মাস। সারা দুপুর আগুনের হলকা বয়েছে। গাছপালা ঘেরা বলে রোশন-মহল অপেক্ষাকৃত শীতল। কিন্তু বাতাস নেই একেবারে। রাত্রে বউকে বললাম—"চল, বাগানে বেড়িয়ে আসি।"

ও বলল—"তুমি যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

আমি একাই বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে আধখানা চাঁদের বাঁকা হাসি। হাওয়া নেই। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

সেই আমগাছটার তলায় এসে হঠাৎ আমার গায়ে রোমাঞ্চ জাগল। কখনো কিন্তু এ-রকম অনুভূতি হয়নি। একটা অস্বচ্ছন্দ ভার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে শিরশির করে নেমে গেল মূলাধারে। চাঁদের আলোয় ছায়ামায়া পরিবেশে চেনা গাছগুলোকেও যেন অচেনা লাগছে। অষ্টাবক্র গুঁড়িগুলো যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। আঁকাবাঁকা ডালপালাগুলো যেন ওদের কিলবিলে শুঁড়—নীরবে ওৎ পেতে আছে মাথার ওপর অক্টোপাসের মতন।

কেন জানি না, মুখ তুলেছিলাম। সাদা মতন একটা বস্তু দুলতে দেখলাম ওপর ডালে। চোখের ভুল নিশ্চয়। কিন্তু সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সেই দৃশ্য দেখে। হাত-পা যেন বশ মানছে না। কতবার এ-গাছের তলায় বেড়িয়েছি, কখনো এ-দৃশ্য দেখিনি, এ-রকম অনুভূতিও হয়নি।

জোর করে পা দুটো সচল করলাম। পেছন হটতে হটতে দৌড়তে গিয়েই ধাক্কা খেলাম একটা পেয়ারা গাছে—নীচের ডালে মাথা ঠুকে গেল বেশ জোরেই।

সঘর্ষে কাজ হল। ভয়ের মায়াজাল খসে পড়ল মনের ওপর থেকে।

ঠিক তখনি শুনতে পেলাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

অনেক দূর থেকে কে যেন ছুটে আসছে ঘোড়ার পেছে। শুধু খটাখট খটাখট খটাখট শব্দ অত্যন্ত বেগে এগিয়ে আসছে এইদিকেই। মনের চোখে দেখতে পেলাম, খুরের ঘায়ে ছিটকে যাচ্ছে আলেগা নুড়ি...হয়তো ফুলকিও ছিটকোচ্ছে।

এগিয়ে আসছে...এগিয়ে আসছে অশ্বখুর ধ্বনি। অস্ফুট আওয়াজ শুনে মাথা তুলে দেখলাম, ছটফট করছে আমগাছে দোদুল্যমান সাদা বস্তুটা।

আচমকা মোড় ঘুরেই আবির্ভূত হল একটা ধাবমান ঘোড়া। মিশমিশে কালো ঘোড়া। কালো মেঘের মতন দামাল কেশর উড়ছে দুরন্ত চলার বেগে। মুখে সাদা ফেনা। শীর্ণ কিন্তু খজু সওয়ারের পরণে সাদা বেশ—টাইজ চুড় আর বুটিদার পাঞ্জাবী। নিষ্পলক চাহনি আমার প্রতি নিবদ্ধ।

মড়ার চাহনি। বহুবছর আগে যে চোখ থেকে প্রাণের চিহ্ন মুছে গিয়েছে বন্দুকের গুলিতে—এ সেই চোখ। হলঘরের অয়েলপেন্টিংয়ে এই মুখই দেখেছিলাম আমি। শিবাজী প্যাটার্নের দাড়ি গোঁফ। চোখ দুটি কিন্তু বরফ-ঠাণ্ডা।

বায়ুবেগে খটাখট শব্দে সাঁৎ করে আমার পাশ দিয়ে উধাও হল কালো ঘোড়া। মিলিয়ে গেল আধ মাইল দূরে বাগানের পাঁচিলের কাছে।

পরদিন বিকেলে কেবলমাত্র পেলাম ইটালী থেকে। আমার মেজ ভাই লঞ্চডুবি হয়ে মারা গেছে রাত দুটোর সময়ে।

গেল একটি বছর। আবার এসেছে জ্যৈষ্ঠ মাস। আবার সেই গুমোট গরম। রাত্রে ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে বেড়াচ্ছি। আমগাছের কাছে আসতেই আবার দেখতে পেলাম সাদা বস্তুটা—ফের শুনলাম অশ্বখুরধ্বনি...ছটফটিয়ে উঠল বুলেন্ত বন্ধু—উল্কাবেগে মোড় ঘুরে আবির্ভূত হল কালোঘোড়ার সওয়ার—বরফ চোখ নিবদ্ধ আমার পানে।...

পরের দিন বিকেলে কেবলগ্রাম এল ওয়াশিংটন থেকে। ছোট ভাই মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে রাত দেড়টার সময়ে।

গেল আরও একটি বছর। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট গরমে আবার সেই প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করলাম—আমগাছের তলায় যাওয়ার অদৃশ্য আমন্ত্রণ।

কিছুতেই ঘরে থাকতে পারলাম না। রাত বারোটায় একলাই বেরিয়ে এলাম বাগানে। সে-রাতেও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কুটিল হাসি হাসছে মাথার ওপরে। এবার আমি তৈরী ছিলাম।

আচমকা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গত দু বছরের মত। দেখা গেল সেই সাদা বস্তুটা, শোনা গেল খটাখট খটাখট অশ্বখুরধ্বনি...মোড় ঘুরেই আবির্ভূত হল কালোঘোড়ার সওয়ার।

বুঝলাম, মর্ত্যলোকের দূত বয়ে নিয়ে আসছে আমার একমাত্র বোনের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা। ওকে ঠেকাতেই হবে—ওর গতি রোধ করতেই হবে—ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে ওর অন্ধকারের আলয়ে।

মাথার মধ্যে কোত্থেকে যে এত সাহস এল জানি না। ক্ষিপ্তের মত ধেয়ে গেলাম রাস্তার ওপর। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে পথরোধ করলাম আগুয়ান কালোঘোড়ার...

আমার প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল কুচকুচে ঘোড়াটা—সওয়ারের বরফ চক্ষু অনিমেষ চেয়ে রইল আমার পানে...আমি নড়লাম না। বিকট বীভৎস গলায় শুধু চেঁচিয়ে উঠলাম—না না... না!

মুহূর্তের মধ্যে শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কালোঘোড়া...কানফাটা চিঁহি-চিঁহি রব ছেড়ে ঘুরে গেল চক্ষের নিমেষে...যে পথে এসেছিল। সেই পথেই ফিরে গেল উল্কাবেগে...খটাখট খটাখট শব্দ মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে!

পরের দিন টেলিগ্রাম পেলাম দেরাদুন থেকে। ক'দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলছিল আমার আদরের বোনটিকে নিয়ে। গতকাল রাতে তার প্রাণের কোনো আশা ছিল না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে রাত বারোটার একটু পরেই। হঠাৎ চোখ খুলে সে ডেকে ওঠে আমার নাম করে। তারপর থেকেই বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তাররা কিন্তু ধোঁকায় পড়েছেন।

এরপর বিয়াল্লিশ বছর কেটেছে। বিনয়-ভূষণ আর দেখা দেয়নি। অয়েলপেন্টিংয়ের চোখ দুটোও আর অশান্ত নয়—শান্তি পেয়েছে।

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

—

With best compliments from

SWAN MILLS LIMITED

"NIRMAL" 18TH FLOOR

★

241-242 BACKBAY RECLAMATION

BOMBAY-1

With best Compliments from

Anglo-India Jute Mills Co. Limited

★

31 NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

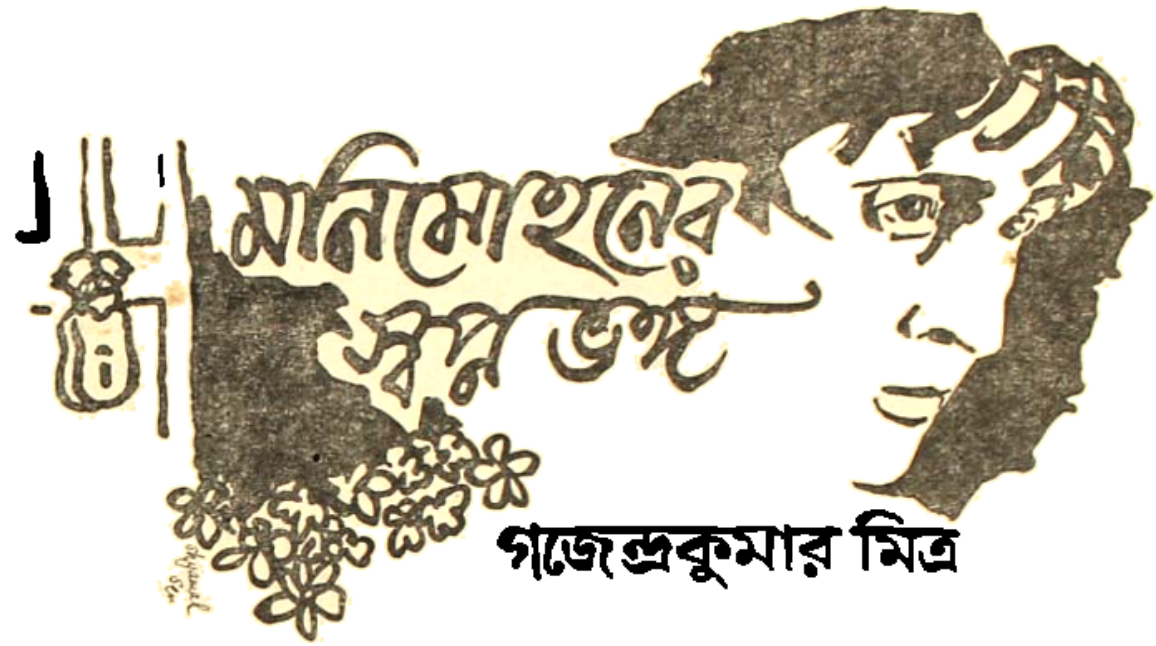

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণিমোহন বা মনুকে নিয়ে গল্প লেখা যাবে কোনদিন, মানে এমন কোন ঘটনা তার জীবনে ঘটতে পারে—তা কেউ কখনও ধারণা করেনি। সে তো নয়ই, আমরা যারা পুজো সংখ্যার গল্প লেখার জন্য প্লট খুঁজে হন্যে হয়ে বেড়াই—তারাও না। 'অশ্বত্থ গাছ বড় রসিক, সে পাষাণ হইতেও রস সংগ্রহ করে'—সঞ্জীবচন্দ্রের এ লেখা তো কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছে, পুজো সংখ্যার গল্প-লেখকরা তার চেয়েও রসিক, 'মক্ষিচুষ' বলা চলে (যে অর্থে সাধারণত বলে সে অর্থে না, শব্দার্থেই ধরুন)—তবু তারাও, মণিমোহনের জীবনী ও জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাকে গল্পের নায়ক বলে কল্পনা করতে পারত না কোনদিন।

তবু সেই অসম্ভবই তো সম্ভব হল।

মনুকে নিয়েই আজ গল্প লিখতে বসেছি।

আর এর প্রায় সবটাই সত্যি, সামান্য তথ্য বৈষম্য ছাড়া।

কিন্তু তার আগে মনুর একটু পরিচয় বোধহয় পাওয়া দরকার।

ঐ যে কালোমতো ছেলেটি, চার ফুট ন' ইঞ্চি ঢ্যাঙ্গা, ফড়িং-এর মতো সর্বদা তিড়িং বিড়িং করে, চলে ছুটে, দাঁড়াতে বললে নাচতে থাকে—পোশাক যার সর্বদাই ময়লা থাকে, অথচ সেই অবস্থাতেই রাজভবনে বা বিয়ের আসরে যেতে লজ্জা নেই—ও-ই মণিমোহন। দেখলে ওকে বারো বছরের ছেলে বলেই বোধ হয়, আসলে কিন্তু ওর বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে, এমন কি লেষেরটা পেরিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

না, বালক নয়, নাবালকও নয়। যে বিপর্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে—সে কেউ দুচার দিনে দুচার মাসে লঙ্ঘন করতে পারে না। আরও কিছু সময় লাগে।

বাড়ি ছিল ওদের পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব-বঙ্গে। পার্টিশনের পরও ওর বাবা এপারে আসেন নি, দেশের ছ বিঘে জমি, একুশটা নারকেল গাছ ও

দুটো পুকুরের মায়ায় পড়ে ছিলেন। এলেন যখন অনেক নাস্তানুবাদ হয়ে, তখন স্থাবর তো কিছু আনা গেলই না, অস্থাবরও সব রেখে আসতে হল প্রায়। শিয়ালদা স্টেশনই ভরসা করতে হয়েছিল। দৈবাৎ অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া এক শালার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে সে দুর্দশাটুকু বেশী-দিন ভোগ করতে হয় নি, সে-ই এই রাসমণি বাজারের পাড়ায় এনে তুলেছিল, সাত বাই আট ফুট টিনের ঘর ভাড়া করে দিয়েছিল এবং যতদিন না ওরা স্বয়ম্ভর হয়া ততদিন ঐ ঘরের তিরিশ টাকা করে ভাড়া টেনেছিল।

মনুর বাবা হারাধন দেবনাথ হাতের কাজ জানতেন অনেক রকম। পাটের দড়ি দিয়ে নানা ধরণের দরকারী জিনিস তৈরী করে বিক্রী করতেন —মাছের জালও বুনতে পারতেন—তাতেই কোনমতে দিন গুজরান হত। সে কাজ না থাকলে ক্যারমবোর্ডের জাল বুনতেন। মনুর মাকেও অনেক চেষ্টা করে এক দর্জির দোকানে ঢুকিয়ে দিয়ে-ছিলেন, সেলাইয়ের কাজ, বিশেষ ভাল রেশমী জামা যা হাতে সেলাই হয় সে কাজ খুব ভাল জানতেন। শান্ত মানুষ সূক্ষ্ম কাজ পারতেন ভাল। মনুর বাবার ঘরে বসে কাজ—তার ফাঁকে ফাঁকে রান্নার কাজটাও চালিয়ে নিতেন, স্ত্রী যাতে বেশী সময় পায়। ভদ্রমহিলার হাত ভাল, সেই অনুপাতেই মন্থর; অনেক বেশী সময়ে কম মজুরী রোজগার করতেন।

তবু দিন কাটছিল, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলেও দিয়েছিলেন হারাধনবাবু। বড় মেয়ের বিয়ের কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ অত্যন্ত অসময়ে মনু যখন মাত্র বছর বারো-তেরো বয়সের—হারাধনবাবু চারদিনের জ্বরে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। গরীবের ঘরে সামান্য অসুখে কেউ ডাক্তার দেখায় না। মনুর মা-ও সে প্রয়োজন বোধেন নি। চারদিনের দিন যখন অকস্মাৎ ঘাড়টা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে গেল তখন বুঝলেন, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। হাসপাতালে পৌঁছেই মারা গেলেন ভদ্রলোক।

আমাদের মনু প্রায় তখন থেকেই—সংসারের ভার নিয়েছিল।

তখন ওর তিনটি বোন একটি ভাই—সব-গুলিই ওর চেয়ে ছোট। শেষেরটি তো এক বছরের মাত্র। অর্থাৎ খাবার লোক আছে ওদের ভাষায় 'খাওয়াইয়া', সাহায্য করবার কেউ নেই। কিন্তু এই ভার—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হারকুলিয়ান টাস্ক'—অনায়াসে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল এবং সে দায়িত্ব সুচারু রূপেই বহন করেছিল। আজ তিনটি বোনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছোট ভাইও সামান্য লেখাপড়া শিখে এক ছাপাখানায় কম্পোজের কাজ শিখছে। এক কথায় দায় দায়িত্ব আর কিছুই নেই—নিজের বিবাহ ছাড়া। উপরন্তু ষেটা— খাজ-নায় জমি নিয়ে নিজে টিনের ঘর তুলেছে।

কী ক'রে এমন করল? এত উপার্জন?

কি করেনি সেটা বলা বোধ হয় আরও সহজ হবে।

ঐ বয়স, লেখাপড়া শেখেনি, উপার্জন কী-ই বা করতে পারে? কি করতে পারে সেটা জানতে হলে ঐ মণিমোহনকেই দেখতে হ'ত।

বাজারের ধারে একচালা করলা কি কাঁচা লঙ্কা নিয়ে বসা, এ তো তুচ্ছ কাজ। মণিমোহন বাঁধা পথে চলবার মানুষ নয়। সে বিনা মূলধনেই কারবার শুরু করল। পার্ক স্ট্রীটে বাস-এর বা গাড়ির ধারে ফুল বিক্রী করে—তাদের কাছ থেকেই হয়ত একটা গোলাপের তোড়া কী করে টেনে নিয়ে আর একটা গাড়ির ধারে ছুটল, 'নেবেন নেবেন মেম-সাহেব, তাজা গোলাপ।' বিক্রী হলে খুব বিনম্রভাবে সে পয়সা এনে আসল ফেরিওয়ালার হাতে দিয়ে বলত, 'আমাকে কিছু দেবেন না কি? যা খুশি দিতে পারেন—এক পয়সা দিলেও খুশী আমি।'

এইভাবে বিনম্রতার পরিচয় পেয়ে আরও অনেকে ওকে মাল গছাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সেও স্বাভাবিক। আরও তাদের আগ্রহ—এ হিসেব করে কমিশন চায় না, যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট।

এইভাবেই—হয়ত একদিন কোন 'স্পেশ্যাল

'সংখ্যা' বেরোল কাগজের, মনুও হকারদের কাছ থেকে পাঁচখানা সাতখানা টেনে নিয়ে বেচে এসে সে দাম জমা দিয়ে আবার ছুটল আর দশখানা কাগজ নিয়ে। ফিল্ম সাপ্তাহিকগুলো বেরোবার তারিখে বেশ আয় হ'ত তার—ফেরিওয়ালার সাগরেদী ক'রে।

নামটা ছড়াতেও দেরি হয় নি।

শিয়ালদার ফুটপাথে যারা তৈরী জামা সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে—তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওপরপড়া হয়ে কাজ করে, মাল গছাবার চেষ্টা করে। খুলে খুলে দেখায় আবার পাট করে সাজিয়ে রেখে দেয়—যেগুলো পছন্দ হল না খদ্দেরের—সেগুলো। দোকানদার খুশী হয়েই দিনের শেষ আট আনা একটাকা দেয়।

না, আনাজ কি ফল বেচতেও আপত্তি নেই। ঐটুকু ছেলে, পয়সা-কড়ির বিষয়ে ভারি হুঁশিয়ার ও সৎ—এ জেনে সকলেই বিনা পয়সায় মাল দেয়। ফুটপাথে বসে যায় সঙ্গে সঙ্গে—অসময়ের কপি কিম্বা ডুয়ার্সের আনারস কিম্বা মালদা কি ভাগলপুরের ফজলি নিয়ে।

একবার পাড়ার ছেলেরা ধরলে, 'রবিবার তারকেশ্বর যাবি মনু—রাতটা থেকে সোমবার ভোরে বাবার মাথায় জল দিয়ে ফিরব?'

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, যাবো। কত খরচ পড়বে রে—?'

কিন্তু সে কথার জবাব শোনার দিকে কান ছিল না তখন আর—চিন্তা-প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। এই যাত্রায় কি কি বাণিজ্য করা যেতে পারে—ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

কোন এক বাড়ির রকে বসে কথা হচ্ছিল—তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রাস্তায় পড়েই ছুটল ট্যাংরার দিকে। সেখানে এক বন্ধ দোকানের সামনে পাটের দড়ি টাঙ্গিয়ে একটি লোক 'লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'ব্রতকথা', 'তারকেশ্বর মাহাত্ম্য', 'গোপাল ভাঁড়' প্রভৃতি বই বিক্রী করেন। কদিন আগেই আলাপ হয়েছে। সেখানে গিয়ে বললে, 'আমায় কিছু বই দেবেন? একদিনের জন্যে? আমি একটা মেলায় যাচ্ছি রবিবার। সোমবার সন্ধ্যের আগে ফিরে দাম বুঝিয়ে দোব।'

তারকেশ্বরের কথা বলে লাভ নেই—নিজেই হয়ত চলে যাবেন।

তিনি একটু ইতস্তত করছিলেন। পাশে একটি লোক বসে বিড়ি খাচ্ছিল—সে বললে, 'একে আপনি অনায়াসে দিতে পারেন। শিয়ালদার বাজারে আমি অনেক দিন দেখেছি—সেখানে খুব নাম ওর, কারও এক পয়সা মারে না।'

মন্দিরের ধারে জায়গা পায়নি, দুধপুকুর যাবার পথে এক জায়গায় বই নিয়ে বসেছিল। ভোরে বন্ধুদের একজনকে বসিয়ে একবার দর্শনও সেরে এল—কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে ফিরল না। বেলা দেড়টা নাগাদ প্রায় সব বই বিক্রী হয়ে গেলে এক জায়গায় কিছু খেয়ে বিকেলের ট্রেনে ফিরে এল। তিনখানা বই শুধু ফিরেছিল, বাকী সবগুলোর দাম চুকিয়ে দিয়ে হাত পাতল। ভদ্রলোক খুশী হয়ে তিনটে টাকা দিয়ে দিলেন একেবারে। একটা বিড়িও দিলেন। পথের ধারে এক পানের দোকানের দড়িতে সেটা ধরিয়ে পিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরল মণিমোহন।

মাসে দশ-পনেরো টাকা থেকে শুরু হয়েছিল আয়, সেটা যখন পঞ্চাশ-ষাটে দাঁড়াল তখন এই চাকরিটা পেয়ে গেল। বড় কাপড়ের দোকানের চাকরি। মাইনে ষাট টাকা, দৈনিক চার আনা জল-পানি, ছুটির দিন কিম্বা সকালে বেরিয়ে বন্ধ দোরের মধ্যে বসে মাল সাজানোর কাজ করলে ওপর টাইম আছে। স্টক টেকিং-এ খাওয়া ও বকশিশ। মাগগিভাতা তেরো টাকা। অর্থাৎ মোট প্রায় আশি পঁচাশি টাকা আয়।

কিন্তু সংপথেই একটা বাড়তি আয়ের উপায় করে নিল মনু।

আরও কিছু উপরি পেতে পারত অর্থাৎ চুরির ভাগ কিন্তু সে পথ মনুর নয়। বস্তুত ওর

এই সততার কথা শুনেই মালিকরা ডেকে বেচে চাকরি দিয়েছেন। তবে মনু চুকলিও খাবে না, ভেবেই রেখেছিল। তাই অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে তেমন বিরোধ বাধল না।

দু-চার মাস দেখে মনিবকে বলল, 'রবিবার তো বন্ধ রাখেন আপনারা—কিছু কমদামী মাল দিন না, আমি এই বাইরে রেখে বিক্রী করব? যা দাম তাই দেব—আপনি খুশী হয়ে যদি কিছু দেওয়া উচিত মনে করেন দেবেন—। কী বলেন?'

মনিব একটু ইতস্তত করে বললেন, 'পথে বসে মাল বিক্রী করা—ওই ওদের সঙ্গে? বড় লজ্জার কথা না?'

'এতো আপনারা নন, আমি বেচছি তো! আমার আবার লজ্জা কি?'

লোভ তো ছিলই—মনিব রাজী হয়ে গেলেন।

প্রথম দিন খান কুড়ি সাড়ি নিয়েছিল। আর মালগুলো রাখার জন্যে একটা ছোট কাঠের বেঞ্চ। এক ঘণ্টার মধ্যে বিক্রী হয়ে গেল পনেরো ষোল-খানা। আরও বেশী থাকলে বেশী বিক্রী হতো। এই ক'খানা পড়ে আছে দেখে কেউ এল না, বেছে নিতে পারবে না ভেবে। কিম্বা মনে করল 'শপ-সয়েলড্' মাল।

পরের রবিবার পঞ্চাশখানা সাড়ি, ধুতি, ইত্যাদি। এখন তো রীতিমতো 'মিনি' দোকানই সাজিয়ে বসে একটা। আর একটি ছেলেকে সাগরেদ নিয়েছে, তাকে দৈনিক একটাকা আর চার আনা জলপানি দেয়।

এ ছাড়াও আছে।

পুজোর পর দশমী থেকে সাত দিনের ছুটি। মনিব খুব স্নেহ করছেন। উদামী ও টাকার ব্যাপারে এত সৎ—পরিষ্কার হিসেব রাখে দুদিকেই —ব্যবসায়ীমাত্রই স্নেহ করবেন। বললেন, 'আমি পঞ্চমীর দিন মাদ্রাজ যাচ্ছি কদিনের জন্যে—তুই যাবি? ফিরব দিন দশেক পরে—এই কদিনের বাড়তি ছুটি দিয়ে দেব, আটকাবে না। আর ষষ্ঠীর পর তেমন কাজের চাপও তো থাকবে না।'

'সেখানে পুজোটুজো হয়?' শুধোল মনু, 'মায়ের মুখ দেখতে পাবো তো?'

'খুব খুব। আমি যেখানে যাচ্ছি সেই পাড়াতেই বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশনের বারোয়ারী পুজো হয়। আমার ভগ্নীপতি কুণ্ডুবাবু সেখানের প্রেসিডেন্ট। চল না, প্রসাদ খাওয়াবো। তোর খরচা লাগবে না, আমার ছেলেপুলে নিয়ে যাওয়া —একটা লোক থাকলে ভাল হয়।'

মনু রাজী তো হয়ে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল পড়ায় পড়ায় টো-টো ক'রে ঘোরা। কে মাদ্রাজ গেছে, কার আত্মীয় মাদ্রাজে থাকে—খুঁজে খুঁজে তাদের বার করল। মাদ্রাজে কী কী পাওয়া যায় না, কোন জিনিসটা বাঙালী পছন্দ করে অথচ পায় না—তারই একটা তালিকা করে নিল।

ট্রেনে উঠে মালিক রসিকবাবু প্রশ্ন করলেন, 'তোর এত বড় কাঠের বাক্সটা কিসের রে? এত কি নিলি?'

'দেখতেই পাবেন মাদ্রাজে নেমে।' সংক্ষেপে উত্তর দিল মনু।

পেলেনও দেখতে রসিকবাবু।

পৌঁছলেন ওঁরা সপ্তমীর ভোরে। স্নান জল-খাবার সেরে মালিকের ফাইফরমাশগুলো খুব দিয়েই সেই বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মনু। দুপুরবেলা পুজোমণ্ডপে গিয়ে রসিকবাবু দেখলেন, ইতিমধ্যে কুণ্ডুবাবুর অনুমতি নিয়ে মনু একদিকে বসে গেছে—ঐ কাঠের বাক্সটা টেবিল করে। সিঁদুর, তরল আলতা, শাঁখা আর ধনেখালির কখানা সাড়ি সাজিয়ে।

দুদিনেই সব বেচে শেষ করে মায় কাঠের বাক্সটা পর্যন্ত একজনকে ছ টাকায় বেচে বাড়ি

এসে বলল, 'মোট দুশো কুড়ি টাকা আমার নীট লাভ হয়েছে। আরও মাল আনলে আরও বেত।'

এ-ই মনু।

মনু এতদিনে নিষ্কর্মা, নির্দায় হয়ে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিজের দৈহিক প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা ভাবতে শুরু করেছে, অর্থাৎ বিবাহের কথাটা।

ওর সবই হিসেব করা। বিয়ের বেলাতেই বা অন্যথা হবে কেন?

বিয়ের কথা মা বলছেন বহুদিন থেকেই—কিন্তু মনু তাতে কর্ণপাত করেনি, ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। এবার নিজেই ডেকে বলল, 'মেয়ে দ্যাখো, এবার আমি বিয়ে করব।'

কিন্তু—

মনু যে 'হিউমান', মানুষ। মানুষের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষার ঢেউ তার বুকেও আঘাত করে—তারও শখ সাধ আছে—সে পরিচয়টা এত-দিনে আমরা পেলুম।

মনু বলল, 'পয়সা কড়ি চাই না। তিন সাড়ে তিন হাজার আমি খরচ করতে পারব, দরকারে হয় এক হাজার টাকা ধার করব—কিন্তু মেয়ে সুন্দর চাই। আমি কালো, তোমরা সবাই কালো—কালো দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, এবার একটু ফরসা রঙ অন্তত চোখে পড়া দরকার। আর চোখ দুটো টানা যেন হয়। গান জানে তো আরও ভাল।'

এই খানেই গোল বাধলো।

ওদের জাতের এবং ওদের মানের যারা—তাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে বিশেষ নেই। মেয়ে এমনি ঢের, প্রতিদিনই দু-চারজন এসে হাতে পায়ে ধরতে লাগল। বিশেষ ওদের দোকানের শশীবাবুর ভগ্নীপতি। সে বুড়ো আবার ও-পাড়াতেই থাকে, সে রোজ এসে একবার মনুর হাত ধরে আর এক-বার ওর মায়ের পায়ে পড়ে। এত মিনতি আর এত কান্নাকাটি করে—মেয়েটা যদি একটু চলনসই হত তো মনুর মা-ই জোর জবরদস্তি করতেন। কিন্তু সে মেয়েকে ওরা সবাই দেখেছে, মা, মনুর বোনেরা। ঘোর কালো, চাকাপানা মুখ, কুৎসিত চোখ,—নাক চ্যাপ্টা, সামনের দুটো দাঁতের মাঝে অনেকখানি ফাঁক। হাসলেও তাই খারাপ দেখায়।

না, ও মেয়ে চলবে না।

পুরো এক বছর ধরে চলল মেয়ে খোঁজা ও দেখা। না ভুল বলছি, প্রায় সওয়া বছর। প্রথম প্রথম মনু নিজেই যেত, এক মামার সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে কিন্তু তাতে ফল হত এই—বেশীর ভাগ জায়গাতে ও যত অপছন্দ করুক না করুক—মেয়ের সঙ্গে বেমানান—এই অজুহাতে তারাই নাকচ করে দিত প্রস্তাব, অনেক সময় মেয়েরাই আপত্তি তুলত। ইদানীং তাই সোজাসুজি দেখা ছেড়ে দিয়েছিল, মামা এসে প্রশংসা করলে আড়াল থেকে দেখে আসত।

অবশেষে তেমন মেয়ে মিলল—পুরো চোদ্দ মাস বাদে। কালোমণি নয়, পোশাকী নয় বুঝি সুগন্ধা, কিন্তু রঙ ফরসা, টানা টানা চোখ, গোলালো গড়ন—আর কি চাই? মেয়ের বাবা শিয়ালদার বাজারে কলা বিক্রী করেন, এক পয়সাও দেবার সঙ্গতি নেই তাঁর—নইলে অমন মেয়ে এত-দিন পড়ে থাকত না।

তা না দিক—মনু যথারীতি আড়াল থেকে দেখে এসে ঘোষণা করল, সব খরচ আমিই দোব, ওদের ঘর খরচা সুদ্ধ। মা একটু গাঁই গুঁই করতে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ করো। চিরদিন তোমার গুষ্টি খাওয়াতেই ভূতের মতো খেটে যাচ্ছি—এত করে রোজগার করছি, নিজের শখ মেটাতে দু পয়সা খরচ করব তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন? ফের যদি একটা কথা বলো তো বিয়ে ভেঙ্গে দোব, আর জীবনে বিয়েই করব না। চাকরিও ছেড়ে দিয়ে যে-দিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। ছোট ছেলেকে নিয়ে মনের সুখে থেকো।'

এর পরে আর কথা বলবেন মা, তাঁর একটা ঘাড়ে এমন দশটা মাথা নেই।

মনু নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হয়ে উঠে-পড়ে লাগল এবার।

তাড়াতাড়ি পাটিপত্রটা সেরে নিল। মেয়ের জন্যে দুটো সোনাবাঁধানো পলার চুড়ি অর্ডার দিল। ভাবী শ্বশুরকে বলেছিল, 'এই চুড়ি আর ভাল কাপড় একখানা বিয়ের আগে পাঠিয়ে দেব। সেই কাপড় পরিয়েই বিয়ে দেবেন—বাকী যা আমি এখানে এনে দেব।'

আগে অসমাপ্ত বাড়িটা শেষ করে নিল। দোকান থেকে ছুটি নিয়ে মিস্ত্রিদের সঙ্গে থেকে মেঝের খোয়া-পেটা থেকে দেওয়ালে চুণ দেওয়া রঙ-করা নিজেই করল খানিক খানিক। বাজার সব নিজে করল ঘুরে ঘুরে, বেশীর ভাগই চেনা দোকান—তাদের হাতে পায়ে ধরে অনেক কমেই করল বাজার। বৌয়ের জন্যে ব্রোঞ্জের চুড়ি ও হার গড়াল। বেনারসী কিনল টকটকে লাল দেখে। নিজের সিল্কের পাঞ্জাবী একজনকে দিয়ে বিনা খরচায় কাটিয়ে নিয়ে মাকে দিয়ে সেলাই করাল। এইভাবেই মেয়ের জামাও তৈরী হল। বোন-ভগ্নীপতিদের আনাল সব খরচা দিয়ে। অনেক লোক, সহস্র কাজের ফাঁকে নিজেই রান্না করল কতক কতক। বিয়ের দিন থেকে বোনেদের হাতে ওটা ছেড়ে দিল—কিন্তু নিজে আগের দিন সারারাত জেগে বোঁদে তৈরী করল। বাড়িতেও খাওয়া যাবে, ভোজেও কাজে লাগবে। নতুন বাজারে কাঁচাগোল্লা সন্দেশ আর আঁটপুরে পান্তুয়া দইয়ের বায়না দিল, কিছু কমে হবে।

গাড়ি একখানা পেয়েছিল মনিবকে বলে করে। ভাল ঝকঝকে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি। সকালের বুদ্ধি-শ্রাদ্ধ সেরে একটা আন্ডারওয়ার পরে কাঁধে আর কমদামী মৌসুমী পাটের ফুল, দড়ি এনে লেগে গেল নিজেই গাড়ি সাজাতে। এইটে মনে রেখেই এর আগে কদিন এক এক ফাঁকে বৌ-বাজারে গিয়ে দেখে এসেছে কেমন করে সাজায় ফুলওলারা।

গাড়ির পালা শেষ করে ভাইকে নিয়ে লেগে গেল টুনিবালবে দিয়ে বাড়ি সাজাতে। ভাড়া? না মশাই, মণিমোহন আমার ভাড়া করার মধ্যে নেই। তিনটে টুনি বালবের মালা পুরো দামে কিনে এনেছে পোলক স্ট্রীট থেকে। বলে, 'থাক্ না, আমিই ভাড়া খাটাব এর পর। পাঁচ টাকা করে একেকটা মালার ভাড়া—আমি চারটাকা করে দিলে লুফে নেবে দোকানদাররাই।'

সব শেষ করতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। হোক, বেশী রাত্রে লগ্ন। মনু এবার সাবান মেখে স্নান করে জীবনে এই প্রথম, সেনা পাউডার দিয়ে প্রসাধন সেরে, কুঁচনো ধুতি (এটা মালিক দিয়েছেন আইবুড়ো ভাত হিসেবে) ও গরদের পাঞ্জাবী পরে—গলায় জুঁই ফুলের মালা, কপালে গোরি-মাটির ফোঁটা পরে—এদেশে 'কলকাত্তাই' বরেরা যেমন সেজে যায়, সেইভাবেই একসময় রওনা হল মনু প্রবল শঙ্খধ্বনি ও হুংকারের মধ্যে। ওর তো গাড়ি ছিলই, বরযাত্রীদের জন্যেও পাড়ারই মেয়ে ইস্কুলের একটা ছোট গাড়ি যোগাড় করেছিল সে, জনকুড়ি-বাইশ ধরে—তেল আর মবিল দিলেই হবে। ড্রাইভারকে পাঁচটাকা বকশিশ। এর বেশী লোক ধরবার দরকারও নেই, দোকানের বন্ধুরা কাজ সেরে বাস ট্রামে যাবে।

অর্থাৎ বিয়েটা যাতে সব দিক দিয়েই বিয়ের মতো হয়—কোথাও কোন খুঁৎ কোন সাধ না অপূর্ণ থাকে সেদিকে কড়া নজর ছিল মনুর। দীর্ঘদিনের আয়োজন তার, মেয়ে ঠিক হবারও আগে থেকে। মেয়ে তো পাওয়া যাবেই—তখন যেন না কোন অসুবিধা হয়, কিছু না অনবধানতা ঘটে—প্রত্যেকটি সেইভাবে হিসেব করে আয়োজন ও সংগ্রহ করেছে মনু।

ওরা থাকে ট্যাংরায়, নতুন বাড়ি ওখানেই তুলেছে—মেয়ের বাড়ি গড়পার। বেশী সময় লাগার কথা নয়, লাগেও নি। গড়পারের প্রান্তে বস্তির মধ্যে বাড়ি—কথা ছিল পাশের এক পাকা বাড়ির

দুটো ঘর তাঁরা যোগাড় করবেন, সেইখানেই এরা বসবে, বিয়েও হবে। কাপড় গয়না, তাছাড়া ঘর খরচের জন্যে একশো ও সাজাবার জন্যে পঞ্চাশ—মোট দেড়শো টাকা দুদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে—সেদিকেও আয়োজনে খামতি হবার কথা নয়।

কিন্তু একি! সব অন্ধকার, নিঝুম কেন?

ওরা ভুল পথে এল নাকি?

বর নিতে আসার কথা ছিল কেউ আসেনি বটে। কিন্তু সে তথ্যটাকে অত গুরুত্ব দেয় নি মনু। কলকাতায় যানবাহন সমস্যা—হয়ত আটকে গেছে কোথাও, গাড়ি যখন তারা আনবে না, তখন অপেক্ষা করে লাভ কি? এই ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিল।

বর নিজেই নেমে ঘুরে দেখে এল সব। পথ ভুল হবার কোন কারণ নেই, ওর মামা তিন-চার দিন এসেছেন, ভাই দুদিন ঘুরে গেছে, মনু নিজে এসেছে এই কদিনে সাত-আট বার লুকিয়ে চুরিয়ে।

এই বস্তি এই ঘর। ভাইও চিনল—কোথাও কোন ভুল হয় নি। কিন্তু সব অন্ধকার, দোরে তালা ঝুলছে একটা। কেউ কোথাও নেই।

তাহলে কী রুক্ম হ'ল?

অপমানে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে—কিন্তু অস্থির হ'ল না তবু। মামাকে বলল, 'আমরা গাড়ি নিয়ে একটু দূরে গিয়ে কোথাও দাঁড়াই, আপনি আশপাশের বাড়ি গিয়ে খোঁজ করুন। ওরা হয়ত প্রথমটা বলতে চাইবে না। বলুন—যা হয় একটা নাম করে দিল—বলুন অমুক ইনস্পেক্টর আমার আত্মীয়। পুলিশ এলে আপনাদের সুদ্ধ বাড়ি খানাতল্লাশ করবে। ঠিক করে বলুন এরা কোথায় গেছে—কেন গেছে। মেয়ের বিয়ে দেবে বলে টাকা খেয়েছে—তার সাক্ষী সাবুদ আছে, পুলিশ কেস করব।'

অত কিছু করতে হ'ল না অবশ্য। দু-চার জনকে জেরা করতেই খবরটা বেরিয়ে পড়ল।

এই পাড়াতে মেয়ের একাধিক প্রণয়ী ছিল। সুন্দর মেয়ে, অনেকেই পেছনে লেগেছিল। মেয়ের বাবা অনেক সংখ্যক বলেই তত গুরুত্ব দেন নি। দু-চারজনকে ধমক ধামক করেছেন, মেয়েকে শাসন করেছেন—ভেবেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মেয়ে বুঝি দুদিন বরকে বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে—বর্ণনায় চিনেছে। তার বর পছন্দ হয়নি আদৌ। প্রথমটা মায়ের কাছে কান্নাকাটি করেছে—তারপর সেদিকে কোন ফল হবে না বুঝে ঐ অনেক প্রণয়ীর একটির সঙ্গে যোগাযোগ করে কাল রাত্রে কোথায় পালিয়ে গেছে। এঁরা আজ সারা সকাল যথেষ্ট খোঁজ করেও কোন খবর পান নি—তখন এঁদের সামনে অপ্রতিভ হবেন—কী জবাবদিহি করবেন এই ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছেন—হয়ত মারামারি বাধবে একটা, হয়ত পুলিশ কেস হবে—এই ভয়ে তাঁরাও বিকেলে সপরিবারে সরে পড়েছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

ধীর স্থিরভাবে বসে সব শুনল মনু। উত্তেজিত হ'ল না, গালাগালি করল না, শুধু বলল, 'গাড়ি ঘোরাও, চল রাসমণি বাজার।'

শশীবাবুর ভগ্নীপতি কালীসহায়ের বাড়ি চেনাই ছিল। সেখানে পৌঁছে তাঁকে ডেকে বর নিজেই বলল, 'এখনই, আজ রাত্রের এই লগ্নে যদি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন, আমি করতে রাজী আছি। খরচার জন্যে ভাববেন না। কাপড় গয়না আমার তৈরী আছে, পুরুত আছে—আর যা লাগে—আমি খরচ দিচ্ছি, কিনে আনুন।'

কালীসহায় এ সুযোগ ছেড়ে দেবেন, অবশ্যই তেমন বোকা তিনি নন। এ কলকাতা শহর, পয়সা ফেললে কী না করা যায়। তিনি তখনই হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন। মনু হোটেলে লোক পাঠাল, বরযাত্রীদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে। শেষ পর্যন্ত মহা সমারোহেই বিয়েটা হয়ে গেল বলতে গেলে।

——

ভারত-জার্মান সহযোগিতার সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায়?

ভারতীয় ও জার্মান জনগণের প্রতিভার মিলন ঘটিয়ে, স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমগ্র মানব-কল্যাণের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

ভারতের এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর জনগণ গত ২৬ বৎসর ধরে এই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে এসেছে।

এক নজরে ভারত-জার্মান আর্থনীতিক সম্পর্ক ঃ

ভারতকে আর্থনীতিক সাহায্য (১৯৭৪ এর ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত)	
জার্মানীর মোট সরকারী দ্বিপাক্ষিক ঋণের এক তৃতীয়াংশ এবং মোট জার্মান কারিগরি সহায়তার দশ শতাংশ	৩·১ বিলিয়ন ডি. এম বা ১·৯০০ কোটি টাকা
১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতকে জার্মানীর মোট উন্নয়ন মূলক সাহায্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ	৭২৫ মিলিয়ন ডি. এম বা ২১৭·৫ কোটি টাকা
—১০৮ কোটি টাকার দ্বিপাক্ষিক মূলধনী সাহায্য (স্বল্প সুদের হারে এবং বিশেষ শর্তাধীনে প্রদত্ত ঋণ)	
—১৮·৩ কোটি টাকার কারিগরি সাহায্য (অনুদান)	
—৯১·২ কোটি টাকার বহুপাক্ষিক ও অন্যান্য সাহায্য (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত)	

১৯৭৪ সালে ভারত ও ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ঃ ৩৯৪ কোটি টাকা

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
—এক নির্ভরশীল সহযোগী

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর জনসংযোগ কেন্দ্রের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ, ১ হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত।

With best compliments from

SCHRADER SCOVILL DUNCAN LTD.

World Leadership for over a Century

★

Schrader

The largest Selling Tyre Valves and accessories in the world.

BENGAL SHIPPING CO.

STEAMER & BOAT OWNERS & GENERAL CONTRACTORS

Office :

169, VIVEKANAND ROAD

CALCUTTA-6

City Office :

15, GANESH CHANDRA AVENUE

CALCUTTA-13

নারীমেধ যজ্ঞে

প্রতিভা বসু

ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধেশ্বর বাবুর মুখ দেখলেন ললিতা দেবী। ললিতা দেবী সমাজ সেবিকা, অল্প বয়সে ইংরেজ আমলে সক্রিয় রাজনীতি করে অনেক শাস্তি ভোগ করেছেন, বছরের পর বছর জেল খেটেছেন, লুকিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন করবার সময় পাননি। তারপর কখন দিন গত হয়ে গেছে। এখন শান্ত, এখন দীন দুঃখীর সেবা ধর্মই তাঁর ব্রত। অতি সজ্জন, অতি দয়ার্দ্র চিত্ত ও মহিয়সী মহিলা। রাজা উজিররা সকলেই তাঁকে চেনেন, সকলেই মান্য করেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর প্রতিবেশী। এক সময়ে পৈতৃক অর্থে স্বচ্ছন্দ ছিলেন, যৌবন কেটেছে তাস পাশা জুয়া আর নেশায়, এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। পিতৃদেবের মৃত্যুতে বিধবা মা ঘাড়ে পড়েছেন, স্ত্রী বছর বছর সন্তানের জননী হয়ে মধ্যে সংখ্যা আশাতীত রূপে বাড়িয়ে ফেলেছেন, নিজস্ব বাড়িখানা সংস্কারের অভাবে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়েছে। তারই মধ্যে একঘর ভাড়াটে বসিয়ে মোটামুটি রেশনের সংস্থানটা করে নিয়েছেন বটে তবু দিন চলে কই? শুধু ভাতরুটিতে পেটও ভরে না, পরণের কাপড়ও জোটে না। আট নটি সন্তান মুর্গির ছানার মতো ঘুরে বেড়ায় পিল পিল করে। পিতার লাইফ ইনসিওরের টাকাটা ভাঙিয়ে মনোহারী দোকান দিয়েছিলেন একটা, বড়ো ছেলেটা অসাধ্য হলেও মেজোটা সহকারী ছিলো। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজে এতো আয়াসী আরামী লোক যে বেলা দশটার আগে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে না, দিবানিদ্রার অভ্যাস প্রবল, সন্ধ্যা লাগতে নেশা আর জুয়ার টানে ভেসে যান। এ অবস্থায় দোকান আর টিকে থাকতে চাইলো না। তা নিয়ে নিজেকে দোষ না দিয়ে তিনি, বড়ো ছেলেকে দায়ী করতে গিয়েছিলেন, কিছু করে না বলে, সঙ্গে সঙ্গে রুকবাজ পুত্র নিঃশব্দে এমনভাবে এগিয়ে এসেছিলো পিতার দিকে যে দুই লাফে তিনি স্ত্রীর পিছনে এসে হাঁপাতে লাগলেন।

তারপর বড়ো ছেলে, বেরিয়ে যেতেই সিংহনাদে মেজছেলেকে বললেন, "শুয়োরের বাচ্চা, আমি না দেখলে না করলে তোমরা কিছুই করতে পার না, না? খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি অমনি অমনি?" এই বলে এমন ধমকাধমকি করলেন যে, ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালালো। তারপর প্রথম মেয়ে শান্তা। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালো ছিলো, ললিতা দেবীর বাড়ির পাশ দিয়ে ইস্কুলে যেতো, আগে তার খুব ভালো লাগতো মেয়েটাকে। অনেক সময় ডেকে ওর সঙ্গে কথা বলেছেন, দরকার মতো বই জুগিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুদের সঙ্গে ঐটুকুই পরিচয়। তাই অনেকদিন পরে হঠাৎ বাড়ির দরজায় দেখে অবাক হলেন। উনি হাসা বিতরণ করে বললেন, "একটা অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনি তো আমার বড়ো মেয়ে শান্তাকে চেনেন, তাকে একটা পরিচয় পত্র লিখে দিতে হবে। একটা দোকানে একজন সেলস গার্ল চাইছে, চেহারা পছন্দ হলেই নিয়ে নেবে। কিন্তু ভালো পরিবারের মেয়ে চায়। ভেজালের তো অন্ত নেই, সব মেয়েই তো সেজেগুজে গিয়ে বলে আমি অমুক, আমি তমুক, আসলে যে তারা কোন পাড়ার তা চেনার তো একটা উপায় থাকা চাই? আপনারা হলেন গিয়ে কতো নাম করা মানুষ, আপনাদের সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই সকলের সম্ভ্রম হয়"। ললিতা-দেবী বললেন, ঠিক আছে। বিকেলে ওকেই পাঠিয়ে দেবেন, ওর হাতেই দিয়ে দেব। বিকেলে শান্তা এলো। ও বরাবরই সুশ্রী ছিলো, দেখলেন আরো একটু ভরেছে। পড়াশুনো ছেড়ে দিলে কেন? বলতেই মুখ তুলে তাকালো, বড়ো বড়ো চোখে আগুনের তাপ নিয়ে বললো, 'বাবা কিছু করেন না, দাদাকে তো জানেনই, আমার পরে আরো পাঁচজন ভাইবোন আছে, কারো মুখ ভরে না, পড়বো কী দিয়ে? পাশের বাড়ির বাচ্চাদের মাস্টারি করে পনেরো টাকা মাইনে পেতুম, তার জোরেই জেদ করে বলে-ছিলুম, অন্তত হায়ার সেকেণ্ডারিটা আমি পাশ করবোই। হঠাৎ বড়দা কোথা থেকে এক চাকরি যোগাড় করে নিয়ে এলো, বললো, ওর চেনা বাড়ি, তিন-চারটা ছেলেমেয়ে রেখে মা মারা গেছে, ভদ্র-লোক আপিস করে দেখতে শুনতে পারেন না, একজন গভর্নেস মতো চাইছেন. যে নাকি ঝি চাকর খাটাতে পারবে, বাচ্চাদের পড়াশুনো করাতে পারবে, মাইনে আড়াইশো টাকা। এ চাকরিতে প্রথমে আমার বাবা মার আপত্তি ছিলো, কিন্তু আড়াইশো টাকা মাইনে শুনে আমিও ক্ষেপে গেলুম, দাদাও মা বাবাকে বুঝিয়ে রাজী করলো। কিন্তু কাজে ঢুকেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম দাদা আমাকে কোন অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। জেনে শুনেই দিয়েছিলো, তার জন্য টাকাও নিয়ে-ছিলো'। থেমে বললো, 'আপনি এক সময় আমাকে ভালোবাসতেন, আমি তার দোহাই দিয়েই বলছি. এই চাকরিও আমার সেই অন্ধকার। অন্তত আপনি আমাকে সেখানে ঠেলে দিতে সহায়তা করবেন না। চাকরিতে আমি ছমাস ছিলুম, ছমাসে আমার সব আমি খুইয়েছি। আমাকে তালাবন্ধ করে আটকে রাখতো, আমি পালাতে পারি নি। বাচ্চা ঠিকই ছিলো, কিন্তু আমার কাজ শুধু বাচ্চারাই ছিলো না, ছিলো তাদের বাবার লোভের ইন্ধন হওয়া। আমি বলেছিলাম, আমাকে বিয়ে করুন, আমার সম্মানের বিনিময়ে আমি আপনার দাসী হয়ে থাকবো। লোকটা হাসতে হাসতে বলেছিলো, বাংলাদেশে পুরুষদের কি এতোটাই দুর্গতি হয়েছে যে একটা উচ্ছিষ্ট মেয়েকে বিয়ে করবো জেনে শুনে। ঐ আড়াইশো টাকায় আমার বাবার সংসার তখন বেশ মসৃণভাবেই চল-ছিলো, প্রথম সুযোগেই আমি যখন পালিয়ে এলুম, কেউ আমাকে ভালোমুখে গ্রহণ করে নি। রাগ করেছিলো, বলেছিলো, নিজের যোগাড় নিজে দেখ, আমরা খাওয়াতে পারবো না। আমি বলেছিলাম, ঐ লোকটা ভালো নয়, ওখানে কোনো মেয়ে সসম্মানে কাজ করতে পারে না। তবুও সে কথায় কেউ কান দেয় নি। কস করে অতগুলো টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এতোটাই রেগে গিয়েছিলেন ওঁরা, উঠতে বসতে আমাকে গঞ্জনা দিয়েছেন। আমি একজন মেয়ে মাত্র, লেখাপড়া জানি না, কী করে দাদাদের

মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবো বলুন? দিন কাটলেও রাত কাটাবো কোথায়? বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসাধন বিক্রীর কাজ নিয়েছিলাম একটা, সামান্য কমিশন, তাতেও কতো বিপদ। কড়া নেড়ে কারো বাড়ির নিদ্রাভঙ্গ করে গিন্নীদের গাল খেয়েছি, কারো বাড়ির একা কর্তার নিভৃত শয়নকক্ষে ডাক পড়েছে। এই তো জীবন। তারপর দাদাই আর একটা পথ দেখিয়ে দিল। ততোদিনে আমি অনেক শক্ত হয়েছি, অভিভাবকদের অবিচার আমাকে বিকৃত করেছে, দারিদ্রের হাঁ আমাকে গিলে ফেলেছে। অনশনে অর্দ্ধাশনে থেকে থেকে কাঙাল হয়ে গেছি। শেষে মরীয়া হয়ে ধীরে ধীরে দাদার পায়ে পা ফেলে ফেলেই অনেকদূরে এগিয়ে গেলাম। যাকে কলগার্ল বলে সর্বতোভাবে একদিন তাই হলাম। এখন সংসারে আমি টাকা দি, তবে নিজেকে বঞ্চিত করে নয়, নিজের সখ সাধ মিটিয়ে তারপর'।

'ওরা জিজ্ঞেস করেন না তুমি কোথা থেকে টাকা পাও?'

'না। আমি খেয়ে উঠে বেরিয়ে যাই, যখন খুশি তখন ফিরি। এর মধ্যে আমার অনেক স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য আছে, কতোদূর পর্যন্ত যাবো সেটাও আয়ত্বের মধ্যে আছে, তাছাড়া অনেক সহৃদয় মানুষেরও দেখা পাই আমি। কিন্তু এই কাজ, এই সেলস গার্লের নাম করে মরেল তোষণের কাজ অসম্ভব আমার পক্ষে। আমি আর এখন আগের মতো কাঁচা মেয়ে নেই যে বাবা দাদা যেখানে খুশি সেখানে ঢুকিয়ে দিলেই ঢুকে যাবো। খবরটা এনেছে দাদা, এখন পাকা করছেন বাবা। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি অনেক লুকোনো ব্যবসা আছে এদের, সে সব রক্ষার জন্যে অনেক রুই কাৎলাকে হাতে রাখতে হয়, আর হাতে রাখতে গেলেই মেয়ের দরকার। এইসব বড়ো মানুষেরা মনে তথাকথিত ধনী ভদ্রলোকেরা যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে মিলতে চায় না, গৃহস্থ ঘরের সুশ্রী নীরোগ মেয়ে চায়। পাওয়াও তো কঠিন নয়, আজকাল। আমার বাবা দাদার মতো আরো অনেক বাবা দাদা আছে সংসারে। আবার তাদের প্রয়োজনায় আমরাও যেমন পেশাদার মেয়েদের পথে নেমেছি, তেমনি পেশাদার মেয়েরাও ভদ্র সেজে ঠকায় বলে কোনো বিশেষ লোকের পরিচয় পত্র দরকার হয়।'

'সে জন্যই তোমার বাবা আমার কাছে এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা দুজনে মিলে আরো দু'-তিনটে পরিচয় পত্র যোগাড় করেছেন, কিন্তু আপনি দিলে সেটার মূল্য আলাদা। আপনি দেবেন না। আপনাকে আমি ভক্তি করি, আপনাকে ওঁরা ঠকাবেন সেটা আমি হতে দেবো না। এসব বলেছি জানলে আমাকে কেটে দু' টুকরো করে ফেলবেন। আপনি আমাকে বাঁচান এ অবস্থা থেকে।'

ললিতা দেবী সম্মোহিত হয়ে শুনছিলেন, বুকের ভিতরটা শুকনো মনে হচ্ছিলো।

চোখ নামিয়ে মেয়েটি সহসা কোমল হয়ে উঠলো, তার মুখে আগুনের লালের বদলে লজ্জার লাল ছড়িয়ে পড়লো। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো সে, নিচু গলায় বললো, 'এদের মধ্যেই একজন মেলামেশা করতে করতে আমাকে ভালোবেসেছে, আমিও তাকে ছাড়া জগৎ সংসার অন্ধকার দেখি। এখন সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। অথচ আমি যদি বিয়ে করে চলে যাই অতগুলো সন্তান নিয়ে আমার মা ভেসে যাবেন। দুঃখ তো তাঁরও। তিনিও তো আমার মতোই একজন ওদের কারাগারে বন্দী মেয়ে? মা দেখতে এখনো সুন্দর। কে জানে ওরা শেষে তাঁকেও ঠেলে দেবে কিনা।'

ললিতা দেবী হতবাক।

'আপনি আমার মনে জোর দিন, এইসব মমতায় আবিষ্ট না থেকে, মায়ের দুঃখে কাতর না হয়ে আমি যেন এই মৃত্যু থেকে একটা সম্মানের

জীবনে প্রবেশ করতে পারি। আর যারা আমাদের মতো অবস্থার বিপর্যয়ে দুঃখী মেয়েদের নিয়ে টিটকিরি করে, খালো বসে নিদ্রায় তৃপ্তকর হয়ে বসে বসে নিন্দার জাবর কাটে তাদের ঘৃণা যেন ঘৃণা দিয়েই উচ্ছেদ করতে পারি।' চোখের জলে ভেসে সে পায়ে মাথা রাখলো।

ললিতা দেবী বেদনাহত বিস্ময়ে চুপ করে রইলেন, দু' হাতের আদরে তুলে নিলেন বুকে। এতো মাত্র একজনই নয়, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এই ঢেউ উচ্ছিন্ন হতে না হতে আর এক ঢেউ এসে হাজির হবে। ককে ফেলে যে তিনি কাকে রক্ষা করবেন সে কথাটাই ভেবে পেলেন না।

——

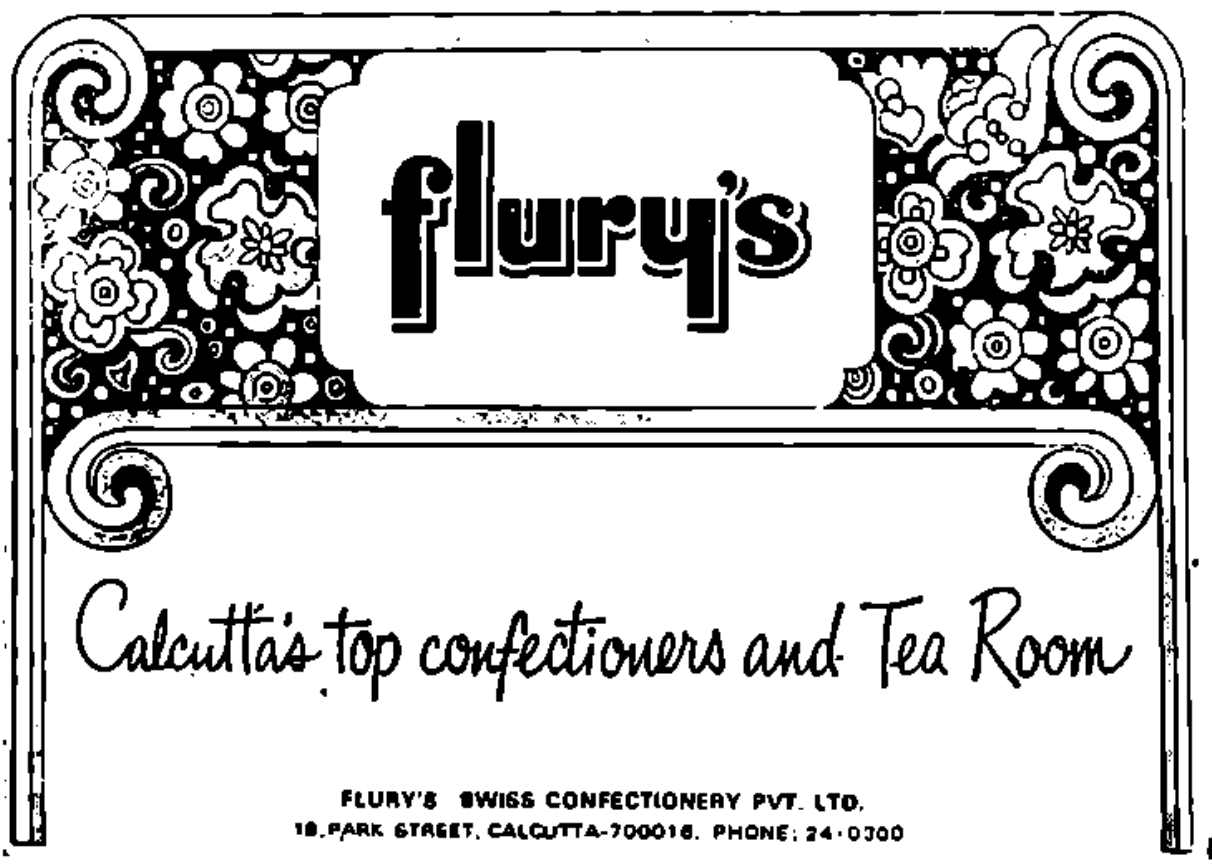

সকালে কোনো লক্ষণ ছিল না। আকাশ পরিষ্কার; ক্বচিৎ দু এক খণ্ড সাদা মেঘ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নি; রোদ ঝকঝক করছিল। দুপুরেও একই রকম। মেঘলাও হয় নি। সামান্য গুমোট লাগছিল, বিকেলে তাও কেটে গেল। অশোক বিকেলের পর ভবানীপুরে গিয়েছিল। কিছুদিন ধরেই তার অদ্ভুত এক অসুখ দেখা দিয়েছে। অসুখ, না ব্যাতিক? কেউ বলছে অসুখ, কেউ বলছে ব্যাতিক। অসুখই হোক আর ব্যাতিকই হোক, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে। তা আজ প্রায় দিন পনেরো হল। এখনও হাতে তার দু সপ্তাহ ছুটি। দরকার পড়লে আরও নিতে পারে; অফিসে তার ছুটি পচে যাচ্ছে।

ভবানীপুরে তার ডাক্তার। মানে তার বন্ধু প্রবোধের জামাইবাবু থাকেন। মানুষটি বড় ভাল। ঘর-ঘরে অশোককে দেখছেন।

সন্ধ্যের মুখে এসপ্লানেডে ফিরে এসে অশোক দেখল, সর্বনাশ—আকাশ যেন ভেঙে পড়ার অবস্থা। ঘুটঘুটে করছে আকাশ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘের কী ডাক। ঝড়ও উঠছে।

ট্রাম বাস ট্যাক্সি কোনোটাই ধরা যায় না তখন। বৃষ্টি আসছে দেখে সবাই ছুটছে। সর্বত্রই একটা হুড়োহুড়ি, প্রায় মারপিটের অবস্থা। অশোক এই ধরনের ভিড়ের মধ্যে গেল না। উত্তেজনা, উদ্বেগ তার পক্ষে ভাল নয়। বিরক্ত বোধ করলেও অশোক চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর বৃষ্টি নামল। মুষলধার বৃষ্টি। মনে হল, আকাশ যেন কয়েক দিনের যত জল সঞ্চয় করেছিল আজ সব ঢেলে দেবে। ঝড়ের ঝাপটাও কম নয়, মাঠের দিক থেকে দমকে দমকে ছুটে আসছিল।

প্রথম দফায় আধ ঘণ্টা বৃষ্টি। তাতেই চারদিকে জলময় হয়ে উঠল, রাস্তার অনেক বাড়ি

নিবে অন্ধকার হয়ে গেল।

অশোক একটা ট্রামে উঠে পড়েছিল বৃষ্টির শেষ মুখে। ভেবেছিল—রাস্তায় জল জমার আগে যতটা এগিয়ে যেতে পারে—এগিয়ে যাবে।

ওয়েলিংটনের মুখে এসেই তার ট্রাম থেমে গেল। সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জলে আটকে গিয়েছে বোধ হয়। অতএব এখানেই নামো।

বাধ্য হয়েই নেমে পড়ল অশোক। কোনো দিকেই যাবার উপায় নেই।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গেটের দিকে একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। পরদা ঢাকা, জলে প্রায় জলমগ্ন। রিকশাওয়ালাও কাছে নেই।

এমন সময় আবার পাতলা বৃষ্টি নামল।

অশোক প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে রিকশাটাকে ধরল। কি আশ্চর্য, রিকশাওয়ালা রিকশার মধ্যেই বসে আছে পরদা ঢাকা দিয়ে। বোধ হয় গাঁজার বিড়ি খাচ্ছিল। কী দুর্গন্ধ!

সাধারণত এই অবস্থায় রিকশাও যেতে চায় না। কিন্তু রিকশাওয়ালা রাজী হয়ে গেল। বলল, পাঁচ টাকা লাগবে।

অশোক সুকিয়া স্ট্রীট পর্যন্ত যাবে। যে রকম জল তাতে পাঁচ টাকা তেমন কিছু মনে হল না তার কাছে। দশ টাকাও হাঁকতে পারত।

রিকশায় উঠে পড়ল অশোক।

রিকশাওয়ালা বলল, একটু বসতে হবে; তার আর-এক সওয়ারী আছে; সে ফিরে এলে যাবে।

অশোক এমন বিচিত্র রিকশাওয়ালা দেখে নি। শেয়ারের ট্যাক্সিতে এই রকম হয়, ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। কিন্তু শেয়ারের রিকশা? কলকাতার হল কী?

ঝগড়া করা বৃথা। গজগজ করল অশোক, বিরক্তি প্রকাশ করল। তার পক্ষে আর কী করার আছে বুঝতে পারল না। চারপাশে কোথাও আর কিছু নেই যাতে গিয়ে বসতে পারে। বৃষ্টিও পড়ছে।

কলকাতার রিকশাওয়ালারা আজকাল কেমন কর্তব্যপরায়ণ হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে রিকশাওয়ালা বলল, সে একজন সওয়ারী নিয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে ফিরতে হবে। একই রাস্তা। অশোককে নিতান্ত বিপদে পড়তে দেখে সে তাকে নিতে রাজী হয়েছে। নয়ত ভাড়া করা রিকশায় কেউ লোক নেয় না।

কিছুক্ষণ পরে রাস্তা পেরিয়ে জলে ভিজতে ভিজতে সেই প্রথম সওয়ারী এসে হাজির। গায়ের ওপর ভেজা চাদর, অশোকের প্যান্ট জামা ভিজে যাচ্ছিল।

সওয়ারীকে প্রথমে অশোক দেখতে পায় নি। যখন পরদার ফাঁক থেকে দেখল, তখন সে অবাক। নেমে যাবার জন্যে ব্যস্ত।

রিকশাওয়ালা কী যেন বলল তার প্রথম সওয়ারীকে নীচু গলায়। মেয়েটি অন্ধকারে বিমূঢ় অশোককে দেখল। তারপর কী ভেবে বলল, "আপনি বসুন।"

"না না, সে কী—" বিব্রত হয়ে অশোক বলল, "আমি জানতাম না; বুঝতে পারি নি। আপনি আসুন, আমি নেমে যাচ্ছি।"

"কোথায় নামবেন, বৃষ্টি পড়ছে। একটু সরুন, আমি উঠি।" মেয়েটি অশোককে নামতে না দিয়ে উঠে পড়ল। শাড়ি ভিজে গিয়েছে। হাতে গোটানো ছাতা। মাথার কাপড় নামিয়ে ফেলল মেয়েটি।

অশোক ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। এ-রকম ঘটনা ঘটতে পারে সে কল্পনাও করে নি। রিকশাওয়ালা একবারও যদি তাকে বলত আগে, সে নেমে যেত। পরদার মধ্যে তখনও সেই উৎকট গন্ধ।

মেয়েটি—না ঠিক মেয়েটি বলা যায় না; মহিলাই বলতে হয়। বয়েস হয়েছে। অন্তত বছর তিরিশ। ছিপছিপে চেহারা।

মহিলা নিজের থেকেই বললে, "রিকশাওয়ালা আমার চেনা। পাড়ার রিকশা। আমি

বি, সি, রায় ক্লিনিকে এসেছিলাম।"

"না, মানে আপনার অসুবিধে হচ্ছে..."

"কিছু না।...আপনাকেও আমি দেখেছি।"

"আমাকে?"

রিকশাওয়ালা ততক্ষণে রিকশা তুলে নিয়েছে। বলল, সে বড় রাস্তা দিয়ে যাবে না, গলি দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে। বড় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে, রাস্তা জ্যাম।

মহিলা বলল, "আমি কৈলাস বোস স্ট্রীটে থাকি, আপনাকে প্রায়ই দেখি।"

অশোক একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল। পাড়ার মেয়ে। অশোকও নিশ্চয় দেখেছে। মুখে চেনে হয়ত। কিন্তু এই রিকশার অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

অশোক বলল, "আমি থাকি সুকিয়া স্ট্রীটে; একেবারে মুখেই। আপনাদের কৈলাস বোসে আমার কখু তুলসী থাকে।"

"জানি। উনি আমায় চেনেন। ওঁর সঙ্গেই বোধ হয় আপনাকে দেখেছি। ওঁকে আমার কথা বলবেন, যমুনা নাগ।"

অশোক আরও স্বস্তি বোধ করল। তুলসীর চেনা। তা হলে আর দোষ কী? একেবারে অপরিচিত তারা নয়। যমুনাকে বেশ সহজ মনে হল অশোকের। সহজ, সপ্রতিভ।

রিকশা চলতে শুরু করেছিল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। একেবারে ধীরেও নয়, জোরেও নয়। অশোক যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে বসেছিল। তবু তার গায়ের সঙ্গে যমুনার শরীর ছুঁয়ে আছে।

অশোক বলল, "বি সি রায় ক্লিনিকে কেন? কোনো অসুখ বিসুখ।"

"হ্যাঁ। বাড়িতে অসুখ। উনি—মানে আমার স্বামী অসুস্থ। ওঁর চেনা শোনা একজন ডাক্তারবাবু বিকেলে এখানে আসেন। তিনিই দেখছেন। ডাক্তারবাবুকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল।"

"দেখা পেয়েছেন।"

"পেয়েছি।"

যমুনা বিবাহিতা জেনে অশোক অবাক হল না। কেননা তার প্রথম থেকেই সে-রকম মনে হচ্ছিল। সিঁদুরের দাগ যদিও স্পষ্ট করে অশোক দেখতে পায় নি, তবু বাঁ হাতে শাঁখার মতন বাঁধানো কী-একটা চোখে পড়েছিল।

সামান্য চুপচাপ।

অশোক বলল, "হুট করে এ-রকম বৃষ্টি এসে পড়বে ভাবতেই পারি নি।"

যমুনা বলল, "হ্যাঁ। আমারও ভুল হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় একবার মনে হয়েছিল বৃষ্টি আসতে পারে। তারপর ভাবলাম—মেঘ উড়ে যাবে। পথে একটা কাজ ছিল বলে রিকশা নিলাম। নরত টামেই আসতাম। হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল।"

"আপনি বৃষ্টির মধ্যেই এসেছেন?"

"হ্যাঁ। কী বৃষ্টি তখন।"

রিকশাওয়ালা গলি দিয়ে যাচ্ছিল। বউ-বাজারের গলি। জল জমেছে গোড়ালি পর্যন্ত। নোংরা ভাসছে, দুর্গন্ধ উঠছে, টিমটিমে বাতি জ্বলছে গলিতে, অনবরত রিকশার ঘন্টি, পথে বড় কেউ নেই। বৃষ্টি আবার জোরে পড়তে শুরু করেছে।

যমুনা বলল, "বৃষ্টি হলে কলকাতা যেন নরক হয়ে যায়।"

অশোক বলল, "কি আর করা যাবে! এই কটা মাস আমাদের বড় ভোগান্তি। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিশেহারা হয়ে যাই।"

"আপনি অফিস থেকে এত দেরী করে ফিরছেন?"

"না—" মাথা নাড়ল অশোক, "অফিস থেকে ফিরছি না। ছুটিতে আছি। এক জায়গায় গিয়ে-

ছিলাম।" অশোক ডাক্তারের কাছে যাবার কথা বলল না। তারপরই তার মনে পড়ল, বারে—এ তো অদ্ভুত যোগাযোগ। সে নিজের অসুখের জন্যে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। আর যমুনা গিয়েছিল স্বামীর অসুখের জন্যে!

যোগাযোগের ব্যাপারটা মনে পড়তেই সে কেমন সচেতন হয়ে উঠল। বেশী রকম সচেতন। এতক্ষণ যা অত খুঁটিয়ে ভাবে নি এখন তা খুঁটিয়ে ভাবতে লাগল। এ কেমন করে হয়? রিকশা পাওয়া থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই কেমন অবিশ্বাস্য। যেন মনে হবে, যমুনা তার জন্যে বৃষ্টির দিনে রিকশা ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে ওয়েলিংটনে দাঁড়িয়ে ছিল।

অশোক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল যমুনাকে। রোগা রোগা মুখ, লম্বাটে নাক, কানে কপালে চুল জড়ানো। পরনের শাড়িটা সাদা, ফিকে ধরনের পাড়। একে কি কোথাও দেখেছে অশোক আগে? মনে পড়ছে না। পাড়ায় দেখে থাকতে পারে।

রিকশাওয়ালা টাল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। বউবাজারের অদ্ভুত গলি, পায়ে পায়ে বাঁক, বাঁকের মুখে কখনও যমুনা তার গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনো সে যমুনার দিকে ঢলে যাচ্ছে।

অশোক ভেতরের অস্বস্তি কাটাবার জন্যে কথা বলতে লাগল। "আপনি আমাদের পাড়ায় পুরোনো?"

"হ্যাঁ, বছর ছয়...।"

"তাহলে তো অনেক দিন।" বলে একটু থামল অশোক; ভাল করে মনে করবার চেষ্টা করল, যমুনাকে আগে দেখেছে কি না?

"কটা বেজেছে?" যমুনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

অশোক ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করে কিছু দেখতে পেল না। বলল, "আটটা হবে।"

"বড় দেরী হয়ে গেল।" যমুনা যেন উদ্বেগের গলায় বলল।

"পাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে আরও ঘণ্টা খানেক—যেভাবে রিকশা যাচ্ছে! কোথায় গিয়ে আবার আটকে যাবে কে জানে!"

যমুনা কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

অশোক ঢাকা পরদার বাইরে হাত বাড়াল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এত গোলমালের মধ্যে এই শব্দ শোনাও যায় না।

"আপনার স্বামীর কী অসুখ?" অশোক জিজ্ঞেস করল।

"ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারছে না।"

"মানে?"

"বুকের কিছু হবে। অনেক দিন ধরেই ভুগছেন। আগে অতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। কখনো সখনো হত। হালে বেশ বেড়ে গেছে।"

অশোক এবার নিজের অবস্থাটা অনুভব করতে পারল। তার শরীর ভাল লাগছে না। এই যে বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ আটকে যাওয়া, বাড়ি ফেরার চাপা দুশ্চিন্তা, অসহায় ভাব, মানসিক একটা অস্থিরতা—এ-সবের জন্যে তার ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্বেগ তার শরীরের পক্ষে খারাপ। উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে এল চাপা এক উত্তেজনা। উত্তেজনার কারণ, অশোক ভেবে দেখল, যমুনা। মানে যমুনার সঙ্গে এই যোগাযোগ। এমন বর্ষার দিনে একটা রিকশা পাওয়া হয়ত ভাগ্য। সেটা স্বীকার করা যায়। কিন্তু এই ধরনের একটা ভাড়া করা রিকশা পাওয়া, তারপর সেই রিকশার আসল ভাড়াটে তারই পাড়ার মেয়ে হবে, তাকে চিনবে, একই সঙ্গে তারা বাড়ি ফিরবে—এর মধ্যে যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার রয়েছে সেটা নিশ্চয় কিছুটা উত্তেজিত করতে পারে অশোককে।

অশোক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। যেন তার কপালে ঘাম হচ্ছে।

যমুনা বলল, "আমি যে কী বিপদে পড়েছি?"

"বিপদ! কেন?"

"বাড়িতে একজনও বড় কেউ নেই। ওঁর এই অসুখ। আমার চাকরি-বাকরি। চারদিক আর সামলে উঠতে পারছি না।"

অশোক বেশ বুঝতে পারল তার বুকের মধ্যে সেই হাঁপ ধরা ভাবটা আবার ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল সে। জোরে জোরে। বুকের ব্যাপারটা ভুলে থাকার জন্যে কথা বলতে লাগল। "বাড়িতে কে কে আছেন?"

"আছে অনেকে; ভরসা করার মতন কেউ নেই। আমার শাশুড়ী প্রায় অন্ধ; কিছুই দেখতে পান না। ছানি কাটাবার পর একটা চোখ একেবারেই গেছে; আরেকটার সামান্য দেখতে পান, না দেখার মতন। এক ননদ আছেন, তাঁর আবার মাথা খারাপ। ননদের দুই বাচ্চা কাচ্চা।"

অশোক আবার মুখ মুছল।

"সংসারটা বড় জ্বালার, জানেন—" যমুনা বলল, "মাঝে মাঝে মনে হয়—সারাটা জীবন এই ভাবেই হয়ত কেটে যাবে। অসুস্থ স্বামী, অন্ধ শাশুড়ী, পাগল ননদ নিয়ে।"

অশোক বলল, "পুরুষ মানুষ কেউ নেই?"

"এক দেওর ছিল; সে পাটনায় চলে গেছে চাকরি নিয়ে। চালাক ছেলে। সংসারের এত ঝক্কি ঝামেলা পছন্দ করে না।"

অশোক যেন নিজের সংসারকে হঠাৎ দেখতে পেল। বুড়ো বাবা—বছর পনেরো রিটায়ার করে বসে আছে ছেলেদের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে; বুড়ী মা বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব থেকে খারিজ হয়ে গেছে, ছেলের বউদের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করছে, একটু বেশী পান খায় বলে বউদের কত রকম মুখ। বড়দা মার্চেন্ট অফিসে কেরানী, মেজদা স্কুলের টিচার, মেজদি বিয়ের পর ঝগড়াঝাটি করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। কোথায় একটা চাকরি জুটিয়েছে, সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ভাই পাড়ায় বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে গুলতানি করে, একেবারে মূর্খ, স্কুল ফাইনালটাও পাস করতে পারে নি।

এই সংসারের চেহারা অশোককে অনেকদিন ধরেই পীড়িত করছিল। পীড়িত এবং বিরক্ত। বাড়ির নোঙরামি তার অসহ্য লাগত। সাতপাঁচ ভেবে, এবং বিরক্তির জন্যে সে আজ ছত্রিশ বছর বয়েসেও বিয়ে করে নি। কী হবে বিয়ে করে? এই কদর্যতার মধ্যে আরও কিছু নোঙরামি বাড়ানো। সে বিয়ে না করায় বউদিরা একদিক থেকে খুশী। বিয়ে করলেই যেন তাদের শরিকি-আনায় হাত পড়ত। আবার বিয়ে না করার জন্যে বেঁকা চোখ করে ঠোক্করও মারে। মারুক। বিয়ে ব্যাপারটা বড় জড়ানো। অশোক এত জড়াতে চায় না।

নিঃশ্বাস ফেলে অশোক বলল, "আপনার ঘাড়েই সব?"

"হ্যাঁ। সব দায় দায়িত্ব।...উনি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করেন। এখন মাস দুই ছুটিতে।"

"ডাক্তাররা কিছুই ধরতে পারছে না?"

"কই আর পারছে! কত বার যে এক্সরে আর রক্ত-টক্ত পরীক্ষা হল?"

"আশ্চর্য!"

রিকশাটা কী এক বিচিত্র কায়দায় হ্যারিসন রোড ছাড়িয়ে আবার এক গলির মধ্যে ঢুকল। সারকুলার রোডে গিয়ে উঠবে। জল পাবে না ওই রাস্তায়।

"এই দেখুন না," যমুনা বলল, "এখন বাড়ি ফিরব। এত রাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে কী দেখব জানি না। উনি হয়ত ছটফট করছেন। আমার ফিরতে দেরী দেখলেই দুর্ভাবনায় মরেন। বুকের কষ্ট আরও বেড়ে যায়।"

"কী হয় বুকে?"

"ব্যথা আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট।"

"হার্টের রোগ নয়?"

"কই!"

অশোকেরও এই রোগ। বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা চিনচিন ব্যথা লাগে, ভার হয়ে যায় বুকটা। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ডাক্তাররা সবরকম দেখেছে: দেখে বলেছে হার্টের রোগ নয়, নার্ভাসনেস থেকে একটা কিছু হচ্ছে, নিউরোসিস, একটা বিয়ে-থা করে ফেলুন, ঠিক হয়ে যাবে। এ-ধরনের রসিকতার কোনো মানে হয় না। বিয়ে সর্বরোগহর কোনো ওষুধ নয়। এ-দেশের মানুষ যৌবনের সমস্ত ব্যাধিকেই বিয়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়। নির্বোধ।

যমুনা বলল, "উনি একজন সাঁতারু ছিলেন, অনেক খেলাধুলো করেছেন—ভাল স্বাস্থ্য ছিল। হাসিখুশী মানুষ। জীবনের সমস্ত কষ্ট সহজ করে গায়ে মাখতেন। অথচ দেখুন কী হয়ে গেল!"

অশোক যমুনার গলার স্বর থেকে স্বামীর প্রতি তার মমতা ও অনুরাগ বুঝতে পারল। কেমন একটু সন্দেহ হল অশোকের, যমুনা কি ভালবেসে বিয়ে করেছিল ভদ্রলোককে? ভালবেসে বিয়ে না করলে এত অনুরাগ থাকে কি করে? নাকি সাধারণ বিয়ে, বিয়ের পরই এত ভালবাসা?

অশোক নিজের বুকের ওপর হাত রাখল। "ভাল হয়ে যাবেন।"

যমুনা ঘাড় ফেরাল। "হলে বাঁচি।"

"হবেন।...এক এক সময় এ-রকম হয়ত হয়।"

"কেন বলুন তো?"

"আমি ঠিক জানি না।...আমি নিজেও এই ধরনের অসুখে ভুগছি।"

"সে কি! আপনিও?"

চুপ করে থাকল অশোক। বুকের ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল।

যমুনা যেন কৌতূহলের সঙ্গে অশোককে দেখছিল। অপেক্ষা করছিল—অশোক কিছু বলবে।

কোনো জবাব না পেয়ে যমুনা বলল, "আপনার কেন অসুখ হবে? আপনি তো ছেলে-মানুষ!"

"ছেলেমানুষ।" অশোকের হাসি পেল। "কি করে বুঝলেন আমি ছেলেমানুষ!"

যমুনা যেন সামান্য বিব্রত বোধ করল। তাড়া-তাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, "না, তা নয়। ছেলেমানুষ বলতে আমি বয়েস কম বুঝিয়ে-ছিলাম।"

"আমার বয়েস ছত্রিশ।"

"ও! আমারও প্রায় ওই রকম।"

অশোক সামান্য চুপ করে থাকল। রিকশা-ওয়ালা বলিহারী, পাকা লোক। এত ভিড়, জ্যাম, গাড়ি, লোকারণ্য—তার মধ্যে থেকে গলি মেরে মেরে কেমন সারকুলার রোডে পড়ে গেল। যত গাড়ি সব এই রাস্তাতে জমেছে, ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

যমুনা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার অসুখ হল কেন, বললেন না তো?"

অশোক যমুনার দিকে তাকাল। আবার বুঝি বৃষ্টি আসছে চেপে। রিকশার পায়ের কাছে জল দাঁড়িয়েছে অনেক, পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে।

"কেন হল, জানি না। হয়ে গেল।"

"এমনি এমনি?"

"বোধ হয়।...আপনার স্বামীর কেন হল?"

যমুনা গায়ের আঁচলের বাড়তি অংশ দিয়ে হাতের জল মুছছিল। পা আরও গুটিয়ে নিল। তারপর বলল, "দুশ্চিন্তায়। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়। উনি বোধ হয় অনেক দিন থেকেই নানা রকম দুর্ভাবনায় ভুগছেন। আমার কিছু জানতে দিতেন না।"

"কিন্তু আপনি তো স্ত্রী।"

"স্ত্রী হলেই কি সব জানা যায়? মানুষের মন বড় অদ্ভুত।"

অশোক যমুনার দিকে তাকাল।

"আপনার তো কোনো দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়—" যমুনা অশোককে বলল, "তা হলে?"

অশোক বলল, "আমার দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয় আপনি কি করে জানলেন? আমার বাড়ির কিছুই আপনি জানেন না।"

যমুনা যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলল না।

বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের মুখে পৌঁছতে পৌঁছতে আরও মিনিট পঁচিশ কেটে গেল।

যমুনা হঠাৎ কথা বলল, "আপনাকে একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"আজ যেমন হল, আচমকা—; হওয়া উচিত নয়—অথচ হয়ে গেল, এইভাবে রিকশায় আমরা একসঙ্গে এলাম; আপনি অবাক হলেন না?"

অশোক কেমন থতমত খেয়ে গেল। "অবাক! হ্যাঁ, নিশ্চয় অবাক হয়েছি।"

"এ-রকম তা হলে হয়?"

"মানে?"

"না, যা ভাবা যায় না—তাও হয়।"

"হয়।"

"কেমন করে হয়?"

"জানি না। একজনের একটা লেখা পড়েছিলাম একবার—ভাল বুঝি নি। তাতে মনে হল, মানুষের জীবনে এ-রকম ঘটে। ঠিক কোয়েনসিডেন্স নয়, তার চেয়েও বেশী, কোনো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার..."

"আমি অত বুঝব না।...কিন্তু আপনি সত্যি করে বলুন তো, আমার আগে আপনি আর কখনও দেখেন নি?"

অশোক তাকাল। তাকিয়ে থাকল। শুকনো মুখ, লম্বা নাক, ফ্যাকাশে গাল। দেখা মেয়ে কী? মনে করতে পারছে না। কিছুতেই মনে আসছে না। অথচ অশোকের কেমন ভয় করতে লাগল।

রিকশা সুকিয়া স্ট্রীটের মুখে এল।

অশোক বলল, "না, আপনাকে আমি মনে করতে পারছি না।...এই রিকশা, রোখকে। আমি নামি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

রিকশা দাঁড়াল। নামল অশোক। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে রিকশাওয়ালাকে দশটা টাকা দিল। খাটো গলায় বলল, তুমি ওঁর কাছ থেকে আর টাকা নিও না, আমি দিয়ে দিলাম।

অশোক কেমনো রকমে একটা নমস্কার জানিয়ে বলল, "চলি।"

অশোক এমনভাবে চলে গেল যেন সে পালাল।

যমুনার কেমন হাসি পেল। অশোক আর আসবে না; ফিরে তাকাবে না। তাকাবার প্রয়োজন নেই। তার যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু মিটে গেছে। বিপদ থেকে পার পেয়ে গেছে। আবার কী?

এই রকমই হয়। এই কলকাতা বড় বিচিত্র। কোথায় কার সঙ্গে কখন দেখা হয়ে যায়—কেউ জানে না।

হয়ত আবার একদিন অশোককে যমুনা দেখতে পাবে। মেট্রো সিনেমার উলটো দিকে, সামান্য নেশার ঘোরে, কিছুটা খেপা অবস্থায়। কিংবা ট্রাম গুমটির পশ্চিম দিকে অন্ধকারে।

অবশ্য তখন যমুনা নিজের নাম বলবে বেলা বা বকুল, কিংবা ময়না। অশোক তখন বুঝতে পারবে না—যমুনার চেহারা এত সাধারণ। কত মিথ্যে দিয়েই যে সত্য তৈরী করতে হয় যমুনা তা জানে। কী করবে? এই মিথ্যে দিয়েই তার চলছে। স্বামী সত্যি সত্যি বেকার—পুরোপুরি। তার ওপর পাগল। অন্ধ শাশুড়ী আর হবা, পাগল এক ননদকে খাওয়াতে পরাতে যমুনার সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল। এই তার চাকরি!

মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়, সে নিজেকে নষ্ট করল। যখন এ-সব মনে হয়, তখন বিষ খেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু নতুন করে বিষ খেয়ে কী হবে! এও বিষ!

রিকশা থামিয়ে নামার সময় যমুনা রিকশা-ওয়ালাকে বলল, "কাল বিকেলে এসো না। কাল বাড়িতে থাকব।"

রিকশাওয়ালা একটু হাসল।

ডানলপের কাহিনী

অনেক দিন আগে, সেই ১৮৯৮ সালে ডানলপ এদেশে প্রথম নিউম্যাটিক টায়ার আমদানি করে। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ডানলপ দেশের প্রগতির সঙ্গে সমানভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতের যানবাহন, শিল্প, কৃষি, প্রতিরক্ষা এবং বুনিয়াদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বহু জিনিস এদেশে প্রথম চালু করার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ডানলপ।

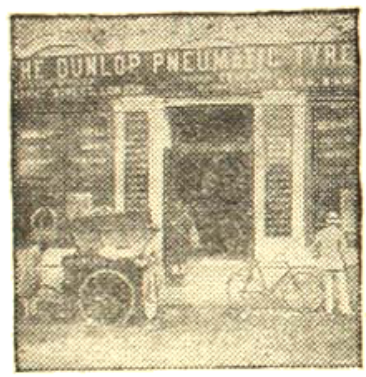

১৮৯৮ আরাবল্যাণ্ডের বেলফাস্ট শহরে জন বয়েড ডানলপের নিউম্যাটিক টায়ার আবিষ্কারের মাত্র দশ বছর পরেই ডানলপ এদেশে প্রথম হাওয়া-ভরা টায়ার আমদানি করে। তারতে ডানলপের প্রথম অফিস খোলা হয়েছিল বোম্বাই শহরে।

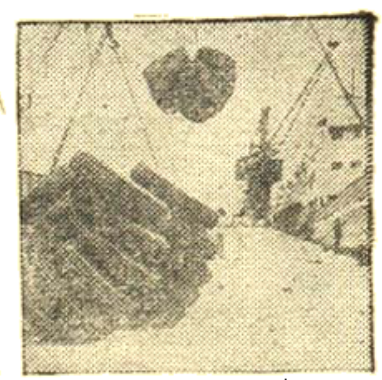

১৯৭৪ এই প্রথম কোন টায়ার কোম্পানি রপ্তানি থেকে ৫.৩০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে।

১৯৩৬ পশ্চিমবঙ্গের সাহাগঞ্জে ডানলপই ভারতের প্রথম মোটর গাড়ির টায়ার কারখানা স্থাপন করে।

ডানলপ ইণ্ডিয়া
—দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে।

দক্ষিণী বার্তা

উত্তর মেলেনি : ৬৪ পৃষ্ঠার শেষাংশে

হঠাৎ গাড়িটা থেমেছে নীচে। অনুতোষ-বাবুর অফিসের গাড়ি থেকে কারা নামছে। অণিমা ওদের দেখে চমকে ওঠে। অনুতোষ ফেরেনি।

নীলেশও এসেছে ওদের সামনে। সারা আকাশটা যেন অতর্কিত বজ্রাঘাতে ফেটে পড়েছে। থরথরিয়ে কাঁপছে পায়ের নীচের মাটি, সব গান-সুর কলরব স্তব্ধ হয়ে গেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা।

—কি বলছেন আপনি?

ভদ্রলোকও একথা বলতে পারেন না, অনু-তোষবাবু অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, হাসপাতালেও রিমুভ করা হয়েছিল—চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু কোন কিছুই করা যায়নি। সব শেষ হয়ে গেছে।

নীলেশ যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। —অনুতোষদা নেই? সব দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল সে?

স্তব্ধতা খানখান করে সীমার কান্নাটা আর্তনাদ হয়ে ওঠে। দেখছে অণিমা ওকে, পাষাণ প্রতিমার মত, ওর চিন্তা ভাবনাগুলো সব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ মনে হয় অনুতোষের কথা। সে নেই। আর এ বাড়িতে কোনদিনও ফিরে আসবে না মানুষটা। অণিমা কি হাহাকারে ফেটে পড়ে।

অভিজিৎও স্থির হতে পারে না একা নীলেশকে ফেলে। অণিমার এই বিপদে সেও এসে পাশে দাঁড়ায়। উৎসবের কোলাহল থেমে গেছে, উঠেছে হাহাকার আর বুকফাটা নিঃস্বতার আর্তনাদ। সব ফুল সাজ খুলে গেছে—মৃত্যুর হিম-স্পর্শ নেমেছে উৎসবের উষ্ণতায় মাঝে।

মানুষের তবু সবই সইতে হয়। কথিত আছে সৃষ্টিকর্তা, শোক-এর সৃষ্টি করে মৃত্তিকাকে দিলেন, শোকের দাহে মৃত্তিকা নিষ্ফলা হয়ে গেল, জলধারা শুকিয়ে গেল। তখন বসুমতীর বুক থেকে শোককে দিলেন অরণ্যের বুকে। অরণ্যের সবুজ স্নিগ্ধতা নিঃশেষ হয়ে গেল, ফল ফুল বিলুপ্ত হল। তখন শোককে স্থাপন করলেন মানুষের মাঝে। তার দুঃসহ জ্বালায় সেও সব ভুলে গেল। শ্রীহীন হয়ে ঘোরে সেই জ্বালা নিয়ে। একদিন-দুদিন-তিনদিন পর শোকদগ্ধ মানুষ বনের হরিতকী মুখে দিয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণার জল-পান করে। তার মুখ থেকে তৃপ্তির একটি শব্দ ধ্বনিত হয়—আঃ!

সৃষ্টিকর্তা হাসেন। শোক সহ্য করার আধার তিনি পেয়েছেন। সেই কাল থেকেই মানুষ শোক তাপ সয়ে আসছে।

তাই অণিমাও কিছুটা সামলে নিয়েছে। সীমার মুখে চোখে শোকের স্তব্ধতা নামে।

সরমা সুতপা করবী প্রাণতোষ এসেছে। অণিমার আজ সব হারিয়ে গেছে। নীলেশ ওদের দেখেও ঘর থেকে বের হয়ে এল। ওদের কথার মধ্যে সে থাকতে রাজী নয়, তাছাড়া ওদের হৃদয়-হীনতাকে সহ্য করতে পারেনি সে প্রথম থেকেই।

একপর্ব কান্নাকাটির পর অণিমাই বলে সীমাকে।

জেঠু—উনি জেঠিমা—দিদা—

সীমা দেখছে ওদের। তার কল্পনার দেখা সেই ছবিগুলোর সঙ্গে যেন কোন মিল নেই। সরমা বলে ওঠে,

—আর চিনিয়ে লাভ কি বাছা? যে বাবার সে তো গেল। আমরাই সব হারিয়ে গেল। উঃ কি ধরাত আমার!

সুতপা বলে ওঠে—তাই বলছিলাম মেজো, এত তেজ ভালো নয়। পাপও চাপা থাকে না। সেদিন বড় মুখ করে সাধু সেজে স্বামীর নামে দিব্যি করেছিলি, আজ সুখ হইলো?

চমকে ওঠে অণিমা। আজ ওরা যেন তাকে

ইচ্ছে করেই আঘাত আর যন্ত্রণাই দিতে এসেছে। সীমাও দেখছে তার মায়ের অসহায় অবস্থাটা। আজ মনে হয় এরা তাদের কেউ নয়। তার এত-দিনের দিদা-জেঠুর স্বপ্ন সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

প্রাণতোষ এসব কথার চেয়ে অন্য প্রসঙ্গই ভাবে। ওরা যদি এই অবস্থায় গিয়ে ওবাড়িতে ওঠে, তাদের ঝামেলাই বাড়বে। অথচ গেলে ফেরানো মুস্কিল, কথা উঠবে নানারকম। তাই প্রাণতোষ বলে—ওদিকে বাবার প্রেসারও বেড়েছে। এমন সময় তোমাকে—সীমাকে এই অবস্থায় দেখলে ওঁর ভালোমন্দ একটা কিছু না হয়ে যায়।

অণিমা এ কথার অর্থ জানে। সেও ভেবেছে এটা। তবু সরমা বলে—তাহলে কাজকম্মো এখানেই করছো?

প্রাণতোষও সায় দেয়—তাই ভালো। বরং দরকার হয় আমাদের খবর দিয়ো, হাজার হোক ভাই। পর করে দিলে তুমি, তবু তাকে তো অস্বীকার করতে পারি না।

অণিমা এ কথারও কোন জবাব দিল না। ওদের অনুযোগ, অনুগ্রহ সবই তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। তবু তার সেই তেজী মনটা আজ নতুন করে জেগে ওঠে। বেশ জেনেছে তাকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, তার মেয়েকে মানুষ করতে হবে। ওদের কারো দয়া সে চাইবে না। তাই অণিমা স্থির কণ্ঠে জানায়,

—তাঁর কাজকম্মো যেটুকু পারি এখানেই করবো। আর এইখানেই থাকবো মা। আপনাদের বিব্রত করতে কোনদিনই ওবাড়িতে যাবো না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ওর স্পষ্ট কথায় ওরাও থমকে গেছে। সুতপাই একটু দম নিয়ে বলে,

—হয়েছে তো? মুখের মতো জবাব পেয়েছো এবার। তাই বলছিলাম মা, যেচে কেন চড় খেতে আসেন।

আর তোকেও বলি মেজো—এত তেজ ভালো নয়। এত ঠোকেও শিখলি না।

প্রাণতোষ বলে—চলো মা। দেরী হয়ে গেছে।

প্রাণতোষ অবশ্য রাগেনি। কারণ এইটুই চেয়েছিল সে। আর অণিমার মত তেজী মেয়ে যে এই পথ বেছে নেবে এটা ভেবে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রাণতোষ।

ওরা চলে যাবার পর গুম হয়ে বসে আছে অণিমা। সীমা দেখছে মাকে। আজ সেও বুঝেছে এতবড় পৃথিবীতে তাদের আর কোনো আশ্রয় —আপনজন নেই। বাবাকে মনে পড়ে—অনেক কিছু হারিয়ে গেছে তার। কি দুঃসহ কান্নায় সীমা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অণিমাও বুঝেছে তার কঠিন দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা। তাই সীমাকে আজ সব স্নেহ দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলে—কাঁদিস না সীমা, ওরে—আমি তো আছি মা।

মা মেয়েতে আজ যেন নিজেদের একটি নিভৃত জগৎকে প্রত্যক্ষ করেছে। ওরা নোতুন করে বাঁচতে চায় সব সয়ে, নীলেশ এ বাড়ির যন্ত্রণা এই নোতুন আশ্বাসটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছে নীরব দর্শকের মত। ছোড়দির জন্য দুঃখ বোধ করে সে। তবু জানে তার কঠিন সত্তা এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখে। জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা হতে উত্তরণের এই আশ্বাস নীলেশও যেন দেখেছে ওই ছোড়দির মধ্যে।

অণিমার এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে একটা যেন শূন্যতা জেগে ওঠে। এই বাড়ি-ঘর-সবকিছুতে মাকেই অনুভবের স্মৃতি রয়ে গেছে। তাই অফিসের কাজেই সব শূন্যতাকে ভোলার চেষ্টা করে।

মিঃ বোস অবাক হন, অভিজিৎও দেখেছে অণিমাকে। মিঃ বোসই বলেন দিন, কতক বরং ছুটি নাও এখন।

অণিমা ওঁর দিকে চাইল। অণিমার মনে হয় ওই শূন্যতার মাঝেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। তাই বলে অণিমা,

—বাড়িতে মন টেকে না। সীমাও স্কুলে

যায়। অপিসেই তবু কাজের মধ্যে থাকতে চাই স্যার!

মিঃ বোস বলেন, দেখো যা ভালো বোঝ করো।

তাই অণিমা যেন কাজের মধ্যে সব দুঃখ নিঃসঙ্গতাকে ভুলতে চায়। অপিসের ছুটি হয়ে গেছে। অভিজিৎও দেখেছে তাকে তাই শুধোয় বাড়ি যাবেন না?

অণিমা ওর দিকে চাইল। একটু ম্লান হেসে জানায়—যাবো এইবার, অণিমা যেন নিজেকে এড়িয়ে থাকতে চায় এই ভাবেই।

নীলেশও এটা দেখেছে। তাই সেদিন সীমা বলে—এত দেরী করে ফেরো কেন মা? ছোট মামা কলেজে চলে যায়। তখন...।

অণিমা মেয়েকে দেখছে। ওর কথাটা ভাবেনি অণিমা। নিজেই মুক্তির পথ খুঁজছিল ওই ভাবে। তাই মেয়ের কথায় চমক ভাঙে তার। তারা দুজনেই সব দুঃখকে সয়ে নেবে। তাই অণিমা বলে সীমাকে কাছে টেনে নিয়ে,

—আর দেরী হবে না রে।

নীলেশও ফিরেছে। ছোড়াদির কথায় বলে সে,

—নিজের সঙ্গে লুকোচুরি না খেলে দুঃখটাকে সামনে থেকে পাল্লা কসে ধর ছোড়দি। দেখবি অনেক সহজ হয়ে গেছে সব কিছু!

হাসছে অণিমা। নীলেশ তাড়া দেয়—সীমা, স্পোর্টসেই নয়, পড়াশোনাতেও স্ট্যাণ্ড করতে হবে। গেট রেডি!

...কয়েকটা বছর কোন দিকে কেটে গেছে। অরণ্যের বনস্পতির অন্তরে পড়ে সেই বর্ষা-চক্রের চিহ্ন, আর মানুষের মনে-দেহেও তার ছায়া পড়ে। বছরগুলো ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে যায়। তাই তাকে ঘিরে আসে রূপবদলের পালা।

অণিমার মনেও এই ক'টা বছর অনেক ছায়া আলোর আবেশ এনেছে। তার শূন্য মন তবু বাঁচতে চেয়েছে, তাই হয়তো অভিজিৎ তার কাছে আসতে চেয়েছিল। এ দুর্বলতা নয়—তার নিঃস্ব মনে এই মুহূর্তগুলো কি সাড়া এনেছিল। অভিজিৎ-এর অস্তিত্বটুকুকে অস্বীকার করতে পারেনি সে। অভিজিৎ মাঝে মধ্যে এ বাড়িতেও আসে, সীমার জন্মদিনটা আর পালন করা হয় না। ওরা তিনজন একসঙ্গে বের হয়। সীমা ক্লাস এইটে উঠেছে। মাঠে বসে ওরা হৈ-চৈ করে। হঠাৎ সেদিন ডায়মণ্ডহারবারের নদীতীরে গিয়ে পৌঁছে সীমা চমকে ওঠে—বাবার কথা মনে পড়ে। ওরা আসতো তখন।

হঠাৎ সীমা চেয়ে দেখে মা আর অভিজিৎ বসে আছে—সীমার চোখের চাহনিতে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। হঠাৎ নতুন যেন একটা কি দেখেছে সে।

তাই ওই অভিজিৎকে সে সইতে পারে না। সেদিন অভিজিৎ-এর কিনে দেওয়া উপহারটা ও নিল না। ঘরে ফিরে ইচ্ছে করেই যেন সেটা ফেলে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

অণিমাও দেখেছে সেটা। দেখেছে সে সীমার চোখে নীরব একটি প্রতিবাদের চাহনি। আজ ভাবনায় পড়ে অণিমা, হঠাৎ যেন একটা ভুলই করেছিল সে। আজ তাই সে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই অভিজিৎকে সে স্পষ্টে কথাটা বলেছিল।

—আমাকে ভুল বুঝো না অভিজিৎ। আমারও মেয়ে বড় হচ্ছে, তার দায়-দায়িত্ব আছে। এ-বাড়িতে বেশী আসা-যাওয়া না করাই ভালো।

অভিজিৎ ওর দিকে চাইল। তার মনের কোণে কোনো সোচ্চার কামনা ছিল না। তবু যেন ভালো লাগতো তারও। কিন্তু ওদের নিজস্ব চাইবার কিছুই নেই।

অণিমা মেয়ের জন্যই নিজের সব ভালো-লাগার স্মৃতিকেও বিসর্জন দিয়েছে। বছরগুলো তবু অণিমার মুখেও ছাপ এনেছে। চুলের ললিতে সাদাটে ছোপ পড়েছে। চোখে উঠেছে হাই পাওয়ারের সেল ফ্রেমের চশমা। অণিমার এখন অপিসেও দায়িত্ব বেড়েছে। বাড়িতেও ফাইলপত্র

জার্নালগুলো এনে কাজ সারতে হয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের মতামতও দিতে হয়। অণিমা কাজ করছে, ওদিকে নীলেশ চায়ের কাপ শেষ করে কাগজখানা ওল্টাচ্ছে। দিদির সামনে ইদানীং চুরুটও ধরেছে সে। নীলেশ বলে,

—কলেজে মাস্টারি করি, পার্সোনালিটি বাড়াতে হবে রে! চুরুটে ওটা ফট করে বেড়ে যায় ছোটদি।

অণিমা হাসে, লায়েক হয়ে উঠেছিস! তা দেখলি কিছু কাগজে?

নীলেশ বলে- আজই বেরুবার কথা।

—মেয়েরও পাত্তা নেই! জানায় অণিমা।

হঠাৎ সিঁড়িতে কলরব—চীৎকার শুনে নীলেশ চাইল। হুড়মুড় করে লাফিয়ে ঢুকছে চঞ্চলা একটি কিশোরী। বেলবট প্যান্ট—আর ছেলেদের মত হাওয়াই সার্ট পরা। মাথায় চুল-গুলো ছোট করা, আর চলনে একটি সাবলীল তথ্যী ফুটে উঠছে। কতকগুলো বছরেই সীমাও বদলে গেছে। আর পৃথিবী এসেছে ওকে ঘিরে। সীমা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা, ফার্স্ট ডিভিশন উইথ টু লেটার্স! আজই রেজাল্ট বেরিয়েছে দেখে এলাম।

সীমা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—

অণিমা মেয়ের দিকে চাইল, তার চোখে-মুখে খুশির আভা ফুটে উঠেছে। —তাই নাকি রে?

নীলেশ কথাটা শুনে হাতের খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে বলে—বাজে কথা। তুই করবি ওই রেজাল্ট হায়ার সেকেণ্ডারীতে? তাহলে নির্ঘাত টুকেছিস তুই!

দপ করে বলে ওঠে সীমা—কি যা তা বলছে দ্যাখোনা মা ছোটমামা। এাই ছোটমামা ওসব তোমার কলেজের ছাত্রদের অবশ্য কর্ম। তারা কি বলে জানো? টোকা স্বর্গ, টোকা ধর্ম, টোকায় নাইকো পাপ। তুই টুকেছিস, আমি টুকছি, টুকেছে মোদের বাপ। ও মণিহার আমায় নাহি সাজে!

সীমাও ছোটমামার কলেজ-ছাত্রদের সম্বন্ধে এসব মন্তব্য করে।

নীলেশ বলে—এ যে ভাবিয়ে তুললি রীতিমত।

হাসছে অণিমা। সীমা বলে, ভাবো তাহলে, আমি একটু ঘুরে আসি।

—আবার এ সময় কোথায় চল্লি? অণিমার কথায় সীমা জানায়! —ইরা, আভা, লতাদের রেজাল্টও শুনলাম। সবাই পাশ করেছে—যাই, একবার দেখা করে আসি মা-মণি।

—দেরী করিস না? অণিমা শোনায়। কিন্তু সেকথা শোনারও সময় নেই সীমার। রাশছেঁড়া ঘোড়ার মত সে দৌড়ালো। অণিমা চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। আজ অনুতোষের কথা মনে পড়ে। সবই ঠিকমতই চলেছে.কেবল সেই-ই নেই। অনু-তোষের স্মৃতি পরিণত হয়েছে একটা ছবিতে।

—কি ভাবছিস ছোড়দি?

নীলেশ ওকে দেখছে। অণিমার কথাটা মনে জাগে। সে বলে—সবই হলো নীলেশ, আজ সেই-ই নেই। এ খবর সে দেখে যেতে পারলো না। নীলেশ জানে অণিমার মনের অতলের সেই নীরব হাহা-কারের কথা। অণিমাই সে প্রসংগ চাপা দেবার জন্য

With Best Compliments of

SOUTH EASTERN ROADWAYS

134/4 MAHATMA GANDHI ROAD

CALCUTTA-700007

★

Administration Office

94 Chitta Ranjan Avenue, Calcutta-700012

Serving the Nation with more than Branches.

With Best Compliments of

AIR TRANSPORT CORPORATION

★

14, TARACHAND DUTTA STREET

CALCUTTA-700001

PHONE

বলে—এবার একটা ভালো কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা দেখ।

অণিমার মনে মনে মেয়ের সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা হয়ে গেছে। সে-ও চায় সীমা ভালো-ভাবে পাশ করেছে, এবার কমার্স পড়ুক। অনার্স নিয়ে পাশ করলে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্সীই পড়াবে তাকে। মিঃ বোসও আর বেশীদিন নেই, তিনি থাকতে থাকতে ব্যাঙ্কে একটা ভালো চাকরীও জুটিয়ে দেবেন মেয়েকে। মা মেয়েতে নতুন করে এইভাবে বাঁচতে চায়। এসব অণিমার নিজেরই পরিকল্পনা। নীলেশকে শোনায় নি। এখন তাই ওর সেই পরিকল্পনার কিছুটা আভাস দেয় মনে।

নীলেশের বন্ধুবান্ধব আছে অনেক কলেজেই। তাছাড়া সীমা ভালোভাবে পাশ করেছে, কৃতী ছাত্রী। তাকে ভর্তি করবার জন্য অসুবিধাও হবে না। অণিমা বলে—

—কমার্স নিয়ে পড়ুক। এ্যাকাউন্টেন্সীতে অনার্স নিতে বল—নাহয় ইকনমিকসেই নিক।

নীলেশ আশ্বাস দেয়—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। কলেজ যাবার কথাই ভুলে গেছল! অণিমার কথায় খেয়াল হয়। অণিমারও ওই আধপাগল ভাইটিকে নিয়ে জ্বালাও কম বাড়েনি। তাকেও সব দিক সামলাতে হয়। দিদির কথায় নীলেশ বলে—তাইতো রে, স্রেফ ভুলে মেরে দিইছি। সেকেণ্ড পিরিয়ডে ক্লাশ।

সীমা এসে জুটেছে বন্ধুর বাড়িতে। ইরা-দের অবস্থা ভালোই। বাড়ির সামনে বেশ ছোট-খাটো একটু বাগান মত। ওদিকে গ্যারেজ আর ইরার বন্ধুদের আড্ডা জমে এ বাড়িতেই। মায় নাচ-গানের আসরও বসে এখানে। আর ইরার মা-কাকীমাও এদের সমবেত জুলুমগুলো বেওজর সহ্য করে থাকেন। আজ পাশের খবর শুনে সকলেই এসেছে। আড্ডা নিরীহ গোছের মেয়ে, ভীতু ভীতু ভাব। ইরা তার তুলনায় অনেক সাহসী আর সীমাই যেন ওদের দলের নেত্রী। সবচেয়ে বেপরোয়া। খেলাধুলো করে তার মনে পুরুষালী ভাবটাই বেশী ফুটে উঠেছে। যদিও তার দেহ ঘিরে যৌবনের কমনীয়তা আর নিটোল স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, তবু মেয়েটা একটু গোঁয়ার।

আইভি জানায়,

—এবার সকলেই কিন্তু এক কলেজেই পড়বো।

আভার ভয় করে, ছেলেদের সঙ্গে? জানিস না—কি বাঁদর ওরা?

সীমা বলে—আর তুই তো বাঁদরী! মরণ—আমে আজকালকার ওগুলো আবার ব্যাটাছেলে নাকি? লম্বা চুল, ব্লাউজ পিসের জামা পরে, হাতে বালা দেয়। ওগুলো ছেলে নয়—ইমিটেশন গার্ল।

হুঁ! ওদের আবার ভয় করবি কি!

আইভি এদিক-ওদিক দেখে বলে—তা যা বলেছিস। ইরাকে দেখছি না—

ইরা ঢুকছে। সীমাকে দেখে বলে—কিরে, দুটো লেটার পেয়ে তোর ভাঁট বেড়ে গেছে, এলি বেলা দশটার সময়? যাক খাবার আনতে বলে দিইছি, দাদু খাওয়াচ্ছে।

সীমা শোনায়—আমি আর কি লেটার পেলাম বল! তুই তো গত বছর থেকেই সপ্তাহে দুখানা করে 'লাভ লেটার' পাচ্ছিস নির্লজ্জ রঞ্জন বোসের কাছ থেকে।

ইরা পকেট থেকে একটা কি বের করে ওই ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। ওটা তার জীবনে একটা যেন স্বপ্নই। ইরা হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলে—তার আগে পাশ করাটাকে সেলিব্রেট করতে হবে—কাকুর পকেট থেকে ম্যানেজ করেছি খাস বিলেতী সিগ্রেট, বেনসন এ্যাণ্ড হেজস! —নে ধরা।

আভা বিবর্ণ হয়ে ওঠে ভয়ে—সিগ্রেট খাবি তোরা?

সীমা বিকৃত স্বরে বলে—না। ঝালমুড়ি খাবে খুকুমণি। মায়েরো এক রম্বা! ধরা সিগ্রেট!

তারপরেই কাশির পালা শুরু হয়। একমাত্র সীমা সিগ্রেট ধরিয়ে চোখ বুজে কেওড়াতলার ঘাটের বাবাজীদের মত টানছে সহজভাবেই। আর

ইরা ভক্ত শিষ্যের মত বলে চলেছে—গুরু—গুরু! সীমা দীর্ঘ টান দিয়ে বেভাবে গুরু ধূমায়িত গাঁজার কলকে চেলার হাতে তুলে দেয় প্রসাদের ভগ্নাংশে, সেইভাবে বাকী সিগ্রেটটা ওর হাতে তুলে দিয়ে হুকুম করে—পিয়ো বেটা।

এমন সময় ইরা ওদিকে কাকামণিকে দেখেই চমকে ওঠে—কাকামণি রে! বীরাঙ্গনাদের বীরদর্প কোথায় হারিয়ে যায়। তারাও বাগানের এদিক-ওদিকে লুকোবার চেষ্টা করে।

সীমার জেদটাও নীলেশকে শেষ অবধি মানতে হয়। বন্ধুরা সবাই সেণ্ট জেভিয়ার্স-এ ভর্তি হয়েছে। ওদিকের পরিবেশটাও ভালো, আর পড়াশোনাও হয় সেখানে। দক্ষিণ কলকাতা থেকে সোজা প্রেসিডেন্সীতে আসায়ও ঝামেলা বাড়ে। তাই অণিমাও বলে—ও যখন বলছে তাই কর বাপু! ওখানেই ভর্তি হোক সীমা।

সীমাও খুশি হয় মায়ের কথায়। মাকে খুশির চোটে জড়িয়ে ধরে একটু আদরও করে বসে। অণিমা হাসছে—ছাড়। ছাড়।

সীমা কাজ হাসিল করে নিজের ঘরে চলে গেল। নীলেশও জানে, ছোড়দি সীমাকে কোথাও দুঃখ দিতে চায় না। একটি মাত্র মেয়েকে স্বামী মারা যাবার পর থেকে সব আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করেছে।

নীলেশ বলে—ঠিক আছে তাই হোক বাপু।

অণিমা জানায়—ওটা তো ভালো কলেজ, চাইছে যখন ওখানেই পড়ুক।

নীলেশ বলে—অনিল ডাক্তার তোর বলেছে আর তোর দ্বিমত হবে? কখনও না।

অণিমা ভাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় নীলেশের কথাটা সত্যিই। কোথায় অণিমার মনের তলে একটা যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে। একমাত্র মেয়ে ওই সীমাকে সে ব্যথা দিতে পারে না।

তাই বলে অণিমা—জীবনে কিছুই তো পায়নি নীলেশ। অল্পবয়সে বাবা গেল—ওর মনের কথাটাও ভেবে দেখবি তো?

অণিমার নীরব একটু স্নেহ আর ভালোবাসার খবর সীমাও জেনেছে। তবু পড়াশোনাতে ও ভালো। আর মা তাকে স্কুল-কলেজের খেলাধুলোতেও যোগ দেবার সুযোগ দিয়েছে। গানও শিখেছে সীমা।

ওদের এবার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার চাপ কম। ওরা তাই এবার রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজনও করছে। সব জুলুম পড়ে ইরাদের বাড়িতেই। গানের রিহার্সেল—শ্যামা নৃত্যনাট্যের সব পরিকল্পনাও হয়। আর ইরার নতুন মাসীও ও পাড়াতে নতুন এসেছে, তাকেও দলে টেনেছে ওরা।

অণিমা অপিস থেকে ফিরে মেয়েকে না দেখতে পেলে চটে ওঠে মনে মনে, এটা সীমাও জানে। তাই বন্ধুদের কাছ থেকে আগেই এসে পড়ে বাড়িতে। সেদিন গানটা তোলা হয়নি, তাই বাড়িতে এসে সীমা গাইবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নেমেছে। একফালি চাঁদের আলো পড়েছে বাড়ির সামনের গাছগুলোর মাথায়, সবুজ মাঠে নেমেছে রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতা।

অণিমা চুপ করে বসেছিল—তার মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। সেও কোন অনুষ্ঠানে গেয়েছিল ওই গানটা। কুমারী মনের অনেক স্বপ্ন-স্মৃতি মিশে আছে ওই সুরে। সেদিন অনুতোষও গিয়েছিল। তার মুখে চোখে কি নীরব ব্যাকুলতা—অণিমার মনের অতলে জেগেছিল সেই পরমলগ্নের কথা।

গুনগুনিয়ে ওঠে অণিমা—

জীবনের পরম লগন

করোনা হেলা—হে গরবিনী।

বৃথাই কাটিবে বেলা

সাঙ্গ হবে যে খেলা—

সীমা মায়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মাকে অনেকদিন গান গাইতে শোনে নি। আজও মা গান

গায়—সুন্দর সুরেলা গলায়। সীমা মাকে এসে জড়িয়ে ধরে—সেও গাইতে থাকে—

সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি
হে গরবিনী—
মনের মানুষ লুকিয়ে আছে
দাঁড়ার কাছে—

অণিমা চমকে ওঠে। সীমার ওই নিবিড় বাঁধনে সে আজ হারানো সেই মুহূর্তগুলোর—অনুতোষের অস্তিত্বটুকুকে খুঁজে পায়। ওই সুর স্মৃতি সব ফিরে ফিরে আসে কোন স্মৃতির উজান স্রোতে—হাসছে সীমা—এখনও তুমি সুন্দর গাও মা-মণি। আগে গাইতে, না?

অণিমা মেয়ের কাছে যেন কোথায় ধরা পড়ে গেছে। সলজ্জভাবে বলে—না রে! কবে গাইতাম—এখন সব ভুলে গেছি।

মা মেয়ের মাঝে অতীতের চাঁদের আলোয় রহস্যময় কোন জগতের ছবি ফুটে ওঠে।

সীমা বলে—রবীন্দ্র জন্মোৎসবে ইরা-আভা থাকবে না। কোথায় বাইরে যাচ্ছে। তাই দোলের দিনই রাত্রে আমাদের শ্যামা হচ্ছে। যাবে তো মা-মণি?

অণিমা হাসছে—দেখি। সেদিন তো তোর সাবিত্রী মাসী কত কথা বলে গেছে, কি উৎসব ওর বাড়িতে।

—ও! সীমা মাকে তবু অনুযোগ করে। অণিমা বলে—দেখি, এখনও তো সময় আছে। চল—রাত হয়ে গেছে। বামুন মেয়েকে খাবার দিতে বল। আর পড়াশোনা করছিস তো—না ওই অভিনয় আর স্পোর্টস নিয়েই থাকবি?

হাসে সীমা—ইস্। তার উপায় আছে। পিছনে একটি দারোগা রেখে দিয়েছো জানো না?

—দারোগা! কে রে! অণিমা অবাক হয়।

সীমা জানায়। —কেন তোমার ইরণ্ডার ব্রাদার। ওই ছোটমামা—আরে বাপু কলেজে মাস্টারি করিস কর। বাড়িতেও ওকে ফাঁকি দেবার জো আছে? সবদিকে ওঁর কড়ানজর।

হাসছে অণিমা। তবু নীলেশের জন্য কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে অণিমা। ছেলেবেলা থেকেই সীমাকে সে মানুষ করেছে। হৈ-হৈ করে দুজনে। প্রাণখোলা সহজ সরল একটি ছেলে। ও না থাকলে অণিমা যে কোথায় দাঁড়াতো জানে না।

...সীমার অবসর নেই। কদিন ধরে অনুষ্ঠানের সব আয়োজন করতে হয়েছে। অণিমারও এ সময় অফিসে কাজের চাপ পড়ে। মার্চ-এর বছরকাবারী হিসেব আছে। আর দোলের সময় ব্যাঙ্কের মিনিয়াল স্টাফদের বোনাসও দেওয়া হয়। হেড অপিস থেকেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের স্টাফদের সেই সব বিল পাঠাতে হবে। অণিমাও ব্যস্ত রয়েছে। ফিরতে দেরী হয়ে যায়।

সীমাও তবু সময়েই ফেরে। অবশ্য দিনের বেলাতেই কাজগুলো দেখতে হয় তাকে। দোলের দিন। আয়োজন এখনও অনেক বাকী। নতুন মাসীকে পোষাকপত্রের কথা বলা হয়নি। সীমা চটে ওঠে বন্ধুদের উপর—কি করিস তোরা? বসে থাকলেই সব হবে? চল নতুন মাসির কাছে।

দোলের উৎপাত সুরু হয়েছে পথে। উৎসাহী ছেলেমেয়েদের রং নিয়ে মাতামাতির চীৎকারও শোনা যায় ইরাদের বাগান থেকে। ইরা চমকে ওঠে—এখন যাই কি করে?

ওদিকে দুপুর গড়িয়ে যাবে কামেলা চুকতে, কাজও সব বাকী। আজকের অনুষ্ঠান পণ্ডই হয়ে যাবে। ভাবনায় পড়েছে ওরা। আভা বলে—কি হবে তাহলে?

সীমা চেয়ে দেখছে পথের দিকে। বলে সে,

—চল। এই তো পথ! কোনরকমে চলে যাবো। কেউ কিছু বলবে না।

বাধ্য হয়েই পথে বের হল ওরা কাজের গুরুত্ব বুঝে।

এদিক ওদিক ছেলেদের কলরব কানে আসে।

কে কাকে রং নিয়ে তাড়া করেছে। অবশ্য ব্যাপারটা চলছে নিজেদের মধ্যেই। তাই সীমা-ইরা-অভা নির্বিঘ্নেই চলেছে।

পথটাও জনহীন। আজ বিশেষ কেউ বের হয়নি ওই উৎসাহীদের দল ছাড়া। পথের মোড়ে মোড়ে দু-একটা জায়গায় তারা জটলা করছে।

কয়েকটা সিটকে ছেলে রং মেখে ভূত হয়ে রকে বসে সিগ্রেট টানছিল, হঠাৎ সীমাদের কয়েকজনকে দেখে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। শীর্ণ সিটকে ছেলেটা বোধহয় ওদের দলের গুরু। তাকে চেয়ে থাকতে দেখে অন্য একজন বলে।

—কি গুরু, কাৎ হয়ে গেলে নাকি?

ওদের মন্তব্য শোনা যায়—তা লাট খান জব্বর কিন্তু। হঠাৎ ছেলেটা উঠে দলবলকে বলে—চল, ওদিকে দোল খেলে আসি।

সীমাও লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা, তাই সাবধান হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের আসতে দেখে। মায়া ভয় পেয়ে যায়, ইরাও ভাবেনি যে ওই অসভ্য ছেলেগুলো ওদের এভাবে পথের মধ্যে আটকাবে। সীমা রুমা তবু বলে ওদের—পথ আটকালেন কেন?

ছেলেটা সিগ্রেটের শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলে—দেখছি একটু তা দোলের দিন—এমনি এমনিই ছেড়ে দোব?

ভয়ে ইরা সিটিয়ে গেছে। সীমাই বলে—পথ ছাড়ুন। সিটকে ছেলেটা এবার ওর জোরালো গলার শব্দে ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—ফটকে, বাঁদরের ঘন্টা দেতো—ওর মুখেই আগে মাখিয়ে মুখখানাকে মেরামত করে দিই।

হাসছে ওরা—ছেলেটাও রাতে রঙ নিয়ে এগিয়ে আসছে সীমার দিকে, হঠাৎ শীর্ণ সিটকে ছেলেটাকে সীমা এগিয়ে এসে একটা চড় কসতেই ছেলেটা থমকে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে সীমার জোড়া-পায়ের লাথি খেয়ে ছেলেটা ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমাতেই পড়ল সশব্দে।

সীমা গর্জাচ্ছে—কেউ এগিয়ে এলে তাকেও ওখানেই জমা করে দোব। ইতর অসভ্য কোথাকার।

বেকায়দায় নর্দমায় পড়ে সেঁটে গেছে ছেলেটা—ওরা কর্দমাক্ত নাজেহাল গুরুকে তুলেছে। আর সীমাকে রুখে দাঁড়াতে দেখে ওরাও এগোলো না। সরে গেল বেশ কড়া চাহনি মেলে।

মেয়েরা যেন সাহস ফিরে পায়, সীমা বলে—চল, ধত্তো সব ইতরের কাণ্ড।

হঠাৎ রাস্তার ওদিকে একটা ছোট গাড়ির হর্ণটা শর্ট সার্কিট হয়ে বেজে চলেছে সাইরেনের মত। একটি তরুণ বনেট খুলে সেটাকে মেরামত করতে নেমে পথের মধ্যে ওই তাণ্ডব দৃশ্যটা দেখে চেয়ে থাকে। বিস্মিত হয়েছে সে।

হঠাৎ এদের দলে ইরাকে দেখে ছেলেটি ডাকলো—আরে ইরা! তুই!

ইরাও অবাক হয়—সুব্রদা! তুই এখানে?

সুব্রত একটু কাজে যাচ্ছিল, তার কারখানার ব্যাপারে একজন ভদ্রলোকের কাছে যাবার দরকার রয়েছে, পথের মধ্যে গাড়িটা এভাবে বিগড়ে যেতে নেমেছে। সুব্রত বলে—

—মিস্ত্রী মানুষ, গাড়ি মেরামত করতে গিয়ে নেমে দেখলাম ব্যাপারটা।

ইরাই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার পিসতুতো দাদা, সুব্রদা। আমার বন্ধু—মায়া-অভা-সীমা। সীমা ওদিকে দাঁড়িয়েছিল—তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাবার মুখে সুব্রতই বলে—ওর পরিচয় একটু আগেই পেয়েছি। তাই দূর থেকেই তেল কালি মাখা হাতে নমস্কার জানাচ্ছি। উঃ, দারুণ ব্যাপার ঘটালি কিন্তু—ওদিকে গেলে মাসীমাকে বলতে হবে।

ইরা চমকে ওঠে। ওসব বলিস না বাড়িতে। তবে সীমার ওই পরিচয়টাই দেখলি, এছাড়া পড়াশোনায়ও দারুণ, নাচ-গান-এ টপ—আর চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টসম্যান।

সুব্রত হাসে—থাক থাক।

—বিশ্বাস হচ্ছে না। আর আজই সন্ধ্যায় আমাদের ফাংশান, শ্যামা—

সুব্রত কি ভাবছে। ওদের নিয়ে গাড়িতে তুলে নতুন মাসীমার ওখানে পৌঁছে দিতে চলেছে সে। সীমা গাড়ির সামনের সিটে বসে আছে। আজ হঠাৎ সীমার মনে যেন লজ্জার বিচিত্র একটি সুর জাগে। প্যান্ট সার্ট পরে মনে হয় অসাবধানে তাদের দেহের রেখাগুলো অকারণে সেক্সি হয়ে উঠেছে সেই লজ্জাই বোধ হয় তায়। সুব্রতর চাহনি ওর দিকে। সুব্রত বলে—যেতে বলছো তাহলে?

—কি রে সীমা? ইরা শুধোয়।

সীমা বলে—যার ইচ্ছে হয় আসবেন। আমি কি বলবো?

সুব্রত হাসছে। সীমার সব তেজ যেন উবে গেছে।

নিজেরই মনে তাই গুণ গুণ সুর ওঠে। কি যেন ভালোলাগার সুর। নিজেকে আজ সাজাতে চায় সে। তাই মায়ের পুরোনো শাড়ি একটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। অণিমা ঘরে ঢুকে মেয়েকে ওই বেশে দেখে থমকে দাঁড়ালো। অনেক বড় হয়ে গেছে সীমা, আর মনে হয় এ যেন তারই যৌবনের প্রতিচ্ছবি। অণিমার অল্পবয়সের ছবিটাই যেন ফুটে উঠেছে ওই আয়নায়। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে অণিমা দেখছে এ কোন নতুন সীমাকে।

সীমা বলে—তোমার শাড়িগুলো সব পুরোনো মা। ব্যাকডেটেড। একটা নতুন শাড়ি কিনে দাও না? আজ ফাংশানে পরবো।

নীলেশও সীমাকে দেখছে। তার মনে হয় মেয়েটার একটা পরিবর্তন কোথায় এসেছে। তবু হাল্কা স্বরে নীলেশ বলে—বেশ তো বেলবট-স্ল্যাকশ পরছিলি—আবার শাড়ি-ফাড়ি কেন? ওই সব পর—লেস কন্টোল।

সীমা জানায়—বাঃ রে, চিরকাল ওই সব পরতে হবে নাকি?

নীলেশ বলে ওঠে—তাহলে শাড়ি পরার যথেষ্ট কারণ কিছু ঘটেছে?

অণিমাও চমকে ওঠে ভাই-এর কথায়। সীমা বলে ওঠে—চাই না কিছু। কিছুই চাই না আমার।

অণিমা জানে মেয়ের এই জেদের কথা। তবু সেও চায় তার মেয়েকে সুখী করতে, সাজাতে। তাই বলে—হবে বাপু, এখন থাম দিকি তোরা!

এ অন্য কোন সীমা—ফুলের সাজ আর ওই নতুন শাড়িতে মানিয়েছে তাকে সুন্দর। সুব্রতও এসেছে দর্শকদের মাঝে, আজ সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে সীমাকে। গান শোনা যায়—

জীবনের পরম লগন করো না হেলা—

হে গরবিনী।

বৃথাই কাটিবে বেলা—

সীমার চোখে ফুটে ওঠে সুব্রতর মুখখানা-তার মনে কি সাড়া জাগে।

রাতের আঁধার ভরে উঠেছে চাঁদের আলোয়। বাগানের নির্জনে সুব্রত যেন সীমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। উৎসবমুখর পরিবেশে আজকের তিথিটা যেন স্মরণীয় হয়ে ওঠে সীমার মনে।

সীমা চেয়ে থাকে সুব্রতর দিকে। তার জীবনে কোন পুরুষ এভাবে এর আগে কোনদিনই আসেনি। সুব্রত বলে—সত্যি তোমাকে আজ না দেখলে চিনতে পারতাম না।

সীমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। তার মনের অতলে কি নতুন সুর জাগে। হারিয়ে যাওয়ার সুর। সুব্রত হঠাৎ কিছুটা আবীর বের করে ওর দিকে এগিয়ে আসে। হাসছে সীমা—সকালের কাণ্ডটা মনে নেই?

তবু সুব্রতর হাতের যেন ওই স্পর্শটুকু সীমা নির্জনে অনুভব করতে চায় সারা মন দিয়ে। সুব্রতর আবীরে ওর মুখ মাথা ভরে উঠেছে—যেন তারই গন্ধ বর্ণালী জেগেছে সীমার মনেও। সীমা হাসছে।

—ইস্। কি করলে দেখোতো? মাথা মুখ—নতুন শাড়িটা অবধি ভরে গেল।

কি ভেবে সীমা ওরই আবীর নিয়ে সুব্রতর মুখ মাথা ভরিয়ে তোলে। হাসছে ওরা। হঠাৎ ইরা ওদের খুঁজতে এসে এভাবে দেখে সরে গেল —তার মুখেও হাসির আভাস জাগে।

অণিমা সাবিত্রীদির ওখানে নেমন্তন্ন সেরে বাড়ি ফিরেছে। নীলেশ একা বসে আছে। তখনও ফেরেনি সীমা। তাই যেন রেগে ওঠে অণিমা। মনে হয় মেয়েটা যেন বদলে যাচ্ছে। তাই বলে—এত রাত অবধি কোথায় রইল? এসব আমি পছন্দ করি না।

নীলেশ বলে—ফাংশানে গেছে, দেরী হচ্ছে। ফিরবে এখুনিই।

—এত দেরী হবে? অণিমা গজ গজ করে।

নীলেশ বলে—তোরাও তো এককালে ওই বয়সের ছিলি। সেদিনের কথাগুলো ভাব। ফিরবে এখুনিই।

নীলেশের কাজ রয়েছে। কাছেই বাড়ি। তাই ফিরছে সে। একা বসে আছে অণিমা। তার মনটা এই চাঁদনী রাতে দোলের তিথির কোন অতীতে ফিরে যায়।

নীলেশ রাস্তায় নেমেছে। হঠাৎ সীমাদের বাড়ির অদূরে একটা গাছের নীচে গাড়িটা এসে থামল। ভিতরে আলো জ্বলে উঠতে দেখে গাড়ির মধ্যে সীমা আর একটি তরুণকে। সীমা নেমে হাত নেড়ে কি বলে—ও চলে গেল।

নীলেশ দেখছে ব্যাপারটা। সীমা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অণিমার মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। গঙ্গার বুকে নৌকায় অনুতোষ আর সে। অনুতোষ ওর মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে দেয়। অণিমা অস্ফুট কণ্ঠে বলে—এ কি করলে? মুখ মাথা সিঁথি অবধি ভরে গেল।

হাসছে অনুতোষ। ও বলে—সিঁথিটুকু যদি পাকাপাকিভাবে রাঙিয়ে দিই!

—এ্যাই। অণিমা চমকে ওঠে। অনুতোষ ওকে কাছে টেনে নেয়। ওরা যেন কি স্বপ্ন দেখছিলো সেই মিলন সন্ধ্যায় আবীর রাঙানো মন নিয়ে।

—মা।

চমকে উঠে চাইল অণিমা মেয়ের দিকে। ও যেন সামনে নিজের সেই সরম রাঙানো আবীর মাখানো রূপটাকেই দেখেছে ওই সীমার মধ্যে। সীমা জানে না মায়ের মনের গভীরের সেই কথাটা। সীমা বলে—দ্যাখো না মা—ইরা আভা সবাই মিলে কি রকম আবীর মাখিয়ে ভূত করে দিল?

মিথ্যা কথাটা আজ সীমা মায়ের সামনে সহজভাবেই বলে। অণিমা মেয়েকে বলে—যা। চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে নে গা। রাতদুপুরে আর নাইবি না, চুল শুকোবে না। সীমা বিরক্তিভরে গজগজ করে চলে এল ভিতরে।

আজ তার মনে কি সুর জাগে। আবীরগুলো তুলছে—হঠাৎ সিঁথির আবীরটুকু তুলতে গিয়ে থামলো, কি ভেবে শাড়িটা মাথায় ঘোমটা মত করে তুলে দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছে। গুণগুণ সুর ওঠে।

—বৃথাই কাটিবে বেলা,
সাঙ্গ হবে যে খেলা—

হঠাৎ ও পাশের ঘর থেকে মায়ের গলা ভেসে আসে। —রাত হয়েছে, শুয়ে পড় সীমা।

সীমা চমকে ওঠে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। চাঁদের আলো পড়েছে গাছগাছালির বুকে। সুব্রতর কথা মনে পড়ে—তার মুখখানা। অণিমা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মেঘগুলো আকাশে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ একটা কালো মেঘ যেন চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে। আঁধার নামছে। অণিমা চমকে ওঠে। অনুতোষের কথা মনে পড়ে—মেয়ে বড় হলে সমস্যা আরও বাড়বে অণিমা।

সাবিত্রীদি সকালে এসেছে ছুটির দরখাস্ত-খানা অণিমার হাতে পাঠাবার জন্য। বাড়ির কামেলা এখনও মেটেনি। সীমা সকালে পড়া নিয়ে ব্যস্ত। ফাইনাল পরীক্ষা সুরু হচ্ছে। সাবিত্রীদিও দেখছে সীমাকে সাহেবের ঘর থেকে একটা জার্নাল নিতে এসেছিল। সীমা শাড়ি পরেছে আজও।

সাবিত্রী বলে—মেয়ে তো বড় হয়েছে অণিমা? যা দিনকাল পড়েছে তাতে ভাবনার কথা। সব যেন ক্ষেপে উঠেছে।

অণিমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভাবনাটা তারও হয়েছে। অণিমা বলে—সীমাকে তাই চোখে চোখে রাখি সাবিত্রীদি। পড়াশোনা নিয়েই আছে, পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

সাবিত্রী বলে—পরীক্ষার পরই মিঃ বোসকে বলে অপিসে ঢুকিয়ে দাও একটা কাজে। তবু একটা কিছু নিয়ে থাকলে ওসব বদ চিন্তা মাথায় আসবে না। নজরেও থাকবে।

অণিমাও কথাটা ভেবেছে। তাই বলে—দেখি, তাই ভাবছি। ওই করুক, তারপর বিয়ে তো দিতেই হবে। একটা ভালো ছেলে দেখেশুনে বিয়ে-থা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

সাবিত্রীও সায় দেয়। ওদিকে অপিসের বেলা হয়ে গেছে। অণিমাকেও বের হতে হবে তাই উঠে পড়লো।

সীমা পরীক্ষার পড়া নিয়ে বসেছে। তবু সারা মনে জাগে সুব্রতর কথা। এর মধ্যে দু-একদিন দেখা হয়েছে তাদের ইডেনের ওদিকে গঙ্গার ধারে। সেই পড়ন্ত বেলার রঙীন মুহূর্ত-গুলো সীমার মনে অনাস্বাদিত একটি আনন্দের স্বাদ এনেছে। সেই জগতে যেন হারিয়ে গেছে সে।

খাতার পাতায় তাই সুব্রতর স্কেচটা করছে। নীলেশ ঢুকে ওকে তন্ময় হয়ে একটা ছেলের ছবি আঁকতে দেখে চাইল। সীমা নীলেশকে দেখে কাগজখানা সরিয়ে দিয়ে বই টেনে নিয়ে বসল।

অণিমা অপিস বের হবার সময় মেয়েকে কথাটা বলতে আসে, পড়াশোনাও করতে হবে তাকে। যেন বৈকালে বন্ধুদের সঙ্গে না বেরোয়। ক'দিন বের হয় মাঝে মাঝে সীমা—এ খবর পেয়েছে অণিমা।

সেই ছবির আলগা কাগজটা কখন হাওয়ায় উড়ে নীলেশের এদিকেই এসেছে। সেটা তুলে নিয়েছে নীলেশ। অণিমা মেয়েকে কথাগুলো জানাতে সীমা চুপ করেই শোনে বাধ্য মেয়ের মত। নীলেশও জানায়—পড়ছে ভালোই।

অণিমা বের হয়ে যেতে নীলেশ সীমাকে শুধোয়—সুব্রত কে?

চমকে ওঠে সীমা। কাগজটা তখন নীলেশের হাতে। সীমা নীলেশের দিকে চেয়ে থাকে। নীলেশই বলে—

—কাল থেকে পরীক্ষা, ওই সব ভূত ঘাড় থেকে নামিয়ে এখন পড়াশোনায় মন দে। অনার্স পেতেই হবে।

সীমা জানে, ছোটমামাকে সে বিশ্বাস করে। তাই কথা দেয়।

পরীক্ষা সুরু হয়েছে। সেদিন টিফিনের সময় নীলেশ অণিমা ওর গাড়িতে গেছে। সীমাকে দেখা যায় না। অণিমা গাড়িতে রয়েছে—হঠাৎ দূরে একটা দেওদার গাছের নীচে সীমা আর একটি ছেলেকে দেখে নীলেশ এগিয়ে যায়।

সুব্রতও এসেছে সীমার পরীক্ষার বিরতির সময়। সীমা ছোটমামাকে দেখে এগিয়ে আসে। আর ব্যাপারটা গাড়ি থেকে অণিমাও দেখেছে। একটু অবাক হয় সে—ওদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে। তবু সীমা গাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করে। খাবারও খায়।

অণিমাই শুধোয়—ছেলেটি কে? ওই যে কথা বলছিলি।

সীমা একটু যেন ঘাবড়ে যায়। পরক্ষণেই বলে ওঠে সীমা—ওতো একদঙ্গেই পড়ি—এবার

"EMERGENCY-anushasan parva"

—Acharya Vinoba Bhave

NEW GAINS

Marked improvement in every sphere of national activity

- Fall in prices of essential commodities.
- Increased production. More power.
- Improved industrial relations.
- Strikes, lock-outs and bandhs disappear.
- Distinct reduction in crime, violence and other anti-social activities.
- Punctuality and efficiency in offices.
- People working harder.
- The rate of inflation down from 30.1% in April 1974 to minus 2.1% on July 19, 1975.
- More and better agricultural inputs and credit facilities for farmers.
- Public distribution system streamlined.
- Adequate supply of kerosene for all States.
- Production of controlled cloth to go up from 100 million square metres in 1974 to 160 million square metres this year.
- 2.5 lakh new cooking gas connections for consumers annually
- Production of 117 essential drugs to be stepped up.
- Cement to cost less in inaccessible and hill areas.
- Tax relief for middle income groups.
- A greater sense of discipline has emerged.

help implement Shrimati Indira Gandhi's

20 POINT PROGRAMME

work hard, produce more and maintain discipline

DAVP

পরীক্ষা দিচ্ছে। বুঝলে মা-মণি—এইসা টোকে না ওরা।

নীলেশ দেখছে সীমাকে। সময় হয়ে গেছে—সীমা হলে গিয়ে ঢুকলো। অণিমা গুম হয়ে ফিরছে, নীলেশ দিদিকে দেখে। অণিমাই বলে—পরীক্ষার পর সীমাকে আমাদের ব্যাঙ্কেই চাকরীর ব্যবস্থা করছি। পাস করে—সি এ পড়ুক। চাকরী করুক।

নীলেশ অবাক হয়—কেন রে? মানে বিয়ে-থা—

—যদি তখন ভালো ছেলে পাই দোব। এখন বসে থেকে কি করবে? যা বন্ধুর দল জুটছে।

হাসছে নীলেশ। ও জানে, আজকের অস্থির যৌবনের কথা। তাই বলে—দ্যাখ। পড়াশোনা করুক। আবার চাকরীর জোয়ালে যোতা কেন?

অণিমা কথা বলে না। মেয়েকে তবু নজরে রাখতে পারবে সে। কোথায় যেন অণিমার মনে একটা কি সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে আসে।

একটা ভয় জাগে মনে। তাই সীমাকে যেন নজরে রাখতে চায়।

সীমাও সেটা বুঝেছে। তাই মায়ের ওই শাসনে সেদিন প্রতিবাদ করে—দিনরাত ঘরে বসে থাকতে পারবো না!

অণিমাই জানায়—সামনের বুধবার ব্যাঙ্কে একটা ফর্মাল টেস্ট দিতে হবে তোকে। আর ফর্মটা ফিল-আপ করে দে।

অবাক হয় সীমা—কেন? পরীক্ষা চুকে গেল, আবার ওখানে কিসের পরীক্ষা?

অণিমা জানায়—আমি ঠিক করেছি, ওখানেই চাকরী করবি। তবু সময় কাটবে। আর বৈকালে সি-এ পড়ার ব্যবস্থাও করছি।

চমকে ওঠে সীমা। মায়ের দিকে চাইল। আজ মনে হয় মা তার মনের সব কমনীয়তা—সব সুরকে নির্মমভাবে হত্যা করে দিয়ে তাকে ওই চাকরীর বাঁধনে বেঁধে শেষ করে দিতে চায়। তাই প্রতিবাদ করে।—চাকরী আমি করবো না!

চমকে ওঠে অণিমা, সীমার চোখে-মুখে বিদ্রোহের কাঠিন্য! অণিমার জেদী মন যেন জ্বলে ওঠে। তাই কঠিন স্বরে ধমকে ওঠে অণিমা।

ফর্ম রইল, ওটা ফিল-আপ করে দিবি আজই। আর যা বললাম তাই করতে হবে। খুব বেড়েছিস তুই, মুখের উপর কথাও বলিস আজকাল।

অণিমা কথাটা শুনিয়ে বের হয়ে গেল। সীমা কাঠ হয়ে শুনছে মায়ের কথাগুলো। সব শুনেছে নীলেশও। সীমার চোখে জল নামে মায়ের শাসনে। আজ সে যেন বিদ্রোহ করতে চায়—এ আমি পারবো না ছোটমামা। চাকরী—ওই দিনরাত পড়া—জীবনে আর কিছুই কি নেই?

নীলেশ কি ভাবছে।

অণিমার জীবনে ওই মনোহরবাবু যেন একটা গ্রহের মতই হয়ে রয়েছে। ব্যাঙ্কের সেই মামলার বিরুদ্ধে মনোহর হাইকোর্টে ব্যাঙ্কের নামে বিরাট অঙ্কের ডামাজেজ সুট করেছে। তার মালপত্র আটকে ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষতি করেছে। মিঃ বোস-অভিজিৎ-অণিমাও রয়েছে। অণিমা নিজেকে যেন দোষী মনে করে। তাই বলে—আমার জন্যেই ব্যাঙ্কের ক্ষতি—

হাসছেন মিঃ বোস। তিনি জানান মনোহর ধূর্ত লোক। জানে আমরা জিতবোই। ওর সব কিছু 'সিল' করে দোব। তাই আগে থেকেই অন্য পথে মরণ কামড় দিতে চায়। আমরাও ফাইট করবো। অণিমা, অভিজিৎ-এর সঙ্গে বসে ওর রিট পিটিশনের প্যারাওয়াইজ কমেণ্ট করে আজই 'ল' অফিসারকে দাও। তাকেও আমি বলে দিচ্ছি।

অর্থাৎ মনোহরবাবু অণিমাকে শান্তি দেবে না। ওই লোকটার জন্য সংসার থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছে অণিমাকে, অনুতোষও মারা গেছে হয়তো সেই দুঃখেও। আজও তাকে সব সইতে হচ্ছে।

অভিজিৎ বলে—লোকটা একটা শয়তান। অনেক রকমের কারবার ওর। তাই ওর একমাত্র ছেলেও বাপের কারবার থেকে সরে গেছে। ও গুড ইয়ংম্যান। ওই বাপকে সেও সহ্য করতে পারে না।

সীমা তবু বের হয়েছে, কি যেন নেশার মতই সেই বৈকালে তারা এসেছে ময়দানের দিকে। সীমার মনে হয় তার নিঃস্বমনে মায়ের ছবিটাও কঠিন হয়ে ফুটে উঠেছে আর সেখানে ফুটে রয়েছে সুব্রতর ছবিটা কি স্নিগ্ধতা নিয়ে।

সীমা বলে—মা হয়তো কিছু সন্দেহ করেছে। তাই বলছিলাম—এভাবে আর বেশীদিন চলবে না। মা-ও তাই চাকরীর খাঁচায় বন্দী করতে চায় আমাকে।

সুব্রত অবাক হয়ে দেখছে সীমাকে। মনে হয় অনেক কিছুই যেন হারিয়ে যাবে। আজ সে নিজের পরিশ্রমে নিজের ছোট্ট কারখানাকে দাঁড় করিয়েছে। বাবার কোন সাহায্য না নিয়েই। তাই বলে সে—আমিও একটা পথ বের করতে চাই সীমা। যদি তোমার অমত না থাকে।

সীমা ভাবছে মায়ের কঠিন মূর্তিটার কথা। কি যেন ভয় হয় তার। কি জবাব দেবে জানে না। সুব্রত বলে—যদি তোমার মায়ের কাছে যাই—চমকে ওঠে সীমা।

অণিমা ফিরছে অফিসের গাড়িতে। দেরী হয়ে গেছে আজ ওই কেসের ব্যাপারে। তাই অভিজিৎ আর সে ফিরছে। হঠাৎ ময়দানের ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটা দাঁড়াতে অণিমার চোখে পড়ে সীমা আর সুব্রত ওদিকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছে। অভিজিৎ দেখেছে ব্যাপারটা। কি লজ্জায় অণিমার মাথা নুইয়ে আসে। অণিমা ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলেছে—ব্যাপারটা বুঝে অভিজিৎই বাধা দেয়।

—পরে যা বলার বলো, তাছাড়া ছেলেটির পরিচয়ও নাও। যদি তেমন ভালো হয়।

অণিমা জবাব দিল না। গুম হয়ে বসে থাকে। অভিজিৎ-এর কথাটা যেন শুনতেও পায়নি সে।

আজ অণিমা গুম হয়ে বাড়ি ফিরেছে। অফিসে মনোহরের কেসটা তার শান্তি নষ্ট করেছে আরও অশান্তির কারণ হয়েছে ওই সীমার ব্যাপারটা।

তাই সীমাকে ফিরতে দেখে অণিমা গম্ভীর-ভাবে ডাকে ওকে। আজ নিজের চোখে দেখেছে ব্যাপারটা। তাই শুধোয়।

—ছেলেটি কে? সেদিন পরীক্ষার সময়ও ওকেই দেখেছিলাম। আর তুই একটার পর একটা মিথ্যে কথা আমাকে বলেছিস? আজেবাজে ছেলের সঙ্গে ঘুরতে লজ্জা করে না তোর?

সীমা মায়ের কথায় আজ জানায়—সুব্রত বাজে ছেলে নয় মা। নিজের কারখানা আছে।

—থাক! এসব আমি পছন্দ করি না। নিজের স্বাধীন মতের চেয়ে এ ব্যাপারে বাড়ির মতটাকে বেশী দাম দেবে। আর যেন কখনও ওর সঙ্গে মিশতে না দেখি। সামনেই অফিসের টেস্ট, ওটা দিয়ে ভাবছি মাসখানেক বাইরে ঘুরে আসবো তুই আর আমি।

মা আজ নতুন পথে চলেছে। সীমাকে ও বাধা দিতে চায় এইভাবে। তারপর ওই চাকরীর জলে বন্দী করে তাকে শেষ করে দেবে। সীমা চমকে ওঠে—মা!

—যা বলছি করোগে!

সীমা আজ কঠিন হয়েই সরে এল। নীলেশ ঢুকছিল—সেও শুনেছে মা-মেয়ের কথাগুলো। আজ তার মনে হয় অণিমা যেন অন্যায় জেদই করছে। সীমার মনের খবরও সে জানে। সেদিনও দেখেছে মেয়েটার চোখের জল। মনে হয় অণিমা যেন সীমাকেও জীবনের সব পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে নিজের মতই ব্যর্থতার অতলে টেনে নামাতে

চায় ওকে। নীলেশ তাই বলে—একটু ভুল করছিস ছোড়দি? চাকরী আর চাকরী নিয়েই কি ওর জীবন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে? ওর বিয়ে-থা ঘর-সংসার—

অণিমা ভাই-এর দিকে চাইল। আজ অণিমার এত দুঃখের মাঝেও ওর মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। তাই বলে অণিমা।

আমিও তাই চাইরে। যদ্দিন তেমন ছেলে না জোটে—ওই সব নিয়েই ব্যস্ত রাখতে চাই ওকে!

—ওই সুব্রত কেমন একটু খোঁজখবর নিলে হয় না?

নীলেশের কথায় অণিমা ওর দিকে চাইল। নীলেশ বলে—যদি ধাজে ছেলে হয় তখন এইসব পথ নিস—আমিও কোন কথা কইব না। কিন্তু যদি সত্যিই ভালো ছেলে হয় তাহলে ওরা সুখী হোক এও কি চাইবি না?

অণিমা কি ভাবছে। ভয় হয় তার জীবনে সহজে কিছুই আসেনি। যা এসেছে তা শুধু পরিণত হয়েছে বেদনাতেই। জীবনের পাত্র কি বেদনার গ্লানিতে ভরে উঠেছে। অণিমা বলে বেদনাবিধুর স্বরে—ভয় হয়রে? জীবনে আশা করে শুধু ঠকেছি। তাই মনে হয় সীমাও ভুলই করেছে। তাই কঠিন হাতে ওর ভুলটাকে শুধরে দিতে চাই। নইলে আমিও চাই—ও সুখী হোক। কিন্তু সুখ পেলাম কই?

নীলেশ কি ভাবছে।

ও ঘরে সীমা গুম হয়ে বসে আছে। মায়ের কঠিন কথাগুলো তার মনে আজ ঝড় আনে। বইগুলো খোলা—রাত হয়েছে। সীমা খেতেও আসেনি, ওর নাকি শরীর ভালো নেই। অণিমাও শুনেছে কথাটা।

রাতের অন্ধকারে অণিমা জেগে আছে। ঘুম আসেনি। অনুতোষের ছবিটার সামনে আজ যেন তারই অতীতের কথাগুলোর অনুরণন শোনে সে।

—ওকে না জেনে দুঃখ দিও না অণিমা। ওর আর তো কেউ নেই। অণিমা কি ভাবছে।

পায়ে পায়ে বের হয়ে আসে বারান্দায়। খাবার জায়গায় সীমার খাবারটা পড়ে আছে। বিড়ালে মুখ দিচ্ছিল—ওকে দেখে সরে গেল। রাতের অন্ধকারে সীমার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো অণিমা।

সীমা যেন নিষ্পাপ শিশুর মত ঘুমোচ্ছে—মুখে পড়েছে এক ফালি চাঁদের আলো। সীমাকে দেখছে অণিমা—তারই আত্মজা। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হয়তো জেগে উঠবে। মায়ের গোপন নীরব স্নেহটুকুকে আজ প্রকাশ করতে লজ্জা হয় অণিমার। তাই যেন চোরের মত সরে এল।

সীমার টেবিল বইপত্র খোলা, সেই পরীক্ষার ফর্মটাতেও সই করেছে সীমা। সেটাও পড়ে আছে।

অণিমা ফিরে এল।

মনোহরবাবু ধূর্ত মানুষ। সেও বুঝেছে মামলার অবস্থা ভালো নয়। হেরে গেলে বিপদে পড়বে। অনেক কিছুই চলে যাবে তার।

তাই এখনো অবস্থা চালু থাকতে থাকতে একমাত্র ছেলেকে ভালো একটা জায়গায় বিয়ে দিয়ে বেশ কিছু তুলে আনতে চায়। সেই সব দিক ভেবেই মনোহরবাবু গতিরামবাবুর মেয়েকেই ঠিক করেছে বৌ করে আনতে।

মনোহরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-ও মত দিয়েছে। কারণ গতিরামবাবুর ওই একটি মাত্র মেয়ে, আর লোকটার অঢেল পয়সা—ব্যবসা সবই আছে। মনোহরই সব কিছুর দখল নেবে ক্রমশই।

গতিরামবাবুও আজ আসছেন সন্ধ্যায়। মনোহরবাবু তার স্ত্রী লোকজন নিয়ে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছে। ছেলেকেও বলেছে যেন সন্ধ্যার পরই বাড়িতে আসে।

সুব্রত বসে আছে ময়দানে। সীমার দেখা নেই। আজ তাদের জরুরী কথাটা ছিল। দরকার

হলে সুব্রত ওর মায়ের কাছেই যাবে। কিন্তু সীমার দেখা নেই।

সীমা একাই বন্ধ ঘরে রয়েছে। ওই পড়া আর অঙ্কের বইগুলোর সামনে হঠাৎ বন্ধ ঘরে এক ঝলক খুশির হাওয়া নিয়ে ইরাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

ইরাও চমকে উঠেছে সীমাকে দেখে। মুখে বিবর্ণতার ছায়া—ফিরে।

ইরার জীবনে আজ এসেছে পূর্ণতার দিন। দিল্লীর রঞ্জন বোসের সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে সামনের সপ্তাহে। তার মা-বাবাও রাজী হয়েছেন—রঞ্জনও ভালো চাকরী করছে দিল্লীতে। বিয়ের পর ইরা সেখানে চলে যাবে।

আজ তার চোখেমুখে খুশির স্বপ্ন—সার্থকতার আভাস। আজ ইরাকে হিংসা করে সীমা। ওর সব হারিয়ে যেতে বসেছে। ইরা চলে গেছে কার্ডখানা রেখে।

সীমার চোখের সামনে কার্ডের ওই উজ্জ্বল প্রজাপতিটা যেন কোন শূন্যতার অসীমে হারিয়ে যায়। কিসের শব্দে চমকে ওঠে।

দেওয়ালে একটা টিকটিকি একটা রঙীন পথভোলা প্রজাপতিকে ধরে ফেলেছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় বর্ণময় প্রজাপতিটা ছটফট করছে।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে চমকে ওঠে। এ যেন তার স্বপ্নের সেই আলোটা বর্ণময় হয়ে উঠেছে। সীমা এগিয়ে আসে—সুব্রত!

সুব্রত বলে—তোমাকে না পেয়ে এখানেই এলাম। আজই তোমার মাকেও কথাটা জানাতে চাই সীমা।

সীমার মুখটায় আরক্তিম আভা ফুটে ওঠে। সুব্রত বলে—জীবনে একটা লগ্ন আসে, তাকে ফেরানো যায় না সীমা। অনেক ভেবে দেখলাম, তোমাকেও পাশে চাই আমি।

হঠাৎ অণিমাকে ঢুকতে দেখে সীমা চাইল ওর দিকে। অণিমার হাত থেকে চমকের ঘোরে ব্যাগটা পড়ে যায়। সুব্রত ওর দিকে চাইল। সুব্রত দেখছে অণিমাকে, কি ভেবে প্রণামও করেছে। অণিমা যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে তারই অবর্তমানে সীমা সুব্রতকে এখানে আনতে পারে।

—তুমি সুব্রত?

সুব্রত বলে—আমার পরিচয়টা আগেই জানানো উচিত ছিল। একটা ফ্যাক্টরী করেছি নিজের চেষ্টায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। আমার ঠিকানা—ফোন নাম্বার—

অণিমা দেখছে ছেলেটিকে।

কি যেন আশ্বাস একটা খুঁজে পায় সে। অণিমার কাঠিন্যটা মিলিয়ে আসে, অণিমাও ওকে বসতে বলে। সীমা দেখছে ব্যাপারটা, ওর মনের ভয়টা যেন মিলিয়ে আসছে।

অণিমাই বলে—বসো।

হয়তো এতটুকু আশ্বাস মেলে তার। সীমা নিজে রান্নাঘরে চা তৈরী করছে বামুন মেয়েকে দিয়ে। খাবারের প্লেটটা নিয়ে আসে।

নীলেশও ঢুকছে। সে গিয়েছিল, সুব্রতর কারখানাও দেখে এসেছে—খোঁজ খবর নিয়ে ঢুকছে খুশী মনে। সীমা-অণিমাও সুখী হবে। ছেলেটি সত্যিই ভালো।

নীলেশও সুব্রতকে এখানে দেখে অবাক হয়। অণিমাই বলে—আয় নীলেশ। আমার ছোট ভাই নীলেশ। অধ্যাপক—আর এই সুব্রত।

নীলেশ বলে ওঠে—তোমার ওখান থেকেই তো আসছি। তা কারখানা মন্দ নয় দেখলাম। শুনলাম নিজের চেষ্টাতেই করেছো—ভাবলাম তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবো, ঠিকানাও নিলাম—মনোহর মুখুজ্যে, কেদার দত্ত রোড।

চমকে ওঠে অণিমা—ওর হাতের প্লেটটা পড়ে যায়। দাঁড়িয়ে উঠে শুধোয়—তোমার বাবার নাম—মনোহর মুখুজ্যে, কেদার দত্ত রোড। কারখানা আছে ওর ওখানেই, গুদাম—আড়ত।

সুব্রত মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

অণিমার পায়ের নীচেকার মাটিটা সরে যাচ্ছে। অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা —না-না। এ হতেই পারে না।

সীমা মাকে ওই অবস্থায় দেখে এগিয়ে আসে। অণিমা সামলে নিয়ে জানায়—তুমি এসো সুব্রত। সীমার বিয়ে ওখানে হতে পারে না।

—মা! সীমা আর্তনাদ করে ওঠে।

নীলেশও অবাক হয়—ছোড়দি! কি বলছিস তুই?

অণিমা কঠিনস্বরে বলে—ওই সেই মনোহর-বাবু, যার জন্য আমাকে সংসার ছেড়ে বাইরে আসতে হয়েছিল। আমার স্বামীও ওরই দেওয়া আঘাতে অসময়ে চলে গেল। আজও তারই মামলা নিয়ে আমার শান্তি নেই অফিসে—তিলেতিলে ওই লোকটা আমার সব কেড়ে নিয়েছে। নিষ্ঠুর, লোভী একটা মানুষ। আমার একমাত্র মেয়েকে এবার কৌশলে ছিনিয়ে নিয়ে আমার সব কেড়ে নিতে চায় সে। এখানে আমার মেয়ের বিয়ে হবে না—হতে পারে না নীলেশ।

অণিমার কঠিন কণ্ঠ যেন বেদনায় বুজে আসে।

অণিমা বেদনার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে সুব্রতকে। —তুমি যাও। যাও এখান থেকে। আর আমার মেয়ের সংগে কোন সম্পর্ক রেখো না।

সুব্রত চলে গেল কি বেদনা নিয়ে। সীমা কঠিন মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। এবার বলে সে—ওর কি দোষ মা! ওকে ফিরিয়ে দিলে

—সীমা! তোর কাছেও এটুকু সহানুভূতি, এটুকু বিচারও পাবো না? অণিমার কণ্ঠস্বর কি বেদনায় ভরে ওঠে। সীমা চলে গেল নিজের ঘরে।

নীলেশ দেখছে দিদিকে। আজ যেন কি চরম আঘাতে ও ভেংগে পড়েছে। নীলেশ বলে—চুপ কর ছোড়দি। ঠিকই করেছিস তুই।

অণিমা বলে—তখনই ভয় করেছিলাম নীলেশ, বরাতে আমার সুখ শান্তি নেই। তাই সুব্রতকে এড়াতে চেয়েছিলাম সীমার জীবন থেকে। কালই—নাহয় পরশুই কিছুদিনের জন্য চলে যাবো বাইরে সীমাকে নিয়ে। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে রে।

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়ে, গতিরামবাবু এসেছে দলবল নিয়ে। ওদিকে সন্ধ্যাও খুঁজছে সুব্রত নেই। রাত্রি হয়ে আসে। গতিরামবাবুও অধৈর্য হয়ে ওঠে ছেলের আশীর্বাদে। অথচ তার পাত্তা নেই। লগ্নও বয়ে যাচ্ছে—অমৃতযোগ পার হয়ে গেল।

সুব্রত বাবার প্রকৃতিটা জানে। দেখেছে মানুষটাকে। নানা কারবারে থাকে। তাই সুব্রতও সাবধান করেছিল। তারপর বাবার কাছ থেকে সরে এসে নিজেই কারখানা করেছে। রাত্রি হয়ে গেছে। মনোহরবাবু ক্ষেপে উঠেছে। রাগে গতিবাবু ফিরে গেছে হতাশ হয়ে। বেশ কড়াস্বরেই জানিয়েছে গতিবাবু—অন্যত্র কোথাও লভ টভ করে ঝুলে পড়েনি তো বাবাজী, তাই বোধ হয় কেটেছে। আজকাল তো আকচাআকচি হচ্ছে। তবে গুরুবল—আগেই সাবধান হয়ে গেলাম।

অপমানিত বোধ করে মনোহর। তবু বলে—কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কাল সকালেই আমি খবর দিচ্ছি।

ওরা চলে গেছে। উৎসবের আসর ভেংগে গেছে। সেই শূন্যতার মাঝে সুব্রত ফিরছে আজ ক্ষুব্ধ জ্বালাময় মন নিয়ে। সামনেই বাবার চীৎকার শুনে চাইল। আজ মনোহর কঠিন স্বরে শুধোয়। —কোন চুলোয় ছিলে? গতিরামবাবু আশীর্বাদ করতে এসেছিল লোকজন নিয়ে, অপমানের শেষ। মুখ দেখাবো কি করে?

সুব্রত বাবার দিকে চেয়ে বলে—ওসব করবেন না। বিয়ে আমি ওখানে করবো না।

মনোহর গর্জে উঠতে, সুব্রত ওর দিকে চাইল। স্বার্থপর লোভী মানুষটাকে আজ সে নিদারুণ ঘৃণা করে। মনে পড়ে সীমার মায়ের

বেদনার্ত মুখখানা ; ওকেও চরম আঘাত দিয়েছে তার বাবা। আজ গতিবাবুর টাকার লোভে তাকে সেখানে বিক্রী করতে চায়। সুব্রত বলে।

--আপনার কোন সাহায্য না নিয়েই আমি দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। আমার বিয়ের ব্যাপারেও সেই পথই নিতে চাই। আপনি এ নিয়ে কোন চেষ্টাই করবেন না।

চমকে ওঠে মনোহর কথাটা শুনে। আজ তার সামনে গয়াগতির সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। সেটা হারাতে চায় না সে। তাই গর্জে ওঠে মনোহর—অন্য কোন বিদ্রোধরীকে পাকড়েছিস, লজ্জা করে না তোর? ইতর—

সুব্রত বাবার দিকে চেয়ে থাকে। সৎ মা-ও এসে পড়েছে। সুব্রত বলে—তোমার জন্য বাইরে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। আমার ভবিষ্যৎ জীবনকেও তোমার পরিচয় শুধু কালোই করে তুলেছে।

অণিমার সেই কথাগুলো মনে পড়ে সুব্রতের। আজ সে নিজের পথেই বাঁচতে চায়। মনোহরবাবু বলে—এত জ্ঞান হয়েছে তোর? তবে এখানে আসিস কেন?

—এবার সরেই থাকবো।

মনোহর রাগে ফুঁসছে। তার সম্বন্ধে ওই হীন মন্তব্যগুলোয় চটে উঠেছে। তাই শুধোয় —তার আগে জবাব দে—কোথায় শুনেছিস ওইসব কথা!

আজ সুব্রত তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। তাই জানায়—অনুতোষবাবুর স্ত্রীই আমাকে বলেছেন।

চমকে ওঠে মনোহর—ওই ব্যাঙ্কের সেই মেয়েটা? তাই বুঝেছি—ওরই মেয়েটাকে তোর ঘাড়ে চাপাতে চায়! ইতর—ছোটলোক—

—বাবা! যার তার সম্বন্ধে ওসব কথা বলবেন না। আর তিনিই তোমার পরিচয় শুনে এ বিয়েতে রাজী হন নি। তাই আমার এই পরিচয়টাকেই আমি পিছনে ফেলে নতুন করে বাঁচতে চাই। তাই এ বাড়ি থেকেই চলে যাচ্ছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মনোহরবাবু। সুব্রত বের হয়ে গেছে।

সৎ মা এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—এই নাহলে সতীন কাঁটা। আজ এই অপবাদ দিয়ে চলে গেল?...

মনোহরবাবুর মনে পড়ে অণিমার কথা। একদিন সেই তেজী মেয়েটাই তাকে অপিস থেকে বের করে দিয়েছিল। আজ তাকেও চরম আঘাত দিয়েছিল মনোহরবাবু।

আজ সেই কঠিন মেয়েটি তার সব আঘাতের জবাব দিয়েছে এইভাবে। তার সব ভাবনাগুলো যেন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। শরীরটা ভালো নেই।

সারা বাড়িটায় স্তব্ধতা নেমেছে। অণিমা রাতে ঘুমুতে পারেনি। সীমার ঘরেও ঢোকেনি। সীমাকেও জানিয়েছে ওকেও বাইরে যেতে হবে। সীমা শুনেছে মাত্র কথাটা।

সকালে চুপ করে বসে আছে অণিমা। নীলেশও রয়েছে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে মনোহরবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল। বুড় কঠিন লোকটা আজ নরীয়া হয়ে এসেছে। সুব্রতও চলে গেছে—আজ তার সামনে শুধু জ্বালা আর কাঠিন্য। অণিমাকে দেখেই আজ ফেটে পড়ে মনোহরবাবু—তোমার কাছেই এসেছিলাম। মুখোমুখি কথায় বোঝাপড়া করতে। আমার ছেলেটাকেও কেড়ে নিতে চাও এবার? ব্যাঙ্কের দুলিয়া বের করে সর্বস্বান্ত করতে চাও, আবার একমাত্র ছেলেকেও কেড়ে নিতে চাও—তোমার মেয়ের প্রলোভন দেখিয়ে।

—কি বলছেন আপনি? অণিমা অবাক হয়।

মনোহর তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—কিছুই জানো না তুমি? সুব্রত কোথায়? কাল রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে এখানেই এসেছে।

—না। তার খবর জানি না আমি। কাল আমার অমতের কথাও জানিয়েছি। আপনার ছেলে

বলেই ওখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না। অণিমা স্থির স্বরে কথাটা জানায়। মনোহরবাবু গর্জে ওঠে।

—আমি পুলিশে যাবো। তোমার মত মেয়ে চক্রান্ত করে আমার একমাত্র ছেলেকে বিগড়ে দিয়েছো। আজ সব হারাতে বসে তবু ওটুকু সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু তাও—

নীলেশ দেখছে লোকটাকে। ও দেখেছিল সেদিনকার গৃহবিতাড়িত অণিমাকে। তার চোখের জলও দেখেছিল। আজ তাই নীলেশ বলে মনোহরবাবুকে।

—দুঃখ হচ্ছে তাহলে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন একটু—দুঃখ অনেককেই দিয়েছেন। সংসার হারাবার—স্বামী হারাবার দুঃখ কি সেটা এবার অনুভব করুন।

মনোহর ওর দিকে চেয়ে থাকে। তবু শোনায়—এর জবাব আমিও দোব। একমাত্র ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে—ঘরছাড়া করে দেবে, এর বিচার হবে না?

মনোহর বের হয়ে গেল। অণিমা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ফোনটা বাজছে। অভিজিৎ ফোন করছে—কালকের ফ্লিজারভেশন হয়ে গেছে।

কালই যাচ্ছে তারা বাইরে সীমা আর অণিমা। ছুটিও তার স্যাংকশন হচ্ছে কাল থেকে। আজ তাই অণিমা উঠলো—অপিস ঘুরে আসতে হবে। কেনাকাটাও বাকি।

মনোহর চমকে উঠেছে—কোর্টের লোকজন এসে গেছে—এতদিনের মামলার রায় বের হয়েছে। আর সে হেরে গেছে।

ব্যাঙ্কের খবর এসেছে। মিঃ বোস—অভিজিৎ সকলেই রয়েছে। অণিমাকে দেখে তারাও অভিনন্দন জানায়। অণিমার জন্যেই এই জয় সম্ভব হয়েছে তাদের।

মিঃ বোস বলেন—ফোনে—আজই যেন 'সিল' করা হয়, নাহলে রাতারাতি মালপত্র উধাও করে দেবে মনোহরবাবু। তারই ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

আজ মনোহরের সব খেলা চুকে গেছে। হেরে গেছে সে—সবই তার হারিয়ে গেল। এতদিনের গড়ে তোলা ইমারতটা যেন তাসের প্রাসাদের মত এক ধাক্কায় ঝুর ঝুর করে ধ্বসে পড়েছে। ধ্বসেস্তূপে পরিণত হয়েছে। আর সেই ধ্বসেস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মনোহরবাবু।

তার দেহ মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে। চোখের সামনে দেখে গুদাম সিল করে সেখানে পাহারা বসে গেল। তার নিজের অপিস ঘরে বসেছিল মনোহর। এতদিন ধরে বহু চেষ্টায় বহু কিছু অন্যায় করে তিলে তিলে এই সাম্রাজ্য গড়েছিল, আজ সেখান থেকেও তাকে বের করে দেয় ওরা।

মনোহর বাধা দেয়—এটা আমার নিজের অপিস।

কঠিন পাহারাদার, সে শোনায়—হুকুম নাই। আপকো বাহার যানে হোগা। চলিয়ে—

মনোহরবাবু চেয়ার থেকে উঠেছে। হাঁটবার যেন শক্তি নেই। লোকটা উন্মাদের মত সব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। চোখেমুখে দুঃসহ উৎকণ্ঠা—হঠাৎ মনে হয় এই বস্তু মুষ্টি আলগা হয়ে আসছে। পায়ের নীচে মাটি তার নেই।

কি কঠিন আঘাতে যেন ছিটকে পড়ল মনোহর দাঁড়াবার শক্তি নেই। ওরা ওর মূর্ছিত দেহটাকে ধরে ফেলেছে।...এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করার শক্তি তার নেই তাই শৌকই হয়ে গেছে মানুষটার।

ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হলো মনোহরবাবুকে। স্তম্ভিত বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টি মেলে মনোহরবাবু তার হারানো সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে এখনও।

সীমা সকালেই মায়ের সঙ্গে মনোহরবাবুর কথাগুলো শুনেছিল। সুব্রতর কথা মনে পড়ে।

A copy is never so good and new as the original but not so, Indian Handicrafts, whether they are play-things or decoration pieces. Indian handmade toys and dolls have a personality of their own. At the creator's hand, they spring to real life; with disarming charm, they demand your affection. They are an example of integration through the ages.

they are always new and original

FOR ELEGANT LIVING BUY INDIAN HANDICRAFTS

dcvp 74/367

গুড্‌লাক

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া মোজা

ফোন : ৩৪-৯৮৬৮ ৩৩-৩৯৮৭

গুড্‌লাক হোসিয়ারী মিলস্ প্রাঃ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ও শোরুম

১৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭০০০০৭

আমাদের অন্যান্য ব্রাঞ্চ

আলিপুরদুয়ার, ফোন : ১৮৪ • শিলিগুড়ি, ফোন : ১৪৭২

গৌহাটি, ফোন : ৬৩১২ • বনগাইগাঁও, • দুর্গাপুর (বেনাচিতি)

এজেন্ট—দাস এণ্ড কোং (রায়গঞ্জ) ডি, দাস (বহরমপুর)

এ, কে, দাস (রঙ্গিয়া)

With Best Compliments of

PHILLIPS CARBON BLACK LTD.

Manufacturers of the famous 'Philblack'

RANGE OF FURNACE BLACKS.

★

Delhi Office :

HINDUSTHAN TIME HOUSE,
12th Floor
18-20, Kasturba Gandhi Marg
New Delhi-110001
Tel. 385571-72

Regd. Office

NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001

মায়ের অমত ছিলনা। সীমাও স্বপ্ন দেখেছিল সুব্রতের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

কিন্তু হঠাৎ মা ওই মনোহরবাবুর নাম শুনেই চমকে উঠেছিল। আর পরক্ষণেই বদলে গিয়ে সুব্রতকে নিষ্ঠুর আঘাতে এখান থেকে চলে যেতে বলেছিল। কোন কথাই শোনেনি আর।

সীমা মায়ের এই যুক্তিটাকে মেনে নিতে পারেনি। মনেমনে তার প্রতিবাদের আগুন ধুমায়িত হতে থাকে। দেখেছে এবাড়ির এতদিনের আপনজন ছোট মামাকেও।

মা অপিসে চলে যাবার পর সীমাও তাকে বলেছিল কথাটা।

—মা অন্যায় করেছে। সুব্রতের দোষ কি?

নীলেশ আজ সীমার দিকে চাইল। নীলেশও জানে সব ব্যাপারটাই। তাই বলে-ছোড়দির দোষ দিইনা সীমা। সব ব্যাপারটাই আমি জানি, খবর নিয়ে তোকেও সাবধান করা উচিত ছিল।

সেদিন ভাবিনি যে ঘটনা এমনি পরিণতি নেবে। আজ মায়ের দোষ আমি দেখি না।

সীমা ছোটমামার দিকে চেয়ে বলে-সুব্রতের দোষ কি?

—তবু বলবো সীমা। এসব তুই ভুলে যা।

—ওই চাকরী নিয়ে বাঁচতে আমি পারবোনা মায়ের মত।

সীমা কঠিন হয়ে ওঠে। বুঝেছে এখানে তার জন্য কোন সমবেদনা হয়তো নেই।

আজ সকালে মনোহরবাবুও এসেছিল। সীমা শুনেছে ওর কথা। সুব্রত ঠিকই করেছে। বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার জন্যেই আর সীমারও মনেহয় তারও কর্তব্য আছে সুব্রতের প্রতি আজ সীমা মনে মনে তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। যত বাধাই আসুক আজ সে তার প্রেমের মর্যাদা রাখবে, সুব্রতের এই ত্যাগেই সে ও যেন মনে মনে জোর পেয়েছে।

অণিমার মনে একটু স্বস্তি ফিরেছে। এতদিন পর ব্যাঙ্ক এতবড় মামলায় জিতেছে। অণিমা যেন এবার মুক্তি পেয়েছে। হালকা মন নিয়ে কেনাকাটা সেরে ফিরছে—সকাল চলে যাচ্ছে তারা কাশীতে।

বাড়ি ফিরেছে। সিঁড়ি থেকেই সীমাকে ডেকে খবরটা শোনাতে থাকে। ভালো একটা বাড়ি পেয়েছে সেখানে। অভিজিৎ বাবুদের বাড়ি। কিসব কিনেছে তারই ফর্দও দেয় অণিমা। সিঁড়ি থেকে বলে—সীমা। এবার গোছগাছ করে নে। আর কি লাগবে দেখে বলেদে—কাল সকালেই সব চুকিয়ে নোব।

কিন্তু কোথায় সীমা। ঘরটা খোলা—সীমা নেই। সারা বাড়িটা শূন্য—সীমা কোথায় চলে গেছে। বামুন মেয়ে জানায়।

—দুপুরেই বের হয়ে গেল।

—কোথায়? আর্তনাদ করে অণিমা।

সব জিনিষপত্র ফেলে দিয়ে এদিক ওদিকে খুঁজছে পাগলের মত। হাতে আসে চিঠিখানা। টেবিলের উপর পড়ে আছে সীমার দুলাইন চিঠি।

অণিমার সব চাঞ্চল্য—ব্যাকুলতা নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চিঠিখানা পড়ে। মাত্র দুলাইন চিঠি—সীমা তার কঠিন প্রতিবাদ জানিয়ে চলে গেছে এবাড়ি থেকে।

—তোমার অন্যায় বিচার মাথা পেতে মেনে নিতে পারলামনা, তাই সরে গেলাম। পারো তবে আমাকে ক্ষমা করো।

অণিমা কি অস্ফুট আর্তনাদে বসে পড়ে।

নীলেশও বাড়ি ঢুকে ব্যাপারটা দেখে এগিয়ে আসে। অণিমা স্তব্ধ পাষাণ মূর্তির মত বসে আছে। নীলেশ চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠে—কিন্তু কোথায় গেল সে?

অণিমা বলে—যে যেতে চায় তাকে যেতে দে নীলেশ। বলেছিলাম না—আমার অদৃষ্টই এমনি। যখনই কিছু পেতে চেয়েছি—পেয়েছি শুধু দুঃখ আর গ্লানি। আমার জীবনপাত্র সেই গরলে ভরে উঠেছে।

নীলেশ দেখছে অণিমাকে।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চাইল। চমকে ওঠে অণিমা—দীর্ঘদিন পর এ বাড়িতে এসেছে একটি মানুষ। বৃদ্ধ বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে ষোড়শীবাবু। অনুতোষের বাবা।

অণিমা চমকে ওঠে—বাবা!

ষোড়শীবাবু বলেন—শুনো ঘরে আসিনি মা। আজ এলাম—সীমা আমার কাছেই গেছে। মনে হল অনেকদিন পর যেন আমার শুনো বুকে অনুতোষই ফিরে এসেছে। সেই মুখ—সেই চোখের নিষ্পাপ চাহনি। ওকে ফেরাতে পারিনি মা। তাই এলাম তোমার কাছেই।

তিনিই বলেন—মনোহর মুখোপাধ্যায়। ওখানে গিয়েছিলাম মা—

অণিমা চমকে ওঠে—সেকি!

—হার্ট এ্যাটাক। ডাক্তার আশা দিতে পারে নি। বার বার তোমাকে দেখতে চায়। বলে—আজ সব হারিয়ে গেল, তবু মৃত্যুর আগে বৌমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে গেলে পরকালেও শান্তি পাবো না।

অণিমা শুনছে কথাগুলো। আজ মনোহরবাবুর সব হারিয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে সে-ও বাবার সংগে সব সম্পর্ক ছেড়ে চলে গেছে। জীবনে অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে সব হারিয়ে। অণিমা সর্বহারা লোকটাকে আজ যেন করুণার চোখেই দেখে। মৃত্যু বোধহয় সব বিভেদ-পার্থক্যকে ভুলিয়ে দেয়।

অণিমা বলে—আমি যাবো বাবা!

—যাবে? ষোড়শীবাবুও যেন এটা ভাবতে পারেন নি।

অণিমা এসেছে মনোহরবাবুর ওখানে। মনোহরবাবু আজ যেন অন্য মানুষ। অনেক করেছে—কিন্তু শেষ মূল্য তার শূন্য। আজ সর্বহারা নিঃস্ব মানুষটা তাই অণিমার সামনে বলে—তোমার কাছে অনেক পাপ করেছি মা। সুখের সংসার—শান্তি সব তছনছ করে দিইছি। ভেবেছিলাম লোভ আর লালসা দিয়েই সব ছিনিয়ে নোব। তার কোন দাম নেই আজ বুঝেছি। তাই যাবার আগে তোমার ক্ষমা চেয়ে যেতে চাই মা—।

অণিমা দেখছে অসহায় মানুষটাকে। মনোহরবাবু বলেন—তাই যাবার আগে শুধু অনুরোধ করবো—আবার হারানো ঘরে তুমি ফিরে এসো। তোমাকে ঘরছাড়া করেছিলাম—মা। তোমরা সুখী হও—

অণিমা দেখছে আজকের নতুন মানুষটাকে।

মনোহরবাবু বলে—আমার সব হারিয়ে যাবে জানি। তাই একমাত্র ছেলেও ঘরে ফেরেনি। তোমাকে অন্যায়ভাবে দোষী করেছিলাম। দোষ আমারই—সুব্রতের মত ছেলে আমাকে অস্বীকার করবে। এই আমার প্রাপ্য।

অণিমা দেখছে মানুষটাকে। আজ তার সব কাঠিন্য যেন ফুরিয়ে আসে কি বেদনায়। মনোহর বলে।

—তোমাকে হারাতে পারিনি মা। জয়ী হয়েছো তুমি—আমি হেরে গেলাম। হারিয়ে গেলাম।

অণিমা বলে—সুব্রতও আসবে! আমি তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনবো।

আজ অণিমা যেন কি একটা স্বপ্ন দেখে।

নীলেশ কথাটা শুনে অবাক হয়। অণিমা ফিরে এসেছে মনোহরবাবুর কাছ থেকে। নীলেশকেই বলে সে।

—আমিও ভেবে দেখলাম নীলেশ। এতদিনের একটা জ্বালা হয়তো ভোলা যায়। আর সীমাও কোন অন্যায় করেনি। মনোহরবাবুর উপর প্রতিশোধও নিতে চাইনি আমি! তাই বলছি কথাটা!

অণিমার মনে হয় একটা পথ সে পেয়েছে। নির্জন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির পথ। এই নিঃসঙ্গতাই তাকে সীমার সম্বন্ধে স্বার্থপর করে

তুলেছিল। তাকে যেন আঁকড়ে ধরে কাছে রাখতে চেয়েছিল।

অণিমা বলে—আমি আর নিঃসঙ্গ নই। আপনজন আছে। সংসার আছে। ওদের মাঝেই ফিরবো—ওদের মাঝেই থাকবো। সীমাকেও নিজের জগতে যেতে দিতে চাই।

নীলেশ দেখছে আজ অণিমাকে। নীলেশ বলে—তাই ভালো রে! হয়তো ভুলই করেছিলাম আমরা। আজকের যৌবন সেই মিথ্যা ভুল অনায়েরই প্রতিবাদ করেছে।

অণিমাও ভাবছে কথাটা—মেয়ের কাছে অনেক কিছুই দাবী করেছিলাম হয়তো। ভালোবাসা—তার ভবিষ্যৎ সব কিছু। কিন্তু মেয়েরা বড় বিচিত্র রে। মা বাপের সব ঋণ তারা শোধ করে দিয়ে যায় একমুঠো মাটি আর এক কুনকো ধান দিয়ে। এ কথাটার অর্থ বুঝিনি তখন? আমিও তাই দিয়েই সব চুকিয়ে এসেছিলাম একদিন।

সানাই-এর সুর ওঠে। বাড়িটাকে সাজানো হয়েছে। সুতপা-ষোড়শীবাবুকেও দেখা যায়।

নতুন বরবধূর সাজে সুব্রত আর সীমাকে দেখা যায়। তন্তুপদীর বন্ধনে ওরা আজ নতুন পথযাত্রী।

নতুন বরকনে যাবার সময় আজ অণিমার হাতে সীমা সেই ধান আর পূর্ণপাত্র দিয়েই অশ্রু ভরা কণ্ঠে বলে—তোমাদের সব ঋণ শোধ দিয়ে গেলাম মা।

অণিমার দুচোখ জলে ভরে ওঠে।

সীমা মাকে জড়িয়ে ধরে। আজ সে চিনেছে তার মাকে—অনেক বেদনা-ত্যাগ আর আনন্দে এ যেন অন্য কোন এক মহিমময়ী নারী। সীমার মাকে আজ ছেড়ে যেতে যেন বুক ভেঙ্গে আসে।

তবু যেতে হয়।

অণিমা এগিয়ে যাবে, হঠাৎ সুতপার ডাকে থামলো।

সুতপা বলে—এ সময় ওদের সামনে যেতে নেই মেজো।

চমকে ওঠে অণিমা। দু চোখে মুখ ঢেকে সরে এল সেই পুরোনো ঘরে। অনুতোষের ছবিটা সাজানো হয়েছে। সামনে সেই পূর্ণ ঘট।

অণিমা আজ ওর সামনে যেন মাথা নুইয়ে বলে—সীমা নিজের ঘরে গেল ওকে আশীর্বাদ কর্বো।

কর্মব্যস্ত নীলেশ ছোড়দিকে দেখে চাইল—তুই এখনও কাঁদছিস!

অণিমা ওর দিকে চাইল। আজ কান্না নয়—অণিমা হাসবার চেষ্টা করে। তার একমাত্র মেয়ে সুখী হোক—কিন্তু মনে হয় অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে তার। সেই হাসিটুকু কান্নার চেয়েও বেদনাময় করুণ। সানাই-এর সুর ওঠে। কি বিষন্নতার গভীরে যেন হারিয়ে গেছে ওরা সবাই!

শেষ

Here is a sure way to make buying a satisfying business

Very often you feel disappointed, after you have bought a packaged commodity. You realise you have paid more and bought less. Perhaps you have failed to look for this marking* on the container... the marking that ensures the net weight of the packaged goods, be it bread, detergent, oil or any consumable item... the marking that indicates the right quantity for the price you pay... the marking that infuses confidence in you when you buy.

Underfilling and erroneous markings on containers are crimes under the Weights and Measures Act and severely punishable.

LAWS ON METRIC WEIGHTS AND MEASURES PROTECT THE CONSUMER

LOOK FOR THIS MARKING ON EVERY CONTAINER

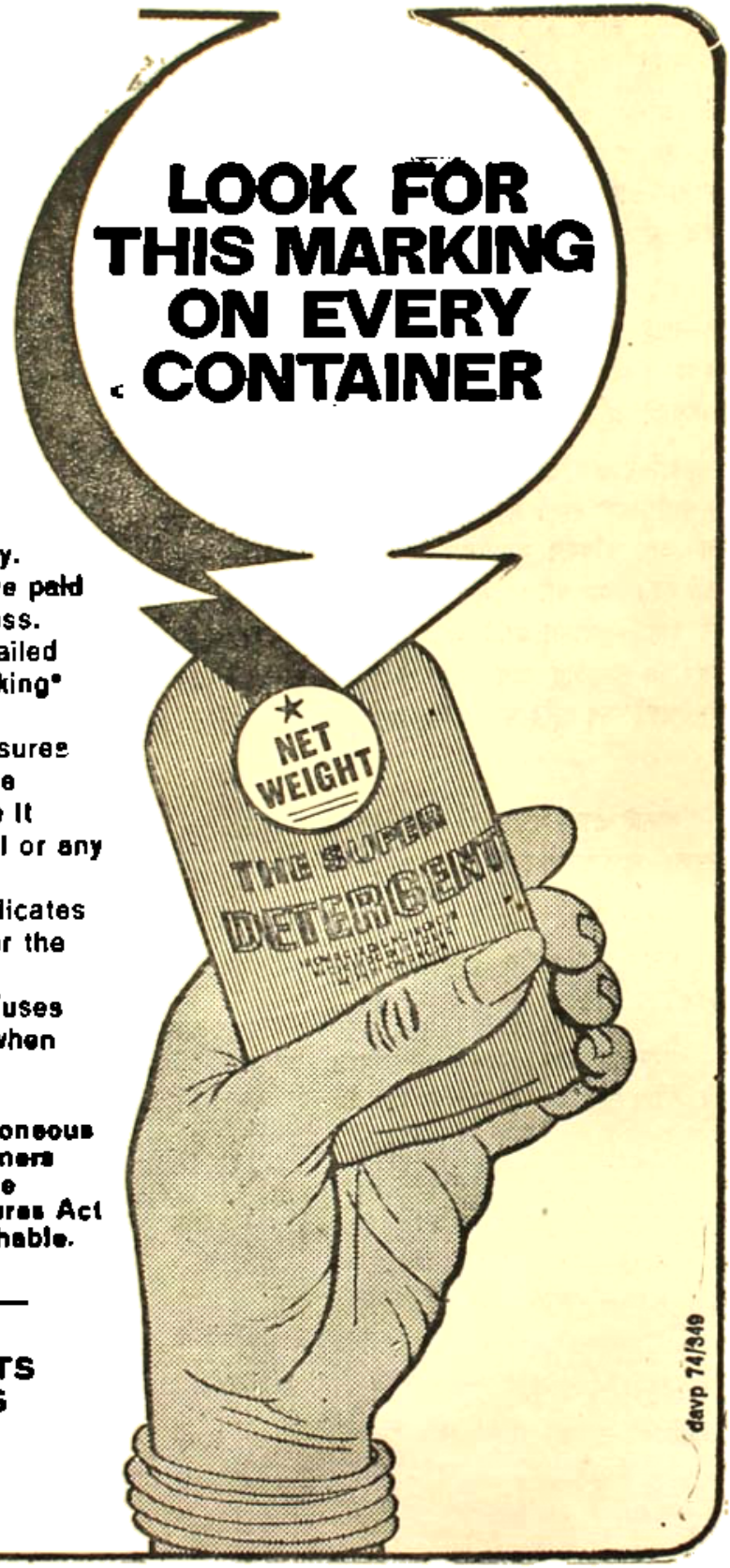

davp 74/349

সেকেনল// নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিসেস নীতা চৌধুরী।

মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ আমার নৈনীতালের একটা হোটেলে। সেখানেই তাকে আমি প্রথম দেখি।

পূজার ঠিক অব্যবহিত পরেই দিন পনেরর জন্য কোথাও গিয়ে ঘুরে আসা আমার একটা যেন অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কটাদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে ঘুরে না আসতে পারলে যেন আমার ভাল লাগত না। অথচ পূজার ছুটির ভিড়ও আমার ভাল লাগে না কোন দিনই তাই ঐ ভিড়কে এড়াবার জন্যই ছুটির পর যাই।

অক্টোবরের শেষ।

নৈনীতাল তখন বেশ ঠাণ্ডা। সর্বক্ষণ গরম কাপড় গায়ে চাপিয়ে রাখতে হয় এবং রাত্রে পুরো কম্বল ছাড়া শীত বাগ মানে না।

কাঠগুদাম থেকে টাঙ্গাসহযোগে দীর্ঘ পথ এসে একটু পরিশ্রান্তই লাগছিল তাই আর সেদিনটা বের হইনি—হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে লেক চোখে পড়ে।

ছোট্ট ছিল স্টেশনটি। চারিদিকে পাহাড়—মাঝখানে নীল টলটলে জল লেক আর ঐ পাহাড়ের গায়ে গায়ে সব ঘর বাড়ি।

রাত্রে চাঁদের স্বপ্নের মতো মনে হয়।

অনেকক্ষণ বারান্দায় চেয়ারে বসে থেকে রাত্রের ডিনারের পর সবে ঘরে ঢুকে শোব বলে মনস্থ করেছি বন্ধ দরজার গায়ে টুক টুক করে যেন কে মৃদু নক করলো।

এ সময়ে আবার কে রে বাবা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম—রাত প্রায় পৌনে বারটা।

কে।

ডক্টর—

ডক্টর বলে আবার কে একজন ডাক্তার এর মধ্যেই কে আবার পারল। ড্রেসিং গাউনটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে দিলাম কে!

Dr. Gupta, I am sory to disturb you at this late hour of night!

তাকালাম।

সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা।

পরনে পাতলা নাইটি—দামী ইটালিয়ান সিল্কের—বক্ষোদেশে ব্রেসিয়ারটা পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছে। মাথায় বব্ করা চুল বিস্রস্ত—

ডকটর আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। I want to have a sound sleep—sound sleep—could you help me—

আপনি এই হোটেলেই থাকেন—

হ্যাঁ মিসেস চৌধুরী—নীতা চৌধুরী—আপনার ষোল নম্বর ঘর আমার পনের—সেই পনের নম্বরেই আমি আছি। যখনই বাইরে যাই টুক্-টাক্ প্রয়োজনীয় ঔষধ সর্বদাই আমার সংগে থাকে। বললাম, come inside আমি দেখি আমার কাছে কিছু ঘুমের ঔষধ আছে কি না, বসুন।

মিসেস চৌধুরী এসে চেয়ারে বসলেন।

সুটকেশ হাতড়ে 'ভেলার গান' ট্যাবলেটটা পেলাম।

গোটা দুই ট্যাবলেট কৌটো থেকে বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, এই দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে ঘুম এসে যাবে।

ব্লু রংয়ের ছোট ছোট ট্যাবলেট দুটো হাতে নিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে নীতা চৌধুরী বললেন, কি—ভেলার গান।

হ্যাঁ—

হবে না—ওতে ঘুম আসবে না।

খেয়ে দেখেছেন ভেলার গান ট্যাবলেট

হ্যাঁ— but no effect ভেলার গান সানারিল, ম্যানড্রেক্স লমিনল লিপাস্টান —I tried so many times—but no effect—ডক্—no effect—

গোটা চারেক না হয় খান—

ডকটর—have you got সেকোনল সোডিয়াম—I had a stock—and never knew before evening that my stock exhausted—সব শেষ হয়ে গিয়েছে—শিশিটা খালি—আর একটা নতুন শিশি ছিল আমার আয়াটা সেটা ভুল করে আনেনি—

সেকোনল সোডিয়ামও আমার কাছে ছিল কিন্তু আমি ছিলাম না। বললামও না আছে।

সন্ধ্যায় একটা কেমিস্ট শপে এখানে গিয়েছিলাম কিন্তু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া দিতে পারবে না বললো—তখন যদি একবারও আপনার কথা মনে পড়তো—আপনাকে দিয়েই একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিতে পারতাম—নেই আপনার কাছে সেকোনল ক্যাপসুল that red Capsule! Please যদি থাকে ত আমাকে গোটা পাঁচেক ক্যাপসুল দিন—কাল আপনার কাছ থেকে একটা প্রেসক্রিপসন লিখিয়ে নিয়ে একটা ফাইল আনিয়ে নেবো—

কটা ক্যাপসুল আপনি খান মিসেস চৌধুরী—

নীতা চৌধুরী হাসলেন, শুরুতে একটাতেই কাজ হতো—

এখন?

পাঁচটা—পাঁচটা না হলে আমি ঘুমোতে পারি না—

বুঝতে বাকী রইলো না আর ভদ্রমহিলা 'সেকোনল' এডিকটেড—

দেখুন না ডকটর আপনার ঐ ব্যাগটার মধ্যে 'সেকোনল' আছে কি না, পারি না আর আমি সহ্য করতে পারছি না। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে—প্লিজ—প্লিজ—ডকটর—

কিন্তু থাকলেও পাঁচটা ক্যাপসুলত আপনাকে আমি দিতে পারি না মিসেস চৌধুরী—

বিশ্বাস করুন ডকটর, আমি সুইসাইড করবার জন্য আপনার কাছে সেকোনল চাইছি না। আর ঐ পাঁচটায় আমার কিছুই হবে না—কেবল আমি কাল বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমাবো। healthy—normal sleep!

না—আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী—

নীতা চৌধুরী হঠাৎ উঠে এসে আমার দুটো হাত চেপে ধরলেন—আবেগভরা কণ্ঠে বললেন একটু ঘুম—আমি একটু ঘুমাতে চাই ডক্টর—একটা ভয়ংকর বিভীষিকা থেকে রাত্রিটুকুর জন্য কেবল একটু মুক্তি চাই—

কিসের বিভীষিকা আপনার।

সে একটা ভয়ংকর বিভীষিকা—

ভয়ংকর বিভীষিকা!

হ্যাঁ—আজ পাঁচ বছর ধরে আমাকে যে বিভীষিকাটা প্রতি রাত্রে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে—কিন্তু সেই বিভীষিকা যাই হোক এমনি ক্রমশঃ ডোজ বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঘুমের ঔষধ খেয়ে খেয়ে forced sleep নন তাহলে আপনি ত কোন দিনই তা থেকে মুক্তি পাবেন না মিসেস চৌধুরী—যতদিন যাবে ডোজ আপনাকে বাড়িয়েই চলতে হবে—একটা থেকে শুরু করে আজ পাঁচটা হয়েছে—এরপর ক্রমে ছটা—সাতটা—আটটা হবে। কি করব—আমি কি করতে পারি, আমি কি জানি না, আমি কি বুঝি না—জানি, বুঝি সব—তবু—তবু আমার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই—কান্নায় সহসা ভেঙ্গে পড়লেন নীতা চৌধুরী।

আমি চেয়ে থাকি মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে।

কতদিন থেকে ঐ 'সেকোনল' আপনি খাচ্ছেন মিসেস চৌধুরী।

বছর তিনেক—আমেরিকায় থাকতে আমাকে একজন ঐ red dolls খেতে বলে—and I started taking that red dolls.

আপনাকে আমি red dolls দেবো—মিসেস চৌধুরী কিন্তু আগে আমি শুনতে চাই আপনার কিসের বিভীষিকা। কি এমন ভয়ংকর সে বিভীষিকা যে জন্য—

Oh ! doctor please ! আগে আপনি 'সেকোনল' দিন তারপর বলবো—Its a horror !

দুটো 'সেকোনল' ক্যাপসুল দিলাম—মিসেস চৌধুরীকে।

Please আর দুটো দিন—

দেবো আগে বলুন সব কথা।

ঠিক দেবেনত।

দেবো।

Give me a glass of water—এক গ্লাস জল—

দিলাম এক গ্লাস জল—মিসেস চৌধুরী ক্যাপসুল দুটো জল দিয়ে খেয়ে নিলেন। একটু একটু করে মুখের অস্বাভাবিকতা—যন্ত্রণার চিহ্নটা যেন ক্রমশঃ মুখের উপর থেকে মিসেস চৌধুরীর মুছে যেতে লাগল। মিসেস চৌধুরী যেন একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠতে লাগলেন।

আচ্ছা মিসেস চৌধুরী আপনি কি আগে আমাকে কখনো দেখেছেন।

না—

তবে আমিই যে ডাঃ গুপ্ত জানলেন কি করে—মানে আমাকে চিনলেন কি করে।

আপনার একটু পরেই আমি এসেছি নৈনীতাল—আপনার পিছনে যে টাকসীটা আসছিল সেটাতেই আমি ছিলাম। হোটেলের খাতায় নাম সই করতে গিয়ে আপনার নামটা দেখলাম। আপনাকে না দেখলেও পূর্বে কখনো আপনার নামটা আমি জানতাম। তারপর যখন সন্ধ্যায় ঔষধের জন্য বের হই দেখলাম আপনি হোটেলের বারান্দায় বসে আছেন—আপনি আমার পরের ঘরটাই নিয়েছেন।

যাক্—এবার বলুন আপনার বিভীষিকার কথা—

আমি চোখের উপরে একটি শিশুকে হত্যা করতে দেখেছি—

একটি শিশুকে হত্যা করতে দেখেছেন।

ইস—it ghastly—

সেই শিশুটিই বা কে—আর যাকে হত্যা করতে দেখেছিলেন সেই শিশুটিকে সেই বা কে?

শিশুটি আমারই সন্তান—

সে কি!

হ্যাঁ—আর হত্যাকারী আমার স্বামী—জয়ন্ত চৌধুরী—মানে আপনি সেই উয়িং কমনভার জয়ন্ত চৌধুরীর কেসটার কথা বলছেন। যার নিজের পুত্র হত্যার দায়ে বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়—বছর পাঁচেক আগে?

হ্যাঁ—সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল সে রাত্রে— just before my eyes জয়ন্ত ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে আছি—কিন্তু আমি জেগেই ছিলাম—

আপনিই—কাগজে পড়েছিলাম সে সময় মনে পড়ছে প্রধান সাক্ষী ছিলেন সেই হত্যা মামলায়।

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন—আপনার স্বামী—তাঁর নিজের সন্তানকে হত্যা করলেন কেন?

সে চেয়েছিল—মানে তার ধারণা হয়েছিল যে শিশুর জন্মদাতা সে নয়— some one else! অন্য কেউ।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ—এমনই নীচ প্রকৃতির ছিল সে—এমন কুৎসিত সন্দেহ বাতিক ছিল তার।

ঠিক ঐ সময়ে দরজায় আবার নক পড়লো—

কে?

আমি শৈবাল সেন—

দরজা খোলাই আছে আসুন মিঃ সেন—

শৈবাল সেন এসে ঘরে ঢুকলো, অসময়ে এসে এত রাত্রে disturb করলাম না ত আপনাদের ডাঃ গুপ্ত—

না, না—নট এটঅল—পরিচয় করিয়ে দিই মিঃ সেন, উনি উয়িং কমান্ডার জয়ন্ত চৌধুরীর স্ত্রী নীতা চৌধুরী—আর ইনি শৈবাল সেন আমার এক পরিচিত আর্টিস্ট—এই হোটেলেই আছেন—চোদ্দ নম্বর ঘরে—দাঁড়িয়ে কেন মিঃ সেন বসুন—

শৈবাল সেন বসতে বসতে বলেন, আপনার ঘরের মধ্যে আলো দেখে বুঝলাম আপনি এখনও ঘুমাননি—আমারও ঘুম আসছিল না—বারান্দায় পায়চারি করছিলাম—ভাবলাম আপনি জেগে থাকলে আপনার কাছে যদি কোন ঘুমের ঔষধ পাওয়া যায়—তাই—

নীতা চৌধুরী শৈবাল সেনের দিকে তাকালেন একবার—

ঘুমের কোন ঔষধ আছে নাকি ডাঃ গুপ্ত!

না তো—

তাহলে আমি উঠি—

বসুন না—মিসেস চৌধুরীর কাছে শুনছিলাম তার স্বামী জয়ন্ত চৌধুরীর নিজের সন্তানকে হত্যা করবার কাহিনী—it is rather interesting শুনুন না—

শৈবাল সেন আর উঠলেন না।

তারপর মিসেস চৌধুরী আপনার স্বামীর ঐ ধারণা হলো কেন যে—তার সন্তান তার ঔরসজাত নয়।

আমার এক বয়ফ্রেন্ড ছিল কালী বটব্যাল—বহুদিনের আলাপ-পরিচয় ছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে—আমাদের বিবাহের পরও সে প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে—দিল্লীতে। জয়ন্ত ঐ কালীকেই সন্দেহ করে—

বলেন কি! বললাম আমি।

বললাম যে অত্যন্ত সন্দেহবাতিক ছিল তার।

With best Compliments from

National Standard Duncan Limited

★

31 NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

With Best Compliments of

Road Transport Corporation

14 TARACHAND DUTTA STREET

CALCUTTA-700001

325 BRANCHES, ALL OVER INDIA

PHONE 34-7105

তা ঘটনাটা exactly কি ঘটেছিল সে রাত্রে মিসেস চৌধুরী? প্রশ্ন করলাম আমি।

জয়ন্তকে বেশীর ভাগ সময়েই কাজের জন্য বাইরে বাইরে থাকতে হতো—সেই সময়টা বোধহয় মিঃ বটব্যাল আপনাকে কোম্পানী দিতেন! প্রশ্নটা করলো শৈবাল সেন।

naturally—বললেন মিসেস চৌধুরী।

তারপর—

বাইরে dutyতে গিয়েছিল একমাসের জন্য জয়ন্ত—হঠাৎ এক রাত্রে সে ফিরে এলো—কালী তখন আমার ঘরেই ছিল—অত রাত্রে কালীকে আমার ঘরে দেখে জয়ন্ত হঠাৎ যেন একেবারে ক্ষেপে উঠলো, কালীকে যাচ্ছেতাই করে বলে ঘর থেকে বার করে দিল—তারপর একটা চাবুক নিয়ে আমাকে পেটাতে শুরু করলো ঘরের দরজা বন্ধ করে—আমি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই।

তারপর—

হঠাৎ জ্ঞান ফিরে আসায় দেখি আমার বেডের পাশেই বেবী কটে শায়িত আমার ছয়মাসের শিশুপুত্রের মুখের উপরে একটা বালিশ চেপে ধরে আছে—

আমি চিৎকার করে উঠে তাড়াতাড়ি ছুটে যাই—বাধা দেওয়ার জন্য—কিন্তু সবই শেষ হয়ে গিয়েছে the poor child was already dead—মারা গিয়েছে।

How horrible! বললাম আমি—

আমি সেই রাত্রেই পুলিশকে ফোন করে দিই—

হঠাৎ আবার শৈবাল সেন প্রশ্ন করলেন হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে—ঘটনার ব্যাপারটা আমিও সংবাদপত্রে পড়েছিলাম—আপনি আদালতে বলেছিলেন রাত তখন সোয়া দশটা তাই না।

হ্যাঁ—

মিঃ চৌধুরী আপনার স্বামী সে রাত্রে এসেছিলেন তাহলে কখন, রাত তখন সাড়ে নয়টা হবে—

কিন্তু আপনি তো আদালতে exactly এখন যা বললেন তা বলেন নি বলেই যেন মনে পড়ছে মিসেস চৌধুরী শৈবাল সেন বললেন।

বলিনি মানে—আমি তাই বলেছিলাম আমার বানবন্দীতে—

না। আপনি বলেছিলেন—তিনি মানে আপনার স্বামী এসেছিলেন রাত সাড়ে এগারোটার পর—এবং আপনার স্বামী কালী বটব্যালকে ঐ সময় আপনার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখেই—

তা হবে—হ্যাঁ মনে পড়ছে তাই—সময়টা আমি গোলমাল করে ফেলেছি।

না—সময়টা আপনি গোলমাল করেন নি—

কি রকম? মিসেস চৌধুরী তাকালেন একটু যেন চকিত করেই শৈবাল সেনের দিকে—

আপনার statementই সেদিন আদালত accept করে নিয়েছিলো—আপনার স্বামীর statement আদালত সেদিন বিশ্বাস করে নি। তিনি সে রাত্রে রাত দশটাতেই এসেছিলেন বাড়ি—পালাম এয়ার পোর্ট থেকে সোজা কুতুবে—তার এয়ার পোর্ট থেকে ট্যাকসীতে আসতে ঠিক পয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল।

পাঁচ বছর আগেকার কথা তো ঠিক সব মনে নেই—মিঃ সেন আজ, মিসেস চৌধুরী বললেন।

মনে না থাকাই সম্ভব। কিন্তু রাত সাড়ে নয়টার পরেই যদি সে রাত্রে কোন এক সময় তার ছেলেকে বালিশ চেপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে থাকেন তো—আপনি সে রাত্রে সাড়ে বারোটার পর পুলিশে ফোন করেছিলেন কেন? ফোন করতে অতক্ষণ সময় আপনি নিলেন কেন! আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে। তা নয় মিসেস চৌধুরী—

তবে কি?

Actually মার্ডারটা হয় some time in between সাড়ে এগারোটা থেকে সোয়া বারটার মধ্যে তাই মন স্থির করে ফোন করেছিলেন আপনি পুলিশকে সাড়ে বারটার পর আর—

আর কি?

মিঃ চৌধুরী মানে আপনার স্বামী সে সময় আপনাকে চাবুক দিয়ে পেটাবার পর পাশের ঘরে বসে ড্রিংক করছিলেন—

কিন্তু আদালত বিশ্বাস করেছে জয়ন্তই আমাদের ছেলেকে হত্যা করেছিল—

করেছিল ঠিকই—তার কারণ তারা ভাবতেও পারেনি—কোন এক মা তার নিজের গর্ভের সন্তানকে ঐ ভাবে মুখে বালিশ চেপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করতে পারে—আর আপনিই যে হত্যা করেছিলেন তার আরো প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করেছে—

পুলিশ!

হ্যাঁ পুলিশ—আপনাদের বাড়ীর নীচের তলায় কাঞ্চন বলে যে বয় সারাক্ষণটা থাকতো—যাকে আপনি ঐ দিনই রাত্রে তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফেরার হয়ে যেতে বলেন—যে সমস্ত কিছু দেখতে পেয়েছিল, মামলার সময় যাকে পাওয়া যায়নি মাত্র মাসখানেক আগে সে মাদ্রাজের এক পলীতে ধরা পড়েছে—এবং সব সত্য statement সে দিয়েছে।

কে! কে আপনি—অস্ফুট চিৎকার করে ওঠেন মিসেস চৌধুরী—

আমি C. I. D.-র special officer—সঞ্জয় চক্রবর্তী—আজ ছয়মাস ধরে আপনার পিছনে পিছনে সর্বত্র আমি ছায়ার মতো ঘুরেছি—just to have a confession from you!

হেসে উঠলেন মিসেস চৌধুরী খিল খিল করে।

কিন্তু কে—কে বিশ্বাস করবে আপনার কথা—আমি সব কিছু deny করবো—

কোন লাভ হবে না তাতে কারণ এ ঘরে আগে থাকতেই বসানো একটা টেপ রেকর্ডারে সব টেপ করা হয়ে গিয়েছে—এখন মিসেস চৌধুরী—it was I —আমিই আপনার সুটকেশ থেকে "সেকোনলের" নতুন ফাইলটা সরিয়ে এনে ডাঃ গুপ্তের জিম্মায় রেখে দিই এবং আমিই স্টেশনে আপনাকে জানাবার ব্যবস্থা করি আপনার ঠিক পাশের ঘরেই ডাঃ গুপ্ত আছেন।

you filthy snake! গর্জে উঠলেন মিসেস্ চৌধুরী—

কিন্তু আপনি, আরও নিকৃষ্ট জীব—যে নারী নিজের হাতে তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করতে পারে স্বামীকে হত্যাপরাধে পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্য তাঁর যোগ্য বিশেষণ অভিধানেও পাওয়া যায় কিনা সঠিক সন্দেহ। চুরী করেছিলাম আপনার 'সেকোনলের' ফাইল যাতে করে নেশার জন্য আপনি আজ রাত্রে ডাঃ গুপ্তর শরণাপন্ন হন—তারপর সামান্য তিনটে ক্যাপসুল দিয়ে আপনার অবচেতন মনের পশুটাকে বার করে আনতে পারি—আপনার মুখ দিয়ে সত্য কথাটা বের হয়—আমার experiment সফল হয়েছে—আপনি trap-এ ঠিক পা দিয়েছেন—

হ্যাঁ—মিঃ চক্রবর্তী—it was I—আমি—আমিই ছেলেটাকে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে সে রাত্রে হত্যা করেছিলাম, কেবল জয়ন্তকে ফাঁসীকাঠে চড়াবার জন্য—কিন্তু সব যেন তারপরই কেমন গোলমাল হয়ে গেল মিঃ চক্রবর্তী—সব কিছুই যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আমার নিজের সেই হত্যাকাণ্ডটা যেন আমাকে ভূতের মতো তাড়া করে বেড়াতে লাগলো—মৃত সেই ছেলের মুখটা—ফুলের মতো সেই শিশুর মৃত মুখটা—যেন শয়নে স্বপনে আমার সমস্ত সত্তাকে পীড়ন করতে লাগল। মনের শান্তি গেল, চোখের ঘুম গেল, রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কাটতে লাগলাম—ঘুমের ঔষধ—পল্টে পাল্টে খেতে লাগলাম—দেশ ছাড়লাম—সমস্ত ইউরোপ ঘুরে আমেরিকা গেলাম—সেখানে পেলাম সেকোনল ক্যাপসুল "red dolls"-দের স্বাদ—and that gave me sound sleep at last—

ঘুমে এলো কিন্তু ক্রমশঃই ডোজটা বেড়ে চলতে লাগলো—

মিঃ চক্রবর্তী বললেন, সে সংবাদটা আমি অনেক আগেই সংগ্রহ করেছিলাম মিসেস চৌধুরী —কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাঃ গুপ্তের এখানে আগমন ও এই হোটেলে ওঠা এবং সবশেষে তার এতখানি সহযোগীতা না পেলে হয়ত আজও আপনাকে আমি ধরতে পারতাম না মিসেস চৌধুরী—

মিসেস চৌধুরী তখন মাথাটা নীচু করে বসে আছেন।

মাথাটা বুকের উপর যেন ঝুলে পড়েছে।

মিঃ চক্রবর্তী—

আমার ডাকে চক্রবর্তী আমার দিকে তাকালেন।

ওকে এবার একটু ঘুমাতে দিন—আর দুটো ক্যাপসুল ওকে দিই আমি—

দিন। চক্রবর্তী বললেন।

আরো দুটো ক্যাপসুল শিশি থেকে বের করে মিসেস চৌধুরীর দিকে এগিয়ে ধরলাম, নিন আপনার বাকী দুটো সেকোনল ক্যাপসুল।

মিসেস নীতা চৌধুরী আমার দিকে তাকালেন নিঃশব্দে তারপর হাত বাড়িয়ে ক্যাপসুল দুটো নিলেন।

জলের গ্লাসটা আমি এগিয়ে ধরলাম।

বাইরে শীতের রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে।

B C C L

helps him build his castles on solid ground

Humble little castles.....a shelter over his head.....education for his children...health and medicine for his family.....provident fund and financial benefits for the unknown future. To the coalminer, even these basics were visionary gleams.....airy.....untouchable three years back. He now enjoys the benefits of permanent employment. He can look on tomorrow, assured that his family will be well looked after and taken care of. These are the humble dreams of humble miner come true.

bharat coking coal limited
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Office : SIJUA
Dist. DHANBAD.

THE RAINS ARE OVER

And with it the perplexing heat. The land is now cool and colourful. Autumn—the Season of feasts and festivals is round the corner. And Autumn is the time when the birds from distant lands make ORISSA their destination - we mean—CHILIKA, the largest brackish water lake of the Country - acclaimed as the Beauty Queen of Nature - a dream of the past and a crase of the present. People, whether pleasure - seeker, holidayer, bird-watcher or nature-lover have found solace in her craddle - an experience you will love to live with.

So why give a second thought ? Let CHILIKA be your destination during this Autumn. Of course, we - the friends in need - are there to help you in deed. Just ring-up Rambha 44 or Cable 'Lakeview' or write to Tourist Officer, Rambha and our entire compliment will be there at your service.

●

Issued by : DIRECTOR OF TOURISM, GOVERNMENT OF ORISSA, BHUBANESWAR

হরিসাধন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

চঞ্চল ঘুম থেকে উঠেই দেখল চারদিকে একটা কালচে ভোর। সারারাত দামাল বাতাস কত মেঘ উড়িয়ে এনে জমা করেছে আকাশে। বৃষ্টির শেষ নেই। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে।

সকালবেলাতেও সেই একই রকম বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ছিপ ছিপ করে অনন্ত জলধারা পড়ছে। সামনের রাস্তাটা ঘোলা জলের মধ্যে ডুবে আছে। লোকজন নেই, একটা কাকও ডাকছে না কোথাও। কলকাতার এই শহরতলীতে সারা রাত ব্যাঙ ডেকেছে আনন্দে। এখনো ডাকছে। শুধু ঐ একটিমাত্র জীবের শব্দ শোনা যায়।

পুবের জানালাটা বন্ধ রেখেছে পূরবী। ওটা দিয়েই হাওয়ায় জলের ছাঁট এসে ঘর ভাসায়। কিন্তু ওদিকেই রয়েছে ব্যাঙ-ডাকা একটু ছাড়া জমি। আর তিনদিকে বাড়িটা আবদ্ধ। আলো-হাওয়া তেমন আসে না। একটা মাত্র ঘর, ঘরের পিছনে অল্প একটু ঢাকা বারান্দা। সেই বারান্দাতেই স্নান করে পূরবী, বারান্দার অন্য ধারে বাথরুম। এই হচ্ছে এক ঘরের ফ্ল্যাট। একতলায়।

পূরবী উঠে গেছে। ছেলে দুটোও উঠেছে। একমাত্র একা চঞ্চলই ছিল এতক্ষণ বিছানায়। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে একটা বিদেশী গোয়েন্দা গল্প পড়েছিল। দেরীতে শোয়ায় উঠতে দেরী। তবু এমন কিছু বেলা হয়নি। ঘড়ি দেখে চঞ্চল নিশ্চিন্ত হয়। সাতটা বেজে ছ মিনিট মাত্র।

পুবের জানালাটা খুলে একটু দেখে চঞ্চল। মাঠটা একটা হুবহু পুকুর হয়ে গেছে। কয়েকটা ভিখিরির মতো গাছ আছে, সেগুলোর গোড়ার অনেকখানি ডোবা। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে জানালাটা বন্ধ করে দেয় চঞ্চল। একসঙ্গে অনেক-

খানি হাওয়া ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় বুকটা কেঁপে উঠল। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আবহাওয়া। চঞ্চল একটা গেঞ্জী পরে নিয়ে বাথরুম ঘুরে এল।

—পূরবী, আজ খিচুড়ি নাকি?

ছেলে দুটো বাসি আটার রুটি খাচ্ছে বসে। বড়টার পাঁচ বছর, ছোটোটার তিন। দুজনেই ভারী বাপ-ভক্ত বলে চঞ্চলের একটু অহঙ্কার আছে। ছোটোজন বাপকে দেখে রুটি রেখে উঠে এসে হাঁটু ধরে ঊর্ধমুখে তাকায়। খুব কোলে উঠতে ভালবাসে। চঞ্চল তাকে কোলে নিয়ে দুগালে দুটো গভীর ভালবাসার চুমু খেয়ে ছেড়ে দিল—যা, রুটি খা।

পূরবী উত্তর দিচ্ছিল না। কড়াইতে কি একটা পুড়ে যাচ্ছে, সামলাতে ব্যস্ত। একটু অপেক্ষা করে চঞ্চল।

—কি গো? ফের সে জিজ্ঞেস করে।

—খিচুড়ি খাবে তো আগে বলোনি কেন? ভাত নাবিয়ে ফেললাম এইমাত্র।

চঞ্চল হতাশ হয়ে বলে—বলব কি! এই তো খিচুড়ির পক্ষে একটা আইডিয়াল দিন। একি আর বলে দিতে হয়!

—খিচুড়ি আমার সহ্য হয় না। অম্বল হয়ে যায়, জানো তো!

—ওঃ হ্যাঁ, তা বটে। চঞ্চল বলে।

বলে ঘরে এসে বিছানা তোলে। এ তার রোজকার কাজ। খুব নিখুঁত করে লণ্ডভণ্ড বিছানার চাদর পাট করে শলার কাঁটা দিয়ে ঝাড়ে, বালিশগুলো চাপড় মেরে তাদের আকৃতি ঠিক করে রাখে, একটা পুরোনো বেডকভারে নিখুঁত করে ঢাকে সব। একটাই ঘর, তাই বাইরের লোকজন এলে এ ঘরেই বসে। সবসময়ে গুছিয়ে রাখতে হয়। পূরবী বিছানা তুলতে পারে না। তুললে বেডকভার তেড়াবেঁকা হয়ে থাকে, বালিশের উচ্চতাগুলি সমান হয় না। তাই গত সাতবছর ধরে চঞ্চল এ কাজ করে আসছে। এই বিষয়ে সে প্রায় বিশেষজ্ঞ।

ঘরের একধারে গোটা তিনেক সস্তা বেতের চেয়ার, একটা পলকা সেণ্টার টেবিল, ঘরের অন্য ধারে আবার পূরবীর ঠাকুরের সিংহাসন, অন্য ধারে আলনা, খাটের নীচে ট্রাংকবাক্স, একধারে জায়গা জুড়ে বিশাল কিয়ের আলমারিটা। মোটামুটি এই হচ্ছে তাদের জাগতিক আসবাবপত্র।

বিছানা তুলে চেয়ারে বসে চঞ্চল চারদিকে বৃষ্টিপাতের চমৎকার অনুভূতিটি উপভোগ করছিল।

চা নিয়ে পূরবী এসেই বলল—আজ ঝি আসেনি।

—যা বৃষ্টি। না আসাই স্বাভাবিক। চঞ্চল বলে।

—সব নিজের হাতে করতে হচ্ছে। আজ বেশী বায়না কোরো না।

কখনো সখনো চঞ্চল এই সকালবেলায় আর এক কাপ চা চায়। সেইটির প্রতিই ইঙ্গিত করল নাকি পূরবী!

চঞ্চল বলে—না।

—আর চা খেয়ে বাজারে যাও। ঘরে একটা আলু পর্যন্ত নেই।

—বাজারে? চঞ্চল খুব ব্যথিত হয়।

—শুনলে তো, কিছু নেই।

—এই বৃষ্টিতে? বোড়ো বাতাসও বইছে প্রিয়তমা! একটু কনসিডার করো।

—তোমরাই খাবে, আমার কি? জলও বেশী ছিল না, কুড়িয়ে কাচিয়ে তিনরকম ডাল মিশিয়ে মুঠোভরও হয়নি। খিচুড়ি খেতে চেয়েছিলে, তাও হত না। কাঁচা লঙ্কাটাও নেই। বাজার না করলে খাবে কি?

চঞ্চল চা থেকে ঢেলে একটা কালোমতো চায়ের পাতা প্লেটে ফেলে ভ্রু কুঁচকে বলে—তা বটে।

—ছাতা নিয়ে যেও।

বিয়ের সাতবছর পর স্ত্রীর সঙ্গে আর কথা বলার মতো কিছু থাকে না। এইসব ছাড়া। তবু চঞ্চলের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। কথা বলতে সে বড় ভালবাসে।

—শোনো পূরবী, তোমার আর কিছু চাই

পূরবী খুব সুন্দরী নয়, কুৎসিতও নয়। ঐ একরকম। তবে তার স্বাস্থ্যটা ভাল। অসূর্যম্পশ্যে বড় একটা করে না। কে জানে কেন পূরবী কথা বলতে খুব একটা ভালবাসে না। সবসময়েই কিছু গম্ভীর থাকে। তার ফলে তন্ত্র গোমড়া মুখে এক ধরণের বাঙ্ময়তা দেখা যায়। সম্বন্ধ করে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের রাতেও তারা ছিল পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা আর অজানা দুটি নারী-পুরুষ। সেই অচেনার ভাবটা আজও রয়ে গেছে। যেমন, পূরবী আজও চঞ্চলের সামনে কাপড় ছাড়ে না, একসঙ্গে বাথরুমে ঢোকে না, এবং শোওয়ার পর বাতি না নেভালে কখনো মিলিত হতে চায় না। অর্থাৎ পূরবীর সম্পূর্ণ শরীরটা আজও ভাল করে নিরাবরণ অবস্থায় দেখেনি চঞ্চল। এখন অবশ্য সেসব ইচ্ছে মরে গেছে।

প্রশ্ন শুনে পূরবী অবাক হয়ে বলে—আমার আবার কি চাই!

—কিছু না?

—না। ভ্রু কুঁচকে পূরবী বলে।

—তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না? ধরো, জিলিপি বা তেলেভাজা! গয়ের সাবান, একটু সুগন্ধী, একটা ব্লাউজ বা শাড়ি।

পূরবী হাসল না। বলল—চাইবার কি আছে। এ বৃষ্টিতে হঠাৎ এসব কথা কেন?

—মনটা চাইছে, তোমাকে কিছু দিই। তুমি তো পানও খাও না যে জর্দা কিনে আনব এক কৌটো।

—আমার কিছু চাই না। বাজারে যাওয়ার কথা বলায় বিরক্ত হলে নাকি। আমার জন্য তো নয়, তোমাদের সংসারের জন্যই।

—আরে না, না। বিরক্ত হইনি।

—তাহলে ওসব বলছ কেন?

—এমনিই। দিনটা বেশ অন্যরকম। আমারও একটু অন্যরকম হতে ইচ্ছে করছিল, তাই বলা।

—তাড়াতাড়ি করো। আটটা বাজে।

চঞ্চল বলে—শোনো পূরবী, আজ অফিসে যাবো না।

—কেন, বৃষ্টির জন্য?

—হ্যাঁ।

—থেমে যাবে। এখনই তোড়টা অনেক কমে গেছে। বড় রাস্তায় বাস-ট্রাম চলছে, শব্দ পাচ্ছি।

—আমি আজ যাবো না।

—তোমার অনেকদিন কামাই হয়ে গেছে। গত মাসেই না বলছিলে তোমাকে একটা শো-কজ নোটিশ দেবে বলে অফিস থেকে শাসিয়েছে?

—তুমি অত কিছু মনে রাখো কেন পূরবী? আমার আজ ইচ্ছে করছে না।

—ইচ্ছে! ইচ্ছে তো মানুষের ঘাড়ের ভূত। ওটাকে বেশী পাত্তা দিতে নেই। চাকরিটা নিয়ে অত হেলাফেলা কোরো না।

চঞ্চল চেয়ে রইল। পূরবীও চেয়ে থাকে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে চলে যায়।

চঞ্চল ওঠে। বাজারের ব্যাগ টাগ নিয়ে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ে।

বাজারটা বেশ দূর। রাস্তা জলে ডোবা। লুঙ্গিটা কিছু ওপরে তুলে চঞ্চল জল ভেঙে হাটে। রবারের জুতোর মধ্যে জল ঢুকে ফচ ফচ করছে। পূরবী বলেছিল, জলের তোড় কমেছে। হয়তো তখন কমেছিল, এখন আবার তোড়ে পড়ছে। বাতাস এসে হাত থেকে ছাতাটা খসিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বাচ্চা ছেলের মতো বাতাস এখন ছাতাটা খসাতে পারলে আকাশে প্যারাসুটের মতো উড়িয়ে মজা দেখাবে। ছাতাটা খুলে রাখার

মানেও হয় না, কারণ জলের ছাট আশপাশ দিয়ে ঢুকে আগাপাশতলা ভিজিয়ে দিয়েছে।

বটতলার চায়ের দোকান থেকে সন্তু ডাকল —এই চঞ্চল!

ছাতাটা মুড়ে চঞ্চল উঠে এল দোকানে। ভারী আরামের জায়গা। উনুনের গরমে দোকান-ঘরটা তেতে আছে।

সন্তু তার বন্ধু। একই অফিসে চাকরি করে। এখনো বিয়ে করেনি, তাই সকাল বিকেল আড্ডা দেওয়ার অনেকটা সময় পায়।

সন্তু বলল—ঘানিগাছটায় বেশ জুতে গেছিস দেখছি।

—ঘানিতে সাতবছর হল, তোমারও দিন আসছে।

—দূর শালা, বিয়েই করব না। একটু আগে একটা লোক তোর বাড়ির ঠিকানা খুঁজছিল, পেয়েছে?

—না তো! বলে একটু উদগ্রীব হয়ে চঞ্চল বলে—কিরকম লোক?

—বুড়ো মতো। বেশ অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা।

—খুঁজছিল কেন?

—তা বলব কি করে! দুইয়ের এক বি বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করল, তোর নামও বলল। আমি দেখিয়ে দিলাম। যায়নি?

—না।

—তাহলে বোধহয় রাস্তায় তোর সঙ্গে ক্রসিং হয়েছে।

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে বলে—তাহলে তো দেখাই হত।

—না। বলে মাথা নাড়ে সন্তু—দেখা হত না।

—কেন?

—লোকটা গাড়ি করে এসেছে। গাড়ি থামিয়ে ডাইরেকশন নিয়ে চলে গেল।

—গাড়ি? খুব অবাক হয় চঞ্চল। গাড়ি করে কে আসবে? তাদের কারো কস্মিনকালে গাড়ি নেই। বলল—ট্যাক্সি?

—না রে। বিরাট পুরোনো গাড়ি। দামী জিনিস। তাই ভাবছিলাম, তোর আবার বড়লোক আত্মীয় কে এল!

—কি জানি বাবা! চঞ্চল ভাবিত হয়ে বলে—ফিরে যাবে নাকি!

—যাওয়াই উচিত।

চঞ্চল উঠছিল। উঠে বলল—না, অনেকটা এসে গেছি, বাজারটা করেই যাই। পারলে একটু মিষ্টি টিষ্টিও নিয়ে যাওয়া দরকার। কে এল!

খুব তাড়াহুড়ো করেই বাজার সারল চঞ্চল। মনটা কোথাও স্থির হচ্ছে না। কারো সঙ্গে দরাদরি পর্যন্ত করল না। বিস্তর জিনিসের কথা বলে দিয়েছে পুরবী, তার মধ্যে কয়েকটা কথা মনেও পড়ল না। আবার এমন কয়েকটা জিনিস কিনে ফেলল যার কথা পুরবী বলে দেয়নি।

বাড়িতে ফিরবার সময়ে দেখল, সিঁড়ির মুখে কালো একটা গাড়ি সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে ঢুকে দেখে, চমৎকার চেহারার ষাট-বয়সী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাদের ঘরের নিয়ম হল, জুতো সিঁড়িতে রেখে বাইরের লোক ঢুকবে। তারা বিনীতভাবে বহিরাগতদের কথাটা জানিয়ে দেয়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ লোকটা জুতো ছাড়েনি। ফর্সা রঙ, খুব চমৎকার ব্যক্তিত্বপূর্ণ গম্ভীর চেহারা, মোটা গোঁফ আর ভারী চশমা। বুদ্ধিতে মাখানো মুখ। পরনে খুবই মহার্ঘ জামা প্যান্ট। পাশে একটা জাপানী ছাতা। পাইপ খাচ্ছে।

চঞ্চল লোকটাকে চেনে না, তবু তাকে দেখেই লোকটা বলে উঠল—আপনার জন্যই বসে আছি। বাজারে গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যান, ওসব রেখে আসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

চঞ্চল ভিতরের বারান্দায় গিয়ে চাপা স্বরে পূরবীকে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার! কে বলো তো?

—আমি চিনি না। তোমার খোঁজ করল, বসিয়ে রেখেছি। তুমি চেনো না?

—না। গাড়ি করে এসেছে।

—গাড়ি? পূরবী অবাক।

—গাড়ি।

—গাড়িওলা লোক কেন?

—বুঝতে পারছি না।

—ভদ্রলোক ভীষণ গম্ভীর। কথা বলতে ভয় করছিল আমার। পূরবী বলে। তারও মুখে দুশ্চিন্তার ভাব, আবার উদগ্রীবতাও।

—দেখি। একটু চা দিও। বলে চঞ্চল ঘরে আসে।

বড় ছেলে বাবলু খাটের বিছানায় উঠে পড়তে বসেছে। আসলে বই খুলে হাঁ করে আগন্তুককে দেখছিল। ভদ্রলোক বাবলুকে কি যেন জিজ্ঞেস করছিলেন, বাবলু উত্তর দিচ্ছিল না।

বাবলু ঐ রকমই। লোকজনের সামনে ভীষণ মুখচোরা। এত মুখচোরা যে অনেকে চঞ্চলকে জিজ্ঞেস করেছে যে তার এই ছেলেটা বোবা কিনা।

চঞ্চল সামনে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক স্মিত-মুখ তুলে বললেন—আপনার ছেলে নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ মিষ্টি দেখতে। আপনি বসুন।

চঞ্চল বসে। মুখের অবাক ভাবটা এখনো যায়নি। বসে সে খুব অস্বস্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্ববান লোকটির কঠোর চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে।

লোকটির গলার স্বর চমৎকার। বেশ গম্ভীর, উচ্চারণ স্পষ্ট, শিক্ষিত ব্যক্তির এবং উচ্চসমাজের লোকের যেমন হয়, তেমনি।

—আপনিই তো চঞ্চল রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বর্গত অধীর রায়ের ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।

এই বলে ভদ্রলোক হাসলেন। খুব মজা ঝকঝকে দাঁত। হাসিতে বয়সের ছাপ পড়েনি।

চঞ্চল মৃদুস্বরে বলে—কি ব্যাপার বলুন তো!

ভদ্রলোক একটু অভিজাত উপেক্ষার স্বরে বলেন—আমি একজন আর্টর্নি, আমার নাম অবিনাশ সেনগুপ্ত।

নামটা শুনে চঞ্চলের কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। তবু আর্টর্নি কথাটা তাকে একটু ছুঁয়ে যায়। আর্টর্নি! তার মানে আইন, মামলা, সম্পত্তি, অনেক কিছু।

চঞ্চল বলে—ও।

ভদ্রলোক তেমনি উপেক্ষার স্বরে বলেন—আপনি কি কখনো শমীক চক্রবর্তী নামে কোনো লোককে চিনতেন?

শমীক চক্রবর্তী! খুব অবাক হয় চঞ্চল। নামটা তার স্মৃতিতে কোনো গুঞ্জন তোলে না। না সে চেনে না।

—না। বলে চঞ্চল।

—না চিনবারই কথা। বলে ভদ্রলোক তেমনি হাসলেন, মুখে একটা বুদ্ধির চকমকি জ্বলে উঠে নিভে গেল, বললেন কিন্তু নামটাও কখনো শোনেন নি?

—উনি কি বিখ্যাত ব্যক্তি? চঞ্চল অবাক হয়ে বলে।

না, না। খুব বিখ্যাত কেউ নয়। তবে উনি আমেরিকায় থাকেন, মাঝে মাঝে দেশে আসেন, প্রচুর টাকার মালিক।

না, চিনি না। ওরকম কোনো লোকের

ভদ্রলোক হাত তুলে তাকে থামান। বলেন—আমি জানি।

বলে পাইপটা আবার একটা গ্যাস লাইটারে ধরিয়ে নিলেন। খুব সুন্দর তামাকের গন্ধ পায় চঞ্চল।

ভদ্রলোক একটু স্বগত চিন্তা করলেন। ভ্রু সামান্য ভাঁজ হল, মুখ তেমনি গম্ভীর, চোখ দুটো ভারী চশমার ভিতর থেকে ঠিকরে আসছে তাদের তীক্ষ্ণতা এবং নিষ্ঠুরতায়।

অবিনাশ সেনগুপ্ত কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক? চঞ্চল ভাবতে চেষ্টা করল। তার নিজের জীবন খুবই সাদা মাটা। সে একটা রেল অফিসের মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যান। খুবই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন তার। এই জীবনে উচ্চ-সমাজের লোকজনের সংস্পর্শ বড় একটা ঘটে না। তাই তার অস্বস্তিটা গেল না।

ভদ্রলোক একটু নড়ে বসে বললেন—নামটা যদি না শুনে থাকেন তবে এখন আপনাকে নামটা মাঝে মাঝে শুনতে হবে।

—তার মানে? চঞ্চল সাতাকার বিস্ময়ের সঙ্গে বলে।

—শমীক চক্রবর্তী আমার মক্কেল।

এ কথাটাও বুঝল না চঞ্চল।

বলল—ও। কিন্তু—

—আমার মক্কেল আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করতে চাইছেন।

চঞ্চলের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে। শ্বাসকষ্ট হয়। অভিযোগ! তার বিরুদ্ধে অভিযোগ! কিন্তু জানত সে কারো ক্ষতি করেনি। আর শমীক চক্রবর্তীর নামও সে শোনেনি জীবনে।

—কিসের অভিযোগ? আমি তো কিছু করিনি—

ভদ্রলোক একটু যেন হতাশা আর ক্লান্তির স্বরে বলেন—ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত। আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন।

—হ্যাঁ। ভীষণ অবাক লাগছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিসের?

—শুনুন। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে বললেন—আপনার কি এই ঘরটা ছাড়া আর কোনো একলা রুম নেই?

—না। কেন? চঞ্চল ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে।

—আপনার সঙ্গে কথাটা খুবই কনফিডেন-শিয়াল। অন্ততঃ, আপনার ছেলেটার কানে কথা-গুলো যাওয়া উচিত নয়।

আরো ভয় পেয়ে যায় চঞ্চল। অস্বস্তিটা এক লাফে গলায় উঠে আসে। বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। শ্বাস কষ্ট হতে থাকে। বাইরে বাতাসের জোর বাড়ে। প্রচণ্ড বৃষ্টি চাবুক ছপাং ছপাং করে চারকাছে চারদিককে।

—একটা প্যাসেজ আছে ভিতরে।

—তাহলে—

বলে অবিনাশবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকান।

চঞ্চল ছেলের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে বলে—বাবলু, একটু মার কাছে যাও।

বাবলু চলে যায়।

অবিনাশবাবু প্যাসেজের দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—ওটা বন্ধ করে দিন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসে চঞ্চল।

বলে—বলুন এবারে।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ভেজানো দরজাটার দিকে চেয়ে থেকে বলেন—আজ থেকে প্রায় সাড়ে

আট বছর আগে আমার মক্কেল শমীক চক্রবর্তী একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন।

চঞ্চল শোনে, কিন্তু বুঝতে পারে না।

—বুঝলেন? অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন।

—হ্যাঁ। বিয়ে করেছিলেন।

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—ঘটনাটা খুব সাধারণ ছিল না। অর্থাৎ বিয়েটা প্রকাশ্যে হয়নি, হয়েছিল গোপনে।

—ও। না বুঝেই চঞ্চল বলে।

—মেয়ের ফ্যামিলি বা শমীক চক্রবর্তীর ফ্যামিলির কেউ জানত না।

—ও।

চঞ্চল যদিও কিছু জানে না এখনো, পরিষ্কার বুঝতে পারছে না কিছু, তবু তার বুকের মধ্যে একটা ভয় ফণা তোলে। কেন যেন মনে হয়, তার জীবনকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য কি একটা বিপদ আসছে।

অবিনাশ বলেন—তখন আমার মক্কেলের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রায় বেকার, এবং সমাজে তার কোনো স্ট্যাটাস ছিল না। তাই বিয়েটা করেছিল প্রচণ্ড রিস্ক নিয়ে। কিন্তু বিয়েটা ছিল সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ।

—ও। ফের বলে চঞ্চল।

—এবং আমার মক্কেলের সেই স্ত্রীর নাম ছিল পূরবী সমাজপতি।

এর চেয়ে একটা ঘুঁষি খেলেও চঞ্চল এতটা চমকে উঠত না। পূরবী সমাজপতি! এ তো পূরবীর নাম। ওদের বপের বাড়ির পদবী সমাজপতি।

—কি বলছেন?

ভদ্রলোক তাঁর চেয়ারের পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখা ব্রীফ কেসটা টেবিলের ওপর তুলে আনলেন।

কেসটা খুলতে খুলতে বললেন—অবশ্য প্রমাণ বা দলিলের জন্য চিন্তার কিছু নেই। ম্যারেজ সার্টিফিকেটের একটা কপি আমি সঙ্গে করে এনেছি। ও রিজিনালটা শমীকবাবুর কাছেই আছে।

বলে অবিনাশ নীলচে রঙের একটা মোটা কাগজ বের করে আনলেন। এবং সেটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন—দেখুন।

চঞ্চল হাত বাড়ায় না। শুধু বলে—ইমপসিবল।

অবিনাশের গম্ভীর মুখটায় একটু শোকের ছায়া পড়ল কি!

উনি একটু গভীর শ্বাস ছেড়ে বলেন—সরি। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। কোনো গোলমাল নেই।

—ইমপসিবল। চঞ্চল ফের বলে।

অবিনাশ হাসলেন, ব্যথিত হাসি। লোকটাকে এই প্রথম একটু সাধারণ মানুষ বলে মনে হল। উনি বললেন—আপনার বিস্ময়টা বুঝতে পারছি। কিন্তু—

চঞ্চল কাগজটা তুলে নেয়।

খুলে দেখে, কোনো গোলমাল নেই। ঠিক সাড়ে আট বছর আগেকার একটা তারিখে শমীক চক্রবর্তীর সঙ্গে পূরবী সমাজপতির বিয়ে হয়েছিল। তিনজন সাক্ষী আছে।

—এ হতেই পারে না। আমি এক্ষুনি বলে উঠে চঞ্চল পূরবীর কাছে যেতে চাইছিল।

ভদ্রলোক ফের হাত তুলে থামান বললেন—অত ব্যস্ত হবেন না।

—আমি এক্ষুনি—

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন—আপনার স্ত্রী অবশ্যই স্বীকার করবেন। কারণ অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু সে পরে হবে। আমার কথা আগে সেরে নিই, আমার সময় খুব কম।

চঞ্চল বসে পড়ে। তার প্রচণ্ড শীত করে। মাথা ঘোলাটে লাগে।

—বলুন। সে অন্যরকম গলায় বলে।

—এমন কি, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক-সঙ্গে বসবাসও করেছিলেন।

এক অতল খাদে তলিয়ে যেতে যেতে চঞ্চল দু হাত তুলে বলে—আপনি কি বলছেন?

ভদ্রলোক তেমনি বিচ্ছ হাসি হেসে বলেন-ঠিকই বলছি।

প্রমাণ?

—আছে।

বলে অবিনাশ ব্রীফ কেস থেকে এক গোছা ফটো বের করে আনেন। ফটোগুলো চঞ্চলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—দেখুন।

চঞ্চল দেখে।

প্রথম ছবিটায় এক অত্যন্ত সুপুরুষ এবং প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান ও গুণ্ডা চেহারার ছেলের পাশে ঘোমটা মাথায় পূরবী। দুজনেই ভারী হাসিখুশী। সেই হাসির মধ্যে খুব একটা তৃপ্তি ও সব পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে।

পরের ছবিটা আরো ঘনিষ্ঠ। এক বিশাল পেশীবহুল হাতে পূরবীকে পাঁজরের সঙ্গে চেপে ধরে আছে ছেলেটা। পূরবীর হাত তার ডান কাঁধের ওপর পিঠের দিক থেকে বেষ্টন করে উঠে এসেছে।

তৃতীয় ছবিটা সমুদ্রের ধারের বেলাভূমিতে। জল থেকে উঠে আসছে দুজনে। পাশাপাশি।

চতুর্থ ছবিটায় দেখা যাচ্ছে, দুজনে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়ানো। দুজনেরই বাইরে যাওয়ার পোশাক।

পঞ্চম ছবিটা আরো মারাত্মক। একটা বিছানায় তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অবশ্য পরণে জামাকাপড় রয়েছে, এবং কোনো অসভ্যতাও করছে না। শুধু শমীকের একটা হাত আলতো-ভাবে পিঠের তলা দিয়ে গিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে পূরবীকে।

আরো পাঁচ ছ'টা ছবি রয়েছে, সেগুলো আর দেখল না শমীক। ছবির গোছাটা ফিরিয়ে দিতে গেল।

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—দরকার নেই। ও সবই আমাদের কাছে আছে। আপনি বরং রেখে দিন।

—কেন?

—যখন এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন তখন এই ছবিগুলো আর ঐ সার্টিফিকেট থাকলে আপনার সুবিধে হবে।

চঞ্চল উত্তর দিল না। সে রেগে যেতে পারছে না, কেঁদে ফেলতে পারছে না। অথচ তার ভিতরে কি যেন একটা আবেগ ফুটছে। সে প্রচণ্ড জোরে চেয়ারের হাতল চেপে বসে থাকে।

অবিনাশ তার দিকে তাকালেন না। বোধ হয় তার অবস্থাটা অনুমান করে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন।

চঞ্চল সময় নিল। তারপর বলল—এখন কি করব?

অবিনাশ শ্বাস ফেলে বললেন -শমীকবাবু যখন বিয়ে করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিন বসবাস করেন—বলে অবিনাশ মৃদু একটু হেসে হঠাৎ নীচু গলায় বলেন—অবশ্য তখন রটে গিয়েছিল যে পূরবী দেবীকে নিয়ে শমীকবাবু পালিয়েছেন।

চঞ্চল উদগ্রীব হয়ে বলে—হ্যাঁ, তারপর?

—যা বলছিলাম, বিয়ের সময়ে শমীকবাবুর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

চঞ্চল শ্বাস চেপে চেয়ে থাকে।

অবিনাশ বলেন কিন্তু তারপর শমীকবাবু আমেরিকায় চলে যান। এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর টাকার মালিক হন। খুবই চতুর ব্যক্তি উনি, বুদ্ধিমান এবং যাকে বলে রুথলেস।

—তার মানে?

অর্থাৎ, কোনো বাধা মানেন না, কোনো অবস্থাকে গ্রাহ্য করেন না, এ ফাইটার ইন দি ট্রু সেন্স অফ দি টার্ম।

চঞ্চলের বুকটা কেঁপে ওঠে।

অবিনাশ বলেন—কেউ অপমান করলে শমীকবাবু তার প্রতিশোধ নিতে জানেন। ক্ষমা করেন না।

—না?

—না। অবিনাশ মাথা নাড়েন।

চঞ্চল আবার শ্বাস চাপে। বুকটা গুড়গোল করছে।

ঠিক এই সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে পূরবী ঘরে আসে। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, দু হাতে দু কাপ চা। পিছনে বাবলু, তার হাতে একটা চায়ের প্লেটে কয়েকটা বিস্কিট। বিস্কিটটা চঞ্চলই এনেছিল একটু আগে।

চায়ের কাপ দুটো রাখল পূরবী। অবিনাশ একবার আড়চোখে পূরবীকে দেখেই চোখ সরিয়ে নেন। ব্রীফ কেসটা সরিয়ে চা রাখার জায়গা করে দেন, এবং খুব নিপুণ দ্রুততায় ফটোগুলো আর সেই সার্টিফিকেটটা হাত চাপা দিয়ে রাখেন, যেন পূরবীর চোখে না পড়ে।

চঞ্চল এক অদ্ভুত চোখে পূরবীর দিকে তাকায়। এই পূরবী কি তার বৌ? না, অন্যের? আশ্চর্য, এতকাল একে নিজস্ব মেয়েমানুষ বলে ভেবে কত না নিশ্চিন্ত ছিল চঞ্চল! এখন পূরবীর দিকে চেয়ে তার বুকটা হাহাকার করে ওঠে। তাদের কি হবে?

পূরবী চলে গেলে ফের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে চঞ্চল। এসে বসে।

অবিনাশ চায়ের কাপ তুলে গোটা দুই অন্যমনস্ক চুমুক দিয়ে স্থায়ীভাবে কাপ নামিয়ে রাখলেন। এরকম কমদামী চা খেয়ে ওঁর অভ্যাস নেই, মুখ দেখেই বোঝা গেল।

—বলুন অবিনাশবাবু। চঞ্চল উদগ্রীব হয়ে বলে।

—উনি প্রতিশোধ নিতে জানেন। নেবেনও।

—কেন?

—উনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখনো পূরবী দেবীর সঙ্গে ওঁর প্রচুর চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছে। সেসব চিঠির কোথাও কোনো অবিশ্বস্ততার কথা ছিল না। বরং পূরবী দেবীর চিঠিগুলিতে স্পষ্টই প্রমাণ আছে যে উনি তখনো নিজেকে শমীকবাবুর স্ত্রী হিসেবেই বিচার করতেন।

চঞ্চল বলে—সেই চিঠিগুলি?

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—না, সেগুলি আমার কাছে নেই। তবে শমীকবাবু চিঠিগুলি সবই আমাকে দেখিয়েছেন। দরকার হলে সেগুলোর কপি করে আদালতে পেশ করা হবে। আপনিও চাইলে পেতে পারেন। তবে, সেগুলো আপনার না দেখাই ভাল।

—কেন?

—গোপন চিঠি। তাতে অনেক ইন্টিমেট কথাবার্তা আছে।

ও।

বলে শুকনো মুখে ঢোক গিলবার চেষ্টা করে চঞ্চল।

—অর্থাৎ, কোনোখানে কোনো গণ্ডগোল নেই। যা বলছিলাম শমীকবাবু আমেরিকায় থাকাকালীন হঠাৎ একসময়ে পূরবী দেবীর দিক থেকে চিঠি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

—কেন?

—সেটাই রহস্য। প্রায় বিনা কারণে পূরবী দেবী হঠাৎ তাঁর মা বাবার ইচ্ছেয় অন্য একজনকে বিয়ে করে ফেলেন। সেই ব্যক্তি আপনি।

চঞ্চল মাথা নাড়ে। বলে—কিন্তু কেন?

—কি কেন?

—ও আমাকে বিয়ে করল কেন? চঞ্চল অবাক হয়ে বলে—অত ভাল পাত্র থাকতেও আমাকে কেন শর্মীকবাবু তো রীতিমতো সাকসেসফুল লোক।

—সেইটাই রহস্য। বলে হাসলেন অবিনাশ।

—তার মানে?

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—আমরা কেনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। শর্মীকবাবু কয়েকটা চিঠি লিখে উত্তর পাননি। তারপর হঠাৎ এক বন্ধুর চিঠিতে সব জানতে পারেন।

—পূরবী খবর দেয়নি?

—না।

—কেন দিল না?

—আমরা সব প্রশ্নের উত্তর জানি না চঞ্চল বাবু। জানবার চেষ্টা করছি। চঞ্চল শূন্যে চোখে চেয়ে থাকে।

—শর্মীকবাবুও গত সাত বছর ধরে ভাবছেন।

—ও।

—অপমানটা ওর খুব বেজেছে। উনি পূরবী দেবীকে সত্যিই ভীষণ ভালবাসতেন।

চঞ্চল একটা গভীর শ্বাস ফেলল।

অবিনাশ পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে আবার তামাক ভরলেন। মিষ্টির প্লেটটা ছুঁলেনও না। প্রায় পুরো কাপ চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকে সেসব খাওয়ার কথা বলল না চঞ্চল। আপ্যায়ন করার মতো মনের অবস্থা নয়। তার নিজের কাপের চা-ও পড়ে আছে।

—আশ্চর্য! চঞ্চল বলে।

—হ্যাঁ. একটু বিস্ময়কর। বলেন অবিনাশ-বাবু।

—তারপর কি হল?

—পূরবীদেবী আর একজনকে বিয়ে করেছেন এই খবর পেয়ে. শর্মীকবাবু আমেরিকায় খুবই ভেঙে পড়েন। কারণ. পূরবীদেবীকে কেন্দ্র করেই তিনি তার জীবনটাকে গড়ে তুলছিলেন। দেশে ফিরে তিনি হয়তো কোনো একটা সময়ে পূরবীদেবীকে আমেরিকায় নিয়েও যেতেন সামাজিকভাবে বিয়ে করে।

—ও।

—কিন্তু তা হল না। পূরবীদেবী ওঁর প্রতি কিন্বস্ত থাকেন নি।

—হ্যাঁ।

—আপনি বোধহয় শর্মীকবাবুর অবস্থাটা চিন্তা করতে পারছেন!

—হ্যাঁ।

শর্মীকবাবু কিন্তু ব্যাপারটা কখনো ভুলতে পারেন নি। ভোলার মতো লোকও নন। ফটো দেখে লোকটিকে কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—হ্যাঁ। খুব বলিষ্ঠ লোক।

—শুধু বলিষ্ঠ নয়, বিপজ্জনকও। একসময়ে ওঁকে সবাই রাফিয়ান হিসেবেই জানত। অসম্ভব অ্যাগ্রেসিভ টাইপ, খুব জেদী, ভীষণ রাগী। আর তেমনি সেন্টিমেন্টাল।

ভয়ে বুক শুকিয়ে আসে চঞ্চলের। কেবল মাথাটা নাড়ল। বুঝতে পেরেছে।

অবিনাশ তার মাথা নাড়া দেখে হাসেন। বলেন- গত সাত বছরে বার দুই উনি দেশে এসেছিলেন। কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা করেন নি। হোটেলে ছিলেন. গোপনে পূরবী দেবী সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে ফিরে যান।

—তখন উনি দেখা করেন নি কেন?

—সেটা উনিই জানেন। বোধ হয় উনি দেখতে এসেছিলেন, যাকে পূরবীদেবী বিয়ে করেছেন সে ব্যক্তি ওঁর চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বা বেশী আকর্ষণকারী। বলেছি তো, উনি খুব জেলাস টাইপের লোক। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবাটাই ও ধরনের মানুষের স্বভাব।

—বুঝেছি।

—উনি গোপনে এসব জেনে ফিরে যান।

—এখন উনি কি চাইছেন?

—বলছি। সেটাও অদ্ভুত।

—বলুন।

—উনি দাবী ছাড়তে চাইছেন না।

—তার মানে?

—উনি আমেরিকা থেকে এসেই আমাকে কনট্যাক্ট করেন। অবশ্য আমি এদেশে ওঁর অ্যাটর্নি হিসেবে অনেককাল কাজ করছি।

—উনি কি চাইছেন সেইটে ভাল করে বলুন।

—উনি চাইছেন ওঁর স্ত্রীকে।

ঘরে বজ্রপাত হল নিঃশব্দে। শিউরে ওঠে চঞ্চল। তার দুটি ছেলে। বাবলু আর গাবলু। তার স্ত্রী। তার সংসার। সবই মিথ্যে হয়ে যায় যে!

কণ্ঠে বুক চেপে ধরে ককিয়ে ওঠে চঞ্চল—কি?

—উনি ওঁর স্ত্রীকে ফেরৎ চাইছেন।

—ওঁর স্ত্রী?

অবিনাশ পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বলেন—আইনতঃ ওঁরই স্ত্রী। সব প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। পূরবীদেবী আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে বাস করছেন। উনি বাইগামী করেছেন, অবিশ্বস্ততার কাজ করেছেন, কিন্তু আইনের চোখে ওঁর আগের বিয়েটা এখনো সিদ্ধ।

—আমার কি হবে?

অবিনাশ শ্বাস ছেড়ে বলেন—শুনুন চঞ্চলবাবু। অবস্থাটা খুবই জটিল। এ সময়ে আপনি বুদ্ধি স্থির রাখুন। হুট করে কিছু করবেন না।

—কি করব?

—আপনি যাকে নিজের স্ত্রী বলে জানেন তিনি আসলে পরস্ত্রী।

—না, না।

—হ্যাঁ। আইনের চোখে তাই।

—কিন্তু ওর বাবা আমার হাতে ওকে সম্প্রদান করেছিলেন।

—সেটা বেআইনী হয়েছিল।

—আমরা সাতবছর ঘর করেছি।

—তাও বেআইনী।

আমাদের দুটো ছেলে!

—ওরাও বেআইনী সন্তান। একটা বিয়ে থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে কিছুতেই আইনসিদ্ধ নয়।

চঞ্চল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তার সামনে যেন একটা কংক্রীটের দেওয়াল। আর পথ নেই।

—আমরা কি করব অবিনাশবাবু?

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—শুনুন চঞ্চলবাবু, মনটাকে শক্ত করুন।

—মন! বলে এই প্রথম হাসল চঞ্চল। অদ্ভুত একটা মড়ার হাসি।

ভ্রূ কুঁচকে অবিনাশ বলেন- আমি এ নিয়ে শমীকবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি ওঁকে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

—তাতে কি হয়েছিল?

অবিনাশ মাথা নেড়ে বলেন—উনি অসম্ভব জেদী। একবার যা স্থির করেছেন তার আর নড়চড় হওয়ার নয়। উনি ওঁর স্ত্রীকে ফেরৎ চান।

—ফেরৎ?

—ফেরৎ।

—কি হবে ফেরৎ নিয়ে! পূরবী যে সাতবছর ঘর করেছে, সন্তানের মা হয়েছে—

—তা জানি না। উনি ফেরৎ চান।

—না পেলে?

অবিনাশ হাসেন। বলেন—জোর করবেন না চঞ্চলবাবু। প্রথমতঃ, আইন ওঁর সহায়। তাছাড়া ওঁর অন্যরকম মিনস্‌ও আছে। ইচ্ছে করলেই উনি পূরবীদেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

KALINGA TUBES LIMITED

Regd. Office & Works :

CHOUDWAR, CUTTACK ORISSA

44, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, CALCUTTA-700071

44-4331 (Five Lines) Telex : 021-7940 Cable : **CALTUBES**

First in India

To Produce & Export Steel Tubes for WATER, GAS & STEAM

Only Manufacturers in India :

Step-Drawn one piece Steel Tubular Poles for POWER TRANSMISSION AND STREET LIGHTING

AHMEDABAD, BOMBAY, DELHI & MADRAS

With best Compliments from :

'G A N E S H'

MUSTARD OIL

PRAG OIL MILLS—ALIGARH

★

Calcutta Depot :

STRAND ROAD

Jetty No. 1 Calcutta-1

M/s. Process Machinery & Equipments Privated Limited

⊡

8-A, Shyama Prosad Mukherjee Road, Calcutta-700025

—ও।

—ওর সে ক্ষমতা আছে। আপনি কিছুতেই পূরবীদেবীকে আটকে রাখতে পারবেন না।

—উনি কি করতে চান?

—উনি আমাকে কাজটা নেগোশিয়েট করতে বলেছেন। উনি কোনো অলটারনেটিভ ব্যবস্থায় রাজী নন। যে কোনো মূল্যে, যে কোনো উপায়ে উনি পূরবীদেবীকে অবশ্যই ফিরিয়ে নেবেন।

—তারপর?

—উনি সস্ত্রীক আমেরিকায় ফিরে যাবেন। সেইরকম সব ব্যবস্থাও করে এসেছেন।

—যদি পূরবী যেতে না চায়?

—চাইবেন না, সেইটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর চাওয়া বা না চাওয়ার কোনো মূল্যই নেই। শমীকবাবু ফোর্স করবেন। কোনো বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কেসটা খুব ইজি।

—যদি ডিভোর্স করে?

অবিনাশ হাসলেন, বললেন—তারও আগে তাহলে অ্যাডালটারী আর বাইগামীর জন্য পূরবীদেবীর নামে মামলা হবে, অসম্ভব স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া, ডিভোর্স করার চেষ্টা করলেও বেআইনী রাস্তা আছে। শমীকবাবু এই বেআইনী ব্যবস্থাই বেশী পছন্দ করেন।

—তার মানে?

—ধরুন, কয়েকজন বাজে গুণ্ডা লোক লাগিয়ে উনি যখন তখন কিডন্যাপ করতে পারেন আপনার স্ত্রীকে। অথবা, বাচ্চাদের কাউকে চুরি করে হোস্টেজ হিসেবে আটকে রাখতে পারেন, আপনাকে ব্ল্যাক ম্যাণ্ডেল করতে পারেন। সোজা কথা, ওঁর হাতে ক্ষমতা প্রচুর। আইন বা বেআইন —যে কোনো উপায়ে উনি ওঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেনই। ইউ অর এগেইনস্ট ভেরী স্ট্রাচ অডস।

—ও।

—তাই বলছি বাধা না দেওয়াই ভাল।

চঞ্চলের মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সে বলে—তবু তা কি করে হয়?

—হয়। আপনি জানেন না, কিন্তু হয়।

—উনি কি পূরবীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করবেন এরপর?

—ঠিক তাই।

—কেন?

—বোধ হয় উনি পূরবীদেবীর ভালবাসা কেন হারিয়েছেন তা বাকী জীবনটা ওঁর ভিতরে খুঁজে দেখবেন।

—আর আমার ছেলে দুটোর কি হবে?

অবিনাশ হাত উল্টে অসহায়ভাবে দেখিয়ে বললেন—সেটা আপনাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। পূরবীদেবী চাইলে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যেতে পারেন।

—না। বলে চেঁচিয়ে ওঠে চঞ্চল।

—না হলে, আপনার কাছেও ওরা থাকতে পারে। আপনাদের যা ইচ্ছে।

চঞ্চল মাথা দু হাতে চেপে ধরে বলে—আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। লোককে আমি কি বলব?

—লোকের জন্য ভাববেন না। আপনারা বরং একটা নকল ডিভোর্সের মামলা করুন। আমরা ইন্টারফিয়ার করব না। আর আমিই সে মামলা চালাব। দু পক্ষই রাজী থাকলে কোনো অসুবিধে হবে না। পূরবীদেবীর আগের বিয়ের প্রসঙ্গও উঠবে না। ডিভোর্সের পর পূরবীদেবী শমীক-বাবুর সঙ্গে চলে যাবেন। কোনো তেমন স্ক্যান্ডাল হবে না। এমন কি পূরবীদেবীকে আদালতেও যেতে হবে না, অন্য একজনকে ওঁর হয়ে দাঁড় করাবো।

—সব ঠিক করা আছে?

—সব। আমরা আপনাকে অসুবিধেয় ফেলতে চাই না। তবে, গণ্ডগোল করলে আপনাকে খুবই

বিপদে পড়তে হবে। এটা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না?

—না। আমি বুঝতে পারছি।

—আর, আপনি যদি কিছু কমপেনসেশন চান তাহলে আপনার জন্য একটা চমৎকার গিফটে প্যাকেট তৈরী রেখেছেন শমীকবাবু।

—কি?

—নগদ দশ হাজার টাকা।

—টাকা?

—টাকা। দশ হাজার। নগদ।

—টাকা দিয়ে কি হবে?

—কত কিছু হয়। হাসেন অবিনাশ।

—পূরবীই থাকবে না, টাকা দিয়ে কি হবে?

—ইটস এ শক। আমি জানি। তবু বলি, মেনে নিন। পুরুষমানুষ, এরপর একটা বিয়ে করবেন ভাল দেখে। ভুলে যেতে দেরী হবে না।

'ভাল দেখে' কথাটা খট করে লাগল চঞ্চলের কানে। কিন্তু কিছু বলল না, সত্যিই তো, পূরবী ভাল মেয়ে ছিল না!

—আমি শমীকবাবুকে গিয়ে কি বলব? অবিনাশ বলেন।

—একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। দুদিন সময় দিচ্ছি।

—আমি শমীকবাবুর সঙ্গে দেখা করব। বলে উঠতে যাচ্ছিল চঞ্চল।

অবিনাশ মাথা নাড়লেন—না। সে উপায় নেই।

—কেন?

—উনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

—কেন?

—টু অ্যাভয়েড কমপ্লিকেসিজ।

—ও।

—আপনি এর মধ্যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। ওঁকে রাজী করান।

চঞ্চল একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কিছু বলল না।

—আমি উঠছি। একটা কার্ড রেখে গেলাম, আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর রইল। জানাবেন, পরশু দিন পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। তারপর উই উইল বি বিজি টেকিং অ্যাকশনস।

—অ্যাকশনস?

—অ্যাকশনস। উপায় নেই। চলি।

অবিনাশ চলে গেলেন।

—শূন্য ঘর।

সামনে একটা দেয়াল।

পথ নেই।

অনেক রাত হয়েছে। ছেলেরা অঘোর ঘুমে। এখনো বৃষ্টি পড়ছে অল্প স্বল্প। বাতাস দিচ্ছে। চঞ্চলের পাশেই শুয়ে আছে পূরবী। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে! সারাদিন পূরবীর সঙ্গে প্রায় কথাই বলেনি চঞ্চল। পূরবী এখনো কিছুই জানে না। সারাদিন চঞ্চল কত কি ভেবেছে!

গভীর রাতে চঞ্চল খুব আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকে—পূরবী।

—হ্যাঁ। সম্পূর্ণ জাগ্রত পূরবী উত্তর দেয়।

—ঘুমোও নি?

—না।

—কেন?

—তুমিও তো ঘুমোও নি। পূরবী বলে।

—আমি একটা ভীষণ সমস্যায় পড়েছি। সেইজন্য ঘুম আসছে না।

পূরবী শান্ত স্বরে বলে—আমারও একই সমস্যা। তাই ঘুমোই নি।

চঞ্চল একটু চুপ করে থাকে হতভম্ব হয়ে।

উঠে বসে বলে—তবে কি তুমি জানো?

—জানি। দরজার ওপর কান পেতে শুনেছি।

—ও।

—সব সত্যি।

—চঞ্চল একটু কাশল, বলল—কি সত্যি?

—শমীকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।

—সারাদিন বলোনি কেন?

—কি বলব? একটু শ্বাস ছেড়ে পূরবী বলে—সারাদিন তোমার শুকনো মুখ দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল।

—তাই কথা বলোনি?

—হ্যাঁ। এখন আজ তুমি দু বেলাই খুব কম ভাত খেয়েছো, আমি তবু সাধাসাধি করিনি। তোমাকে ভাবতে দিয়েছি।

চঞ্চল হঠাৎ দু হাতে পূরবীকে টেনে নিয়ে বলে—কি হবে পূরবী?

পূরবী কাঁদছিল। ফুঁপিয়ে উঠছে সমস্ত শরীর। কাঁপছে।

স্খলিত গলায় পূরবী বলে—শোনো।

—কি?

—শমীক ঠিক ওরকমই, যেমন ঐ ভদ্রলোক বলে গেলেন।

—অ্যাগ্রেসিভ?

—ভয়ঙ্কর অ্যাগ্রেসিভ। ও যা চায় তাই পায়।

—তুমি ওকে বিয়ে করেছিলে কেন পূরবী?

—ঐ কারণেই। তখন ওকে খুব পুরুষ-মানুষ বলে মনে হয়েছিল?

—তারপর?

—তারপর আমার বয়স হল, বুদ্ধি খুলল দেড় বছর বাদে। আমি বুঝলাম, ওকে ভালবাসা যাচ্ছে না।

—কেন?

—কি জানি কেন! তোমাকে আমার জীবনে জড়িয়ে ফেললাম।

—হুঁ।

—সব জট পাকিয়ে গেছে।

—কি করব পূরবী। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পূরবী অনেকক্ষণ কাঁদল। তাকে কাঁদতে দিল চঞ্চল।

একসময়ে পূরবী বলল—তোমার বিপদ জেনে আমি চুপ করে থাকতে পারি না। আমি ওর সঙ্গে না গেলে ও অনেক ঝামেলা করবে।

—হ্যাঁ পূরবী। ওর অনেক ক্ষমতা। আইনও ওর পক্ষে।

—জানি। তাই ভাবছি—

—কি ভাবছো?

—আমি বরং যাই।

—যাবে? তাই কি হয়?

—তাহলে কি করব? যদি তোমাকে মারে, বা ছেলেদের চুরি করে! মাগো, ভাবতে পারি না।

—তুমি আমার বৌ, না পূরবী?

—হ্যাঁ।

—তবে কেন যাবে?

—যেতে চাইছি নাকি? তবু তো যেতে হবেই। নইলে—

—নইলে—

চঞ্চল জানে। পূরবীও জানে।

ঘরময় অন্ধকার। আস্তে চঞ্চলের হাত অবশ হয়ে গেল, বক্ষলগ্না পূরবী সরে গেল। বলল—শোনো।

—বলো।

—আমরা বড় অসহায়। খুব দুর্বল।

চঞ্চল মাথা নাড়ল। বলল—ঠিক কথা। আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

—তাই বলি, তুমি ওকে বাধা দিও না।

—দেবো না পূরবী। শুধু জিজ্ঞেস করি, তোমার কি হবে? আমারই বা ভবিষ্যৎ কি?

—কি জানি।

ওরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। কথা বলে না। পরস্পরের জেগে থাকাটুকু অনুভব করে। পূরবী কাঁদছে তো কাঁদছেই।

—আমরা বড় তুচ্ছ মানুষ, না পূরবী? চঞ্চল বলে।

—বড্ড গো।

—কেঁদো না পূরবী।

—একটু কাঁদতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

—এরপর তো কাঁদবেই। দিন আসছে।

—কাঁদবো? না, কাঁদবো কেন? কান্নার কারণ থাকবে না।

চঞ্চল একটু হাসল। বুঝল। বলল—মরার কথা ভাবছো? ছিঃ।

—সকলেরই মরার অধিকার থাকে।

—না পূরবী। তা হয় না।

পূরবী নীরবে কাঁদে।

চঞ্চল চুপ করে থাকে। চোখ ভরে জল আসে।

—শোনো। চঞ্চল একসময়ে ডাকে।

—কি?

—আমার হাতটা ধরো।

পূরবী ধরল। বলল—কি গো? কিছু বলবে?

—না পূরবী। কি বলব!

—আমার ওপর তোমার রাগ হয় না! ঘেন্না হয় না! আমাকে মারতে ইচ্ছে করছে না তোমার?

—না। শুধু ভাবছি, তোমাকে আমি কি ভীষণ ভালবাসতাম!

তার মুখে পূরবী হাত চাপা দিয়ে বলে—বোলো না ওরকম! আমাকে আর কষ্ট দিও না। বরং একটু ঘেন্না করো।

চঞ্চল মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে ধরে থাকে নিবিড় হাতে। বলে—চিরকাল তো কেউ থাকে না। জীবনটা ক্ষণিক বলেই সুখের।

—আমাদের আর সুখ কি?

চঞ্চল অনেকক্ষণ বাদে বলে—তোমার সঙ্গে সাতবছর থেকে তোমার অস্তিত্ব প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আমার অভ্যাসজাত স্ত্রী হয়ে গিয়েছিলে। সুখটা কি জানো!

—কি?

—সুখ এইটুকুই যে ইঠাৎ আজ বুঝতে পারছি, তোমাকে কি ভীষণ ভালবাসতাম! কি ভীষণ! এটা কি কম হল পূরবী?

কামনার বলি

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

অরূপ চৌধুরী এক সময় বিরাট বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারী চলে যাবার পর এখন কেবল তাঁর আয় বাড়ীভাড়া থেকে। কলকাতা শহরে তাঁর পনর খানা বড় বাড়ী আছে। মাসে দশ হাজারের মত ভাড়া আসে। তিনি যে বাড়ীতে থাকেন সেখানে ঠাট-বাট সেই পুরানো দিনের মতই আছে।

এই অরূপ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে অনুপ চৌধুরীর বিয়ে হয়ে গেল অনেক ধুমধাম করে পলাশপুরের বনেদী বংশের রসময় বোসের একমাত্র মেয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে।

অনুপ চৌধুরী পৈতৃক সম্পত্তির দেখা-শোনা করত। বিয়ের সময় শ্রীলেখা বা তার বাবা জানতে পারেনি যে অনুপ একজন মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র ছিল। বিয়ের কয়েকমাস পরেই শ্রীলেখা জানতে পারল। জানবার পর থেকেই অনুপকে এই অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা করতে লাগল শ্রীলেখা।

প্রায় এক বছর কেটে গেল। অনুপের কোন পরিবর্তন হোল না।

শ্রীলেখার একটা দাঁতে পোকা ধরা ছিল। সেই দাঁতের গোড়ায় একটা অসম্ভব যন্ত্রণায় তার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসায় কোন ফল না হতে তাকে তার বাবা কয়েকদিনের জন্যে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিচিত এক দাঁতের নামকরা ডাক্তারকে দেখালেন। এই ডাক্তার তাঁদের পরিবারের নিয়মিত চিকিৎসা করতেন। তিনি শ্রীলেখার এই তখনই ঠাকুরমশাইকে ডেকে ভাল দিন দেখতে দাঁত লাগিয়ে দেন।

সুস্থ হয়ে শ্রীলেখা আবার তার স্বামীর কাছে চলে যায়।

অনুপের স্বভাব কিন্তু আগের মতই আছে। আজকাল আবার মাঝে মাঝে সে রাত্রে বাড়ী থাকে না। শ্রীলেখার সঙ্গে তার প্রায়ই কোন না কোন কারণে ঝগড়া হয়। একদিন, কখনও বা দুই-তিন দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ থাকে।

একদিন হঠাৎ অনুপ নিজেই শ্রীলেখাকে বলে—চল শ্রীলেখা আমরা দিনকতক কোন জায়গায় বেড়াতে যাই। এখানে আর এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না। চল মাসখানেক আমাদের শিমুলতলার বাড়ীতে যাই। তোমার খুব ভাল লাগবে। কাছেই একটা ছোট পাহাড়ে নদী আছে। যদিও এতে জল বেশী থাকে না কিন্তু বারো মাস জল থাকে একেবারে কাঁচের মত পরিষ্কার। এই পাহাড়ে নদীর ধারে আমার বেড়াবো সকাল সন্ধ্যে। কোথা দিয়ে দিন কেটে যাবে কেউ জানতে পারবে না। বাড়ী থেকে মাইল চারেক দূরে একটা ছোট পাহাড় আছে। আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে মনে হয় যেন কত কাছে কিন্তু একঘণ্টা লাগে সেখানে পৌঁছোতে। চল বেশ আনন্দে সেখানে কিছুদিন থেকে আসা যাবে।

অনুপের মনের এই পরিবর্তন দেখে শ্রীলেখার মনে খুব আনন্দ হোল। সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললে—আমারও খুব ইচ্ছে ঐ রকম কোন জায়গায় কিছুদিন থাকবার। আমি যাব। কবে আমাদের যাওয়া হবে?

—যত তাড়াতাড়ি হয়। আমি মাকে বলে ঠাকুরমশাইকে দিয়ে দিন দেখাই। যদি কালই ভাল দিন হয় আমরা কালই যাব। তুমি সেইভাবেই তৈরী থাক।

যথাসময়ে অনুপের মা সৌদামিনীর কানে কথাটা পৌঁছল। তিনি মনে মনে খুব খুশী হলেন। অনুপের সব খবরই তিনি রাখতেন। শিমুলতলায় যাবার প্রস্তাবে তিনি ভাবলেন যে, অনুপ তাহলে কুঅভ্যাস ছেড়ে দেবে এবার। তিনি তক্ষুণি ঠাকুরমশাইকে ডেকে ভাল দিন দেখতে বললেন।

ঠাকুরমশাই পাঁজি দেখে অনেকক্ষণ পরে

বললেন—দেখুন মা, একটা দিন আছে কাল। সারা দিন, রাতই যাত্রার পক্ষে প্রশস্ত আর তা নাহলে সাতদিন পরে একটা দিন আছে। কালকের দিনটা কিন্তু খুব ভাল।

সৌদামিনী বললেন—বেশ কালকেই ভাল। আমি কর্তাকে বলব। আপনি সরকারমশাইকে একটু খবর দিন যেন এখনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন।

'আচ্ছা মা' বলে ঠাকুরমশাই চলে গেলেন।

পরদিন শ্বশুর, শাশুড়ীকে প্রণাম করে শ্রীলেখা তার স্বামীর সঙ্গে শিমুলতলায় যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে চলল তাদের বিশ্বাসী চাকর বেহারী।

(২)

শিমুলতলায় পৌঁছে শ্রীলেখার মনে আনন্দের সীমা নেই। অনুপ যেমন যেমন বলেছিল সমস্তই সেইরকম। ঘরের জানলা দিয়ে দূরে পাহাড় দেখা যায়। বাড়ীর কাছেই সেই পাহাড়ে নদী। রাত্রে নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরে শুয়ে নদীর জলের কুলুকুলু শব্দ পাওয়া যায়। এখানে অনুপকে সব সময় এত কাছে পেয়ে শ্রীলেখা ভাবে, একমাস না, আরও বেশীদিন এখানে থাকবে, অনুপকে আর কলকাতায় সেই বদসঙ্গে ফিরতে দেবে না। কলকাতায় ফেরার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। এইখানে সে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে যদি অনুপ কাছে থাকে।

এইভাবে চলতে থাকে দিন। রোজ সকালে শ্রীলেখা অনুপের সঙ্গে বেড়াতে যায়। প্রথমে প্রথমে শ্রীলেখা বেশী হাঁটতে পারত না কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে বেশ হাঁটতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। তারই কথামত অনুপ তাকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। রোজ একটু বেশী দূর যাবার চেষ্টা করে। ক্রমে ক্রমে বেশী রাস্তা হাঁটতে শ্রীলেখার কষ্ট হয় না। পনের-বিশ দিনের চেষ্টায় একদিন পাহাড়ের ওপর উঠল। পাহাড়ের ওপরে উঠে ঠান্ডা হাওয়ায় সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল। পাহাড়ের ওপরে একটা সমতল জায়গায় শ্রীলেখা অনুপের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। পরিশ্রমে তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ শ্রীলেখা চোখ বুজে শুয়ে রইল। অনুপ অন্যমনস্ক হয়ে আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে শ্রীলেখা বললে—আমাদের বাড়ীটা যদি এই পাহাড়ের উপর হোত তাহলে কি মজাই হোত! এখান থেকে আমার আর ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। দেখ দূরের ঐ জঙ্গলটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ঐ জঙ্গলের ওপারে কোন লোক থাকে?

যেন চমকে উঠে অনুপ উত্তর দেয়—হ্যাঁ, ওখানে জংলী লোকেরা থাকে। ওরা অনেকটা বেদের মত। বনে জঙ্গলে শিকার করে, পাখী মারে। মধ্যে মাঝে আসে ধনেশ পাখীর তেল, উদের গলায় নলী, শজারুর কাঁটা আরও কত কি বিক্রী করবার জন্যে শহরে।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা উদের নলী কি কাজে লাগে?

আমি অন্যান্য গুণ জানি না তবে একটা গুণ সম্বন্ধে শুনেছি যে মাদুলী করে ধারণ করলে অতি শীঘ্র চাঁদের মতন ছেলে হয়।

—যাও। তোমার মত ফাজলামী। আমার এই জায়গাটা কিন্তু বড় ভাল লাগছে। এইখানে যদি একটা ঘর থাকত। আমি আমার সারাজীবন এইখানে তোমার সঙ্গে থাকতুম। কি বল? তোমার ভাল লাগে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল লাগে বৈকি। তবে এখন চল, এর পর রোদ্দুর বেশী বাড়লে চলা শক্ত হবে। নাও উঠে পড়।

—হ্যাঁ চল, বেহারীদা আবার ভাববে।

অনুপের হাত ধরে ধরে শ্রীলেখা উঠে দাঁড়ায় তারপর কাপড় ঠিক করে নিয়ে দুজনে হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে আসে আর পথ চলতে থাকে। এতটা রাস্তা যাওয়া আসায় শ্রীলেখা অত্যন্ত পরি-

শ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাড়ীর সামনে গেটের কাছে বেহারী চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের এত দেরীতে আসতে দেখে অভিভাবকের মত কৈফিয়ত চায়।

শ্রীলেখা বলে—জানো বেহারীদা, আজ আমরা ঐ পাহাড়টাতে গিয়েছিলুম, কি সুন্দর জায়গা। বড্ড পরিশ্রম হয়েছে।

বেহারী অবাক হয়ে বলে—অতদূর পাহাড়ে গিয়েছিলে? ও তো অনেকদূর। খোকাবাবু তুমি ভাল করোনি। আসবার সময় মা আমাকে বারে বারে বলেছেন যেন তোমরা বেশীদূরে না যাও। আজ যা গেছ গেছ, আর যেওনি। ওদিকে বদমায়েস লোকেরা থাকে। কেন আর কি বেড়াবার জায়গা কোনখানে নেই। এতদূর রাস্তা হাঁটা তোমার অভ্যেস নেই দিদিমণি, আর তুমি যেওনি বাপু।

—না না বেহারীদা, আমি বেশ হাঁটতে পারি, আমার তেমন কষ্ট হয় না।

—না, কষ্ট হয় না, আমি বুঝতে পারিনা না? তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমি কালকেই বাড়ী ফিরে যাব আর মাকে বলে দেব তোমাদের কথা।

শ্রীলেখা কৃত্রিম ভয়ে বলে—না বেহারীদা, আমরা আর যাব না, তুমি কলকাতায় ফিরে যেও না।

এই উত্তরে বেহারী খুব খুশী হয়ে বললে—এই তো লক্ষ্মী দিদিমণি। তুমি আর খোকাবাবুর কথামত অতদূরে যেওনি। কাছে কাছে বেড়াতে যাবে। অতদূরে কোন বিপদ হলে আমি জানতেও পারব নি, কোন কাজেও লাগব নি।

বেশী পথ চলার জন্যে শ্রীলেখার গায়ে বেশ ব্যথা হওয়ায় সে এর পর তিন দিন আর বেড়াতে গেল না। অনুপ একলাই যেত রোজ ভোরে আর বেশ বেলা করে আসত। শ্রীলেখা লক্ষ্য করত অনুপ যেন সব সময় অনামনস্ক থাকে। শ্রীলেখা ঠিক বুঝতে পারে না। তিনদিন পরে শ্রীলেখা আবার বেড়াতে আরম্ভ করল। বেশী দূরে আর যেত না। বেহারীর কথা তার কানে সব সময় বাজত—"অতদূরে কোন বিপদ হলে আমি জানতেও পারবনি আর কোন কাজেও লাগবনি।"

কয়েক দিনের মধ্যে বেহারীর কথা শ্রীলেখা একেবারে ভুলে গেল। একদিন বেশ ভোরে অনুপের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় শ্রীলেখা বললে—চল আজ একবার পাহাড় থেকে ঘুরে আসি। ওখানে যেতে আমার বড় ভাল লাগে।

—বেহারী ওখানে যেতে মানা করেছে না?

—বেহারীদা একেবারে সেকেলে লোক। তোমার সঙ্গে যাব তাতে আর কি হয়েছে। বেহারী দাকে না বললেই হবে।

—বেশ চল।

পাহাড়ের যত কাছে যেতে লাগল, শ্রীলেখার মনটা যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। প্রথম দিনের মতন তার ভাল ত লাগছিলই না বরং তার কেবলই মনে হচ্ছিল, না আসলেই হোত। মুখে কিছু না বলে সে পাহাড়ের ওপর উঠল। একটা অজানা আতঙ্কে তার মনটা ভরে গেল। সে অনুপকে যেন আকড়ে আকড়ে চলতে রইল। প্রথম দিনের মত একটা ফাঁকা জায়গায় শ্রীলেখা অনুপের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল। সে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বলল—সেদিনের মত আমার আজ ভাল লাগছে না। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—পরিশ্রমের জন্যে ঐ রকম মনে হচ্ছে। একটু বিশ্রাম করে নাও তারপর পাহাড়ের ঐ দিকটায় গেলে খুব ভাল লাগবে।

—ঐদিকে নীচে নামতে হবে?

—না না এই ওপর থেকেই দেখব। নীচে নামবার দরকার নেই।

আধ ঘণ্টার মত অপেক্ষা করল দুজনে। আজ বিশেষ কথাই হোল না। তারপর শ্রীলেখা অনুপের হাত ধরে উঠে তার সঙ্গে বিপরীত দিকে যেতে লাগল। সীমানার ধারে এসে অনুপ বললে—শ্রীলেখা তুমি এইখানে চিরকাল থাকতে চেয়ে ছিলে না?

—হ্যাঁ, সেদিন তাই মনে হয়েছিল।

—আর আজ ?

—না, আমার এখানে কেমন ভয় করছে। চল আমরা ফিরে যাই।

আচমকা অনুপ শ্রীলেখার গলা দুহাতে জোরে চেপে ধরলে। শ্রীলেখা মাটীতে পড়ে গিয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল—অনুপ, বেহা...। তার গলা দিয়ে আর শব্দ বের হোল না। একে পথশ্রান্তা তার ওপর এই হঠাৎ আক্রমণে শ্রীলেখা দুই একবার নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অনুপ গলা চেপে রইল অনেকক্ষণ। যখন দেখল যে আর কোন সাড় নেই তখন সে শ্রীলেখার গলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় সে তখন হাঁফাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরে সে শ্রীলেখার মৃতদেহ পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গর্ত করা জায়গায় নিয়ে মৃতদেহ তার মধ্যে রেখে পাশের মাটী চাপা দিয়ে দিল। তারপর শুকন ঘাস পাতা এনে তাতে ছড়িয়ে দিল। ধারে কাছে কোন জনপ্রাণী নেই। একটা পাহাড়ের বনা পাখী কেবল কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল। তার সেই ডাকটা অনুপের কানে পৌঁছতে মনে হোল যেন পাখীটা বলছে—দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি। অনুপের গাটা একটু ছমছম করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল আর তার বাড়ীর দিকে চলতে রইল। পাহাড়ের নীচে নামবার পর আর একবার সেই পাখীটা ডেকে উঠল—দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি। অনুপের মনে হোল যেন পাখীটা তাকে অনুসরণ করছে। সে ভয়ে ভয়ে একবার পেছন পানে চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। সে চলতে রইল।

প্রায় অর্ধেক রাস্তা আসার পর অনুপ ভাবল যে সোজা বাড়ী ফিরবে না। এখন একবার নদীর ধারে যাবে। তার হাতে মাটী লেগে আছে। হাত দুটো ধুয়ে নিতে হবে। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে নদীর দিকে চলতে লাগল। যখন নদীর কাছে পৌঁছল সেখান থেকে বাড়ী এক মাইলের কিছু কম। ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে সে যতদূর সম্ভব সাধারণ মানুষের মত নিজেকে দেখাবার চেষ্টা করল। এইবার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

নদীর কাছ থেকে বাড়ীর পথে যাবার সময় দুই একজনের সঙ্গে দেখা হোল। তারা স্থানীয় অধিবাসী। তারা তাকে নমস্কার জানাল। অনুপ অনামনস্কভাবে বাড়িতে ঢোকবার সময় বেহারী তাকে দেখে বললে—দাদাবাবু তুমি একলা আসতিছ, দিদিমনি কই ?

—কেন দিদিমনি ত আগেই এসেছে।

—কই ? আমিত এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। তোমাকে ত একলাই আসতে দেখলুম রাস্তা দিয়ে। দিদিমনিত আসেনি ?

—কি বলছ বেহারী ? নদীর ধার থেকে সে আগেই চলে এল। এখনও ফেরেনি ?

—নাগো দাদাবাবু না। তোমাদের কি আক্কেল ! তাকে একলা এইভাবে ছেড়ে ?

অনুপ তখন শ্রীলেখা, শ্রীলেখা করে চীৎকার করে সমস্ত বাড়ীটা খুঁজল। তারপর বেহারীর সঙ্গে বাইরে বের হোল খোঁজবার জন্যে।

কোন জায়গায় কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। থানায় খবর দেওয়া হোল। কলকাতায় তার করা হোল। চারদিন কেটে গেল শ্রীলেখার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। থানার অফিসার অনুপ আর বেহারীকে জিজ্ঞেস করল শ্রীলেখা কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কোথায় যেতে ভাল বাসত। অনুপ বললে—ঐ পাহাড়টা তাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। আমার সঙ্গে একদিন ঐখানে গিয়েছিল। ঐ জায়গাটা তার বড় ভাল লাগত। অনুপের এই কথা বেহারীও বলল। সে আরও বলল যে অতদূরে যেতে মানা করেছিল। থানার অফিসার অনুপ আর বেহারীকে নিয়ে সেই পাহাড় আর তার আস-পাশ ঘুরে দেখার সময় পাহাড়ের পেছনে একটা নর কঙ্কাল পেল। সেই কঙ্কালটা পুলিশ নিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে। সকলের অনুমান হোল যে শ্রীলেখা একলা পাহাড়ে গিয়ে বিপদে পড়ে যে ভাবেই হোক প্রাণ হারায়, তারপর বন্য

জন্তু তার মৃতদেহ ভক্ষণ করে আর কঙ্কাল ঐখানে পড়ে থাকে।

এই খবরই চারিদিকে প্রচার পেল। প্রায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল জানা গেল। যে কঙ্কালটি পাওয়া গিয়েছিল সেটা একটি বছর বাইশ আনুমানিক স্ত্রীলোকের। তার উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। মৃত্যুর সময় শ্রীলেখা নিখোঁজ হবার সমসাময়িক।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল ঐ কংকালটি শ্রীলেখার বলেই সাব্যস্ত করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল শুনে অনুপ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক তাহলে সব দিক ঠিক আছে।

(৩)

শ্রীলেখার বাবা রসময় বোস কিন্তু তার মেয়ের মৃত্যুটা এত সহজে নিতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুর আরও তদন্তের প্রার্থনা জানালেন। তার প্রার্থনা মঞ্জুর হোল। শ্রীলেখার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকে তিনি বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা যে ঐ কঙ্কালটি তাঁর মেয়ে শ্রীলেখার নয়। কিন্তু কেমন করে তা প্রমাণ করবেন। তিনি শুনেছিলেন যে রক্ত পরীক্ষা করে প্রকৃত বাবা মা কে জানা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক গল্প শুনেছিলেন কিন্তু কংকাল থেকে ত রক্ত পাওয়া যায় না। তবে কি করে প্রমাণিত হবে যে ঐ কংকাল শ্রীলেখার কিনা? তিনি এই বিষয়ে অনেক বই আনিয়ে পড়লেন কিন্তু কোন রাস্তা দেখতে পারলেন না। তিনি যখন মহা চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন একজন নৃতত্ত্ব বিশারদ আর এলেন তাঁর পারিবারিক দন্তচিকিৎসক। নৃতত্ত্ব বিশারদ বললেন—আমি নরকপাল দেখে পরীক্ষা করে নির্ভুলভাবে বলতে পারব ঐ মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা কে। এ পরীক্ষা বিজ্ঞান-সিদ্ধ এতে কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় সেটা সব সময় নির্ভুল নয়। দন্ত চিকিৎসক বললেন আমার কাছে আর একটি নির্ভুল প্রমাণ আছে। শ্রীলেখার একটা দাঁত আমি তুলে একটা কৃত্রিম দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছিলুম। আমার কাছে তার সমস্ত দাঁতের ছাঁচ আছে। আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে নির্ভুলভাবে বলতে পারব ঐ কঙ্কাল প্রকৃত শ্রীলেখার কিনা।

এই দুই বিশেষজ্ঞের কথায় রসময়বাবু আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি এই দুই বিশেষজ্ঞের দ্বারা কঙ্কালটি পরীক্ষা করাবার আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদন মত পরীক্ষা আরম্ভ হোল। রসময়বাবু এবং তাঁর স্ত্রীর মাথার বিভিন্ন অংশের রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ছবি নেওয়া হোল। নৃতত্ত্ব বিশারদ অভিমত দিলেন যে ঐ কংকাল রসময়বাবুর মেয়ের কোন মতে হতে পারে না। তিনি আরও বললেন যে ঐ কংকাল থেকে মনে হয় যে ঐটি কোন আদিবাসী বা উপজাতীয়ের হবে। তার পরীক্ষার ফল তিনি অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশ দ্বারা একটা বলে দাবী করলেন।

এদিকে দন্ত চিকিৎসক কঙ্কালটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেই কংকালে সবকটি আসল দাঁত আছে এবং তিনি দাঁত থেকে এই কয়টি বিষয় জানালেন—

(১) কঙ্কালটির বয়স ২৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

(২) ঐটি একটি স্ত্রীলোকের।

(৩) তার দাঁতে মিসি বা গুল নেওয়ার অভ্যাস ছিল।

(৪) তার সবকটি দাঁতই বর্তমান এবং সব কটিই আসল দাঁত।

(৫) মৃতা স্ত্রীলোকটি কঠিন অম্লরোগে ভুগছিল, আর

(৬) ঐ কঙ্কালটি শ্রীলেখার নয়।

এই দুই বিশেষজ্ঞের অভিমত পাবার পর রসময়বাবু বুঝলেন যে তাঁর ধারণা অমূলক নয়। তিনি সরকারের কাছে তাঁর মেয়ের নিখোঁজ হবার ব্যাপারে আরও তদন্তের প্রার্থনা জানালেন।

এইবার তদন্ত সুরু করলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের অফিসার। তিনি আবার সুরু থেকে আরম্ভ করলেন। অনুপ মনে মনে বেশ ভয় পেল। ভাবল এ আবার কি উৎপাত এসে জুটল। ঐ বৈজ্ঞানিকগুলোকে শেষ না করতে পারলে আর চলছে না। সে মনের ভাব মনে গোপন করে আবার একবার সুরু থেকে তার কাহিনী বললে। নদীর ধারে যখন সে আর শ্রীলেখা বসেছিল তখন শ্রীলেখা তাকে বলে যে সে আগে বাড়ী যাচ্ছে। অনুপ কোন আপত্তি করেনি কারণ শ্রীলেখা জায়গাটা বেশ ভাল ভাবে চিনে গিয়েছিল।

বাড়ী থেকে কতদূরে হবে?

—প্রায় আধ মাইল।

ঐখান থেকে আপনাদের বাড়ী দেখা যায়?

না। একটা ছোট কোপ আছে তার ডান দিক দিয়ে খানিকটা গিয়ে তারপর আবার বা দিক দিয়ে গেলে আমাদের বাড়ী দেখা যায়। প্রায় মিনিট দশের পর আমি যখন ফিরতে আরম্ভ করি তখন আমি শ্রীলেখাকে রাস্তায় দেখিনি। আমি মনে করেছিলুম সে বোধহয় বাড়ীতে পৌঁছে গেছে। আমি দু একজন লোককে রাস্তায় আমার বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখি।

—তাদের আপনি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—না, কারণ আমার কোন সন্দেহ হয়নি।

—তাদের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়?

—ঐ জঙ্গলটা পার হয়ে যেখান থেকে আমাদের বাড়ী দেখা যায় সেখানে।

—আপনি তাদের চেনেন বা তারা কোথায় থাকে জানেন?

—না।

অফিসার বেহারীকে জিজ্ঞেস করতে সে যা জানত সব বললে। সে আরও বললে—আমি দিদিমণিকে বার বার মানা করেছিনু বেশীদূরে যেওনি। আমার কথা কি কেউ শোনে বাবু?

অফিসার এইবার যেখানে সেই কঙ্কালটি পাওয়া যায় সেখানে বিশদভাবে তদন্ত করতে গেলেন। কঙ্কালটা পাওয়া যায় পাহাড়ের পেছনে একটা জঙ্গলের ধারে। সেই জঙ্গল পার হয়ে একটা আদিবাসীর বস্তী পাওয়া গেল। এই বস্তীকে আদিবাসীরা বলে পাড়া। গায়ে গায়ে লাগা পঞ্চাশ ষাটটা তালপাতার ঘর। কতকগুলো ছোট ছোট উলঙ্গ ছেলেমেয়ে সামনে খোলা জায়গাটায় খেলা করছে। অফিসারকে দেখে সব ছুটে যে যার ঘরে ঢুকে গেল। দু একটা আদিবাসী মেয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল পাতার ফাঁক দিয়ে। অফিসার ডাকতে লাগলেন—ওরে তোদের সর্দার কোথায়। হাঁক ডাক শুনে একজন মাঝ বয়সী লোক বেরিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। তাকে অভয় দিয়ে অফিসার তার এবং তাদের সকলের বিষয় জিজ্ঞেস করল। সর্দার খুব খুশী হোল অফিসারের ব্যবহারে। তাদের সঙ্গে নানা কথায় অফিসার জানতে পারল যে মৃত্যুর পর ঐ আদিবাসীরা মৃতদেহ কবর দেয়। কোথায় কবর দেয় জানতে চাইলে সর্দার তাকে নিয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেখাল। সেখানে পর পর অনেক গুলো কবর রয়েছে। প্রত্যেকটি কবরের ওপর মাটি উঁচু হয়ে আছে। একটা কবরের মাটি খুলে বোধহয় মৃতদেহটা বের করা হয়েছে।

অফিসার জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে এটা এরকম খুলে ফেলা হয়েছে কেন রে?

সর্দার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অফিসারের পীড়াপিড়িতে বললে—বাবু শহরের একজন বাবু ওটা এক হাজার টাকা দিয়ে কিনেছে গো।

—ওটা কার ছিল রে?

—আমার লাতিন গো। তিন মাস আগে মাটি দিয়েছি।

—তুমি হাজার টাকার জন্যে ঐটা বিক্রী করলে?

—কি করব বাবু! যা আকাল পড়েছে তিন টাকার কম চাল পাই না। জ্যান্ত মানুষকেই

বেচতে লাগবে গো। তবুত কিছুদিন সকলকে খাওয়াতে পারব গো।

তারপর অফিসার আরও ধৈর্য সহকারে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল যে সহরের ঐ বাবুটি বড় ভাল। তার ছেলেকে দিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত করার জন্যে একশ টাকা দিয়েছে।

সর্দারের ছেলেকে খুঁজে বের করে তাকে নিয়ে অফিসার পাহাড়ের যেখানে গর্ত ছিল সেখানে গিয়ে দেখল যে গর্তটা বোজানো কিন্তু সেখানে গর্ত করা হয়েছিল এটা বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল।

লোকজন লাগিয়ে গর্তটা থেকে মাটি সরিয়ে অনেকটা নীচে দেখল একটা কঙ্কাল রয়েছে। কঙ্কালের দুই হাতে তখনও চার গাছা করে সোনার চুড়ি আর গলায় সোনার হার। শাড়ী, জামা বিবর্ণ হয়ে গেছে। বেহারী চুড়ি আর হার সনাক্ত করল।

অনুপকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজিতেও কোন ফল হোল না।

অফিসার কঙ্কালটি নিয়ে আবার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোলেন। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হোল যে দ্বিতীয় কঙ্কালটি শ্রীলেখার। খুনী যে অনুপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু সে কোথায় পালালে? তার জন্যে বহু জায়গায় খোঁজ করা হোল কিন্তু সে আজও ফেরার।

—

পুজোয় চাই নতুন জুতো

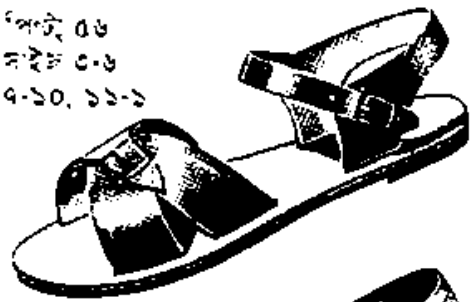

স্পন্টি ৫৬
সাইজ ৩-৬
৭-১০, ১১-১

টিমবয় ১৩
সাইজ ৪-৮

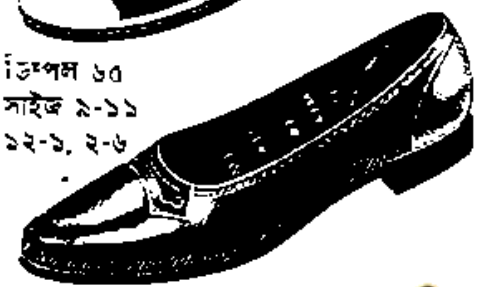

টিপল ৬৫
সাইজ ৯-১১
১২-১, ২-৬

ওয়েফাইন্ডারস ৫৩
সাইজ ৯-১১
১২-১,

ওয়েফাইন্ডারস ১৭
সাইজ ১-১১
১২-১, ২-৬

পল্টন ৪১
সাইজ ৪-৮

স্প্রিংমেটস ৩০
সাইজ ১২-২

Bata

হরমোহন ও ক্ষীরমোহন

শ্রীবিরূপাক্ষ

হরমোহন সারা জীবন পলিটিক্স করেছেন। দেশের জন্যে, দরিদ্র মানুষের জন্যে তিনি গ্রামে ও শহরের মাঠে ঘাটে বক্তৃতা করেছেন, আর সেইসব জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি শুধু বলেছেন, আপনারা সবাই মিলে বিদ্রোহ করুন, ভেঙে ফেলুন, গুঁড়িয়ে ফেলুন, সমস্ত মাঠ করে ছেড়ে দিন, তবেই দেখবেন, মানুষ সুখী হবে, আপনাদের দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেকে ক্ষেপেছে অনেকে কেঁদেছে।

পঁচিশ বছর ধরে তিনি বল পাকিয়েছেন। দরিদ্র শোষিত মানুষদের জন্যে তিনি কোন ঘর বাড়ী তৈরি করে দেননি, তাদের কুঁড়ে ঘরেও বাস করেননি, মাঠে তাদের সঙ্গে কাজ করেননি, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন বিপন্ন করেননি, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি, তাদের কুসংস্কার দূর করেননি, শুধু চাঁদা আদায় করেছেন, মোটরে করে ঘুরেছেন, যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেখানে ভাল খাওয়া দাওয়া করেছেন, আর বিপ্লবের পরেই প্রত্যেক গরীব লোককে বড় বড় বাড়ীঘরদোর করে দেবেন, বড় বড় চাকরিতে বসিয়ে দেবেন, আর যারা বড় বড় চাকরি করেছেন, বাড়ী ফেঁদেছেন, তাদের সবাইকে একেবারে পথে বসাবেন, একথা বলে বেড়িয়েছেন।

হরমোহন নিজের বক্তৃতা খবরের কাগজে নিজে গিয়ে ছাপতে দিয়ে এসেছেন। লোকে পড়ে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছে। হ্যাঁ—এদ্দিনে একটা মানুষের মত মানুষ, দেশের নেতা পাওয়া গেছে বটে—সবাই বলতে আরম্ভ করলে।

আমার বন্ধু ব্যোমকেশ হরমোহনবাবুর মহাভক্ত। আমায় কতদিন বলেছে যে এরকম সিনসিয়ার লোক আমি পৃথিবীতে দেখিনি। শোষিত মানুষদের জন্যে এক এক সময় তিনি কেঁদে ফেলেন।

আমি সবিস্ময়ে বলতুম, বল কি! হরমোহনবাবু, কেঁদে ফেলেন?

সে বললে, আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—গরীবদের এতটুকু কষ্ট দেখলে, তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। আমি নিজে কতবার রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিয়েছি।

আমি যদি জিজ্ঞাসা করতুম, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্যে কি কি করা উচিত, তার কোন পরিকল্পনা তিনি করেছেন?

ব্যোমকেশ বিরক্ত হয়ে বলেছে, আরে পরিকল্পনা কি করবে? ক্ষমতা হাতে না নিলে পরিকল্পনা করার মনে হয়? বিপ্লব পরিকল্পনা করে হয় না, গুঁতিয়ে করাতে হয়। আগে গুঁতোও।

আমি বলেছি, দেখ ভাই, আমি পলিটিক্স বুঝি না কিন্তু টাকটিক্সটা কি?—কি করে বিপ্লবটা হবে, কারা করবে, কতজন করবে? বিপ্লবের ধরণটা কি হবে? সে সম্বন্ধে তিনি কিছু আঁচ দিয়েছেন?

ব্যোমকেশ বলেছে, দিয়েছেন বৈকি? হরমোহনবাবু বলেন আগে সব ছই-ছত্তাকার করে দাও, তারপর দেখবে, আপনা আপনি সব নতুন নতুন ধারণা গজাবে, যাদের তোমরা গরীব লোক বলে দুরছাই কর, তারা যখন বড় হবে—তখন সবার বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। আজ যারা গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘুরছে, তাদের ন্যাড়া করে ওদের পোজিশনে বসিয়ে দাও—দেখবে, তখন মানুষ কি সুখে থাকে!

আমি বললুম, ঠিক কথা। গোঁকে চাড়া দেওয়া লোকগুলোকে ন্যাড়া করে ভেড়া বানিয়ে নয় দেওয়া গেল। নীচেকে ওপরেও তোলা গেল, ওপরে যারা থাকে তারা নীচে নামলো—কিন্তু তারাও তো কিছুদিন পরে আবার নীচে নেমে গোলমাল পাকাতে পারে?

ব্যোমকেশ বললে, তার জন্যে অসুবিধের কি আছে? তিনি তো বলেছেন যেখানে নিপাড়ন—সেখানেই তিনি। উনি আবার তাদের নিয়েই আন্দোলন করবেন। ও রকম দরদী লোক যদি আরও গোটাকতক দেশে জন্মাতো, তাহলে দেখতে দেশের ভোল পাল্টে যাচ্ছে।

আমি ব্যোমকেশের গুরুভক্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, হরমোহনবাবুর বাড়ী কোথায়?

ব্যোমকেশ বললে, নিউ আলিপুরে।

আমি চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠলুম, বল কি, ঐ জায়গায় বাড়ী করেছেন। কবে?

এই কিছুদিন আগে।

তাহলে ওঁর পয়সা কড়ি ছিল।

ব্যোমকেশ বললে, পয়সা কড়ি? সবার জন্যে কাজ করলে সবাই কিছু কিছু দিত—সেই পয়সা জমিয়ে জমিয়ে উনি বাড়ীটা করেছেন। তাছাড়া জমিটা আগেই একটু সস্তা দরে কিনে রেখেছিলেন, পরে বাড়ীটা করলেন। তাছাড়া জন, মজুর, মিস্ত্রী ওঁর কাছ থেকে তো কিছু চায়নি—শুধু জলপানির খরচটা নিয়ে একটু গতরে খেটে দিয়েছে। উনি ওদের জন্যে অত করেন, ওরা তাঁর জন্যে কিছু করবে না ভাব? গরীবরা আর যাই বল, লোক চেনে। হরমোহনবাবুকে পিতৃতুল্য ভক্তি করে। আমি ওঁর শিষ্য বলে, আমাকেও কম পাইয়ে দিয়েছেন?

কি রকম?

—সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্যেই আমি বাড়ীর দোতলাটা তুলতে পারলুম, এটা বুঝছ না? দুঃখী লোকের দুঃখু উনি আগে থেকেই বুঝতে পারেন, আমাকে দেখেই বুঝেছিলেন তাই তো আশ্রয় পেলুম।

ব্যোমকেশের বর্ণিত হরমোহনবাবুর সম্বন্ধে কথা শুনে শুনে তাঁকে একবার দেখবার ভারী ইচ্ছা হতে ব্যোমকেশ বললে, তুমি যাবে? তার আবার কথা কি! তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, পরিচয় করিয়ে দেব। কালই চল।

আমি কৌতূহলী হয়ে সাতাই পরের দিন ব্যোমকেশের গুরুর বাড়ীর দিকে তার সঙ্গেই চলে গেলুম।

সদর দরজায় সবেমাত্র দুজনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে একটি ভদ্রলোকের চিৎকার কানে ভেসে এল। তারপর শুনলুম, একটা হাউমাউ শব্দ। তারপর দেখি একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়-পরা লোকের ঘাড় ধরে সেই ভদ্রলোক এক হাতে চটি নিয়ে বেরিয়ে এসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলছেন, হারামজাদা, ফের যদি মাসকাবার হতে না হতে মাইনের জন্যে ঘ্যানঘ্যান করবি তাহলে এবার দুপাটি চটি নিয়ে তোকে পিটবো। বেটাচ্ছেলে, মাইনেটা নিয়েই ভাগবার তালে আছ না? আমি তো তোকে আগেই বলে-দিয়েছিলুম, এক মাসের মাইনে আমার কাছে জমা থাকবে পরের মাস থেকে মাইনে পাবি, বেটাচ্ছেলে একমাস যেতে না যেতেই মাইনে, মাইনে করে পাগল করে দিচ্ছিস?

কাজ করতে ইচ্ছে না হয়—বেরোও এখান থেকে, বলে তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। ভদ্রলোক এত রেগেছিলেন যে আমরা সদরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি সেটাও খেয়াল করলেন না।

হরমোহনবাবুর কাণ্ড কারখানা আমার সামনে ঘটাতে ব্যোমকেশ কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ বলে উঠল, তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, আমি ওঁকে ডেকে আনছি। আমাদের বোধহয় দেখতে পাননি।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলুম, থাক। আজকে ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত হয়ে আছেন, এসময় ডেকে আনলে ঠিক আলাপটা জমবে না। আর একদিন আসা যাবে—চল।

ব্যোমকেশ ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তবু আমাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে গেল, তা ঠিক। হরমোহনবাবু কখনও চটেন না—চাকর বেটা নিশ্চয় বাজারের পয়সা-টয়সা চুরি করত—তাই বোধহয় অত ক্ষেপে গিয়েছিলেন। এটা ওঁর প্রকৃতিই নয়। এক একসময় মানুষের মন ঐ রকম হয়ে যায় না, কি বল?

আমি নির্বাক—তবু একটু ঘাড়টা নাড়লুম। শিষ্যের দুর্গতি দেখে কিন্তু সে সময় আমার অসম্ভব হাসি পাচ্ছিল। গরীবের মা—বাপ, তাদের কথা শুনলে শুধু নয়—স্রেফ দেখলেই যাঁর চোখে জল করে, অপরকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে হয়, ব্যোমকেশের সেই বর্ণনার সঙ্গে একেবারে আমারই চোখের সামনে এমন গরমিল হয়ে যাবে, এটা সে ভাবতেও পারে নি।

ওখান থেকে সেই দুপুরে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একটু ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু একটু খিদেও পাচ্ছিল। ব্যোমকেশকে বললুম, চলহে, একটু খিদে পাচ্ছে, ঐ মিষ্টির দোকানটায় যাই, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

ব্যোমকেশ কোন প্রতিবাদ করলে না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, চল।

দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁহে, ভাল মিষ্টি টিষ্টি আছে—বেশ টাটকা।

দোকানী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আজ্ঞে, আছে বৈকি বাবু, আজকেই তৈরি করেছি—সেরা মিষ্টি। গরম গরম রস ওর গা দিয়ে গড়াচ্ছে—এই দেখুন।

বললাম, দুটো করে আমাদের দাও। তারপর ব্যোমকেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ব্যোমকেশ তখনও বিশেষ ভাবিত হয়ে বসে আছে।

আমি তখন হেসে সে ভাবটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে বলে উঠলুম, কি আবার ভাবছ কি? হরমোহনবাবুর কথা নাকি?

ব্যোমকেশ দেঁতো হাসি হেসে বলে উঠল, না না—এমনি বসে আছি। তা মিষ্টির অর্ডার দিয়েছ?

—হ্যাঁহে, গরম গরম রসে ফেলা মিষ্টি সদা তৈরি করেছে।

—কি রাজভোগ না রসগোল্লা?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আরে না না, ও-সব নয়—ক্ষীরমোহন। গরম গরম রসে ভেজা।

ব্যোমকেশ সামান্য ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, ক্ষীরমোহন কী, গরম গরম ভাল লাগে?

আমি হেসে বলে উঠলুম, হরমোহনকে গরম হতে দেখে ভাল না-লাগতে পারে বন্ধু, কিন্তু গরম গরম রসে-ভেজা ক্ষীরমোহন খেয়ে দেখ, খুব ভাল লাগবে।

Trade Mark G.E.C. and Osram User—The Electric

সাম্প্রতিক ইতিহাস

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রথমে বোধ হয় বলা প্রয়োজন যে পশ্চাত্য অর্থে কার্যকর কোন গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থা এশিয়ার প্রায় কোথাও দানা বাঁধেনি। ব্যতিক্রম বোধ হয় ফিলিপাইন, ইসরায়েল এবং জাপান। আমাদের সমাজ আছে, সমাজ ছিল, কিন্তু ইংরেজি অর্থে যেমন 'নেশন' পূর্বে কখনো ছিল না তেমনি রাজনৈতিক দলও ছিল না।

এশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে ১৯ শতকের আগে এই ভূখণ্ডে "দল" বা "পার্টি" ছিল না। উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতার যুগেই এদের আবির্ভাব। অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও এইসব দলের অনেকগুলি টিকে আছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেস দল এই রকম একটি দল। কালপ্রসঙ্গে কংগ্রেসের লক্ষ্য আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংস্থা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগে সংগ্রামশীল বিরাট গণপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে মোটামুটিভাবে দেশের শাসনভারও কংগ্রেসেরই হাতে। কিন্তু বরাবরই কংগ্রেস ঢিলেঢালা প্ল্যাট-ফরমের মতো। কংগ্রেস নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। গোড়ার দিকে খুবই সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। চাকুরির মাধ্যমে দেশের সরকারী কাজে ভারতবাসী অংশগ্রহণ করুক এই উদ্দেশ্য নিয়েই ৭৮ বছর আগে এই সংগঠনের জন্ম হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ২০ বছর "নাগরিকের মৌল অধিকার লাভই" কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। তারও পরবর্তী যুগে কংগ্রেস জনসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি তোলে এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্যে জনগণের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এই লক্ষ্য সফল করবার জন্যে প্রথম প্রথম কংগ্রেস সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং সংবিধানসম্মত পথ নেয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেনি। ১৯২৯ সালেই প্রথম কংগ্রেস রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে। এবং কালক্রমে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবেদন নিবেদনের পালা শেষ করে সংবিধান বহির্ভূত গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস সংগ্রামী গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ১৯৩১ সালে করাচীতে কংগ্রেস কল্পিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থনৈতিক রূপ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়। নানা আন্তর্জাতিক ঘটনার সংঘাত ও জাতীয় স্তরে নানা ধারায় আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরবর্তী ২৭ বছর কংগ্রেস প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশশাসন করেছে। ফলে কংগ্রেস-পার্টি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব নয়। যদিও এদেশে একদলীয় নেতৃত্ব ব্যবস্থা নেই তবুও নানা কারণে কংগ্রেস দলই ভারতের সর্ববৃহৎ দল—কার্যতঃ এমন একটি দল যার দ্বিতীয় কেউ নেই। কংগ্রেসের এই প্রতিপত্তি তার ঐতিহ্যের জন্যে এবং মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ মহান নেতাদের বিভূতির দৌলতে।

পশ্চিমবাংলা ও কংগ্রেস

আগেই বলেছি দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। দেশের নতুন সংবিধানে জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয় প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার। আর নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সাধারণ

নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। তখনও সারা দেশে কংগ্রেসই সবচেয়ে শক্তিশালী সর্বভারতীয় দল। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস দলের সরকার গঠিত হয়। মাদ্রাজ, পেপসু, হায়দ্রাবাদ এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেস একক গরিষ্ঠ দল না হলেও বৃহত্তম দলের মর্যাদা পেয়েছিল। গত সাতাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রায় প্রতিটি দল আজ নির্বাচন-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এমনকি যেসব দল আগে নির্বাচন বয়কট করার নীতি গ্রহণ করেছিল তারাও সংসদীয় গণতন্ত্রের আসরে পুরোদমে নেমে পড়েছে।

১৯৫২ সালের পর থেকে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবাংলায়ও নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ আরম্ভ হয়। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলাকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল, কল্যাণী, দুগ্ধ প্রকল্প, নতুন নতুন রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন। অবশ্য তখন থেকেই এখানকার মূল সমস্যা দেখা দিয়েছে, ক্রমবর্ধমান বেকারী, খাদ্য আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা তখন থেকেই প্রকট হচ্ছে। যদিও শাসকদল হিসাবে কংগ্রেসের ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ইতিহাস এবং যদিও ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রগঠন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তবুও কংগ্রেস-বিভাগের আগে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কংগ্রেস নেতারা বলেছেন শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনসাধারণের কল্যাণই তাঁদের লক্ষ্য, অথচ ১৪টি পরিবার দেশের অর্থনীতির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, গ্রামাঞ্চলে চিরাচরিত ব্যবস্থা বহাল রেখেছে। কংগ্রেস সংগঠনেও বিত্তবান, জোতদার-জমিদার ও সুবিধাভোগী শ্রেণীদের প্রাধান্য বরাবরই বহাল থেকেছে। এবং দেশে শিল্পায়ন ভূমি-সংস্কার প্রভৃতি হলেও স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আরও গরীব হয়েছে।

কংগ্রেস সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভারতের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের চেষ্টা করেছে। দেশে নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছেও। আধুনিক শিল্পের অভ্যুদয়ের ফলে বিবিধ সামাজিক শ্রেণীর ক্ষমতা ও গুরুত্বের পরিবর্তনও যে ঘটেছে ইদানীংকালে সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা শিল্প বিকাশ হতে থাকে, উৎপাদন বাড়তে থাকে অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেস দলের মধ্যেও এই সময় অন্তর্বিরোধ মাথা চাড়া দেয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাতন্ত্রের অভিযোগ ওঠে এবং মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যালোচনা করে শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, কংগ্রেস কর্মীরা জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্মীরা উদাসীন।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ('৬২) পর থেকে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ('৬৭)—এই পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গে সংকটের কাল। ব্যক্তির জীবন থেকে শুরু করে গোটা রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে তখন সংকটের কালো ছায়া। ঐ পাঁচ বছরে একদিকে বিদেশী আক্রমণ, প্রতিকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অগ্নি পরীক্ষা, অন্যদিকে দেশে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব-সংকট, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়, উন্নয়নে শম্বুকগতি, জনমনে বিক্ষোভের ঢেউ, সারা দেশকে এক অস্থিরতার ও অনিশ্চয়তার আবর্তে এনে

ফেলে। সীমান্ত রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সংকটের তীব্রতা দেখা দেয় বেশী করে। দিনের পর দিন প্রতিশ্রুতি আশ্বাস আর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সম্বল করে শেষে একদিন প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটল এবং হতাশাগ্রস্ত উপেক্ষিত আবেগপ্রবণ বাঙালীর তোলপাড় শুরু হল। আর তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের চরমতম সংকট কাল ছিল ১৯৬৬ সাল। চরম সংকটের চাপে একদিকে যেমন প্রশাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি কংগ্রেস দলে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। কংগ্রেস দলে চরম সংকট দেখা দেয়, শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রভাবশালী নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্যে। ১৯৬৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের এক তলবী সভা ডাকা হল। সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অজয়বাবুর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব আনেন। সে প্রস্তাব পাশ হয়। অজয়বাবু দলকে দুর্নীতিমুক্ত করার কাজে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজকে টেলিফোন করেন, তার পাঠান, চিঠি দেন, শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে গিয়ে দরবার করেন। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়। ২০ জানুয়ারী কুমার সিং হলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় অজয়বাবুকে সভাপতির পদ থেকে সরাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

একদিকে কংগ্রেসে এই ভাঙ্গন—অন্যদিকে মজুরের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলার বিপর্যয়, বাংলা বন্ধ, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় বিশেষ করে কলকাতা ২৪-পরগণা ও অন্যত্র কারফ্যু—এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে এ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া বামপন্থীদের অনুকূলে চলে যায়। ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর—একটানা আন্দোলন আর বিশৃঙ্খলার ফলে রাজ্যের অর্থনীতিও বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শিল্পে অশান্তির দরুন ১৯৬৬ সালে রাজ্যে ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার শ্রমদিবস নষ্ট হয়—শিল্পশ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, শিক্ষক ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই রকম বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে SSP. RSP. SUC, RCPI, Worker Party's' ও F B (Marxist) নিয়ে গঠিত হয় "সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট"। আর সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, Forward Block ও Bolshevik Party গঠন করে "সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্ট।" পি এস পি জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র এবং গোর্খা লীগ এরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। লোকসেবক সঙ্ঘ কোন ফ্রন্টে যোগ না দিলেও পুরুলিয়ায় তাদের আসনগুলি নিয়ে দুই ফ্রন্টের সঙ্গেই সমঝোতা হয়।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হল। এই পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে তদন্ত হয়েছিল। তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছিল মেদিনীপুরে সতীশ সামন্তর মত প্রভাবশালী নেতা ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-র আঁতাত এবং রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতিতে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সি পি (এম)-এর নেতৃত্বে গঠিত ইউ এল এফ এবং সি পি আই-র নেতৃত্বে গঠিত পি ইউ এল এফ নির্বাচনের পর সমঝোতায় এসে "যুক্তফ্রন্ট সরকার" গঠন করে। যুক্তফ্রন্টে পরে পি এস পিও যোগ দেয়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার অবশ্য নয়মাসের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি। একদিকে ছিল সরকারের ভিতর নানা দলের নানা মতের সংঘাত, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতি। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় সংকট ছিল খাদ্য, শিল্পে অশান্তি, নকশালবাড়ী আন্দোলনের ঢেউ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির

অবনতি। আর সরকারের আভ্যন্তরীণ সংকট ছিল মূলত ঘেরাও, নকশালবাড়ীর আন্দোলন এবং প্রশাসনিক নীতি নিয়ে মতপার্থক্য। এসব সংকটের অবসান ঘটে ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হওয়ার সংগে সংগে।

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয় ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির যেমন নানা পরিবর্তন ঘটে, তেমনি দল ভাংগাগড়ার অনেক ঘটনা ঘটে। অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট আশাতীত সাফল্য লাভ করে। তবে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সরকারের সংকটও কমেনি বরং বেড়েছে ভিতরের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। শুরু শরিকী সংঘর্ষ দিয়ে, পরিণতি দলীয় স্বার্থে সরকারী দফতর ব্যবহার এবং এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টিতে। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ১৬ মার্চ পদত্যাগ করেন। সংগে সংগে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও অবসান ঘটে। পরদিন সারা বাংলাদেশে সি পি এম হরতালের ডাক দেয়। হরতালে নানা জায়গায় প্রধানতঃ সি পি এম এর সংগে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০জন নৃশংসভাবে খুন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয় ১২শে মার্চ ১৯৭০। আর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রপতির শাসনেও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি বা শিল্প পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া দূরের কথা, দ্রুত অবনতি ঘটে। গুপ্তহত্যা ও নকশালপন্থীদের শ্রেণী শত্রু খতম অভিযানের ফলে জনজীবন অস্থির হয়ে পড়ে।

যে জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করেছে, স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়েছে এবং দু দশকেরও বেশী কাল ক্ষমতাসীন থেকে দেশশাসন করেছে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, সেই কংগ্রেস দুভাগ হল ১৯৬৯ সালে। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসে কিছুকাল দেখা দিল নবজীবনের স্পন্দন। ১৯৭১ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী "গরীবী হটাও" ধ্বনি তোলেন, এবং এই ধ্বনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে সাড়া জাগায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী যে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের জয় নব-কংগ্রেসের ভাবমূর্তি অনেকখানি উজ্জ্বল করে তোলে। অসংখ্য ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য অংশের মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেয়। সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন, রাজন্যভাতার বিলোপ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, সাধারণ বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা জনমানসে কংগ্রেসকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দেয়। ফলে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল শক্তি নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করে। তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে।

পূজার ছুটিতে—

দীঘা অথবা বিষ্ণুপুর অথবা দুর্গাপুর টুরিষ্ট লজে থাকুন ও আনন্দে ছুটি উপভোগ করুন।

Moulin Rouge Restaurant
31, Park Street,
Calcutta-16

যদি এমন হতো···· / চিরঞ্জীব

বীরুদা কৈশোরে খেলাধুলোয় বেশ নাম করেছিলেন. বয়স একটু বাড়ার সঙ্গে তার নাম আরও ছড়ায় সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু ওই নিয়ে তিনি আর এগোন নি, তা নয়। এগোতে পারেন নি সুযোগের অভাবে ত বটেই; বিভিন্ন সময়ে নানা দলাদলিরও বলি হয়েছিলেন বীরুদা। তারপর রাগে ক্ষোভে দেশ ছেড়ে চলে যান, অবশ্য তখন বিদেশে তিনি একটা ভাল চাকরির সুযোগও পান। খেলাধুলোর সক্রিয় ভূমিকা থেকেও তিনি বিদায় নিলেন।

তারপর দীর্ঘকাল দেশের সঙ্গে তার যোগা-যোগ ছিল না বললেই চলে। যোগাযোগ বলতে যা, তা ওই চিঠিতে, 'বাড়ির সব কে কেমন আছে, আমি ভাল আছি'—এই। পনেরটি বছর বীরুদা জন্ম-ভূমিতে পা দেননি। বিদেশে মশগুল ছিলেন চাকরি নিয়ে। পনের বছর কেন, দশ বছর অতিক্রান্ত হতেই ধরে নিয়েছিলাম, বীরুদা আর কোনোদিন দেশে ফিরবেন না। তাই ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, শুরুর দিকে একটু আধটু চিঠি লিখলেও পরে ও পাটও চুকিয়ে দিই। বীরুদার দিক থেকেও দীর্ঘকাল কোনো সাড়া মেলেনি। ভেবেছিলাম উনিও আমাদের ভুলে গেছেন অর্থাৎ 'আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড'।

এহেন বীরুদা অবাক করে দিলেন পনের বছরের মাথায় কলকাতায় ফিরে ত বটেই, রাত একটায় আমার বাড়িতে হানা দিয়েও। দেখলাম আগের স্বভাব একটুও বদলায়নি তার। ওই রাত্রে এসে বললেন, বল খাবার কী আছে পেট জ্বলছে। এই বলেই বীরুদা আমার সারা পড়ার ঘর হাতড়াতে লেগে গেলেন। খেলার বই, পত্রিকা কোথায় কী আছে খুঁজতে লাগলেন। শান্ত করার জন্য বললাম, এত রাত্রে আবার ওসব কেন? আগে খেয়ে নিন। তাছাড়া গত পনের বছর ত অনাকাজে ব্যস্ত ছিলেন। আবার খেলার পোকা মাথায় ঢুকল কেমন করে? কোনো জবাব না দিয়ে বীরুদা গম্ভীরভাবে তার দেখা গোটা তিনেক অলিম্পিক, দুটি বিশ্বকাপ, দুটি এশিয়ান গেমস ইত্যাদির বিরাট আয়োজনের কথা বলা শুরু করলেন। জানালেন কী ভাবে চীনে, রাশিয়ায়, আমেরিকায়, পশ্চিম জর্মানিতে খেলাধুলো চলে। অত রাত্রে, তার উপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বীরুদার কোনো কথার উত্তর দেওয়া সমীচিন মনে করিনি। তাছাড়া উনি চিরকাল একটু রগচটা ও বদমেজাজী কিনা!

উনি একনাগাড়ে বলে চললেন, এ দেশটার কিস্সু হবে না। এই জন্যেই ত দেশত্যাগী হয়ে-ছিলাম। এরপর বলা শুরু করলেন, গত পনের বছরে তাঁর দেখা কোন দেশ কীভাবে এগিয়েছে। আমি আবার চুপ করলাম। ওর মাঝরাতের বক্তৃতা শেষে বিনীতভাবে জানালাম, বীরুদা গত পনের বছর ত তুমি কোনো খোঁজই নাওনি দেশের সম্পর্কে। আমি অবশ্য অন্য কোনো বিষয়ে বড়াই করছি না, অন্য বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানিও না, কিন্তু খেলাধুলোর ব্যাপারে হলফ করে বলতে পারি মাত্র বার-তের বছরের মধ্যে এমনভাবে কেউ এগোতে পারেনি।

বীরুদার তাৎক্ষণিক: মন্তব্য হয়েছে, হয়েছে —তোকে আর বাতেলা দিতে হবে না।

বললাম, তোমার ধারণা ভুল। আমাকে দিন তিনেক সময় দিলে প্রমাণ দিতে পারব তোমার দেখা পশ্চিমী দেশগুলোর চাইতে আমরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই।

বীরুদা হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু রাজি হলেন, আমার সঙ্গে তিনদিন কাটাতে। উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ-বারো বছরে খেলার কী কী উন্নতি হয়েছে—তা সরেজমিনে দেখতে যাওয়া। ওকে বললাম, তিনদিনে ত গোটা রাজ্য পরিদর্শন সম্ভব নয়। বরং মডেল হিসেবে যে কোনো একটি জেলা বেছে নিন। দুটি জেলাও নেওয়া যেতে পারে একটি উত্তরবঙ্গে আর একটি দক্ষিণবঙ্গে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও যেতে পারেন ছাত্রছাত্রীরা কী করছেন দেখতে। যাওয়া যেতে পারে কলকারখানা বা অফিস আদালতের কী ভূমিকা খেলাধুলোয়।

বীরুদা মেদিনীপুরকে মডেল জেলা বেছে নিলেন। আমাদের যাত্রা শুরু হল সোমবার ভোরে। ফার্স্ট ট্রেনে খড়গপুর গিয়ে আমাদের জন্য রাখা নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠলাম। প্রথমেই গেলাম জেলাশহর মেদিনীপুরে। বীরুদার জন্মস্থান মেদিনীপুর শহর। শৈশব, কৈশোরও কেটেছে এখানে। এখানেই ওর আদি নিবাস।

ড্রাইভারকে প্রথমেই যেতে বলা হল বড় মঠের দিকে। ড্রাইভার অবাক। বাবু বড় মঠ? অমন ত কিছু নাই!

বললাম, স্টেডিয়ামে চল। ড্রাইভার ঢোক গিলে বলল, উনি বোধ হয় অনেকদিন পরে আসছেন।

গোলাকার বিরাট স্টেডিয়ামের প্রধান ফটকে গাড়ি থামতেই বীরুদা সুধোলেন, এখানকার সেই বড় বড় শিরীষগাছ, কৃষ্ণচূড়া সব কোথায় গেল?

উত্তর দিলাম, গাছগুলোর অনেকেরই অস্তিত্ব এখনও আছে। ওদের অবস্থান উত্তরে। এটা দক্ষিণ। স্টেডিয়ামের ফটকে প্রবেশ করে ওকে উপরে কমেন্টেটর্স বক্সে নিয়ে দেখালাম এটিই এ জেলার বৃহত্তম স্টেডিয়াম হলেও এটি প্রধানত অ্যাথলেটিকসের জন্য নির্দিষ্ট। মাটি বা সিন্ডার নয়—চতুর্দিকে রাবারাইজড ট্র্যাক। মাঝে সটপাট, হ্যামার ইত্যাদির পৃথক জায়গা। উত্তর পূর্ব কোণে জ্যাভেলিনের জায়গা। মাঝ মাঠ অবশ্য তেমন প্রয়োজনে হকির জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিচে নেমে এলাম। গ্যালারির নিচে বিরাট হলঘর। ওখানে খেলোয়াড় ছেলেমেয়েদের নিয়মিত খেলার ফিল্ম দেখানো হয়। পাশেই রয়েছে ছোট ছোট হল। ওখানে জুনিয়র, সিনিয়র অ্যাথলীটদের পৃথক পৃথক ক্লাস হয়।

বীরুদার প্রশ্ন: কখন হয়? কারা আসে?

জবাব না দিয়ে স্টেডিয়াম চত্বরে পূর্বদিকে নিয়ে গেলাম। মেদিনীপুর জেলার সেরা ১০০ জন অ্যাথলীট ছেলেমেয়ে ওখানে রয়েছে। এই সেরা ১০০ জনের জন্য সারা বছর রেসিডেন্সিয়াল কোচিং ব্যবস্থা রয়েছে। এরাই এবার রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। ওরা তখন ব্রেকফাস্ট করছিল প্রাতঃকালীন ট্রেনিং শেষে। অ্যাথলেটিকসের প্রতিটি ইভেন্টের জন্য পৃথক পৃথক এন এস এন আই এস কোচ। সবার উপরে দুজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ। হ্যাঁ, ওই ছেলেমেয়েদের সকলেই কিন্তু স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রী নয়। শতকরা ৩০ জন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার কর্মী। এই এক বছর ট্রেনিং কালে ওদের অ্যাটেনডান্স নেওয়া হচ্ছে এখানে। প্রতিমাসে বেতনও চলে আসে এই স্টেডিয়ামে। স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যাতে ট্রেনিং কালে লেখাপড়ায় ব্যাঘাত না ঘটে তাই প্রতিদিন এখানে বিভিন্ন সাবজেক্টের শিক্ষক বা অধ্যাপকদের দিয়ে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, পরীক্ষাও হয় এই স্টেডিয়ামে।

এবার বীরুদা অ্যাথলীটদের কিছু প্রশ্ন করে জানলেন, অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে। আবার উনি এলেন স্টেডিয়ামে। উত্তরদিকে উঁচু মঞ্চ এবং চারিদিক দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গাটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: ওটা বক্সিং রিং না? হ্যাঁ, আমার জবাব।

মেদিনীপুর শহর ছেড়ে আমাদের গন্তব্য স্থান তমলুক। তমলুকেও অনুরূপ স্টেডিয়াম দেখালাম, তবে ওখানে মূলত ফুটবল, ক্রিকেট, হকি হয়—যেমন হয় মেদিনীপুর শহরের অনতিদূরের

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের নামে উৎসর্গীকৃত স্টেডিয়ামে। এই বীরেন্দ্র শাসমল স্টেডিয়ামেই রয়েছে ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও বাস্কেটবলের পৃথক পৃথক ইনডোর কোর্ট। তমলুকেও জোর দেওয়া হয়েছে স্মল এরিয়া গেমসের উপর। কবাডি, খো-খো ও ভলিবলের চমৎকার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি কোর্টের চতুর্দিকে অন্ততঃ দশ হাজার দর্শক অনায়াসে বসে খেলা দেখতে পারেন।

সারাদিন আমরা এগরা, কাঁথি ও দীঘাতেও ঝটিকা সফর করলাম। বীরুদাকে দেখালাম সর্বত্র কেমনভাবে সুপরিকল্পনা নিয়ে খেলার উন্নয়ন চলছে। ফাঁকে দু-চারটি গ্রাম্য-বিদ্যালয়ও দেখিয়েছি। প্রত্যেকের নিজস্ব মাঠ। যেখানে ফুটবল, হকির জায়গা নেই, সেখানে ব্যাপকভাবে চলছে যোগ ব্যায়াম, ভলিবল, কবাডি, বকসিং। কলেজের স্বল্প পরিসর খেলার জায়গায় টেবল টেনিস, ভারোত্তোলন প্রভৃতি চলছে ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজি, বাংলা অক্ষর পিরিয়ডের মাঝে। বলা বাহুল্য খেলার জন্য পৃথক পিরিয়ডও রয়েছে।

খড়গপুরে ফিরে নৈশ আহারের ব্যবস্থা ছিল। কথা ছিল ওখানে আমরা জেলার কয়েকজন ক্রীড়া-কর্তার সঙ্গে দেখা করব। খড়গপুরে ফিরতে আমাদের বেশ দেরি হল। তবুও ওদের সান্নিধ্য-লাভে বঞ্চিত হইনি আমরা।

ক্রীড়া-কর্তাদের অধিকাংশেই তরুণ। সর্ব-জ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি সবে চল্লিশ অতিক্রম করেছেন। বীরুদাকে জানালাম, এখন আর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বা নিখিলভারত ক্রীড়া পরিষদের গাইড লাইনের প্রয়োজন হয় না। দুই টার্ম বা আট বছর হলেই সকলে পদত্যাগ করেন। সভাপতি, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ পদ আঁকড়ে থাকেন না। শুধু তাই নয়—গত আট বছর যিনি ভলিবলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি এবার পদত্যাগ করে যে ফুটবল, বাস্কেটবল কিংবা কবাডির কর্তা হবেন এমন নজীরও মেলে না। আসলে পদী আঁকড়ে থাকার মনোবৃত্তিটাই কারুর নেই। নেই তার কারণও যথেষ্ট। সভাপতি বা সম্পাদক হয়ে কেউ একে জীবিকা বলে মনে করেনা। অনারারি পোস্ট প্রকৃতই অনারারি। আগে যেমন কেউ কেউ এইসব পদ ভাঙিয়ে বাড়ি করতেন, ফ্ল্যাট কিনতেন তেমন ঘটনা এখন একদম ঘটে না। আবার তহবিল তছরুপ করে মা কালী স্বপ্ন দেখিয়েছেন বলে প্রতিদিন তাঁর নামে অর্ঘ অঞ্জলি দেওয়ার ঘটনা এখন গল্প-কথা।

বীরুদা খড়গপুরে ওই ক্রীড়াকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে অবাক হলেন। কেননা, ওদের কেউ নন টেকনিকাল ব্যক্তি নন। যিনি যে খেলার সভাপতি বা সম্পাদক কিংবা অনুরূপ কিছু—তিনি সেই খেলার আদ্যোপান্ত জানেন। টেকনিকাল জ্ঞানও যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা অধিকাংশের সেই খেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রথম দিন কাটল বেশ পরিশ্রমে। বীরুদা মঙ্গলবার রেস্ট নিতে চাইলেন। তবে দ্বিতীয় দিন—অর্থাৎ বুধবারের প্রোগ্রাম পাকা হয়ে গেল। স্থির হল ওইদিন আমরা যাবো হাওড়া ও ২৪-পরগণার কয়েকটি কলকারখানায় এবং সময় থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পরিষদে।

বুধবারও আমাদের অভিযান শুরু সূর্যো-দয়ের কিছু পরে। প্রথমে দাশনগরে ইণ্ডিয়া মেশিনারিতে। তারপর ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাকটরিতে ও অবশেষে বজবজে কেশোরামে এবং একটি ব্যাংকে। সর্বত্র একই নিয়ম, একই নীতি। প্রত্যেকটি কারখানার চত্বরে নানান খেলার ব্যাপক ব্যবস্থা। যারা কায়িক পরিশ্রম করেন, যারা অফিসে বসেন তাদের সকলের জন্যই একই নীতি। খেলার জন্য প্রতিদিন একঘণ্টা ছুটি। স্কুল কলেজে যেমন টিফিন দেওয়া হয় ছেলেমেয়েদের, এখানেও তেমনি আলাদা বন্দোবস্ত। খেলায় প্রত্যেক কর্মীকে অংশ নিতে হয়। এই আবশ্যিক ব্যবস্থা চালু করে কর্তৃপক্ষ উৎপাদনের ব্যাপারে আশ্চর্য ফল পেয়েছেন। পনের বছর আগে ত এমন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এখন উৎপাদন বেড়েছে ৪০ গুণ। প্রতিটি কারখানা সমীক্ষা করে দেখেছে শতকরা ৮০ ভাগ

কর্মী এখন অতিরিক্ত মেডিকেল বেনিফিট নেওয়া বন্ধ করেছেন। কারণ, নিয়মিত শরীর চর্চার জন্য অধিকাংশেরই স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে। কাজে উৎসাহ বেড়েছে। জেসপের ওয়েলফেয়ার অফিসার একটি চিঠি দেখালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর। মন্ত্রীমহোদয় অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন: সারা ভারত আজ জেসপের জন্য গর্বিত। কারণ, সদ্য সমাপ্ত অলিম্পিক গেমসে ভারত যে ২৫টি সোনা জিতেছে তার ৭টিই জেসপের কর্মীদের প্রয়াসে মিলেছে। তারা দুটি নতুন রেকর্ডও করেছে অ্যাথলেটিকসে।

কারখানাগুলোর সমীক্ষা থেকে বীরুদা স্পষ্ট বুঝলেন, এখন জাতীয় প্রতিযোগিতায় এশিয়ান গেমস বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে বাংলা বা ভারত যত পদক পাচ্ছে তার শতকরা ৪০ ভাগ কলকারখানার বা অফিস কাছারির কর্মী। আর ওঁরা ওই সব অনন্য কৃতিত্বের জন্য পাচ্ছেন স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট ও প্রমোশন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পরিষদ খেলাধুলোর ব্যাপারে একে অপরের পরিপূরক। পরিষদ যেমন স্কুলে খেলাধুলো আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজে কলেজেও। থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালে ৫০+৫০=১০০ নম্বর। আরও ৫০ নম্বর দেওয়া হয় যারা রাজ্য, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গিয়ে পদক পায়। বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিষদের নিয়ম-কানুনও কড়া। নতুন কলেজ বা স্কুলের অনুমোদন চাইলে প্রথম শর্ত খেলার মাঠ রাখতেই হবে।

বীরুদা এতক্ষণ পরে প্রশ্ন তুললেন: বললেই হল?

—হ্যাঁ, আমার জবাব।

বীরুদা: আগে ত কলকাতার অধিকাংশ স্কুল কলেজের খেলার মাঠ ছিল না। তারা কী করছে। সেখানে খেলাধুলো কম্পালসারি হয়েছে?

—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের অফিসার জানালেন: শুরুতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তখন সমস্যার সুরাহা করা হয় অঞ্চলভাগ করে। যেমন দক্ষিণের ৩০টি স্কুল—যাদের মাঠ নেই তারা বিবেকানন্দ পার্কে বা রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন মাঠে খেলবে। বিভিন্ন স্কুলের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এমনিভাবে উত্তরের স্কুলগুলো দেশবন্ধু পার্কে। এখনও সমস্যা কিছু রয়েছে—তবে তা শুধু কলকাতায়। কিন্তু অধিকাংশেই মেটানো হয়েছে জুয়াড়িদের আড্ডা ও পড়ে থাকা পার্কগুলোকে সক্রিয় করে। যাদের মাঠ নেই, তারা কাছাকাছি পার্কে দিন ভাগ করে খেলছে। কলেজগুলোও তাই করছে। তবে স্কুল এরিয়া গেমস হচ্ছে ক্লাবের হলে। যেমন বকসিং, বোগব্যায়াম, ভারোত্তোলন, টেবল টেনিস, দাবা ইত্যাদি।

যেসব স্কুল কলেজে যত খেলা চালু রয়েছে প্রতি ৫০জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন করে সংশ্লিষ্ট খেলার কোচ রয়েছেন। সবার উপরে চিফ ও ডেপুটি চিফ কোচ। প্রতিটি স্কুল কলেজে মেডিকেল ইউনিট ও স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞরাও রয়েছেন। মধ্যশিক্ষা পরিষদের খেলাধুলোর ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানালেন, যেসব বিদ্যায়তনের ভিতরে বাড়তি জায়গা ছিল তারা এখন আধুনিক সুইমিং পুলও গড়ে তুলেছেন।ওরা চান না, আগের মত কিস্তি করে হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার, টালা, পদ্মপুকুর বা রবীন্দ্র সরোবরকে ব্যবহার করতে। সাঁতারের ব্যাপারে বীরুদা সবচেয়ে তারিফ করেছিলেন কিন্তু কেশোরাম ও তমলুকের সুইমিং পুলের।

ওঁকে দেখালাম কলকাতার স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য চারটি ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে দুটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। খেলাধুলোয় অগ্রণীদের জন্য ওখানে বিশেষজ্ঞ রেখে বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থা আছে। যারা আন্তঃরাজ্য স্কুল বা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ায় যোগ দেয়—তাদের জন্য রেসিডেন্সিয়াল কোচিংও হচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ বুধবারে বীরুদাকে তেমন ক্লান্ত মনে হল না। তাই বৃহস্পতিবারেই শেষ দিনের সরেজমিন হবে স্থির হল।

ঠিক হল, এদিন বীরুদা খেয়ালে খুশি মত ঘুরবেন কলকাতায়। তবে এদিন আর সাত সকালে নয়—বাত্রা শুরু দশটা নাগাদ। কলকাতায় এসে ইস্তক ওর বড় অভিযোগ ছিল এখানকার সি এ বি, আই এফ এ ও বি এইচ এ সম্পর্কে। বৃহস্পতিবার বের হওয়ার মুখে আবার ওই কথা তুলতেই জানালাম, এখন সি এ বি লীগে কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছেমত সেঞ্চুরি করতে পারে না। কাউকে বোলিং-এ হ্যাটট্রিক করানোর ব্যাপারটা তিরোহিত। হকি ও ফুটবল লীগে গড়াপেটা করে কোনো নির্দিষ্ট দলকে চ্যাম্পিয়ন বা অবনমনে বাধা করা এখন আর সম্ভব নয়। আই এফ এ, বি এইচ এ ও সি এ বি থেকে গোষ্ঠীতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটেছে বহুদিন। ওখানকার কর্তাদের উপর সি বি আইয়ের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে না।

বীরুদা নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম দেখে ত আগেই অবাক হয়েছিলেন। যখন শুনলেন ইডেনে এখন দু লাখ দর্শক অনায়াসে বসতে পারেন এবং ক্রিকেট টেস্টের সময় যখন খুশি এসে টিকিট পাওয়া যায়, তখন ত চক্ষু ছানাবড়া। আরও জানালাম, টিকিট কালোবাজারে ত যায় না, এমন কি বড় বড় ক্লাবের জন্য টিকিটের কোটা নির্দিষ্ট থাকে না। তবে যারা ক্রিকেট খেলে তারা ডিভিশনের তারতম্য অনুযায়ী সর্বাধিক আড়াইশ ও সর্বনিম্ন পঞ্চাশখানা টিকিট পায়। আগে সি এ বি-র যেমন বাক্স-সদস্য ছিল, এখন তা নেই। নতুন নিয়মে শুধু তাদের অনুমোদিত ক্লাব বা জেলা অ্যাসোসিয়েশনই সদস্য হয়। আর টিকিট পায় যেসব কলেজ বা স্কুল নিয়মিত ক্রিকেট খেলে।

বীরুদা ইডেনের নবরূপ—ইংল্যান্ডের ওয়েমব্লি স্টেডিয়ামের নতুন সংস্করণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করলেন। স্টেডিয়ামেই রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা। রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, কত কী? খেলার সঙ্গে যুক্ত বাক্তিদের কম খরচে এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। এখানে আর আগের মত ফুটবল হয় না। ফুটবলের জন্য ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে পূর্ণাঙ্গ তিনটি স্টেডিয়াম গড়ে উঠেছে। ময়দানে দশ হাজার দর্শকের ছোট স্টেডিয়াম আরও তিনটি—ভলিবল, বাস্কেটবল ও কবাডির। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বক্সিং-এর পৃথক স্টেডিয়াম। আমাদের গাড়ি এবার উত্তরে গেল। কলেজ স্কোয়ার ও হদ্‌রা ঘিরে বিশ হাজার দর্শকের ঢাকা স্টেডিয়াম। এমনি স্টেডিয়াম দক্ষিণ পদ্মপুকুরে ও রবীন্দ্র সরোবরের পূব দিকেও। আগে রবীন্দ্র সরোবরে যে স্টেডিয়ামটি ছিল এখন সেখানে বছর ভর অ্যাথলেটিকস চলে। বাংলার সেরা অ্যাথলীটদের জন্য সারা বছরের জন্য আবাসিক ট্রেনিং ব্যবস্থা ওখানে।

দক্ষিণ থেকে ফিরে পি জি হাসপাতালের গা ঘেঁষে ময়দানের দিকে আসছি, রেসকোর্সের ধারে বিরাট এলাকা জুড়ে থাকা প্রাসাদোপম বাড়িগুলিতে বীরুদাকে নিয়ে গেলাম। প্রবেশ ফটকের নেম প্লেটে অতীতের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম দেখে তিনি অবাক। ওদের নাম এখানে কেন?

বীরুদা বা আমাদের কৈশোরে আমরা যাদের খেলা নিয়ে মাতামাতি করতাম তাদের নাম দেখে অজানা কার না কৌতূহল জাগে। কারুর কারুর সঙ্গে বীরুদাকে দেখা করিয়েও দিলাম। ওর বুঝতে বাকি রইল না—প্রাক্তনদের আবাস এটি। সরকারই এই ব্যবস্থা করেছেন। বিনা ভাড়ায় থাকা খাওয়া পরা ছাড়াও সরকার প্রতি মাসে এদের হাত খরচও দেন।

এরপরেও বীরুদার জিজ্ঞাসার শেষ হয়নি। প্রশ্ন তুললেন, সেই সল্ট লেক কী হয়েছে, কিংবা টালিগঞ্জের রেস কোর্স।*

হাতে সময় না থাকায় ওদিন ওই দুই জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে পারিনি। শুধু জানিয়ে দিলাম, টালিগঞ্জের রেস কোর্সে এখন প্রতিদিন ৪০টি স্কুলের নানা খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। আর সল্ট লেকে আগামীবার হবে এশিয়ান গেমস। তার জন্য সব ব্যবস্থাও পাকা। এখন গেমসের ক্রীড়া তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে।

তৃতীয় দিনের শেষে ডিনারের টেবলে বসে আমার ৫ইতে দশ বছরের বড় বীরুদা আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, পনের বছর দেশত্যাগী থাকায় আগের ধারণা নিয়েই হো হো করে হেসে-ছিলাম তোর কথা শুনে।

বীরুদা সব অজ্ঞতার কথা নিজের কাঁধে চাপিয়ে অনুশোচনায় সুরে বলছিলেন: নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গত পাঁচ-সাত বছরে ভারতের ফল দেখেও আমার আগের ধারণার বদল হওয়া উচিত ছিল।

অবশেষে স্বীকার করলেন, দেশটা অনেক পাল্টে গেছে। খেলাধুলায় এমন উন্নতি বলে দিচ্ছে এদেশের শিক্ষা দীক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সব কিছুতেই বিপ্লব ঘটে গেছে এই ক'বছরে।

পুনশ্চ: বীরুদাকে আমাদের রাজ্য ক্রীড়া পরি-ষদের কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই রচনা মারফৎ তাকে জানাচ্ছি—কল-কাতার পরিষদের সদর দফতর থাকলেও প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, থানা এমন কি ব্লক পর্যায়েও পরিষদের কার্যালয় রয়েছে। নাম যথাক্রমে জেলা, মহকুমা, থানা ও ব্লক ক্রীড়া পরিষদ। ব্লক পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক খেলায় জন্য পৃথক পৃথক কোচ রয়েছেন। আছেন স্পোর্টস অফিসার ও অরগানাইজার। ওই ব্লক পর্যায় পর্যন্ত সরকারই সরঞ্জাম সরবরাহ করেন প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ত বটেই, এমন কি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনেও।

—

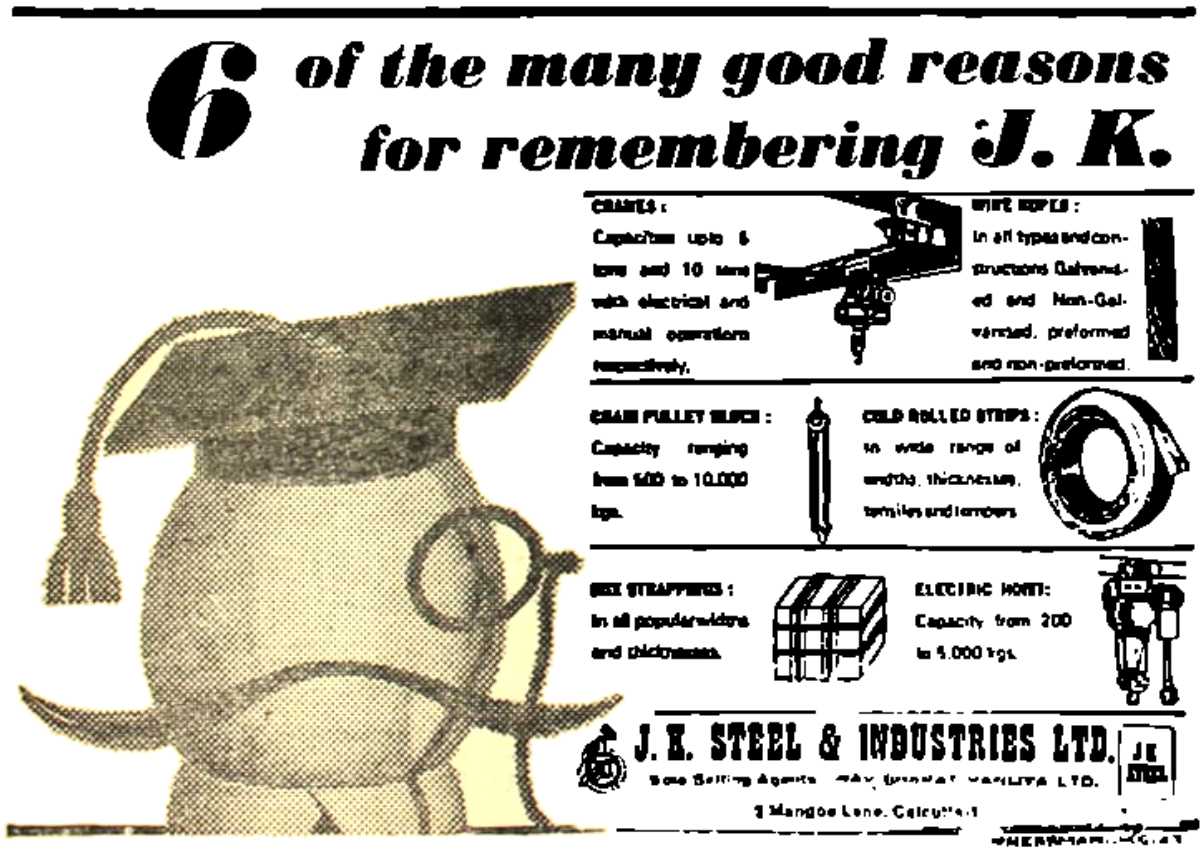

জীবনের প্রয়োজনেই খেলার প্রয়োজন

মতি নন্দী

শুধু ভারতবর্ষ বা পশ্চিম বাংলাই নয়, যন্ত্র-শিল্পে অনুন্নত দেশ মাত্রেই খেলায় পিছিয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগে সংগঠিত ও নিয়মিত খেলার চাহিদা প্রথম এসেছে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে, য়ুরোপ এবং প্রধানত ইংল্যাণ্ডে। হাতে সময় থাকলে শিল্প-সাহিত্যের মত খেলা নিয়েও মেতে থাকা যায়। প্রাচীন গ্রীসে তাই হয়েছে। বয়স্ক নাগরিকরা উৎপাদনের জন্য কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছিল, যেহেতু ক্রীতদাসরাই সে কাজ করত, ফলে তারা দীর্ঘ সময় খেলার জন্য দিতে পারত। একালেও তাই হল। শিল্প বিপ্লব মানুষকে মুক্তি দিয়ে নতুন এক শৃঙ্খলে আবার বাঁধল।

সূর্যের অবস্থান এবং ঋতুর পরিবর্তন থেকে যে মানুষ একদা সময়ের হিসাব কষতো, শিল্প-বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ পরিবেশে ঘড়ি ধরে সে দিন যাপন শুরু করল। ক্ষেতে খামারে, জঙ্গলে, খালে, নদীতে জীবন ধারণের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ত। খেলার মারফৎ শরীরকে তৎপর রাখার বা ভাঙ্গী পেশীগুলিকে নাড়াচাড়া করার কোন প্রয়োজনই সে বোধ করেনি, দরকারও হত না।

কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক মানুষ কর্মস্থল থেকে সন্ধ্যায় যে শরীরটাকে বহন করে আনে, সেটাকে খাটাবার কোন সুযোগই সে সারাদিনে পায়নি বা প্রচণ্ড খাটুনির পরে বিশ্রামের আরামটুকু কেমন তা সে জানে না।

সুতরাং শহর ও শিল্পাঞ্চলের লোকের কাছে শরীরকে খাটাবার জন্য খেলা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল একাধিক নতুন কারণে; খেলা তাকে দৈহিক আনন্দের সুযোগ করে দেয়, নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে বহুবিধ লোকের সংস্পর্শে আনে, কিছু পরিমানে স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব প্রদান করে; নবলব্ধ অবসর ভরিয়ে তোলে এবং প্রমোদ ব্যবসায়ের এই নতুন শাখাটি অবলম্বনে কিছু লোক অর্থ উপার্জনেরও সুযোগ পায়। শিল্পোন্নত, সমৃদ্ধ দেশে খেলা করার তাগিদ তাই স্বতঃস্ফূর্ত। ওই সব দেশের মানুষকে যন্ত্র অবসর এনে দিয়েছে এবং অবসর ভরাতে বা দৈনন্দিন ছক-কাটা একঘেঁয়ে কাজ ভুলতে, উপভোগ্য ও সৃজনাত্মক যে কটি পথ সাধারণ মানুষের সামনে খোলা আছে, খেলাই তার মধ্যে প্রধান।

শিল্পোন্নয়নের যে স্তরে পৌঁছলে সাধারণ মানুষ ভোগ করার মত অবসর পায়, ভাঙ্গী পেশী-গুলোকে খাটাবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভব করে, ভারতবর্ষ বা পশ্চিম বাংলা সেই গন্তব্য থেকে অনেক দূরে। এদেশ এখনও কৃষিপ্রধান, দারিদ্র্য ও মধ্যযুগীয় ভাবনায় আচ্ছন্ন। ১৯৭১ এর জন-গণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৬৮·৩০ জন কৃষিতে নিযুক্ত। পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বাস করেন। এই রাজ্যের ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে কলকাতা করপোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ৩১ লক্ষ। বেকার সমস্যা গিলে রেখেছে পশ্চিমবাংলাকে; উঠতি ছেলেমেয়েরা আধপেটা খেয়ে অবসন্ন; হাজার রকমের দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে জীবন নির্বাহের কড়ি সংগ্রহের ধান্দায় মানুষ সারাদিন চরকির মত ঘুরছে, দেহে ও মনে জীর্ণ শহুরে মধ্যবিত্তরা নিত্য গৃহে ফেরে ধুঁকতে ধুঁকতে, শতকরা ৯০ জন অনাহার ও অর্ধাহারের সঙ্গে উদয়াস্ত লড়াই করে চলেছে কৃষি ও দিনমজুরের হাতিয়ার নিয়ে— এই পশ্চিম বাংলার মানুষ তাহলে খেলার জন্য আগ্রহ বোধ করবে কেন? করার কোন কারণও নেই। খাটুনির উপর খাটুনি কে করতে চাইবে?

টেকনোলজির ও বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের চিন্তায়, শরীরে, পারিবারিক সামাজিক গঠনে যে রূপান্তর আনে তার অন্যতম প্রকাশ খেলার প্রসার ও বিকাশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। সংগঠিত খেলা সব দেশেই লালিত হয়েছে এবং হচ্ছে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে। যেহেতু নিঃসঙ্গতা, অবসর, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজন এখানেই বেশী অনুভূত হয়। আধুনিকতার অভিঘাতে প্রথম চঞ্চল হয়ে ওঠে শহর ও শিল্পাঞ্চলই, গ্রাম নয়।

পশ্চিমবাংলায় এখনো সেই অবস্থা আসেনি যে জন্য বিচ্ছিন্নতাবোধ বা অবসর নিয়ে চিন্তায় পড়া যায়। খেলার অমোঘ প্রয়োজন অনুভব করার মত প্রগতি এখানে অনুপস্থিত। টুর্নামেন্ট খেলানো ছাড়া খেলার আর কোন তৎপরতা এ রাজ্যে নেই।

রীতিমত আন্দোলনের মারফৎ পশ্চিমবাংলায় বয়স্কদের সচেতন করা দরকার জীবনের প্রয়োজনে খেলার গুরুত্ব কতখানি। আমাদের গত ষাট-সত্তর বছরের খেলার অবস্থা লক্ষ্য করেই এ ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মানসিকতায় খেলার গুরুত্ব অনুপস্থিত। লক্ষ্য করুন আমাদের প্রাত্যহিক জীবন কিভাবে কাটে। আমাদের শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, অর্থাৎ সংস্কৃতিতে বিন্দুমাত্রও খেলার স্থান নেই। এমনকি রন্ধনে, আহারে, শয়নের সময়ের মধ্যেও বাছবিচার, শৃঙ্খলা নেই। এগুলো দীর্ঘকাল ধরেই হয়ে আসছে, ফলে পুরুষানুক্রমে ঢিলেমিও চলে আসছে। খেলোয়াড় হবার জন্যই নয়। সুস্থ সবল হয়ে জীবন যাপনের জন্য যতটুকু শরীরিক ক্রিয়া দরকার শতকরা একজনও তা করেন না।

ভিৎ চওড়া না হলে বাড়ী উঁচু করা যায় না। যতবেশী ছেলেমেয়ে খেলতে শুরু করবে ততই আমরা উঁচুমানের খেলোয়াড় পাব। আমাদের সব গরীব দেশে কম জায়গা নিয়ে এবং সস্তায় সম্ভব এমন ধরনের খেলার প্রসার দরকার শরীরকে নাড়াচাড়া করবার জন্য। একজন চ্যাম্পিয়ান শুধু কোচ, ট্রেনিং বা আহারের দ্বারাই তৈরি হয় না। তার মানসিকতা, চারপাশের ঘটনা, আবহাওয়ার দ্বারা গঠিত হয়। সে যদি শুধু বিশৃঙ্খলা, অশিক্ষা, দুর্নীতি, দারিদ্র্য এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু দেখতে না পায়, তাহলে যতই মদত দেওয়া হোক একটা পর্যায়ে পৌঁছে সে আটকে যাবেই। শরীর এবং মন দুটোরই সমান্তরাল অগ্রগতি দরকার। আমাদের দেশে কোনটিই এগোচ্ছে না। একটি চ্যাম্পিয়ান তৈরি করতে হলে দশ হাজার লোককে নিত্য ব্যায়াম বা খেলা করতেই হবে।

অদ্ভুত এবং অবাস্তব অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা যথাসাধ্য খেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং জাতীয় পর্যায়েও সফল হচ্ছে। ভাবলে তখন ওদের প্রতি শ্রদ্ধা আসে।

প্রমীলা ফুটবল

অজয় বসু

মানতেই হবে যে পশ্চিম বাংলার মেয়েদের ক্রীড়া দক্ষতা প্রায় সহজাত। সুযোগ সুবিধে তেমন নেই, সামাজিক অব্যবস্থার সমস্যা আছে, সংস্কারের রক্তচক্ষু শাসানিও রয়েছে। তবু এতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা খেলাধুলোর এক একটি বিভাগে দেশ জোড়া নাম কিনে নিচ্ছেন।

সাঁতারে পশ্চিম বাংলার মেয়েদের ঐতিহ্য তো সুপ্রাচীন। বাণী ঘোষ, লীলা চ্যাটার্জি, আরতি সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসুদের সাফল্যের ধারা কালান্তরে লতিফা আলি, ইলা পালের আচরণের মধ্যে প্রবাহিত ও প্রতিভাত। ওঁরা জনে জনে সারা ভারতের সেরা।

খেলাধুলোর আরও কটি বিভাগের দিকে দৃষ্টি মেললে বোঝা যাবে যে ওসব ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার মেয়েদের জুড়ি মেলা ভার। বাস্কেট বলে ও ক্রিকেটে পশ্চিম বাংলার মহিলা দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। চলতি বছরে জাতীয় ভলিবলে পশ্চিম বাংলা দল দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠের সম্মান পেলেও গত বছরে তার স্বীকৃতি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠের। আর জাতীয় ফুটবল আরম্ভের লগ্নটি নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতার সংশয়াতীত স্বাক্ষরে চিহ্নিত করে দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার মেয়েরাই।

কোনো সন্দেহ নেই যে মহিলাদের জাতীয় ক্রীড়ার, বিশেষতঃ দলগত খেলাধুলোর আসরে পশ্চিম বাংলা এক সাড়া জাগানো নাম। আমাদের মেয়েরা যে ঘরের ছেলেদের টেক্কা দিয়ে চলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া সমাজের একপেশে ব্যবস্থাপনায় ছেলেদের অনুপাতে মেয়েদেরই সুযোগ সুবিধায় বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে।

ভারতবর্ষে মহিলাদের জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন ঘটেছে এবারই, আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে। রাজ্যে রাজ্যে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘটার আগেই হয়েছে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এবং তা হওয়া মাত্রই পশ্চিম বাংলা সেই আসরে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করে নিয়েছে। ফুটবলে পশ্চিম বাংলার মেয়েদের এই সাফল্য যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি অর্থবহ। তাঁরা পুরো একটি পদও নিবিড় অনুশীলনের সুযোগ পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা ভারতকে নতি স্বীকারে বাধ্য করাতে পশ্চিম বাংলার মহিলা ফুটবলারদের অসুবিধে হয় না।

জাতীয় স্তরে এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, পশ্চিম বাংলার মহিলা মহলে ফুটবল সম্পর্কে নতুন উৎসাহের জোয়ার জাগবে। নতুন নতুন ক্লাব গজিয়ে উঠবে। খেলোয়াড়দের সংখ্যাও চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বেড়ে যাবে। তারই পরিণামে মহিলাদের ফুটবলে পশ্চিম বাংলা সম্প্রতি যে ইতিহাস রচনা করেছে সেই ইতিহাসের অধ্যায় দিনে দিনে রাঙা দলের সাফল্যের আঁচড়ে সমৃদ্ধতর হতে থাকবে এবং বাস্তব অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করে আমরা ক্রীড়ানুরাগীর দল আমাদের মেয়েদের ক্রীড়া দক্ষতার প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবো। বলবো, ওঁরা আমাদের গর্ব।

কিন্তু সার্বিক কল্যাণে মেয়েদের ফুটবল যে অভিপ্রেত সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারবো না। যেহেতু বিষয়টি সত্যিই বিতর্কিত।

কাল এগিয়ে চলেছে। পুরনো ধ্যান-ধারণার বদলে নতুন চিন্তা ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে আমাদের মনে। এই মন মানে যে খেলাধুলোয় যোগদানের সুযোগ ও অধিকার মহিলা মহলের উদ্দেশ্যে আরও প্রসারিত করা উচিত। তবে সে সুযোগ ও অধিকার অবাধ হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে কিন্তু সংশয় আছে।

মেয়েদের ফুটবল সম্পর্কে একদা কিন্বমত ছিল ঘোর বিরোধী। স্বয়ং আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনই ছিল বিরোধী পক্ষের মূল প্রবক্তা। কালে বিভিন্ন পক্ষের চাপে পড়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের পূর্বমত অনেকটা নরম হয়ে গেছে। এই চাপ প্রবলভাবে এসেছিল পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে। কারণ মহিলাদের ফুটবলের ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানীর উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এবং অধুনা সে দেশে প্রমীলা ফুটবল মোটামুটি সাংগঠনিক ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু পশ্চিম জার্মানী এবং আরও কয়েকটি দেশের উৎসাহ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন ফুটবল খেলা মেয়েদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। যেহেতু তাঁদের শারীরিক কাঠামোর গঠন ভিন্নতর।

ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক গঠনে ফারাক দুস্তর। মেয়েদের শ্রোণীচক্রের হাড় অপেক্ষাকৃত চওড়া হলেও হালকা। তাঁদের মেদ বেশি। জংঘার হাড় অন্তর্মুখী কাঁধ সরু। বিচিত্র গঠন বিন্যাসে কোনো কোনো পেশী অবস্থা বিশেষে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এই সমস্ত কারণে ফুটবলের মতো শ্রমসাধ্য ও চড়া ধাতের খেলায়, যে খেলায় দৈহিক সংঘর্ষের আশঙ্কা আছে ও তাৎক্ষণিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকানো, বাঁকানোর ও ধাক্কা সহ্য করার দরকার পড়ে, সেই খেলায় জড়িয়ে পড়া মেয়েদের পক্ষে সমীচীন নয় বলেই কেউ কেউ মনে করেন।

তাঁদের আরও অভিমত, স্বাভাবিক কমনীয়তা, লাবণ্য ও শ্রীর প্রতিচ্ছবির পরিপ্রেক্ষিতেই মেয়েরা মেয়ে। তাঁরা ফুটবল খেলতে সুরু করলে এই প্রতিচ্ছবি কি ম্লান হয়ে যাবে না?

বিষয়টি বিতর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন রুশ শারীর চর্চার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের প্রধান ডাঃ এন ক্রেভসকায়াকে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করে দিতে বলেছিল। ডাঃ ক্রেভসকায়া আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিরও সদস্য। তিনি যে অভিমত দিয়েছেন তা ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের মুখপত্রে ১১৭ নং সমাচার হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

ডাঃ ক্রেভসকায়া বলেছেন যে, ফুটবল খেলা মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক। বল কাড়াকাড়ি করার কালে বিভিন্ন শিরা উপশিরা ও যৌন গ্রন্থি ইত্যাদি জখম হয়ে যেতে পারে। অপরপক্ষের কিকের পর সজোরে ধেয়ে আসা বলের ধাক্কায় শ্রোণীচক্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। তাছাড়া বুক পেতে বলের গতিরোধ করার প্রয়াসে মেয়েরা বক্ষদেশে বড় রকমের আঘাত পেতে পারেন। সব মিলিয়ে ডাঃ ক্রেভসকায়ার অভিমত মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং সেই অভিমত শিরোধার্য জ্ঞানে রুশ স্বাস্থ্যমন্ত্রকও স্বদেশে মেয়েদের ফুটবল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ডাঃ ক্রেভসকায়া তাঁর সুপারিশে অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, অসিচালনা, সাইক্লিং, স্কুটিং, জিমনাস্টিকস ইত্যাদি আটচল্লিশ রকমের খেলাধুলার নাম করে বলেছেন যে, মেয়েদের শারীরিক গঠন এই সমস্ত খেলার উপযোগী। কিন্তু ফুটবল, নৈব নৈব চ।

ডাঃ ক্রেভসকায়ার অভিমত জানার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, প্রমীলা ফুটবল প্রসঙ্গে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সঠিক পথ বাতলানোর উদ্যম দেখাচ্ছেন না কেন? ফেডারেশন এদেশের শারীরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে প্রমীলা ফুটবলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট পরামর্শ দিতে পারেন। না জেনে, না বুঝে একটা কাজে জড়িয়ে পড়ার আগে সবদিক চিন্তা করাই তো বিধেয়।

পশ্চিম বাংলায় যাঁরা মেয়েদের ফুটবলের আয়োজন করছেন তাঁদেরও বিশেষজ্ঞদের মতামত

গ্রহণ করা উচিত। তাঁরা নিজেরা খেলেন না। অল্প-বয়সী মেয়েদের খেলান। যাঁরা খেলছেন তাঁরা না হয় অপরিণত বুদ্ধি। কিন্তু যাঁরা খেলাচ্ছেন তাঁরা বয়স্ক। খেলায় উৎসাহের যোগান দেওয়ানোর নামে তাঁরা অল্পবয়সীদের শারীরিক সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন না, খতিয়ে তা দেখে নেওয়া ভাল।

প্রমীলা ফুটবল ঘিরে আজ সত্যি চিন্তা ও গবেষণা করার সময় এসেছে। এবং সে লগ্নের গুরুত্ব ঐতিহাসিক। যতোদিন এ সম্পর্কে সংশয়ের নিরসন না হয় ততোদিন ফুটবলের মতো বহু বিতর্কিত অনুষ্ঠান নিয়ে মেয়েদের মাতামাতির প্রয়োজনই বা কি? আরও তো হরেক রকম খেলা-ধুলোর ব্যবস্থা রয়েছে। সৌন্দর্য ও কমনীয়তার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য অর্জন করতে হলে সে সব খেলায় আত্মস্থ হয়ে থাকা কি কল্যাণকর নয়? বিতর্কের অবসান না ঘটা পর্যন্ত ফুটবল না হয় শিকেয় তোলা রইল? তাতে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

Space Donated by :

a Well Wisher

THE CABLE THAT LEADS POWER

33 YEARS

IN THE SERVICE OF THE NATION

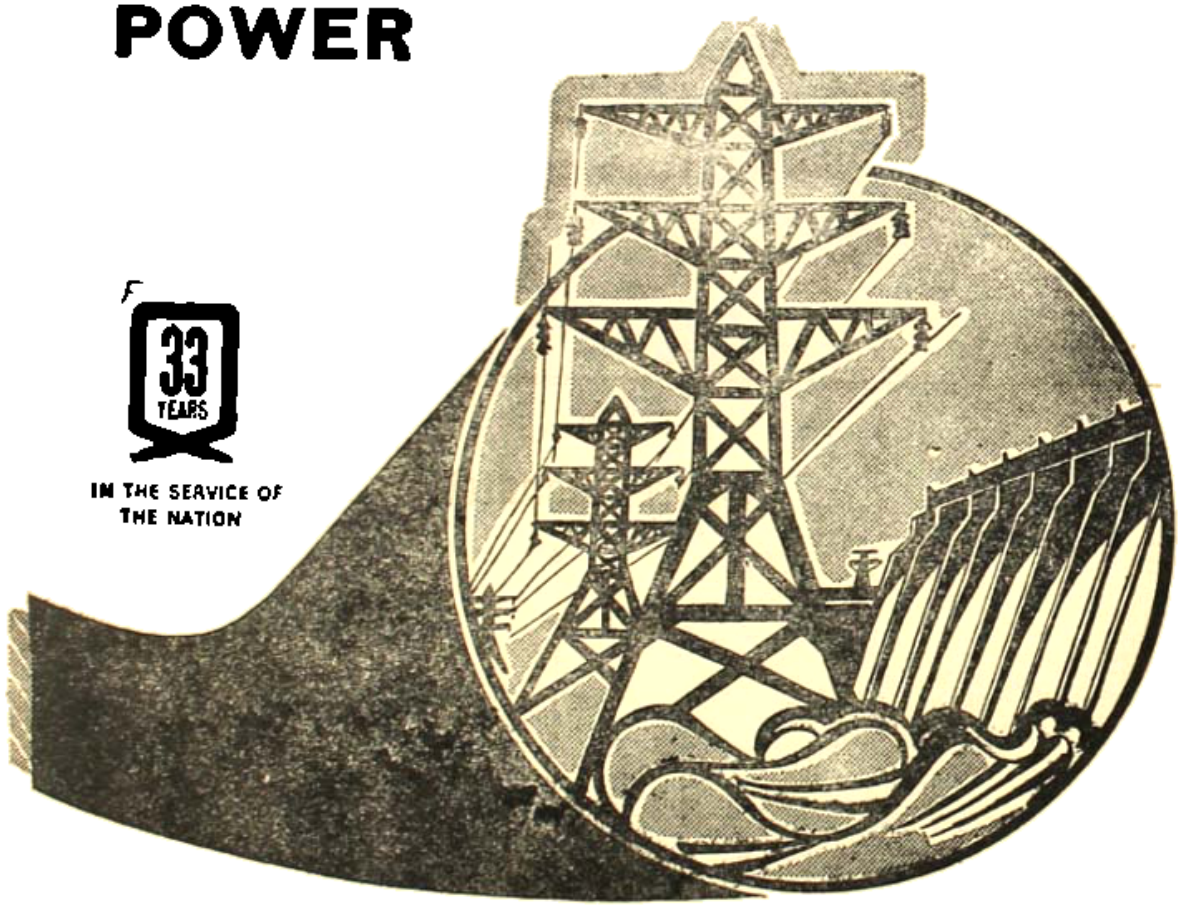

WIRES NICCO CABLES
DEPENDABLE - DURABLE

THE NATIONAL INSULATED CABLE CO. OF INDIA LTD.

NICCO HOUSE 2, HARE STREET, CALCUTTA-700 001
DIVISIONAL OFFICE : Kashmere Gate, Post Box No. 1644, Delhi-6.
REGIONAL OFFICE : 49, Wallajah Road, Madras-2.
SALES OFFICE : 3-6-16-7, Himayat Nagar, Hyderabad.164-B, N. Tapoti Marg, Indore, Pension Lane, Burdwan, Cuttack, Sikaria Building, 1st Floor, A. T. Road, Gauhati.
AGENCIES DIRECT : Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Jaipur, Kanpur, Lucknow.

শরতের কথা ও গান

সন্তোষকুমার ঘোষ

এই তো, ক'দিন আগেই সকালে উঠে রেডিওটার কান মলে দিতে না দিতে, সুরেলা গলাতেই হোক কিংবা অসুরেলা গলায়, অনিবার্য বেজে উঠত বর্ষার গান। আমি অবশ্য বলছি প্রধানত রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা, যে-সঙ্গীত আমার বিশেষ করে প্রিয়, আমার প্রাণ, প্রত্যহের স্নান। বেতারের ওইটেই বিধি, বেতারের ওইটেই রীতি, এবং সন্দেহ নেই যে সেটা অত্যন্তই প্রাকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে। যেহেতু জগতে ছুটি আর যারই থাক, ঋতুচক্রের ছুটি নেই, তাই সময়োচিত গানের প্রবাহ অব্যহমান। আষাঢ়ে আষাঢ়, শ্রাবণে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের বেলায় আবার শ্রাবণেই মনে হয় সংখ্যায় বেশি (গীতিসুমারি করিনি, মানে গুনে দেখিনি)। তারও হেতু সম্ভবত এই যে তাঁর কর্ণ-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের চেতনায় সজল ওই বর্ষা ঋতুটির দ্বিতীয় মাসটির আবির্ভাবই ছিল সঘনতর বিশাল কায়ার এবং মায়ার—হয়তো-বা আষাঢ়ের চেয়েও। জীবনের ঘটনার অন্য কোনও অনুষঙ্গও সক্রিয় ছিল কিনা বলতে পারব না। তবে অতীতের প্রতি আকৃতি, স্মৃতির ক্ষমাহীন ক্ষান্তিহীন নিরন্তর অনুসৃতি—শ্রাবণের প্রবল প্রচুর ধারায় ধারায় বারে বারে এই দেখি। এক বিপুল বেদনার বিরাট বিস্তারও পাই। কখনও-বা সেই বেদনা অপরূপ এক-একটা ছবিরও আকার নেয়। শ্যাম-সমারোহের কম্পিত ব্যাকুল পরিবেশে স্বপ্নেও যেন ওড়ে কার কেশরাশি, গানের বাণীকে নিয়তির মতো অমোঘ পাকে পাকে জড়ায়।

আবার, শুধু কি বেদনা? কবির অনেক-খানি আশাও যেন পরম মমতায় গচ্ছিত বিশেষ ওই মাসটিকে নিয়ে রচিত গানে আর গানে। সে গান শ্রাবণে শ্রাবণে ফিরে আসবে কোনও উজানের বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে; সেই স্রোতে বারে বারে ভিড়বে একটি তরণী—বাহি তার সন্ধান। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় ভরসার বাণী ওইটাই।

এই সুরে কি বাজেনি তাঁর অপরাপর ঋতু সঙ্গীতে—"গীতবিতানে" "প্রকৃতি" নামে যাদের বিভাগীয় পরিচয়? বেজেছে অবশ্যই। তারও প্রমাণ পাব যদি খুঁটিয়ে দেখি। কোনো গ্রীষ্মে, শরতে, শীতে, হেমন্তে—এবং বসন্তে তো নিশ্চয়ই। আন্তরিক ঐশ্বর্যে আবেদনে আর অভিজ্ঞানে তাঁর বসন্তের গান বর্ষার সবচেয়ে কাছাকাছি, প্রবলতম প্রতিস্পর্দ্ধী। অর্থাৎ বলার কিছু কথা আছে। তাকে নানাভাবে উজাড় করে দিয়েছেন "পূজার" গীতাঞ্জলিতে, প্রেমের সকরুণ-বেণু নিবেদনেও—তবু বর্ষা আর বসন্তের গানে পট-ভূমিকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে ঢের দূরে চলে গেছে বলার কথাটাই। বসন্তে বসন্তে একটি ডাক শুনতে পান তিনি, চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় মনের বেদন কার? একটুকু ছোঁওয়া আর একটুকু কথা দিয়ে রচিত হয় ফাল্গুনী।

আর সর্বোপরি, সেই ফাল্গুনে ফুরোনোর বেশ কিছুকাল পরে যখন ঘনিয়ে আসে বর্ষণ-মন্দ্রিত অন্ধকার? সেই বর্ণনাও তুলনাতীত, তবু কোন্ বনপথ থেকে যেন তিনি কুড়িয়ে আনেন মল্লিকা-মঞ্জরী—কোনও ভাগ্যবতী তাকে বেণীবন্ধে তুলে নেবে, মাত্র এই দুরাশায়। অর্থাৎ ফুলটা নিলেন ওই নারীকে, আর নিজের জন্যে কবি রাখ-লেন কী? মাত্র আশাটুকু—আর কিছু না। কিংবা শ্রাবণ আকাশে যখন মেঘে মেঘে মেলে নেন জল ছলছল আঁখি, তখন স্মরণ করেন শ্যামল তমাল বনে কোনও পথ ধরে কবে কে যে চলে গিয়েছিল—তাকে। সে কে? কবি শুধু বলেছেন "সে"। সেই অপরিচিতার নাম নিয়ে আসেননি জনতার সরণিতে। ওই গানের আসল কথাটি শুধু এই: "যে গিয়েছে দেখার বাহিরে/আজি তারি উদ্দেশে চাহি রে।" সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া-টুকুকে নতুন করে তৈরী করবেন বলেই বুঝি গানটির বাকীটা। একটি পুনরায় প্রাপ্তির তবে সবটার প্রস্তুতি।

অন্যান্য ঋতুর গানেও এর আভাস আছে;

তবু বুঝি এতখানি নয়। বৈশাখকে যে মৌনী তাপস বলা, সে মুখ্যত একটি নিপুণ নির্মাণ, অবার্থ তুলির একটি অঙ্কন। দারুণ অগ্নিবানে দগ্ধ বন্দরের প্রথম মাসটি "রক্ত নয়ন মেলে" নিষ্ঠুর মৃত্যুক্ষুধার ন্যায় তাকিয়ে থাকে—এই চিত্রেরও তুলনা অল্পই। আবার তৃষাতপ্ত বিরহীর নিরুদ্ধ নিশ্বাসেরই পাশাপাশি ধ্যানমগন আঁখি"—কল্পনা হিসাবেও পবিত্র সেই রুদ্রের রূপ ভয়াল এবং বিশাল। তথাপি সব গান কিন্তু এই অন্যতর মহত্তর আয়তন পায়নি, পড়েনি প্রলম্বিত কোনও মায়াবী ছায়া—সব ঋতুর প্রকৃতি গানে আপনাকে অতিক্রমকারী আকৃতি পেয়েছে, এ-কথা বলা চলে কি?

বিশেষ করে শীত আর হেমন্তের সম্পর্কে কবি যেন একটু বেশিই কৃপণ। "আজি এল হেমন্তের দিন/কুহেলি বিলীন"—এই ছত্রটুকু যেন শুধুই প্রসঙ্গত একটি রীতিরক্ষা, নতুবা "সেদিন আমায় বলেছিলে/আমার সময় হয় নাই —হয় নাই" এই খেদটুকুকে ভাষা দেওয়ার অপেক্ষা। হেমন্তের মুষ্টিমেয় অন্যান্য গান কয়টিতে এই ঋতুটির বাইরের ধূসর রূপটি যত প্রকট, তাদের মর্মবাণীও ততটাই গৌণ।

কিন্তু লিখছি শরৎকালে, তাই শরতের কথা দিয়েই শেষ করি। কবিতা হিসেবে "আজি কি তোমার মধুর মূরতি" যদিও অকিঞ্চিৎকর, শেষ বর্ষণের বিখ্যাত একটি গীতিতে "কেতকীর" সঙ্গে "যেত কি" মেলানো মূলত মিলেরই চমক ; অন্যথা এর কথাটি খুব মূল্যবান কিছু নয়। তথাপি বেশ কয়েকটি গানে শরৎ ও শ্রাবণ আর ফাল্গুনের গৌরবের উজ্জ্বল অংশীদার হতে পেরেছে বৈকি। শিউলি ফুল অজস্র ঝরেছে শারদ প্রাতে : আলোর কমল বনে বিহার করেছে শরৎ আর "শরৎ-তপনে প্রভাত-স্বপনে" উদাস রাগিনীটির ভণ্গী অবসাদে ক্লান্ত, কিন্তু শব্দের পর শব্দে, দীর্ঘশ্বাসের পর শ্বাসের আঘাত, অভিঘাতে সে অসামান্য অনর্গল।

তার হেতু? শরতের নিজস্ব অজস্র সম্পদ রয়েছে যে! আকাশের টলটলে নীল ; বাতাসে আনন্দময়ীর আগমনীর আলাপ ; সর্বোপরি নিশিভোরে বাজে কার বাঁশি?—ছুটির। এ-ছুটি সকলের, বাঙালী মাত্রের। যাদের নেই, তারাও দূরের হাতছানি দেখতে পায়, ব্যাকুল বাঁশরি শোনে, চঞ্চল হয়, এমন-কী কোথাও যাবে না যারা (কেন না না-আছে ছুটি, না পাথেয় ও উপযুক্ত অর্থ), তারাও বুঝি শুধু টাইমটেবিলের পাতা উলটে উলটে জানা-অজানা ইস্টিশানের নামের পর নাম খালি পড়ে যায়। আমি দেখেছি। একবার দেখেছি কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে এক জংসনে প্লাট-ফরমে—যে কোনও গাড়ি এসে দাঁড়ালেই সে বিস্ফারিত চোখে কামরার মাথায় লটকানো "দিল্লি—পাটনা—লখনউ—এমন-কি বারাউনি-সমস্তিপুর"-এর নাম-লেখা ফলকগুলি অপলক পড়ে যায়। কোথাও যাবে না, যেতে পারবে না সে। তবু দূর স্থানের নামগুলি পাঠ করেই যাওয়ার মনোগত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, সুদূরের সাধ আর পিপাসা মেটায়। এখনও এমন অনেক দিদিমা-ঠাকুমারা বর্তমান, যাঁরা অশক্ত, চলচ্ছক্তিহারা, তবু সুর করে করে পড়ে যান প্রাচীন কাব্য—যাতে লেখা আছে সেই সব সময়ের বৃত্তান্ত, যখন রাজ-রাজড়ারা এই শরৎকালেই বের হতেন মৃগয়ায়।

আর ছুটি পাক না পাক, কোনোখানে যাক কিংবা না-ই যাক, সমাজের বিরাট একটা ভাগের আকর্ষণ যে শারদীয় সাহিত্য-সম্ভার? তা-তো রইলই। যারা কেনে না, কেনার সাধ্য-সামর্থ্য নেই যাদের, তাদের অনেকে অন্তত স্টলে দাঁড়িয়ে বিস্তর পত্রিকার পাতা ওলটাবে নিশ্চয়? এমন-কি নাক কুঁচকে যারা বলবে "দূর, দূর, কিস্সু হয়নি", দৈনন্দিন অস্তিত্বের পারের কোনও ঠিকানা কি তারাও পাবে না—অন্তত কিছু-কিছু নান্দনিক রচনায়? যাচাই কিছু কথা ও কাহিনীতে, কবিতার সুষমায়? শরতের এই অমল মহিমা সকলের জন্যেই—সাধ্য নেই কারও যে ক কেড়ে নেয়। এই নীল-উন্মীল ঋতুর বাণী-টিকে যারা আত্মস্থ করতে পারবে তার সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, তাদের কানে নবতর ব্যঞ্জনার নিশ্চয়ই বাজবে আরও কিছু, অনেক কিছু, বিশেষ করে শরতের আগমনী আর বিজয়ার গান!

দুটি প্রশ্ন ॥ কিছু উত্তর ॥ একটি অনুরোধ

তরুণ মজুমদার

বাংলা ছায়াছবি সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই মনে হয়—নতুন কোন কিছুই বুঝি আর বলবার নেই, সবই বলা হয়ে গিয়েছে। সেই এক-টানা দুঃখ আর দুর্দশার পাঁচালী—বাংলা ছবির নাভিশ্বাস উঠেছে, বাইরের ছবি এসে বাজার দখল করে ফেলল, দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসংখ্যা কমে গেছে, আসামে-বিহারে-উড়িষ্যায় আমাদের ছবি চলছে না, সরকার বাহাদুর শুধু হাত পেতে নেবার বেলায় দড়—কিছু দেবার বেলায় অণ্টরম্ভা, —এসব শুনতে শুনতে কানের পোকা প্রায় খসে যাবার জোগাড়। তবু, আশ্চর্য, বাংলা ছবি মরছে না। ঘুড়িয়ে হোক, হামাগুড়ি দিয়ে হোক, চলেই চলেছে।

কিন্তু কেন? এই আশ্চর্য জীবনীশক্তির পেছনের কারণটা কি? —এই হল প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এভাবে আর কদ্দিন চলা সম্ভব?

প্রথম প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করার আগে কিঞ্চিৎ ভূমিকা দরকার। বোঝা দরকার, বাংলা ছবির জনপ্রিয়তার ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে কবে থেকে, এবং কি কারণে। নিজেদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য যেসব কারণগুলো সচরাচর দেখানো হয়ে থাকে—তার সব কটিই যথেষ্ট যুক্তি-গ্রাহ্য এবং শক্তিশালী কি না। যথা—

(ক)—বাইরের ছবি এসে বাজার দখল করে ফেলল: আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এই দখল করার সুযোগ করে দিয়েছে কারা? নিজেদের দুর্গ সুরক্ষিত থাকলে কি আর বাইরের শত্রু চট করে অতটা কব্জে পেত? কিন্তু পেয়েছে যখন, তখন এটা মানতেই হবে, লখীন্দরের লোহার বাসরে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও সাপ ঢোকবার মতো ফুটো ছিল। সেই সাপ এখন অপরুচির ফণা বিস্তার করে মুহুর্মুহু ছোবল মারছে। আমরা মুহ্যমান। আমরা এখন সাপের দোষ দেখছি, কিন্তু ফুটোর দোষ দেখছি না। কেননা, তা দেখতে হলে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। সেটা যথেষ্ট সুখপ্রদ নয়।

আরো সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা, যারা ইদানীং বাংলা ছবির দুর্দশা দেখে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছি,—তারা স্রেফ ভণ্ড আর সুবিধেবাদী ছাড়া আর কিছুই নই। কোথায় ছিল আমাদের দরদ, যেদিন বাংলা ছবি এই সব তথাকথিত "সংকট"-এর আবর্তে জড়িয়ে পড়েনি! ধরুণ, স্বাধীনতা-পূর্ব দিনগুলোর কথা! কবে আমরা ছায়াছবিকে সংস্কৃতির অঙ্গনে সত্যিকারের মর্যাদার আসন দিয়েছি? কবে মনে করেছি, সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলার মতো সিনেমাও শিল্পীর আত্ম-উন্মোচনের অদ্ভুত একটি মাধ্যম,—অতএব একে ভালোবাসা দরকার, সযত্নে লালন করা দরকার, জাতীয় সম্পদজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার? আমরা করিনি, কারণ সিনেমা সম্পর্কে সে ভালোবাসা, দরদ অথবা দূরদৃষ্টি কোনদিনই আমাদের ছিল না। থাকলে পরে দেবকীকুমার অথবা প্রমথেশচন্দ্রের স্মৃতি এত অল্পেই বিবর্ণ হয়ে যেত না। জাতীয় শিল্পীর মর্যাদায় এঁরা অভিষিক্ত হতেন দেশবাসীর মানস-সিংহাসনে।

এই চেতনাহীনতার মাশুল গুণতে হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে—যখন হঠাৎ বেনো-জলের মতো হু হু করে বাইরের ছবি আমাদের বাজারে ঢুকে পড়ল। মুহূর্তে দেখলাম, চারদিক কর্দমাক্ত। একটা পিচ্ছিল অনুভূতি আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পদস্খলিত করে পাতালের দিকে টেনে

নিয়ে চলল বিপুল বেগে। পতনের আগে দুর্যোগ-ভরা আকাশে বায়ুযানের যাত্রীরা যেমন বাম্পিং (bumping) -এর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন—আমাদের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। খেয়াল নেই, সর্বনাশ আসন্ন। কিন্তু এর জন্য অন্যকে দোষ দিলে চলবে কেন? কেন সময় থাকতে নিজেরা পায়ের নিচের মাটিকে শক্ত করিনি? সিনেমাকে দেবী সরস্বতীর পায়ে নিবেদিত স্থলপদ্মের অর্ঘ্য না ভেবে বারবণিতার খোঁপার ফুল ভেবেছিলাম কেন? সে দোষ কার?

(ঘ) **দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসংখ্যা কমে গেছে:** সত্যি কথা। কিন্তু মাত্র প্রথম কয়েক বছর। তারপর আবার বাড়তে শুরু করেছে। ওপার বাংলা থেকে আসা লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষেরা কি নতুন দর্শকশ্রেণী তৈরী করেন নি? জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ব্যাপারটা কি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়? জিজ্ঞেস করে দেখুন যে কোন সিনেমা হলের মালিককে, আগের তুলনায় এখন সিনেমার দর্শক বেড়েছে না কমেছে। সে দর্শক বাঙালী হয়েও বাংলা ছবি দেখতে আসে না কেন, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

(ঙ) **আসামে-বিহারে-উড়িষ্যায় আমাদের ছবি চলছে না:** কথাটা যদিও সর্বতঃ সত্য নয়, তবু তর্ক এড়াবার খাতিরে না হয় আপাততঃ মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন করি, পশ্চিমবাংলাতেই বা অসমিয়া অথবা ওড়িয়া ছবি কটি দেখানো হয়? (বিহারের প্রশ্ন তুলছি না, কারণ বিহারের নিজস্ব কোন ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি নেই।) আমরা যদি এখানে তাদের ছবির বাজার তৈরী করে না দিই তো তাঁরাই বা আমাদের বেলায় অতটা সদয় হবেন কেন? তাঁদের নিজেদেরও তো নানা ধরনের সমস্যা আছে—টিকে থাকার সমস্যা, আঞ্চলিক ভাষায় ছবি তৈরী করে সর্বভারতীয় ভাষার বড়-বাজেটের ছবির সঙ্গে লড়াই করার সমস্যা। সে সব সমস্যার সমাধানে, কৈ, আমরা তো কখনও হাত মেলাই না।

(চ) **সরকার বাহাদুর, যাকে বলে, মূর্তিমান:** এখানে এসেই মুখ খুলতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা। বিশেষতঃ, 'ইমার্জেন্সী পিরিয়ড' চলছে, শুনেছি কড়া সেন্সর চারদিকে। তবু যদি প্রশ্ন করেন তো কানে কানে বলি, চাইলে সরকার বাহাদুর হয়তো আরো একটু সদয় হতে পারতেন। তাতে এমন কিছু ক্ষতি হত না। যে হাঁস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করে তার পেট চিরে [...বাকিটা খুব কড়া শোনাতে পারে, তাই আর লিখলুম না।]

শুধু সদয় নয়, অন্য দিকে খানিকটা কঠিন হওয়াও দরকার ছিল। অপসংস্কৃতির অপদেবতাদের ওপর। দেশগড়ার কাজে একটার পর একটা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে,—এসব কিসের জন্য? না, বর্তমানের কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়েও ভবিষ্যতের ছবিটাকে যাতে বেশ খানিকটা উজ্জ্বল করে তোলা যায়—তারই জন্য। কিন্তু, কি সেই ছবি? কিছু সংস্কৃতিগতভাবে দেউলিয়া লোক ভালো বাড়িতে বাস করে, সুন্দর টেবিল-চেয়ারে বসে গোগ্রাসে চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় উদরসাৎ করছে—তাদের আর শারীরিক কোন অভাবই নেই—এই কি আমাদের স্বপ্নে দেখা সেই ছবি? এরই জন্য দেশবাসীকে ত্যাগ-স্বীকারের আহ্বান জানানো হচ্ছে? হা কপাল! বিষবৃক্ষের ফলগুলি যদি দেখতে সুন্দর হয়—তবেই কি সাত খুন মাপ? মূলোচ্ছেদের আর কোন প্রয়োজনই পড়ে না? 'প্রমোদ' নামক মাধ্যম-টিকে আশ্রয় করে জাতির সাংস্কৃতিক চেতনায় যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে অহরহ—যারা দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে 'মিসা'-র প্রয়োগ হচ্ছে না কেন? খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে শরীর নষ্ট করা যদি দণ্ডনীয় হয়, সংস্কৃতিতে ভেজাল মিশিয়ে মনের সর্বনাশ করা তাহলে দণ্ডনীয় হবে না কেন? [বড্ড কড়া শোনাচ্ছে কি? বাদ দেওয়া উচিত?]

যাই হোক, মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। কথা হচ্ছে, এত সব ডামাডোলের মধ্যেও বাংলা ছবি বেঁচে আছে কোন্ মন্ত্রে? কিসের জোরে?

এক ॥ সৌভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে এমন কিছু সৃজনশীল শিল্পীরা পদার্পণ করেছেন,

যাঁদের প্রতিভা শিল্পগতভাবে বাংলা সিনেমাকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গৌরব হয়তো আগে থাকতেই কিছু কিছু পাওনা ছিল। কিন্তু বিদেশী স্বীকৃতি ছাড়া তো আমাদের কৃপণ হাতের ফাঁক দিয়ে কোন দাক্ষিণাই গলতে চায় না। তবু, মন্দের ভালো, শেষ পর্যন্ত তা গলেছে। এবং, সব সময় নিজেরা পছন্দ না করলেও, বাইরের লোকদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার জন্য মাঝেমধ্যে এ সব ছবির পৃষ্ঠপোষকতাও আমরা কর্তব্য-কর্মের মধ্যে গণ্য করছি ইদানীং। তাতে আর কিছু না হোক কিছু ভালো ছবি কখনো কখনো চলে যাচ্ছে।

দুই ॥ অন্য কিছুসংখ্যক পরিচালক আছেন যাঁরা একাধারে সুস্থ ছবি ও জনপ্রিয় ছবি তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁরা বুঝতে পেরেছেন, জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশীদিন আত্মরক্ষা করা যায় না। অথচ জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ীই যে ছবি হবে—তা সে যে কোন রুচিরই হোক—এমন অসাড় চিন্তাও এঁদের পেয়ে বসে নি। সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, জনসাধারণের রুচিকে অন্ততঃ একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম—এমন ছবিই এঁদের কাম্য। যখন সফল হন, তখন জনতার সমর্থন আপনা থেকেই এসে পড়ে। কখনো কখনো বা এরই ভেতর থেকে শিল্পগুণসমন্বিত সত্যিকারের কিছু স্মরণীয় ছবিও বেরিয়ে পড়ে।

তিন ॥ বাংলাদেশের নারীসমাজ। এখনো, গর্বের সঙ্গে বলতে হয়, দর্শক হিসেবে অপরুচির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। রুচিকে আঘাত করে—এমন ছবি দেখতে সাধারণতঃ এঁরা উৎসাহিত বোধ করেন না।

চার ॥ বাংলা সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ বাংলা ছবির কাহিনী নির্বাচন করা হয় প্রকাশিত ছোট গল্প বা উপন্যাস থেকে। কাজেই, মূল সাহিত্যের রস ও শক্তি কমবেশি ছবিতেও সঞ্চারিত হয়ে যায়।

এই গেল প্রশ্নের উত্তর। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল,—এভাবে আর কদ্দিন চলা সম্ভব?

বেশী দিন নয়। দেশের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটলে, শিক্ষার সুফল জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়লে—শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যিকারের সমঝদারি আশা করা মুস্কিল। এই পরিবর্তন আসতে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখনো বেশ কিছু দিন দেরী। ইতিমধ্যে যে সময় পার হয়ে যাবে তার মধ্যে বাংলা ছবিকে (এবং যে কোন ভালো রুচির ছবিকেই) 'লুজিং ব্যাটেল' লড়ে যেতে হবে। যতদিন না এই লড়াইয়ের পরিণতি হিসেবে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—ততদিনই তার আয়ু। এই হচ্ছে পরিষ্কার হিসেব।

দেশের যুবশক্তির কর্ণধার যাঁরা, তাঁদের ভেবে দেখতে বলি—ইতিহাসের এই বিষাদঘন করুণ অধ্যায়ের তাঁরা কি শুধু নীরব সাক্ষী হয়েই নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন? রাজনৈতিক লড়াইতে যুবশক্তিকে যেমন ব্যবহার করে থাকেন—সাংস্কৃতিক লড়াইতেও কি তা করা যায় না?

With the Compliments of :

★

WALFORD TRANSPORT LIMITED

71, PARK STREET, CALCUTTA-700016

Branches at : SILIGURI and DURGAPUR

Jeeps, Ambassador Cars, Hindustan Trucks, Mini Buses, Lambretta Scooters, Perkins Diesel Engines.

With Best Compliments from

Inter-State Transport Agency

134/1 Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-700007

"The Bengal Bus Syndicate, which much regrets the sufferings of passengers due to the want of sufficient number of buses, has been trying its best to improve the situation as early as possible. It appeals for co-operation of the travelling public by payment of the approved enhanced stage fares, which are indispensable for saving the motor bus industry from ruin. The endorsed fare-tables are exhibited inside all buses."

BENGAL BUS SYNDICATE

(Incorporated in India)

6, LENIN SARANI

Calcutta-13

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান

শান্তিদেব ঘোষ

ইয়োরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। এর কদিন পরেই তিনি কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠান করলেন, একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন, জোড়াসাঁকোয় একদিন গুরুদেবের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী নিভৃতে সাক্ষাৎ করে গেলেন, তার পরে দেখা গেল তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে, পুজোর ছুটির পূর্বে, "স্বপ্নশোধ" নাটকের অভিনয়ের জন্যে মহড়া সুরু করেছেন। শান্তিনিকেতনে অভিনয় হলো—আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহের গোড়াতে, পুজোর ছুটি আরম্ভের আগের দিন। এত রুক্ষমের নানা প্রকৃতির কাজের মধ্যেও পরবর্তী পৌষ উৎসবের সময়ে বিশ্বভারতীকে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কাজও নানাভাবে করে যাচ্ছেন।

দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে না পারার জন্যে দেশের একদল নেতার মন গুরুদেবের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠায় তিনি যে কতখানি নিরাশ হয়েছিলেন, তা জানা যায়, তাঁরই লেখা, তখনকার দুটি চিঠি থেকে। প্রথমটিতে বলছেন:—

"এবারে দেশে ফিরে এসে অবাধ আমার শান্তি নেই বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলই ইচ্ছে করে চারিদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই—।"

এর পরেই প্রমথ চৌধুরীকে ১৮ই কার্তিক লিখছেন:—

"প্রমথ, আমার মনটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে—সেইজন্যেই কেনো রীতিমত লেখায় হাত দিতে পারিনি। মন বলে যে, পৃথিবীর উপকার করা তোমার কাজ নয়। ঐ কাজে বিস্তর লোক লেগেছে, আর ভিড় বাড়ালে বসুন্ধরার ভার হরণের জন্যে খুব মজবুত গোছের অবতারের দরকার হবে। অত্যন্ত গম্ভীর কর্তব্যগুলো দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে তা নয়, হাসি পায়। মনে হয় ওর বারো আনাই মুখোশ পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেছি তার মহিমা আমাকে আর ধাঁধিয়ে রাখতে পারছে না।"

"জরুরী চিঠি জরুরী প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিস নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠছে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তারা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রেরই মতই...।"

"...দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে, সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর। যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, 'তিনি আবার কে? এক ত আছেন বন্দেমাতরম'। তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বলতে হচ্ছে—'আমার বন্দেমাতরম ভুলিয়েছেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় তারা গুণ্ডা—অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার সুরু হয়েছে। 'মরার বাড়া গাল নেই' আমাদের ভাষায় বলে, সে

কথাটা মিথ্যে। মরাটা গাল নয় মরার ভয় করাটাই গাল।"

"আমার মন মাপের গর্তর মধ্যে আর কোনদিন দেবতা খুঁজবে না। বুঝতে পেরেচি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেছি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্, আমি আর কথা কইব না।"

"আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে।"

কলিকাতায় ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি "বর্ষামঙ্গল" নাম দিয়ে যে সঙ্গীতানুষ্ঠানটি গুরুদেব করিয়েছিলেন, বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়, টিকিট করে, এইরূপ অনুষ্ঠান পূর্বে কখনো হয়নি শান্তিনিকেতন থেকে। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের একদল যে এই অনুষ্ঠানটিকে ভাল মনে গ্রহণ করেন নি সে খবর গুরুদেবের এই চিঠি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এ বিষয়ে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় তিনি তাঁর গানেতেও রেখে গিয়েছেন। সে যুগের, অর্থাৎ ১৩২৮ সালের ভাদ্রমাসের "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠানটির পর পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবের পূর্ব পর্যন্ত রচিত কটি গান থেকে তা জানা যায়। গান কটি হল :—

১। "হায় গো, বাধায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো।"
যায় গো।"

২। "আমায় দাওগো বলে সে কি তুমি।"

৩। "পাছে সুর ভুলি যে ভয় হয়।"

৪। "সময় কারো যে নাই ওরা চলে দলে দলে।"

৫। "আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও।"

WOOLCOMBERS OF INDIA

is helping to achieve self-sufficiency
in the wool industry

In the drive towards self-sufficiency, Woolcombers of India Ltd. do all that foreign combers do, and do it cheaper.

We offer a complete range of services from sorting, scouring and combing to dyeing of tops. We operate strict quality control at every stage ensuring the very best service for our customers.

We have got satisfied clients in Australia and Europe. And of course the bulk of India's wool industry come to us.

WOOLCOMBERS OF INDIA LIMITED

Delhi Office :
Hindusthan Times House,
18-20, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001
Tel : 385471-73

Regd. Office :
31, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001

IN TECHNICAL COLLABORATION WITH WOOLCOMBERS LTD. OF BRADFORD, ENGLAND.

With best Compliments from

Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.

Manufacturers of

Mining and Material Handling Equipment in India

ভোজ

(রম্যরচনা)

মনোজ বসু

গগনসর্দার এবং আসাননগরের আর কয়েকটি মাতব্বর করজোড়ে নিবেদন জানাল: শ্রাদ্ধের ভোজটা সামনের বুধবারে। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেই কবে শ্রাবণ মাসে চুকেবুকে গেছে, ভোজ এতদিন মুলতুবি রেখেছিল। এই সব বিলেন মানুষের নিয়ম এই। বিয়ে অন্নপ্রাশন হলে তারিখ ঠেলেঠুলে যায়—ফাল্গুনে এনে ফেলত ধান-কাটা বিল শুকিয়ে ঠা-ঠা করে যখন। খরার ব্যাপারটা মানুষের হাতে নয়—শ্রাবণের দারুণ ভরার মধ্যেই হয়তো কেউ মারা গেল। যেমন এই গগনসর্দারের বাপ। শাস্ত্রীয় কাজকর্মগুলো, তেমন ক্ষেত্রে, নমো নমো করে সেরে রাখল। ভোজে মহচ্ছব কাণ্ড—সেইটে বাকি রেখে দেয়। ভোজ হবে ফাল্গুনে যখন শীত চলে গেছে, বিলের জমি শুকিয়েছে পৌষ মাসের খরা পেয়ে। হবে ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে, নবমী-দশমীর আগে কদাপি নয়। কেন না ভোজ সারা হতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে, নিমন্ত্রিতেরা আসবে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর থেকেও। তারা যাতে জোৎস্নার আলোয় পথ দেখে বাড়ি ফিরতে পারে।

একুশ গ্রামের সমাজ—মানুষ খাবে অন্তত-পক্ষে ছয় হাজার। তবু তো বাইরের গাঁয়ের মেয়ে-ছেলে বাদ, নেহাৎ যারা ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব সেই কয়েকটি ছাড়া। বড় ভোজে একসঙ্গে পংক্তি-ভোজনে বসবে কম সে কম চার হাজার, গাঁয়ের মেয়ে ও কুটুম্ব—মেয়েদের নিয়ে আলাদা এক প্রস্থ হাজার খানেকের মতো। আরও হাজার খানেক ধনিজবাড়ি খাটাখাটনি করছে, কাজকর্ম মিটিয়ে সর্বশেষে তারা খেতে বসবে। বড়ভোজের আট-দশ দিন আগে থেকেই সর্দারবাড়িতে মচ্ছব। কাজের লোক এসে পড়েছে—স্বশ্রেণীর জওয়ান-জওয়ানীরা। গ্রাম আসাননগরের, এবং বাইরের। খাও দাও, খাটো সব। বাড়ির নিচেই বিল। ধানবন ছিল, ধান কেটে নেওয়া সেইসব জায়গায় বহু দূর অবধি ধানের গোড়া—যার নাম নাড়া—তুলে ফেলে চৌরস করে ফেলেছে। দিনরাত্রি কোদাল মেরে মেরে করেছে, একটুও অসমান কোথাও নেই। পংক্তি-ভোজন ঐখানে। আর টিলার উপর বিশাল খেজুর বন—রাঁধাবাড়া সেইখানে হবে।

দেবনাথকে গগন আলাদাভাবে বলল, যাবেন কিন্তু ছোটবাবু। দেখেশুনে গরীবের বাতে মান রক্ষে হয় করবেন।

দেবনাথ এক কথায় রাজি: সকালবেলাই যাবো চলে। ভোজ দেখা শুধু নয়—এত লোকের রাঁধাবাড়া, সে-ও এক দেখবার জিনিস শুনেছি।

গগনেরা চলে গেল। ভবনাথ আপত্তি জানিয়ে বললেন, বিল ঠেঙিয়ে অত দূর যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তার উপর, ওষুধপত্তোর আজ তুমি, পথের রীতিমত ধরাবাঁধা। আমি বলি, গিয়ে কাজ নেই। গগনসর্দারকে আমি বুঝিয়ে বলব।

দেবনাথই নাছোড়বান্দা। সর্দারদের সামাজিক ভোজ কতকাল থেকে দেখব দেখব করছি—যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। এবারে হয়েছে তো তুমি আর বাগড়া দিও না দাদা।

সেই বুধবারের আগের দিন দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এসে উপস্থিত। মামা বল, তাঁকে সাথী করে নেওয়া যাবে। দেবেন্দ্র এসেই যথারীতি দাবা-বোড়ে সাজিয়ে নিয়েছেন। দেবনাথ বললেন, যেতে পারব না কিন্তু মিতে, আজ নয়, কালও নয়। আসাননগরের ভোজ দেখতে যাবো কাল। ফিরে এসে রাতের বেলা দু-এক কাপি চালানো যেতে পারবে।

দেবেন্দ্র সামান্য ইতস্তত করেন: তাই তো হে, মুশকিলে ফেললে। সেজমেয়ের বাড়ি রওনা হয়েছি, মেয়েটা পথ তাকাচ্ছে। পিতৃসেবা তার ভাগে একটা দিন কম হয়ে যাবে। তবে একত্রিশ দিনের মাস—হরেদরে পুষিয়ে যাবে এক রকম।

সন্ধ্যাবেলা ছানা কেটে সূর্য গোয়ালা নিজে এসে টাটকা ছানা দিয়ে যায়। দুই রেকাবিতে করে ছানা আর খেজুর টিনে আর গেলাসে জল এনে দিল নিমি। হুকুমের সুরে দেবনাথকে বলে, খেলা রেখে দিন কাকা। জল চাপিয়ে এসেছি, চা করে আনছি।

চা এবং চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এবার দেবনাথের সঙ্গে। কয়েকটা দিনের মধ্যে নিমি চা বানানো খাসা রপ্ত করে নিয়েছে। চা নিয়ে এলো, ধোঁয়া উড়ছে। দেবেন চক্রবর্তিরও এক কাপ। অবাক বিস্ময়ে তিনি দেবনাথের উপর তাকিয়ে পড়লেন।

দেবনাথ বললেন, আখ। গাছের পাতা দুধ-চিনি আর গরম জল—জাত যাওয়ার কিছু নেই।

চক্রবর্তী বলেন, ঠাণ্ডা হোক—

ঠাণ্ডা হলে খাওয়া যায় না। দেখ না, আমি কেমন খাচ্ছি।

দেখাদেখি দেবেন এক চুমুক মুখে নিয়ে নিলেন। নিয়েই ফুচ করে ফেলে দিয়ে বাঁচেন। জিভ মেলে হা-হা করছেন মুখ জুড়ানোর জন্য। গেলাসের জল হড়াম করে খানিকটা ঢাললেন চায়ের কাপে।

ও কি, ও কি না—বলতে বলতে দেবনাথ হাসিতে ফেটে পড়লেন। চক্রবর্তী বলেন, হাসছ কেন মিতে? গরম খৈয়ে খেয়ে তোমাদের মুখে কড়া পড়ে গেছে। আমার এই তো সবে সুচপাত—জিভে পড়তে ছাঁৎ করে উঠল। অভ্যাস হয়ে যাক, তখন কি আর জল ঢালতে যাব?

সকালে উঠেই আসাননগর যাবেন, দেবনাথ বেগ ধরেছেন। ভবনাথ অনেক কষ্টে নিরস্ত করলেন। না, আগেকার সে সব দিন নেই—খাওয়া সেরে তবে বাড়ি থেকে বেরুবো। খাওয়ার ব্যবস্থা না হয় তাড়াতাড়ি করে দেওয়া যাচ্ছে।

হল তাই, দুই মিতের বেরুলেন। আসাননগর ভারি তো দু-পায়ের রাস্তা—এর চেয়েও ভারি ভারি বিল ভেঙে জল ঝাঁপিয়ে এই দেবনাথ একদিন নথাড়ার স্টেশনে গিয়ে রেলে চাপতেন। গগনসর্দার ছুটোছুটি করে দুখানা জলচৌকি পেতে দিল বসবার জন্য। কিন্তু বসতে কে চাইছে ঘটকপুরে হয়ে? খেজুরবনে রান্নাবান্না, সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখে পলক ফেলবার উপায় নেই। ভোজ শুধু নয়, ভোজের রান্নাও বস্তুরমতো দেখার বস্তু।

এ-গাছে ও-গাছে বাঁশ বেঁধে বাঁশের উপর খেজুর পাতা ফেলে যৎসামান্য আচ্ছাদন করে নিয়েছে। সারবন্দি উনুন—ভোজের আসরে মানুষ যেমন সারি দিয়ে বসে, রান্নার উনুনগুলোও সেই প্রকার। একদিকে পুরুষেরা রাঁধছে। বড় বড় জওয়ানের প্রতিটি দল—রক্তমাংসের বদলে লোহায় গড়া মনে হয়, গায়ের উপর ঘা দিলে, টুং করে বোধ হয় বেজে উঠবে। পুরুষে রাঁধছে ভাত, তার মধ্যে কারিগরি নেই। মাটির বড় বড় তোলা হাঁড়ি—হাড়ির পর হাঁড়ি চাল ফুটেরেই যাচ্ছে কেবল। চাষের ক্ষেতে মই দেওয়া হয়—সেই মই দেদার এনে ফেলেছে। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মইয়ের খোপে রাখছে, রেখেই অমনি ভিন্ন হাঁড়িতে আবার চাপিয়ে দেয়। উনুনের বিশ্রাম নেই। মইয়ের পাঁচ খোপে পাঁচটা হাঁড়ি বসে গেল। আর একদল আছে—দু-দুজনে মইয়ের দুই প্রান্ত ধরে ডিঙির ধারে নিয়ে যায়। ডিঙি ও ডোঙা ধুয়ে সাফাই করে খেজুর বনে এনে তুলেছে—ভাত-ব্যঞ্জন রাখার পাত্র। ডিঙির খোলে ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে ঢালে। ফুটোফাটা দিয়ে ফ্যান বেরিয়ে যায়, ভাত যাবে। ক্রমাগত এমনি এনে এনে ঢালছে। ভাত চাই পাহাড় তুল্য। দু-হাজার মানুষের খাওয়া—শহরের বাবু ভেয়ে মানুষ নয় যে দু গ্রাস খেয়েই ঢেকুর তুলবে। এদের পাতের ভাত বিড়াল লাফিয়ে এপার-ওপার করতে পারে না।

মেয়েরা রাঁধছে অন্যদিকে। গ্রামবাসী মেয়েলোক, এবং এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব মেয়েলোক সব এসে পড়েছে। দুই সারি উনুন, সামনাসামনি—এদিকে গোটা পঞ্চাশ,

ওদিকেও তাই। উনুনের মুখের কাছে দু-খানা করে থান ইট। কালো কালো মাঝবয়সি জওয়ানী মেয়ে সব। কপালে বড় মাপের সিঁদুর ফোঁটা। চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরনে—শাড়ির প্রান্ত কসে কোমরে বেঁধেছে, চাপড়াশ এঁটেছে কোমরে, এমনি মনে হয়। সুপারির বাখারি চেঁচেছুলে মুখের দিকটা চওড়া রেখে খুন্তির মতন বানিয়েছে—সেই খুন্তি এক একখানা প্রতিজনার হাতে। আর আছে ওড়ং, নারকেল মালার দু'দিকে দুটো দুটো ছেঁদা করে ছিদ্রপথে বাঁশের শলা ঢুকিয়ে দেওয়া। হাতা-চামচের অনুকল্প। দরকারে এক একবার ওড়ংও হাতে তুলে নিতে হয়। ডাল-তরকারি রান্নার ভার মেয়েদের উপর—যে রান্না দেখতে বড় ভাল। এরা পঞ্চাশ আর ওরা পঞ্চাশ সামনাসামনি। খুন্তির মাথা ডাইনে গেল তো দুই সারির প্রতিটি খুন্তির মাথা সেইদিকে। বাঁ-দিকে ঘুরল তো সবগুলো খুন্তি বাঁয়ে। ফুটন্ত ডাল ওড়ঙে তুলে ছড়ছড় করে আবার হাঁড়িতেই ঢালছে পরখ করবার জন্য। দু' লাইনের সমস্ত ওড়ং ঢালছে ঠিক একই রকম। উঠে দাঁড়িয়ে তরকারি ধোবে তো এতগুলো রাঁধুনি সবাই উঠে পড়ল, জোড়া থানইঁটে বসবে তো সবাই পাশাপাশি বসে গেছে। রান্না নয়, নাচেরই বুঝি রকমফের। কি কি পদ রান্না হবে তারও মোটামুটি বিধি গড়ে উঠেছে—বিল অঞ্চলে বারভীয় ভোজের এক চেহারা। ব্যঞ্জনের প্রধান হল ডাল। কৃষ্ণমুগ তল্লাটে প্রচুর ফলে—ঐ ডাল অতি অবশ্য। তাছাড়া ছোলা কিম্বা মটর। মাছও দুই রকম—কই-মাগুর সিঙি-শোল ইত্যাদি বিলের মাছ। কিনতে হয় না, সারা বিলে অগণ্য কুয়া ছড়ানো, সর্দারেরা মালিক—যথা ইচ্ছা জাল ফেল গে, যা ওঠে নিয়ে যাও। এই মাছটা যাচাই—"নাও" "নাও" করে ক্রমাগত ঘুরবে, জোর করে পাতে ঢেলে দেবে। আর আছে পোনামাছ—রুই, কাতলা, মৃগেল—ডাঙা অঞ্চলের পুকুর থেকে পয়সা খরচা করে কিনতে হয়। পরিবেশনও তাই আটোসাটো—পাতা একখানা করে দেবে, খুব বেশি তো দু' খানা। আরম্ভে ডিতো তরকারি, শুকতো, মাছের কাঁটাকুটি দেওয়া—শেষ পাতে অম্বল। মিষ্টান্ন আছে পায়েস—দুধে আর খেজুর গুড়ে। দই নিয়মের মধ্যে নয়, গগনসর্দার বাহাদুরি করে দই দিচ্ছে, একুশগ্রামের সমাজে নাম গড়ে গেছে সেজন্য।

দুপুর গড়িয়ে যায়। নিমন্ত্রিতেরা এইবারে দেখা দিচ্ছে—উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চারিদিক-কার বিল ভেঙে পিল পিল করে সব আসছে। এসে এক মুঠো দু' মুঠো নাড়া নিয়ে এখানে ওখানে বসে পড়ল ভোজের জন্য নিকানো চৌরস জায়গাটা বাদ দিয়ে। হুঁকো-কলকে এনেছে অনেকেই, যজ্ঞি-বাড়িতেও নতুন হুঁকো-কলকে বিস্তর কিনেছে। জিনিসপত্র যা এনেছে নামিয়ে দিয়ে সাজো তামাক, আর দুই পা মেলে দিয়ে আরামে টানো যতক্ষণ না পংক্তিতে ডাক আসে। বাড়ির উপর এত যজ্ঞি, বাড়ির কর্তা গগনের তা বলে এতটুকু উদ্বেগ নেই। তার একলার কিছু নয়, সায় আসানেনগর গাঁয়ের মান-ইজ্জত এর সঙ্গে জড়িত। তাই বা কেন, একুশখানা গ্রাম জুড়ে সুনাম, দায় ঐ একুশ গাঁয়ের। যজ্ঞিবাড়ি খালি হাতে আসার নিয়ম নয়। ধান এখন ঘরে ঘরে, লোকের হাতে টাকা-পয়সা, মনে স্ফূর্তি। চাল দিচ্ছে প্রতিজনেই, ক্ষেতের ডাল, আলু, কাঁচকলা দিচ্ছে এবং অবস্থানুযায়ী নগদ দু'-দশ টাকা। নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে এলো, জিনিসপত্র আসতে লেগেছে তখন থেকেই, আজ তো একে-বারে স্রোতের ধারে। নিতে হবে হাসিমুখে সমস্ত হাত পেতে—না নিলে অপমান করা হল, তেমন ক্ষেত্রে কেউ তোমার বাড়ি পাত পাড়বে না। হতে হতে চালের তো মস্ত এক পাহাড়—মানুষের বদলে পংক্তিতে রাক্ষস বসে গেলেই বা কি, অত চালের আধাআধিও কাবার হবে না।

ডাক হল নিমন্ত্রিতদের। হুড়মুড় করে লাইন ধরে ধরে সব বসে পড়ল। বিলের যে নাড়া তোলা হয়েছিল, তাই বিছিয়ে দিয়েছে, বসা তার উপরে। সামনের কলাপাতায় ভাত তরকারি পড়বে। তেপান্তর বিল চারিদিকে, মাথায় মুক্ত আকাশ, আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, ঠিক যেন দিনমান। মানুষ দুশ' জন করে বসেছে প্রতিটি লাইনে, এমনি বিশ লাইন। লাইনের ভিতরে আবার

পাঁচ অংশ—এক দুই তিন চার খোটায় মাথার ইত্যাদি সংখ্যা এঁটে অংশগুলো চিহ্নিত করেছে। পরিবেশকের বুকেও সেই সেই নম্বর। মালকোঁচা আঁটা জোয়ান মরদ সব, গায়ে গেঞ্জি। দু-দুজনের উপর এক একটা অংশের দায়িত্ব—মোটমাট দুশ' আর দুশো জন এদের সাহায্যকারী, ভাত-তরকারি নিয়ে ছুটে এসে যারা হাতে তুলে দেবে। ওদিকে রান্নার জায়গায় আর এক দঙ্গল রয়েছে, খাবার জিনিস ডিঙি-ডোঙা থেকে যারা পাত্রে তুলেছে। ফাল্গুনে সন্ধ্যায় ফাঁকা বিলের দরদর ধারে। প্রতি ক্ষণে মুছতে হবে, কাঁধে কাঁধে ভিজে গামছা তাই।

পরিবেশকদের মাথা একজন, তারই উপর দায়িত্বভার। মানুষটার বাঁ-হাতে ঝাঁজ, ডান হাতে মুগুর। ঢং করে ঝাঁজে এক ঘা মারল। পরিবেশক যে যেখানে ছিল, নম্বর অনুযায়ী লাইনের মাথায় এসে দাঁড়াল। ঝাঁজে আবার এক ঘা। ঝুঁকছে তারা নিজ নিজ লাইনের দিকে। ঘোড়দৌড়ের মুখে ঘোড়ারা পা দাপাচ্ছে, দেবনাথের এমনি মনে হল। তৃতীয় ঘা পড়ল ঝাঁজে—আর রুখে নেই, লাইনে ঢুকে তীরবেগে সব পাতে পাতে দিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এমনি, সামনে লোক পড়লে পায়ে পায়ে সে লোক থেতো হয়ে যাবে। পরিবেশনের বাহাদুরি বল, খাবে প্রচুর, কিন্তু জিনিস নষ্ট হবে না, ফেলবে না পাতে কেউ। এবং সবাই সব জিনিস টপাটপ পেয়ে যাবে। এই যে পারে তার খুব সুনাম হয়। কিন্তু এই নম্বরে দিতে দিতে ভুল করে ঐ নম্বরে গিয়ে পড়ল কিম্বা লাইনের মানুষ খালি পাতা কোলে নিয়ে বসে রয়েছে জিনিস পাচ্ছে না—শাস্তি তার তক্ষুণি একেবারে নগদ নগদ। ঝাঁজ পেটানো হয়ে যাবার পর কর্তাব্যক্তিটি ঝাঁজ রেখে দিয়েছে, কিন্তু মুগুর রয়েছে হাতে। সেই মুগুর সহ ছুটে গিয়ে পড়বে।

সর্দারদের ভোজ দেবেন্দ্র চক্রবর্তী আগে একবার দুবার দেখেছেন, দেবনাথের এই প্রথম। এর আগে রান্নাবান্না দেখলেন—এখন পরিবেশন দেখছেন, খাওয়াও দেখছেন। সর্বনেশে খাওয়ারে বাবা! দেবনাথের মনে হচ্ছে, চোখের মণি বিস্ময়ে বোধ হয় মিঠেকুমড়োর আকারে এনে এনে, কোটর ফেটে ছিটকে বেরুবে। এমনি খাওয়া শেষ করে পাতের কোলে সামান্য যা পড়েছে খুঁটে খুঁটে পাতায় তুলে, বেশ খানিকটা দূরে কুয়োর মধ্যে পাতা ফেলে, আঁচিয়ে পান মুখে দিয়ে জোৎস্নার মধ্যে হেলতে দুলতে গল্পগাছা করতে করতে চার-পাঁচ ক্রোশ বিল ভেঙে সব বাড়ি ফিরে চলল।

দেবনাথদেরও ফেরা এবারে। ওঁরা খান নি। খাওয়ার জন্য ধরাপাড়া করেছিল খুব—গগন কর-জেড়ে বলেছিল, চক্রবর্তী মশায় ব্রাহ্মণ রয়েছেন, আলাদা পাকশাকের অসুবিধা কি?

খাওয়া সেরেই আমরা এসেছি, ও নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না—দেবনাথ বললেন। শরীর ভাল না, খাওয়ার বাদগোছ আছে অনেক, যখন তখন খেলেও হবে না।

অগত্যা ডাব পেড়ে দিল, তাই কয়েকটা খেলেন। সন্ধ্যার মুখে একজনে খেজুর রস পেড়ে আনল, খেলেন না। আজেবাজে কিছু নয় এখন—একটু আধটু যা মুখে দিতে হয়, একেবারে বাড়ি গিয়ে।

বিল ডিঙে দুইটিতে ফিরে চললেন। গগনের কনিষ্ঠ পবন আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। বাঁ হাতে লণ্ঠন, ডান হাতে কৈ মাছের ভাঁড়, মাথার উপর বিড়ের বসানো তোলো হাঁড়ি। চাল-ডাল-তরিতরকারি তেল-ঘি ইত্যাদি হাঁড়ির মুখে পরি-পাটি রূপে সাজিয়ে নাছোড়বান্দা গগন ভাইকে দিয়ে ষোলআনা দিয়ে পাঠাচ্ছে। আজকে না-ই হল তো কাল দিনমানে রাঁধাবাড়া করে সব খাবেন। জাওলা মাছ পাঠানোর উদ্দেশ্য, পচে যাবে না—এবং অসুস্থ দেবনাথের পক্ষে উপকারীও বটে।

টেক ওভার

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

॥ এক ॥

ট্রেনটা একটু দেরি করেই অণ্ডাল স্টেশনে এসে পৌঁছুলো। সাহিত্রীকে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামলো সুশান্ত, সঙ্গে সুশান্তর কাকা, ওর ছোটো ভাই, আরো কয়েকজন। অণ্ডালের রেলে কাজ করেন সুশান্তর বাবা বিরাজ ঘোষ। কলকাতায় বিয়ে করতে গিয়েছিলো সুশান্ত। বিয়ের পর কলকাতার বন্ধুবান্ধবেরা কলকাতাতেই

থেকে গেছে। অণ্ডালের ক'জনকে নিয়ে ফিরে চলে এলো সুশান্ত ট্রেনে করে।

স্টেশানেই সুশান্তর বাড়ির সবাই এসে-ছিলেন। বাজনা, শঙ্খধ্বনি সেই স্টেশান থেকেই।

কিছু মানুষ উৎসাহ করে একটু উঁকি দিয়েই চলে গেলো। অণ্ডালের প্রায় কর্মরত সব রেল কর্মচারীরাই স্টেশানে। সবাই যোগ দিয়েছে এ উৎসবে। বিরাজবাবুর ছেলের বিয়ে। সুশান্তকে ভালোবাসে সবাই। স্টেশানের কুলিরাও ভাবছে, এ তাদের নিজেদের উৎসব। কলকাতায় বরযাত্রী হয়ে গিয়ে এক সন্ধ্যার আতর আর রজনীগন্ধার আনন্দ থেকে এ-আনন্দ আরো বেশি। কলকাতায় বিয়ের পরেই রজনীগন্ধার ফুলদানি থেকে কার্পেটটা তুলে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ডেকরে-টরের দল। এখানে তা নেই। সেই কতক্ষণ ধরে ট্রেনের আশায় বসে কুলীদের সর্দার রাম সিং নিজে। বিরাজবাবু স্টেশানমাস্টার, কাজেই ভালো-মন্দের সুখ-দুঃখের সবকিছুর মালিক এই অঞ্চলের অনেকটা বিরাজবাবু নিজেই, বিশেষ করে রেলের তো কথাই নেই। তাই অণ্ডালের রেলরাজার পুত্র বা রেলরাজপুত্রের বিয়েতে রেলের প্রজাদের আনন্দ ও উৎসাহ বাড়বে এ আর এমনকি! সুশান্ত বিরাজবাবুর যোগ্য পুত্র। মাইনিং এঞ্জিনীয়ার। রাণীগঞ্জের কয়লাখনিতে থাকে। মাঝে মধ্যে গাড়ি নিয়ে অণ্ডালে মা-বাবার কাছে থেকে চলে যায়।

সাবিত্রীর বাবাও অনেক বিজ্ঞাপন দিয়ে, ভালো পাত্র দেখেই এই বিয়ে দিয়েছেন।

অণ্ডালে খুব ধুমধাম করে বৌভাত হলো। অণ্ডাল ও কোলিয়ারির সব বড় মানুষরা এসে-ছিলেন। রেলের টুপাইস দেবার ও নেবার বন্দো-বস্ত থাকায় খাবার ও আপ্যায়ন আয়োজনের কোনো ত্রুটি রাখেননি বিরাজবাবু। কলকাতা থেকে সাবিত্রীর বাড়ির সবাই এসেছিলো গাড়ি হাঁকিয়ে। কোলিয়ারীর অন্যান্য অফিসারেরাও গাড়ি নিয়ে এসেছিলো, তারা অবশ্য যাবার সময় সুশান্তকে বলে গেল, 'এতে সন্তুষ্ট নই ভাই। কোলিয়ারীতেও এসে পার্টি দিতে হবে।' সুশান্তকে সম্মতি দিতে হয়েছে।

সাবিত্রীর মুখে সেই বিয়ের পর থেকেই হাসি নেই। কেমন যেন বেশি লজ্জা বা ভয় কিছু একটা পেয়ে বসেছে। কেউ বলছে ভীষণ লাজুক। কেউ বলছে অহংকারী; আবার কেউ বলছে ভীষণ অভিমানী।

সুশান্ত লক্ষ্য করছে সবই, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। বেশি কাউকে বুঝতেও দিচ্ছে না।

সুশান্তর মা শুধু একবার বলেছিলো, "হ্যাঁরে সুশান্ত, বৌমার কি শরীর খারাপ। বেশি কথা বলে না তো?"

একটু হেসেই সুশান্ত বলেছিলো, 'কথা বলার কী আছে? নতুন এসেছে; হো-হো করে হাসবে নাকি? কটা দিন নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতেও তো সময় লাগে।' ওর মা এরপর আর এ নিয়ে কথা বলেনি।

আসলে সুশান্তর জন্য ওর মা-বাবা একা-ধিক পাত্রী এর আগে ঠিক করেছিলো, তার কোনোটিই ওর পছন্দ হয়নি। তারপর নিজেই বিজ্ঞাপন দেখে লিখে দিয়েছিলো পাত্রীর বাবাকে। কলকাতা গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজেই দেখে এসে মা-বাবাকে সম্মতি জানিয়েছিলো।

বিরাজবাবু আর না করেননি। তবু যা হোক বিয়ে করতে রাজী হয়েছে সুশান্ত, এই যা।

দেখতে দেখতে তিন মাস হয়ে গেলো। কোলিয়ারির ফ্ল্যাটে এসেছে সুশান্ত, সাবিত্রীকে নিয়ে। যত্ন-আত্তির কোনো ত্রুটি নেই। শুধু কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কোথায় যেন সংকোচ সাবিত্রীর।

সুশান্ত একদিন খেতে বসে প্রশ্ন করলো, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'বল।'

'তোমার কী হয়েছে বলো তো? তুমি কি এই বিয়েতে খুশি নও?'

'হঠাৎ এমন কথা কেন?'

'কেন, তুমি তা ভালোভাবেই জানো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সবার কাছে আমার অবস্থাটা কি ভেবে দেখেছো একবার? বিয়েতে অমত থাকলেও তো বলতে পারতে।'

সাবিত্রী বললে, 'আর কিছু দেবো? ভালো রান্না হয়েছে কিন্তু আজ।' সুশান্ত চটে গেলো, খাবার টেবিল ছেড়েই সে উঠে পড়লো।

'না, কোনো কিছুর দরকার নেই। যার মনে শান্তি নেই, তাকে খাইয়ে শান্ত করা যায় না।'

সাবিত্রী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে ঘরের ভেতর চলে গেলো। বাগদীপাড়ার একটা মেয়ে এসে কাজ করে দিয়ে যায়, টুকটাক ফাইফরমাশ আর বাসন মাজার কাজ। বেসিনে বাসন মাজতে মাজতে সে সব দেখলো। সবটা বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝলো যে, দাদাবাবু না খেয়ে বেরিয়ে গেলো, এবং রাগটা বৌদিরই ওপরেই। সাহস করে বাগদী মেয়েটা এসে সাবিত্রীকে বললো:

'একটা কথা বইলবো দিদি, মনে কিছু ধরিস

'কী, বল।'

'দিদি, তোর সাথে কি দাদাবাবুর বইনছে না দিদি?'

'তোর দরকার কী তাতে? ফুলমা তোর কাজে তুই মন দে। ফের এসব বললে অনাথানে গিয়ে কাজ দেখিস।'

ভয় পেয়ে গেলো ফুলমা। অন্যায় স্বীকার করে মাথা নীচু করে আবার সে কাজে মন দিলো। ফুলমা সাবিত্রীর সামনে চুপ করে থাকলেও সন্ধ্যে-বেলায় কোলিয়ারীর মজদুর কলোনীতে গিয়ে যখন তাড়ি খেতো, তখন পেটের কথা সব বের করে দিতো। একথা ওকথায় সুশান্ত আর সাবিত্রীর কথাও কোলিয়ারীর অনেক লোকই জেনে গেলো।

সুশান্তর ওপর ভীষণ রাগ অনাদি আঢ্যের। অনাদি আঢ্য কোলিয়ারী মালিকের দূর সম্পর্কের ভাগনে। আশা ছিলো, মামার দয়ায় চীফ এন-জিনিয়ারের চাকরিটা ওর পাকা হবে। তা দেখতে দেখতে সরকার সব কয়লাখনি নিয়ে নিলো। খনিমন্ত্রী মোহন কুমারমঙ্গলম সবচেয়ে আগে চাইলেন প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে। অফি-সারদের মধ্যে অনেক অকর্মণ্য লোক বাদ পড়লো, অনেক জুনিয়রের প্রমোশন হলো। অনাদি আঢ্য ছিলো সিনিয়র এ্যাসিসটেন্ট এনজিনিয়ার। আর সুশান্ত তখন শুধুমাত্র পনেরোজন এ্যাসিসট্যান্ট এনজিনিয়ারের মধ্যে একজন মাত্র। তিন

খাবার টেবিল ছেড়েই সে উঠে পড়ল

বছরেই খনি জাতীয়করণ হবার পর ডেপুটি চীফ এনজিনিয়ার হয়েছে সুশান্ত। অনাদি আঢ্যকে কোনোমতে চাকরিতে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো এনকোয়ারি চলছে তার বিরুদ্ধে। শোনা গেছে, ওর এনজিনিয়ারিং সার্টিফিকেটগুলোও নাকি জাল।

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

যেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই পাবেন। এখানে এলে বুঝতে পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে হতে পারে। সারা দেশ জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের শাখা ছড়ানো, আপনার সঞ্চয় যেখানে বেড়ে ওঠে। ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ—

বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে আসুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্কের সঞ্চয় পরিকল্পনা :

১. **সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট**
এই পরিকল্পনায় যত খুশি টাকা রাখুন, সুদ পাবেন বছরে ৪%

২. **রিকারিং ডিপোজিট**
এই পরিকল্পনায় মাসে মাসে যত খুশি টাকা জমান, সুদ পাবেন বছরে ৮% থেকে ১০%

৩. **ফিক্সড ডিপোজিট**
এই পরিকল্পনায়ও আপনি বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।

৪. **ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ রিকারিং ডিপোজিটে সঞ্চয়**
এই পরিকল্পনায় ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আপনি প্রতি মাসে যে সুদ পাবেন তা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বদলে রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ফলে আপনি কার্যকরী সুদ বেশি পাবেন, যেমন ধরুন ৭ বছরে ১৪.৫০%।

৫. **ডিপোজিট সার্টিফিকেট**
এই পরিকল্পনায় মাত্র ১০০ টাকাও জমা দিতে পারেন। ১৫ বছরে তা চারগুণ হয়ে ফিরে আসবে।

With best Compliments from :

BIRPARA TEA COMPANY LTD.

Incorporated 1895

Leading Producers, Manufacturers and Exporters of Tea

●

Regd. Office :

DUNCAN HOUSE

31 NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-700001

With best Compliments from

Tirupati Shipping Private Limited

ওর মামা অবশ্য ওকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন মাইনিং পড়াতে। কী পড়ে এসেছে ও-ই জানে। ভালো করে সাহেবদের মতো ইংরেজি বলা আর মদ খাওয়া—কেবল এই দুটো জিনিস বেশ রপ্ত করে এসেছে অনাদি।

অনাদির কানেও এই কথা পৌঁছুলো। কিছুই না. ক্লাবগুলোতে সুশান্ত সম্বন্ধে খিস্তিটা একটু বাড়িয়ে করা যাবে আর কি।

জাতীয়করণ হবার কথা শুরু হতেই খনি অঞ্চলে আনন্দের বদলে উত্তেজনাই বেড়েছে বেশি। লুকোনো কালো টাকার দুনম্বর হিসেবের খাতা সামলাতে ব্যস্ত অনাদি আঢ্যের মামা ও তার দলবল। ওদিকে মজদুর ইউনিয়নের দুচারজন পাণ্ডা বা দালাল, যার কথায় কথায় মালিকের দালালি করে নানা অজুহাতে সময়ে-অসময়ে মাইন বন্ধ করে রাখতো, তাদের বেড়েছে বিপদ। রাত্রিবেলায় অনাদি আঢ্যের বাড়িতে মিটিং বসলো।

কালুরাম হলো দালাল ইউনিয়নের সর্দার। সে-ই প্রথমে শুরু করলো. 'ওসব ন্যাশনালাইজেশনের মধ্যে আমরা নেই। এটাতে হামাদের কিছু লাভ হলো না। এটাকে আমরা ভেঙে দেবো।'

'মূর্খ তোরা। তোরা ভাঙবার কে? গবর-মেণ্ট আইন করে সব কাগজপত্র পাশ করে দিয়েছে। আর এখন বলছিস ভেঙে দেবো। তাড়ি কি আজ পেটে বেশি চড়িয়েছিস নাকি?' অনাদি ব্যঙ্গ করেই বললে।

'আজ্ঞে তাড়ি পাবে কোথায়। দোকান উঠে গেছে। তাই দিশী টেনে এসেছে বোধহয়।' ফিক করে হেসে বলে অনাদির সহকারী বিনোদ। কালুরাম বললে. 'তাহলে যে আমাদেরকে কয়েক-জন এম. পি. বাবু কথা দিলে এসে, যে তারা মিলে এটা ঠেকাবে। কিছু হবে না।'

'ওসব এম, পি-র কথা শোনেননি ইন্দিরা গান্ধী। যা করার করেছে। মাদ্রাজের বিচ্ছুটা যখন মন্ত্রী হয়েছে তখনই জানতাম একটা কিছু হবে। আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়লে।'

'শুধু কি আপনার মামাবাবুর সর্বনাশ সাহেব? হামাদেরও তো সব গেলো।'

'ভয় পেলে চলবে না, কিছু একটা করতেই হবে। আমি বুদ্ধি করে ঠিক করবো, তোরা কাল রাতে আসবি। আর শোন, পারলে সব ইউনিয়নেরই যেগুলো পেটোয়া মতো আছে না, সবগুলোকেই এটা প্রচার করবি যে আমাদের কিছু একটা করা উচিত।'

'জি সাহেব। হামি তো সবইকে বলবে। লেকিন ওরা শালারা তো খুব ঢোলক বাজাচ্ছে আর বলছে যে, মালিক শালা ফুটলো। নোকরী সব পাক্কা। এখন থেকে মজদুরগুলোই মালিক হলো।'

'চোপ্রাতে সে না ওদের। কদিন পরেই চোখ খুলবে। রাতারাতি খনি বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে নাকি গবরনমেণ্ট। আমাদের থেকেই লোক রাখতে হবে। তখন দেখবো শালাদের।'

কালুরামের কিন্তু নতুন ফন্দি এসেছে মাথায়। চট করে লাফিয়ে বলে উঠলো, 'গবর-মেণ্ট শালা যো করবে সো করবে। কিন্তু মজদুর ছাড়া খাদান থেকে কইলা আনবে কে? আমাদের এরই মধ্যে কিছু একটা কাজ করে নিতে হবে।'

'কী কাজ, শুনি।' চুরুট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো অনাদি আঢ্য।

'মানে ব্যাপার হোলো যে এবার তো মজদুরদের মাস্টার রোল বানাতে হবে। এতদিন তো অপোযে এ্যাকাউণ্টেণ্ট বাবুর সঙ্গে শলা করে হামরা কুটা মজদুরের নামেও পয়সা লিয়েছি। এখন যে ফাইনাল করবো লিষ্টি সে ব্যাপারে একটা কিছু ফন্দি বের করতে হবে। যাদের নাম একবার পাকা হবে তারা হবে পাকা মজদুর। এখন নাম পাকা কোরার ব্যাপারটা লিয়ে আপনাকে সব একটু উপরে কথা বলে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের কোনো প্রবেম আর হবে না।'

কোল বোর্ড, কোলিয়ারী মানেজমেণ্ট সব কিছুর সংস্কার হয়েছে। নতুন করে পার্লামেণ্ট

থেকে কোল মাইনস অথরিটি তৈরি হয়েছে। কোল বোর্ডের কাজ এখন এদের সঙ্গেই হবে। রাণীগঞ্জ, ধানবাদ, ঝরিয়া, গোটা অঞ্চলটাতেই পুলিশ, রেল, কয়লাখনি এই তিনজনের মধ্যেই আপোষের বন্দোবস্তের যে বৃটিশ আমল থেকে একটা ব্যবস্থা চলে আসছিলো, তাতে ছেদ ঘটালো কোল মাইনস অথরিটি আর সরকার। কোল মাইনসের পয়সা দিয়ে এখানকার পুলিশের বড়কর্তা থেকে রেলের মালবাবু পর্যন্ত সবাই কত না সম্পত্তি করেছে দেশের এখানে ওখানে। সবার মা লক্ষ্মীতে টান পড়লো বোধহয় এবার। তাই শুধু কালুরাম আর অনাদি আঢ্যেরই দুঃশ্চিন্তা নয়। দুঃশ্চিন্তা তাদের সবার, যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিলো এতদিন।

কোলিয়ারীর এ্যাকাউন্টেন্ট শিবদাসবাবুর কানেও খবরটা গেলো যে, সুশান্তর সঙ্গে সাবিত্রীর বনিবনা নেই।

শিবদাসবাবু বিচিত্র ধরনের মানুষ। ভোর-বেলা স্নান করে কোলিয়ারির মজদুরদের একটা শিব-মন্দির আর হনুমানজীর মন্দিরে গিয়ে ফুলজল দিয়ে বাড়ি এসে খেয়েদেয়ে কোলিয়ারী অফিসে আসেন। আবার অফিস সারা হলে কোলিয়ারী লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে বাড়ি চলে যান। মজ-দুরদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে ও ভগবানভক্ত। যাঁরা ইউনিয়ন নিয়ে নাড়া চাড়া করেন—তাঁরা ভাবেন ও ভণ্ড। শিবদাসবাবুর ছোট মেয়ে অলকা আসানসোল কলেজে পড়ে। ছুটিতে চলে আসে বাড়িতে। খেলাধুলোয় খুব নাম। বিশেষ করে টেবিল টেনিসে। শিবদাসবাবুর মুখেই তাঁর মেয়ের প্রচার। বিশেষ করে এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী কোনো ব্যাচেলার কর্মকর্তা এলেই, শিবদাসবাবু তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁর মেয়ে রূপে গুণে লক্ষ্মী। খেলাধুলোয় পারদর্শী। শিবদাস-বাবুর সঙ্গে অনাদি আঢ্যের সম্পর্ক ভালো। কেন ভালো তা অনাদি আঢ্যের থেকে অনাদি আঢ্যের মামারাই ভালো বলতে পারেন।

এ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে হাত না মেলালে কোলিয়ারীর কালো টাকা সরাবার কোনো পথ নেই।

সুশান্তর বন্ধু কোলিয়ারীর স্কুলের হেড-মাস্টার। নাম, নবীন সামন্ত। বর্ধমানেই বাড়ি। সুশান্তর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে পড়েছে। বর্ধ-মান স্কুলে একসাথে পড়েছে সুশান্ত ওর সাথে। বিরাজবাবু তখন বর্ধমানের স্টেশানের এ. এস, এম. ছিলেন।

নবীন সুশান্তকে ফোন করে বললে, 'আমি একটু তোর কাছে আসবো, কিংবা তুই যদি আজ অফিস সেরে বাড়ি যাবার পথে একবার আমার ওখান হয়ে যাস।'

'কেন রে, কী ব্যাপার?'

'না, এমনি। তবে এলে কিন্তু ভালো হতো।'

'বেশ তো যাবো।'

কোলিয়ারীতে শিফট চেঞ্জ হবার সংকেত হলেও অফিস ছুটির পর সাধারণত মজদুররা ছাড়া বড় একটা ভিড় এদিকে হয় না। সুশান্তকে কখনো কখনো সব শিফটেই এসে কিছু-না-কিছু কাজ দেখিয়ে যেতে হয়। পুলিশী বন্দোবস্ত দেখে সে আঁচ করতে পেরেছে, যে সরকারের নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে।

নবীনের বাড়িটা অবিশ্যি কোলিয়ারীর লোকালয় থেকে একটু দূরে। গ্রাম বলা চলে, আবার গ্রামও নয়—এরকম আর কি। তবে শহরের দিকে যেতে হলে নবীনের বাড়ির রাস্তা হয়েই যেতে হয়। সুশান্তর জীপটা সন্ধ্যের ঠিক মুখেই নবীনের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলো। তখন আর একটা শিফটের খনি শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ গান গেয়ে চলেছে, সুশান্তকে হাতজোড় কিংবা সেলাম করছে কেউ কেউ।

সুশান্তর জন্যই নবীন দাঁড়িয়ে ছিলো। 'আয়, ভেতরে আয়'। সুশান্ত ভেতরে বসতেই নবীনের স্ত্রী এসে কিছু জলখাবার রাখলো সুশান্তর সামনে।

'এসব কী রে?' এজন্যে ডেকেছিলি নাকি আমায়!' সুশান্তর প্রশ্ন।

'না, না, তা নয়। অফিস থেকে এলি, কিছু খেয়ে নে আগে।'

সুশান্ত হাত ধুয়ে খেতে শুরু করলো।

'হ্যাঁরে তোদের সব নাকি গভর্মেণ্ট নিয়ে নেবে? তাহলে তো গোলামি শেষ হলো। দেখিস বাপু, আমার চাকরীটাও যেন পাকা থাকে।'

'আরে হ্যাঁ। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কানাঘুষো খুব শুনছি, মালিকরা টের পেয়েছে। কাগজপত্র সব সরাবার মতলব আঁটছে। তবে সরকার দেরি করলেই কিন্তু বিপদ। যা সব রাঘব বোয়াল আছে এখানে। গভর্মেণ্ট নেবার আগেই গিলে খাবে সব।'

'আমার ধারণা মোহন কুমারমঙ্গলম যে ধাঁচের লোক তাতে শেষ পর্যন্ত ও নিয়ে ছাড়বে দেখিস।'

'ব্যাপারটা তো ওর একার হাতে নয়। সেখানেই প্রব্লেম।'

'যাক গে ওকথা। যা হবার হবে। অনাদি আঢ্যি আর শিবদাসবাবুদের শয়তানি বন্ধ হলেই খুশি। তাতে আমার চাকরী পাকা না হলেও চলবে। তোকে যে কথা বলতে ডেকেছি, এবার বলি। আমি তোর ছেলেবেলার বন্ধু তাই সাহস করেই কথাটা তোকে বলতে চাই। কিন্তু যদি মনে না করিস তা হলেই বলবো।'

'স্বচ্ছন্দে বলতে পারিস। আমার মনে করার কী আছে। তাছাড়া আমার নেচার তো তুই জানিস নবীন।'

'বেশ তো। তাহলে একটা কথাও তোকে দিতে হবে যে, আমি যেমনটা বলবো তেমনটা তুই করবি।'

'ভেবে দেখবো।'

'আচ্ছা সুশান্ত, তোর সঙ্গে কি সাবিত্রীর মনোমালিন্য হয়েছে? গত দুমাসে মাত্র একবার ওকে তুই ক্লাবে আর আমাদের ফাংশানে এনেছিলি। আমার বাড়িতেও তো মাঝে মাঝে নিয়ে আসতে পারিস। তোকে কথাটা গোপন করতে চাই না। তোর বাড়ির ফুলমাই কথাটা বোধহয় সবাইকে বলেছে। ফুলমা যা বলেছে তার তিনগুণ চড়িয়ে এখন অনাদি আঢ্যিরা বলছে। কয়েকদিন আগে তুই নাকি ওর গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছিলি। আরো সব বাজেতেই কথা। কি হয়েছে কি?'

সুশান্ত মুখ নীচু করে বসে শুনলো সব। তারপর বললো, 'তোর আর কিছু বলার আছে?'

'তুই রাগ করলি সুশান্ত?'

'না, রাগ করবো কেন? তবে যা আমিও আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি নবীন, কেন সাবিত্রী সুখী নয়। কেন ওর মুখে হাসি নেই। সব সময় এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আজ আমি উঠি নবীন। এর উত্তর যেদিন জানবো, সেদিনই বলবো।

সুশান্ত বাড়ি ফিরে দেখলো, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ বাড়িটা বেশ সাজানো গোছানো। কোথা থেকে সব ফুলটুল এনে ঘরটা সাজিয়েছে সাবিত্রী। একটু অবাক হলো সুশান্ত।

'কী ব্যাপার, কেন এত সাজগোজ কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' সুশান্ত বললো।

'আজ যে তোমার জন্মদিন।'

'ওঃ ভুলেই গেছি। সকালে মনে করিয়ে দেবে তো! কয়েকজনকে খেতে বলতাম।'

ভীষণ শান্তভাবেই সাবিত্রী বললে, 'এখনো সময় আছে। কয়েকজনকে বলতে চাইলে বলতে পারো। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

বেয়ারাকে ডেকে একটা চিঠি দিয়ে নবীন আর নবীনের স্ত্রীকেই শুধু নিমন্ত্রণ করে পাঠালো। খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব শেষ হতে রাত এগারোটা বেজে গেলো। নবীন ও তার স্ত্রী ফিরে গেলো। সাবিত্রী সুশান্তর কাছে এসে বললো, 'একটা কথা বলবো?'

'কী, বলো।'

'আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দেবে তুমি? আমি সাতদিনের জন্যে কলকাতায় যেতে চাই।'

'কিন্তু, আমার তো ছুটি নেই। প্রশান্তকে ডেকে পাঠাই না হয়। ও দিয়ে আসুক।'

'না, তার দরকার হবে না। আমি নিজেও যেতে পারি যদি তোমার আপত্তি না থাকে। প্রশান্তর পরীক্ষা এসে গেছে, এ সময় ওকে ডেকে পাঠানো ঠিক নয়।'

'তাহলে বরং নবীনকে বলি। ও পৌঁছে দিক। কোলিয়ারীর গাড়িতে পাঁচ ঘণ্টাতেই কলকাতা পৌঁছে যাবে।'

সে রাতে আর কথা হলো না। নবীন দু-দিনের ছুটি নিয়ে কোলিয়ারীর গাড়িতে সাবিত্রীকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এলো।

হঠাৎ সাবিত্রীকে চলে আসতে দেখে ওর বাড়ির সবাই বেশ অবাকই হলো। নবীনকে তখনি যেতে দিল না সাবিত্রী। একবেলা বাড়িতে রেখে যত্নআত্তি করে তারপর যেতে দিলো। সাবিত্রীর বাবা কলকাতার একজন বড়ো ব্যারিস্টার। ধনী পরিবার। সাবিত্রীর বাড়িঘর দেখে নবীনেরও ভালো লাগলো। তার মনে হলো, সুশান্ত সত্যিই ভাগ্যবান। ফিরে যাবার সময় সাবিত্রীকে বললো, 'নিতে আসবে কিন্তু সুশান্ত। ঠিক সাতদিন পরেই কিন্তু পাঠিয়ে দেবো, কেমন?' একটু হেসে সাবিত্রী বললো, 'আরো সাতদিন যদি বাড়িয়ে নিই?'

'সে কি! তখন যে বললে শুধু সাতদিন।' নবীন প্রশ্ন করলো।

'আপনারা ছুটি নেবার পরেও তো দরখাস্ত করে ছুটি বাড়িয়ে নেন।'

'সব সময় তো দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না।'

'না-মঞ্জুর হলে মাইনে কাটা যায়, রেকর্ড খারাপ হয়। আমারও না হয় তাই হবে।' সাবিত্রীর উত্তর।

কিন্তু কথাটা ভালো লাগলো না নবীনের। তবুও চেষ্টাকৃত একটু হেসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

কোলিয়ারীতে পৌঁছুবার আধঘণ্টা আগে ড্রাইভার পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিলো নবীনের হাতে। বললো, মাস্টার সাব, আপনার চিঠি। মেমসাব হামাকে বলেছিলেন যে, কোলিয়ারীতে ঢুকবার সময় দিতে।'

'কখন ডেকে চিঠি দিলো?'

'হামাকে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে মেমসাব চিঠিটা দিয়েছে।'

খামটা খুলে পড়তে শুরু করলো নবীন। 'প্রিয় নবীনবাবু,

প্রায় তিনমাস ধরে আপনাদের কাছে থেকেছি। আপনি সুশান্তর কিরকম বন্ধু বলে আপনাকেই চিঠিটা লিখছি। সুশান্তকে লিখবার মতো মানসিক অবস্থা ও সাহস আমার নেই।

খামটা খুলে পড়তে শুরু করলো নবীন

আপনাকে লিখছি এই ভরসায় যে, আপনি হয়তো এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

নীরবতা, অভিমান বা ক্রোধ—এর কোনটাই আমার ছিলো না। আর পাঁচজনের মতো আমিও সংসারে হেসে খেলেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে সম্মতি দেয়নি। সুশান্তকে আমি ঠকাতে চাই না। এ চিঠি পড়ে আপনার পক্ষে সব কিছু বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না জানি। তবু যা সত্যি তা-ই লিখছি।

আসলে আমার মা ও বাবা, এঁরা কেউই নেই। পূর্ববঙ্গে রায়টের সময় আমি মা-বাবাকে হারাই। তখন আমার বয়স মাত্র একবছর। আমাকে বাঁচান একজন মুসলমান ফকির। তিনি আমাকে এনে দেন এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কাছে। তার কোনো সন্তান ছিলো না। আমি যখন বড়ো হই, তখন সেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কলকাতা চলে আসি। ভদ্রলোকের উকিল ছিলেন গগন মিত্র। ব্যবসাসংক্রান্ত আইনের পরামর্শ দিতে তিনি প্রায়ই আসতেন। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীটি কলকাতা আসবার এক বছরের মধ্যেই মারা যান। তবে, আমার নামে সব লিখে গিয়েছিলেন। লেখা ছিলো, আমার একুশ বছর পূর্ণ হলে আমি তাঁর সব সম্পত্তি পাবো। এর পরের কথা লিখতে পারছি না। কষ্ট করে একদিন কলকাতায় এলে..."

এর পরে আর কিছুই চিঠিতে লেখা নেই।

অবাক হয়ে গেলো নবীন। ড্রাইভারকে বললে, 'আমায় যে চিঠি দিয়েছিস, আর দিদিমণিই যে তোকে চিঠিটা দিয়েছে আমাকে দেবার জন্যে—এ খবর যেন কেউ না জানে।'

ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে বললে, 'জী নেহি মাষ্টার সাব। আমাকে আপনি কি অনাদিবাবুর লোক ভেবেছেন?'

এ অঞ্চলের অনেকেই অনাদিকে ঘৃণা করে নবীন তা জানতো। নবীনকে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার চলে গেলো।

॥ ৪ ॥

নবীন যেদিন কলকাতা থেকে এসে পৌঁছুলো, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় রেডিওতে প্রচারিত হলো খবর—কয়লাখনিগুলো জাতীয়করণ হয়ে গেছে। রাত্রেই অনেকগুলো মজদুর-কলোনীতে তালা, নাকাড়া বেজে উঠলো। অনেকে আবার ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলো না। তিন চারদিন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে হয়ে যাবে একথা মালিকরাও বুঝতে পারেনি। অনেকেই কাগজপত্র গুছিয়ে উঠতে পারেনি। সেদিন রাত্রেই সরকারের পদস্থ কর্মচারীরা পুলিশ নিয়ে মাইন এরিয়ায় চলে এলো। অফিস, রেকর্ড সবকিছু যেন বাইরে চলে না যায়।

সকাল হতে না হতেই টিসকোর প্লেনে করে মিনিস্টার এসে হাজির হলেন। যেটুকু যা সরাবার ছিলো, তার কিছুই করা গেলো না।

বর্ধমানের বোধহয় সব পুলিশ এসে হাজির হয়েছে রাণীগঞ্জ আসানসোলের সবগুলো কোলিয়ারীতে। সকালবেলাতেই উখড়াতে দুটো লাশ পাওয়া গিয়েছে। দু'জনেই দুটো কোলিয়ারীর এ্যাকাউন্টেন্ট। বোধ হয় মালিকদের কাব-চুপির খবর জানতো, তাই একেবারে শেষ করে দিয়েছে। যাতে সরকারের কাছে কোনো খবর পৌঁছে দিতে না পারে।

যারা সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের অনেকেরই প্যানিক হয়েছে। কে কী মতলবে আছে, কে জানে।

নবীন সকাল হতেই ছুটতে ছুটতে এসেছিলো সুশান্তর ফ্ল্যাটে। 'কীরে সুশান্ত, মিষ্টি খাওয়া। আমার কথা ঠিক হলো তো!'

'ঠিকই, তুই যা বলেছিস তাই হলো। কিন্তু শোন, সকালবেলা এস. ডি. পি. ও-র গাড়ি গেল উখড়ার দিকে। মধুঝোড়ার এ্যাকাউন্টেন্ট নাকি খুন হয়েছে।'

'তুই বরং কদিন আমার বাড়িতে এসে থাক। সব ঠিকঠাক হলে আবার চলে আসিস। একা একা থাকিস তো।'

'না, এতে ভয় পাবার কী আছে।'

'কী জানি সুশান্ত, আমার অনাদি আচকে তেমন ভালো লাগছে না। আবার শুনেছি জাতীয়-করণের পক্ষে বড়ো সভার আয়োজন কালুরামকে দিয়ে অনাদিই করাচ্ছে। এম এল এ-রাও নাকি আসছে সভাতে।'

'হতে দে ওসব। ওতে আমার কি। তবে তোর যখন এতো ভয়, আমি পুলিশকে বলে দেবো গার্ড দিতে।'

সেটা মন্দ নয়। তবুও আমি নিশ্চিন্তে থাকবো।' নবীন বললো।

'তা এ খবর তো হলো। যাকে পৌঁছে দিয়ে লি, তার খবর কী

'অরে সে তো তোকে বলাই হয়নি। রাজার মতো শ্বশুরবাড়ি পেয়েছিস মাইরি। পেল্লাই বাড়ি, লোকজন। আমায় তো খুব যত্ন-আত্তি করলে। তবে সাবিত্রী কিন্তু খুব করে বললে তোকে গিয়ে নিয়ে আসতে।'

'সাবিত্রী বললে, না তুই বললি একথা?'

'না, সীতা, বিশ্বাস কর। আসলে এত বড়ো বাড়ির মেয়ে, মানে, ঠিক মানিয়ে নিতে ওর আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

'ভালো উকিল পেয়েছে সাবিত্রী। শেষ পর্যন্ত তোকেই উকিল ঠিক করলো।'

'কী যা তা বলছিস।'

'ঠিকই বলছি রে নবীন। যাক গে, আনতে হয় তুই গিয়ে আনিস। আমার এখন কাজের চাপ বেড়েছে। এখন কোনোমতেই যেতে পারবো না। সব কিছু রি-স্ট্রাকচার হবে। আমাকে সব সময় থাকতে হবে।'

ফোন এলো সুশান্তর।

'হ্যালো, সুশান্ত ঘোষ স্পিকিং'

'নমস্কার, আমি অনাদিবাবু। তা আজকের মিটিং-এ আসছেন তো?'

'আচ্ছা, যাবো।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথা—যদি আজকে রাতে আমার এখানে দুটো খেতে আসেন।'

'আরে না, না..., এতে এত মিনতি করার কী আছে। আপনি আমার অনেক সিনিয়র। নিশ্চয়ই যাবো। তবে, বেশি রাত করবেন না কিন্তু।'

'আপনার মিসেসকে যদি...'

'না, সে কলকাতায় গেছে'

'ওঃ, আচ্ছা নমস্কার।'

নবীন কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলো অনাদির ফোন। 'তা তোকে বুঝি কিছু বললো?'

'হ্যাঁ, মিটিং-এ যেতে আর রাতে ওখানে খেতে।'

'সাবধান কিন্তু। আমার মতে ওর নিমন্ত্রণ না নিলেই ভালো হতো।'

'এখন থেকে এতো ভয় করলে বাকি দিন-গুলো কেমন করে কাটবে?'

বিরাট সভা হচ্ছে মজদুরদের। সবার বক্তৃতা শেষে অনাদি বললে, 'আজকে আমাকে সভাপতি করে আপনারা মালিক মজদুর, খুড়ি,' সরকার মজদুর একতার এই যে নজির দেখালেন তার তুলনা নেই। এখন থেকে আপনারাও মালিক আমরাও মালিক। আমাদের সব কাজ করে যেতে হবে। বেশি কাজ। এবারে আমাদের ডেপুটি চীফ ইনজিনিয়ার সুশান্ত ঘোষ বলার পরে সভা শেষ হবে।' কালুরামও চেয়ারে বসে। সুশান্ত আদৌ বক্তৃতা করতে আসেনি। শুধু উপস্থিত হতে এসে-ছিলো। তার নাম ঘোষণা করায় অস্বস্তি বোধ করছিলো বেশ। তবুও দাঁড়াতে হলো। মাত্র দু-চার কথা বললে সুশান্ত, 'সরকার আমাদের হাতে খনি তুলে দিয়েছে সরকারের সম্পদ বাড়াবার জন্যে। সরকারের সম্পদ মানেই আমাদের সম্পদ। কাজ করতে হবে। ন্যায্য পাওনাও নিতে হবে। এর থেকে বেশি কিছু আমার বলার নেই। আমার বিশ্বাস যে, বক্তৃতা না করে, কাজ করে আমরা দেখাবো যে আমরা সরকারের নীতিকে সমর্থন করেছি।'

সভা শেষ হয়ে গেলো। অনাদি আঢ্যের বাড়িতে জেলার বড় বড় অফিসাররা খেতে এসেছেন। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগলো সুশান্তর। কাল পর্যন্ত যে অনাদি ছিলো জাতীয়করণের বিরুদ্ধে, সে আজ হয়ে গেলো পক্ষে! তাছাড়া ন্যাশানালাইজড হয়ে যাবার পরেও মালিকের ভাগ্নের বাড়িতে অফিসারদের খেতে আসা কেমন যেন লাগছিলো সুশান্তর। সবাই বেশ তৃপ্তি করে খেলো। সুশান্তকে ডেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে এলো অনাদি। সেখানে আর একজন লোক বসে—পুলিশেরই একজন বড়ো অফিসার। দরজা বন্ধ করে প্রায় পা ধরে বসলো অনাদি সুশান্তর।

'একি করছেন কি আপনি। আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়ো।'

'না, না। তবুও আমাকে বাঁচাতেই হবে সুশান্তবাবু। আমায় কথা দিন আমাকে বাঁচাবেন।'

'কি হয়েছে কি?' প্রশ্ন করলো সুশান্ত।

অনাদি ইশারা করলো পুলিশের অফিসারটিকে 'বলুন না, আপনি বলুন।'

সুশান্তর দিকে তাকিয়ে পুলিশের ভদ্রলোক বললো, 'অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আছে যে, ওঁর নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নেই। যা আছে সব জাল। তারপর আমাকে ইনভেস্টিগেশানে দেওয়া হয় প্রায় দুমাস আগে। আমরা জানতে পেরেছি রিপোর্ট জাল। কিন্তু রিপোর্ট এস, পি-কে জমা দেবার আগেই ন্যাশানালাইজড হয়ে গেছে মাইনস। এখন সব নতুন করে দেখা হতে পারে। আমি জেনেছি, আপনিই হবেন চীফ ইনজিনিয়ার। কারণ, এখন যিনি এই পদে আছেন, তিনি রিটায়ার করবেন এ-মাসেই। যদি এক্সটেনশান না পান তাহলে আপনার হাতেই সব ক্ষমতা।

অনাদিবাবুর ভাগ্য আমাদের হাতে এইটুকু যে আমরা রিপোর্টটা আপাতত চেপে যেতে পারি বা টাইম কিল করতে পারি যাতে সসম্মানে উনি অন্য কোনো ব্যবস্থা করে আস্তে আস্তে চলে যেতে পারেন। আর আপনার হাতে এইটুকু যে, আপনি যদি কোনো অবজেকশান রিপোর্টাকচারের সময় না দেন, তাহলে ওঁর চাকরিটা থেকে যায়। তা না-হলে ওর জেল হয়ে যাবে অনেকদিনের।'

সুশান্ত এর আগেই কিছু কিছু জেনেছিলো। কিন্তু এনিয়ে কোনো মাথা ঘামায়নি। তাছাড়া, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কী? আজ একেবারে বাস্তব অবস্থার সামনে মুখোমুখি হতে হবে সুশান্ত একথা ভাবতে পারেনি। অনাদি আঢ্যের শয়তানির কথাও জানে সে। আজই সকালে নবীন ওকে সাবধান করে দিতে এসেছিলো।

কী করে এড়ানো যায় এই ভেবেই বললো, 'ঠিক আছে, ভেবে দেখবো।'

'ভেবে দেখলে চলবে না সুশান্তবাবু। আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে।' আবার পা জড়িয়ে ধরলো অনাদি।'

বাধ্য হয়েই কথা দিলো সুশান্ত। বললো 'আমার দিক থেকে কোনো অবজেকশান হবে না, এটুকু বলতে পারি। আজ উঠি, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

সুশান্ত চলে আসবার অনেক পরেও পুলিশ অফিসারটি অনাদির বাড়িতে ছিলো। বোধহয় কোনো চুক্তি হলো রিপোর্ট নিয়ে।

কদিন পরেই সব শুরু হলো কারসাজি। জাতীয়করণ হওয়াতে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগলো তারাই সব ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলো। মাইন সিকিউরিটির যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিলো, সেগুলো রাতারাতি উধাও হয়ে গেলো। কাজ বন্ধ থাকলো প্রায় সাতদিন। রেকর্ড অফিস থেকে অনেক ফাইল আগুন লেগে পুড়ে গেলো। এমনি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটতে শুরু হলো।

॥ ৫ ॥

সাতদিনের মাথায় নবীন চলে এলো কলকাতায়। সাবিত্রীকে নিতে আসবার নাম করেই এলো। এসে একটা ছোট হোটেলে উঠেই গগন মিত্রের বাড়ি ফোন করলো।

পশ্চিমবঙ্গের

"বধূ"

৺শারদীয়া পূজায় বোম্বে ও পুনার
আসর মাত করবে
: —সুখরঞ্জন সরকার ও শ্যামলী চক্রবর্তী

প্রযোজনা : চৌরঙ্গী অপেরা
৩৫৬।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

সর্বাধিনায়ক :—কমলকৃষ্ণ বাঁ
স্বত্বাধিকারিণী—শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী

৮২'র শ্রেষ্ঠ অবদান :

কাঁচের স্বর্গ * একদিন রাতে

কুরুক্ষেত্র

ও মর্মস্পর্শী পালা

আঁধারে আলো-র

প্রদর্শনীতে যাত্রামোদীদের রইল সাদর নিমন্ত্রণ

প্রযোজনায় :

৮০ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়

সত্যম্বর অপেরা

৩০৩এ, রবীন্দ্র সরণী
কলিঃ ৭০০০০৬ ফোন : ৫৫-৮১১০

উৎপল দত্ত
রচিত, পরিচালিত

সীমান্ত

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

বর্ণ পরিচয়

পরিবেশনা :

লোকনাট্য

আনন্দলোক

প্রগতিশীল যাত্রা সংস্থা
৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬, ফোন : ৫৫-২৫২
নিবেদিত

শাঁখা সিঁদুর ভেঙে

রচনা : কমলেশ বানার্জী * সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের
চিত্র ও মঞ্চ-সজ্জা নন্দ চৌধুরীর

'মায়ামৃগ' • **পাণ্ডব বিজয়**

পালারূপ—সূর্যসারথী * সুর—পঞ্চানন মিত্র
সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য * নির্দ্দেশনা—সুজিত পাঠক

— রূপায়ণে —

সুজিত পাঠক, দ্বিজু ভাওয়াল, রাধারমণ পাল, জলধ কুমার, প্রিন্স চৌধুরী, শ্যামল দাস, অরূপ চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, তপন কুমার, স্বপ্না কুমারী, অনিলা ভট্টাচার্য্য, বীণা ঘোষ, মধুছন্দা, জয়ন্ত কুমার ও অভয় হালদার।

পৃষ্ঠপোষক—রঞ্জন মণ্ডল, হরিসাধন কর্মকার
পরিচালক—অভয় সাহা, স্বত্বাধিকারী—কৃষিকেশ মিত্র

—'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আমি স্বপন মিত্র।' গগন মিত্রের ছেলের গলা।

'নমস্কার আমি রাণীগঞ্জের নবীন সামন্ত, সুশান্তর বন্ধু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী খবর!'

'সাবিত্রীকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে সুশান্ত।'

'কোথায় উঠেছেন। আমাদের বাড়ি এলেন না যে।'

'না, মানে নিজেরও একটু কাজ আছে। তাই ভাবলুম আপনাদের অসুবিধে করে।'

'খুব অন্যায় করেছেন। বাবা শুনলে ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। তা সাবিত্রীতো নেই। ও শান্তিনিকেতনে গেছে বেড়াতে। কবে আসবে, ঠিক বলতে পারছি না। কী আশ্চর্য, আপনি এখানে এসেছেন আর ও গিয়েছে শান্তিনিকেতনে। আমি বরং ওকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।'

'কবে আসবে কিছু বলে যায়নি?' নবীন জিজ্ঞেস করলো।

'আজ্ঞে না। পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতনে গেছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বরং দু' চারদিন আমার কাজগুলো সেরে নিয়ে আপনাকে খবর করবো।'

'খবর নয়, সোজা চলে আসবেন। আচ্ছা, নমস্কার।'

নবীন সেদিনই দার্জিলিং মেল ধরে চলে গেলো রাতে বোলপুর। পৌষমেলায় ভীড় খুব। ছোটো হোটেলগুলো, অতিথিশালা সব ভর্তি। বিদেশী অতিথিও এসেছেন অনেক। পৌষমেলা, বসন্ত উৎসবের মতো সব কিছুতেই ভীড় শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন দেখার সখ নবীনের বহুদিনের। এবারে তা মিটলো। রথও দেখা হলো এবার কলা বেচতেও হবে। কিন্তু কোথায় উঠেছে সাবিত্রী? খোঁজাও মুস্কিল।

প্রথম দিন তো ভেবেই উঠতে পারলো না; সারাদিন যে কোথায় থাকতে পারে সাবিত্রী। ঠিকানা পত্র কিছুই চেয়ে আনেনি পাছে ওরা সন্দেহ করে।

দ্বিতীয় দিন মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো নবীন আপন মনে, আর চেয়ে দেখছিলো, ভিড়ের মধ্যে যদি একবার দেখা যায়। একটা হ্যান্ডলুমের দোকানের সামনে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে সঙ্গে অনেকগুলো ছেলে আর মেয়ে। ওদেরই স্টল, ওরাই বিক্রি করছে।

দূর থেকে দেখলো নবীন সাবিত্রীকে। কী প্রচণ্ড প্রাণ সাবিত্রীর। কেমন অদ্ভুত হাসছে আর কথা বলছে। আহা, যদি সুশান্তর সামনে এর এতটুকুও করতো—না জানি সুশান্ত কি স্বর্গ পেতো।

কপালে ছোট্ট করে সবুজ টিপ আর সিঁথিতে অল্প করে সিঁদুরের রেখা। সুন্দর একটা কার্ডিগান পরে জিনিস বিক্রি করছে ও।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করেই দোকানে এগিয়ে এলো নবীন। নবীনকে দেখেই সাবিত্রীর হাসি বন্ধ হয়ে গেলো। এবার সেই সুশান্তর স্ত্রীর মুখ। সম্পূর্ণ অন্য মুখ, অন্য অভিব্যক্তি। স্টল ছেড়ে বেরিয়ে এলো সাবিত্রী। ওদেরই মধ্যে কে যেন বললে, 'কীরে যাচ্ছিস যে?'

'তোরা মানেজ কর, আমি একটু ঘুরে আসছি এ-বেলা' সাবিত্রী উত্তর দিলো। তারপর নবীনকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আপনি এখানে এলেন কী করে।'

আস্তে আস্তে নবীন সব বললে। তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু তুমি এখানে কী মনে করে?'

'এমনি এলাম। একটা জগতে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। অরেকটা জগতে এলাম দম নিতে। আমার বন্ধুরা ক'জন শান্তিনিকেতনে পড়ে। ওরা স্টল দিয়েছে। তাই ভাবলাম বেড়িয়ে যাই। কদিন ভালোও লাগবে। সে জন্যেই তো বলেছিলাম দরখাস্ত করবো ছুটি বাড়াবার।'

'তা বেশ করেছো। আমারও বেশ লাগছে।

ছোটোবেলা থেকেই শান্তিনিকেতনে আসবার শখ। কত কাছে থাকি দেখো, বর্ধমানে। কিন্তু দুনিয়ার লোক এসে শান্তিনিকেতন ঘুরে গেলেও, আমার আর ঘোরা হয়নি। সেই যে কবির কথা আছে না—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

ঠিক বলেছেন। কতো ছোটো জিনিস কতো-ভাবে সুন্দর ; অথচ, তার দিকে আমরা তাকাতে

আপনি এখানে এলেন কি করে ?

সময় পাই না। আর কোথায় রডোডেনড্রন ফুটেছে তার ঠিকানা খুঁজতেই মাসের পর মাস কাটিয়ে দিই। চলুন কোথাও বসা যাক।'

'এখন তো বেশ রাত হয়েছে। তাছাড়া, আমি তো হোটেলে ফিরবো।'

'কোথায় উঠেছেন ?'

'শহরেই একটা হোটেলে। তুমি ?'

'আমি তো বন্ধুদের সঙ্গে হস্টেলে আছি। আপনি বরং কাল সকালে চলে আসুন, আমি স্টলে থাকবো। আপনি এলে তারপর কোথাও গিয়ে বসা যাবে।'

'বেশ তো, তাই হবে। আমার জায়গাটা ভীষণ অচেনা। তবে ছোটো শহর তো; কোনো অসুবিধে হবে না।'

সারারাত শুয়ে শুয়ে ভাবলো সাবিত্রী। সব কি খুলে বলবে নবীনকে? চিঠিতে লিখতে গিয়েও সাহস করে সবটা একবারে লিখতে পারেনি। ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে চায় সাবিত্রী। কিন্তু কতোদিনই বা চেপে রাখবে সব? অসহ্য যন্ত্রণা বাজে বুকে। নাঃ, যা হয় হবে। নবীনকে সব খুলেই বলবে সাবিত্রী। সাত পাঁচ ভেবে বেশি রাতে ঘুম এলো ওর। ঘুমুতে ঘুমুতে সেই রাজা ইদিপাসের স্বপ্ন দেখলো যেন সাবিত্রী। ইংরেজি ক্লাসে রাজা ইদিপাস নিয়ে লেকচার শুনতো। রাজা হঠাৎ করে যেন ওদেশের মানুষগুলো নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে চলে এলো। ঘুম ভেঙে গেলো সাবিত্রীর। বিচ্ছিরি যত সব স্বপ্ন। রাজা ইদিপাসের সঙ্গে সাবিত্রীর তো মিল নেই। ইদিপাস তো না জেনেই করেছিলো।

ন্যাশনালাইজেশনের হাওয়ায় শ্রমিকদের মনোবল গেছে বেড়ে। কিন্তু আজ বিকেল থেকেই কোলিয়ারীতে অশান্তি বেড়েছে। পনেরো দিনের মধ্যেই মজুরদের মাস্টার রোল তৈরি হবে। পাকা খাতা। আসল মজদুর কারা সব ঠিক হয়ে যাবে।

কমিটিও তৈরি হয়ে গেছে। ইনটাক, সিটু, কোলিয়ারী মজদুর কংগ্রেস, এ, আই, টি, ইউ, সি—সব শ্রমিক ইউনিয়নেই কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে। এই ইউনিয়ন এক লিস্ট করছে তো, আর এক ইউনিয়ন আর একটা লিস্ট বানাচ্ছে। কোথাও আবার নতুন করে আশপাশের রাজ্য থেকে লোক এনে তাদের নাম লেখানো হচ্ছে।

মজদুর কলোনীতে অশান্তি কম নয় এই নিয়ে। কোনো কোনো ইউনিয়নের নেতা আবার নাম লেখাতে আর নাম কাটাতে মজদুর প্রতি টাকাও নেওয়া শুরু করেছে। এতটা উত্তেজনা হবে ভাবেনি গভর্নমেণ্টও। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার ছেলেটি নতুন। নাম সত্যব্রত সেন। নতুন এসেছে। সে এসে সুশান্তর ঘরে ঢুকে বললো, 'চাকরী ছেড়ে পালাতে চাই। অনেকগুলো লোক মরবে। এ তো ভয়ংকর হলো। সাম্রাজ্য ভাগাভাগির অবস্থা আর কি! জোর যার, মুল্লুক তার। তারই মধ্যে হিন্দুস্থানী, বাঙালী মুসলিম টেনসন ছড়াতে চাইলো কয়েকজন। তাদেরকে রাতে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেলো পুলিশ। কল্যাণ রায়, বিষ্ণু ব্যানার্জির দল ভীষণ চেষ্টা করছে শান্তি রাখার জন্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ইংরেজ যেমন ভারত ছেড়ে চলে যাবার আগে লেলিয়ে দিয়েছিলো সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের, এ অনেকটা সে রকম। মোহন কুমারমঙ্গলম যত ভালোই ভাবুক না দেশ নিয়ে, শ্রমিক নিয়ে; কয়লাখনির খয়ের খাঁ-রা তার সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করতে চায়।'

কালুরাম অনাদি আচাকে বুঝিয়েছে সব্। 'তাড়াতাড়ি ইন্দিরা গান্ধীর জয় বলে ঢুকে পড়তে হবে বাবুজী। এছাড়া এখন কোনো পথ নেই।'

'তা ঢুকবো কী করে শালা, তোকে কি সবাই চেনে। ইনটাকের লোকেরা তোকে নেবে কেন?'

'না লেয় না লিবে, নিজেরা কংগ্রেসী ঝাণ্ডা খরিদ করিয়ে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ লাগাবো। একটা কোনো নেতা ঠিকই এসে যাবে। আপনি দেখে লিবেন। এম, এল, এ-বাবুটাকে ইনটাকের লোকেরা মানছে না। ওটাকে ভাবছি নিয়ে লেবো?'

'যা পারিস করে ফেল শিগগির। আমি আমার কামেলা নিয়ে আছি। যারা দিল্লী থেকে এলো তারা মাল পর্যন্ত খেলো না। এসব কি পদার্থ বানিয়েছে মিনিস্টারটা?'

চিন্তা কিছুটা বিরাজবাবুরও হয়েছে। বর্ধমানের এ, এস, এম, থেকে অণ্ডালের স্টেশন মাস্টার হবার পর ভালো ঘরে দু' দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। দুটো ছেলেকে পড়িয়েছেন ভালো পাশ দিয়ে। আর দুটোকে এখনো পড়াচ্ছেন। কলকাতায় সামান্য বাড়ি করার জমিও কিনেছেন শ্যালকের নামে। স্ত্রীর নামেও ডিভিডেন্স ধরতে পারে এ ভয় আছে বিরাজবাবুর। ওয়াগন এ্যালটমেণ্ট করার মধ্যেই হলো আসল কারচুপি অণ্ডাল ইয়ার্ডে। মালবাবু, ছোটোবাবু, বড়োবাবু—সবার শেয়ার হয় এতে। যাঁরা শেয়ার নিতে চান না, যুধিষ্ঠির হতে চান, তাঁদের হয় প্রাণ যায় বেঘোরে, না হয় বদলি হয় দ্রুত। আসানসোল, রাণীগঞ্জ এরিয়ার সরকার, সংবিধান, নিয়মকানুন, সমাজ সংসার সবকিছু কয়লাখনির নিয়মে চলে। কয়লাখনির মালিকরা সেখানে বাদশা। স্টেশনের বড়বাবু, মালবাবু, পুলিশ কর্মচারী আর ইউনিয়নের নেতাদের কেউ কেউ হলো সুবাদার, সিপাহশালার ইত্যাদি।

কালোমাটির থেকে চকচকে রুপোর মতো ঝকঝকে পয়সা, কড়কড়ে নোট আর সোনা পাওয়া যায় মুঠো মুঠো। বিলেতের সবচেয়ে দামী মদটা কলকাতার গ্রাণ্ডে না থাকলেও কোলিয়ারীর অফিসারস ক্লাবে আছে। কলকাতায় বাগানবাড়ির ফুর্তি আর কোম্পানীর আমলের কুঠিবাড়ির ফুর্তির থেকে কোলিয়ারীর ফুর্তি আরও সতেজ ও উগ্র। এখানে কালিমাখা মুখ সবার। শ্রমিকের, ইনজিনিয়ারের, অফিসারের পুলিশের, স্টেশনের বড়বাবুর—সবার। এদের মধ্যে যারা সাবান লাগিয়ে কালি তুলতে চায়, তাদের কারো কারো চামড়া উঠে আসে হাতে। ফলে, টিকতে তারা পারে না।

সুশান্ত ঘোষও জানে, তার বাবা ঘুষ খায়।

তাই মাইনিং পাশ করার পর ওর বাবাই মালিকদের বলে ওকে এখানে ঢুকিয়েছিলো কয়েক বছর আগে। সুশান্ত কিন্তু সংভাবেই বাঁচতে চেয়েছিলো এখানে। তাই অনাদি আঢ্যর জীবন ওর কাছে অসহ্য হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যের দিকে খবর এলো যে, মজদুর ইউনিয়নগুলোর হামলার জন্য কার্ফু হয়ে গেছে। কখন পড়েছে খবর পাওয়া যাবে কাল।

পুলিশকে ফোন করলো সুশান্ত। জানা গেলো, মজদুরের নাম পাকা করার লিস্ট বানাবার ঝগড়ায় মরেছে পাঁচজন। একজন মজদুর নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কল্যাণ রায়ের এ্যাসিস্ট্যাণ্টকে ভীষণ মেরেছে কালুরামের দল। কালুরাম ফেরার হয়েছে। অশান্তি ঘনিয়ে এলো কোলিয়ারীর বুকে। খনির মালিক হলো এক অর্থে মজদুররাই। কিন্তু কে বোঝাবে এদের সেকথা। এদের মধ্যে কে থাকবে, কে থাকবে না—সে ফয়সালা করার মাতব্বরিতে নামলো ইউনিয়নগুলো। অথচ সব ইউনিয়নেরই এক আওয়াজ—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'।

কী অদ্ভুত তামাশা। বছর কয়েক আগে যুক্তফ্রন্টের সময়ে ইউনিয়নের রাস্তার লড়াই দেখেছে সুশান্ত। কে কোন পার্টিতে যাবে তার লড়াই। যুক্তফ্রন্টের সব শরিকের লড়াই হতো তখন। বর্শা—বল্লম—কানকী দিয়ে প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে খুনোখুনি হতো। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো সেসব। কিছু করতো না। শুধু পুলিশ মন্ত্রীর দলকে বাঁচাবার জন্য যা করা দরকার তাই করতো পুলিশ। শ্রীপুর কোলিয়ারীতে একদিনে সাতজনের লাশ পুঁতে ফেলা হলো মাটিতে। এস, এস, পি-র কর্মীকে পিটিয়ে মারা হলো। কত কিছু হয়েছে। কিন্তু এতো কালো এই মাটি যে লাল রক্তগুলোও শুকিয়ে কালো রং-এর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তখন আর কোনো চিহ্ন থাকে না খুনের। এমনি করেই একদিন মাকরাতে ফুলমার বাবাকে কেটে ফেলেছিলো ওরা। ফুলমার বাবা ছিলো কোলিয়ারীর দারোয়ান। রাত্রি বেলায় চাবি চেয়েছিলো ইউনিয়নের কয়েকজন। ফাঁকা ফ্ল্যাটগুলোয় পার্টি-কনফারেন্সের ডেলিগেট রাখবে বলে। দিতে অস্বীকার করেছিলো ফুলমার বাবা হারান বাগ্দী। বাস, সঙ্গে সঙ্গেই তলোয়ারের কোপ। পরদিন কলোনী কম্পাউণ্ডের গেটের সামনে পড়েছিলো ওর রক্তমাখা দেহটা। সুশান্ত দেখেছিলো এ-দৃশ্য। সেই থেকেই ফুলমাকে এনে রেখেছিলো নিজের টুকটাক কাজের জন্য। হারান বাগ্দীর সংসারে ফুলমা ছাড়া আর কেউ নেই। রাতে তাড়ি খেয়ে নাচে বাগ্দী পাড়ায়, আর সকালে কাজে আসে।

আসানসোলের এখোরাতে খুন হয়েছিলো স্কুলের হেডমাস্টার আর তার ছোট্ট ছেলে ভবানী। সেই খুনেও গিয়েছিলো কোলিয়ারীর দলবল ট্রাকে করে। ভবানী সংগঠিত করেছিলো ছেলেদের 'বন্দেমাতরম' বলে।

বেশ ঝামেলা সব চুকে গিয়েছিলো আস্তে আস্তে। আবার অশান্তি শুরু হলো। এবার কোলিয়ারী কী রূপ নেবে, কে জানে।

মজদুরদের মাস্টার রোলের এসব ঝামেলা দেখে সরকার কমিটি বানিয়েছেন। সেখানে আবার কারা থাকবে, কারা থাকবে না তাই নিয়ে শুরু হলো ইউনিয়নে ইউনিয়নে মারামারি। দিল্লীতে যাদের খুঁটির জোর বেশি, তারা তাম্বরের চোটে ক্ষমতা পেলো বেশি। দেখতে দেখতে সুড়সুড় করে সব ওদিকে ভিড়তে শুরু করলো।

কালুরাম ফেরার হওয়াতে অনাদি চিন্তিত হলো। অনাদি আঢ্য কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। ফুলমার কাছে গেলো রাতে। ফুলমা তখন তাড়ি খেয়ে বেহুঁস। অনাদিকে চিনলো। ফুলমার কাছে জানতে চাইলো সুশান্তর বৌ-এর কথা।

'কী জানি, বৌটা তো নবীন মাস্টারের সঙ্গে চলে গেলো কলকাতায়। সাহেব তো কিছু বইললো না। কিছু জানি না বাবু।'

সেখান থেকে বেরিয়ে নবীন মাস্টারের বাড়িতে এলো। তখন বেশ রাত।

নবীনের ছেলে, ভাই, আর বৌ বাড়িতে। এত রাতে অনাদিকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলো।

'তা মাস্টার আছো বাড়িতে'—অনাদি বললে।

'আজ্ঞে না, দাদা তো কলকাতায় গেছেন, সাবিত্রী বৌদিকে আনতে।'

'কবে নাগাদ আসবে? একটু স্কুল নিয়ে কথা ছিলো। ঠিক আছে, এলে একটা খবর দিও ভাই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

অনাদির মন সন্দেহপ্রবণ। অনেক কথা নাড়া-চাড়া দিতে লাগলো। নবীনের সংগে সাবিত্রীর আবার কোনো সম্পর্ক হলো না তো? কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এলো, আবার কোলকাতায় গেলো—ব্যাপারটা কী? ভাবলে, একবার সুশান্তর কাছে যাবে নাকি। নাঃ থাক। ওকে জিনিসটা এক্ষুনি বুঝতে দিলে চলবে না। কালুরাম যখন ফেরার, তখন অনাদিরও বোধহয় পালা হ'য়ে এসেছে। শালা চীফ ইনজিনিয়ারের আবার তিনমাস একস্-টেনশান হয়েছে। রি-স্ট্রাকচার পর্যন্ত ওকে থাকতে বলেছে গভর্ণমেণ্ট। এদিকে রিপোর্টেরও কোনো খবর নেই। সেই অফিসারটি বদলি হয়ে গেছে পুরুলিয়ায়। কী যে রেখে গেছে রেকর্ডে, কে জানে! সাতপাঁচ অনেক কিছু ভেবে জীপটা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'লো অনাদি।

কোলিয়ারীর অশান্তি ঠিক না হওয়াতে প্রোডাকশান বেশ হ্যাম্পার হ'লো। পার্লামেণ্টে হৈ-চৈ শুরু হলো খুব। মিনিস্টার স্টেটমেণ্ট দিয়ে জানালেন যে, খুব তাড়াতাড়ি সিচুয়েশান ইম-প্রুভ করা হবে।

কিন্তু সুশান্ত জানতো প্রোডাকশানের বারোটা বাজাবার পেছনে কারা, এবং কেমন করে এটা হচ্ছে। এসব সে বলবে কার কাছে, আর কেমন করেই বা বলবে? এর তদন্ত হলে দেখা যাবে সুশান্তর বাবা বিরাজ ঘোষও জড়িয়ে পড়েছেন এর মধ্যে। সুশান্ত ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছে এসব ছোটখাটো পরামর্শ ওর বাবার ঘরে হতে। ঘর থেকে চা যেতো, মিষ্টি যেতো। অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং হতো। মালবাবু আসতেন, সদর থেকে সাপ্লাই-এর অফিসার আসতেন। কোলিয়ারী ম্যানেজার আসতেন। মিটিং চলতো অনেক রাত পর্যন্ত।

ছেলেবেলায় বেশ ভালো লাগতো সুশান্তর এ-ধরণের মিটিং। যেদিন এসব মিটিং হতো, তার পর বেশ কয়েকদিন বাবার মুড ভালো থাকতো। আসানসোল থেকে ভালো বাজার আসতো। ওর মায়ের কাছে স্যাকরা আসতো। সেসব গয়নাগুলো ওর বোনেদের বিয়েতে তাদের দিতে দেখেছে সুশান্ত। কোথাও যেন এদের সবার সংগে বাবার বন্দোবস্ত থাকতো। সেই থেকে ওর বাবার কিছু আসতো। বুঝতে পারলেও প্রতিবাদ করেনি সুশান্ত। কিন্তু মনে মনে বাবাকে সে শ্রদ্ধা করেনি কোনোদিন, সেই যখন থেকে ওর জ্ঞান হয়েছে। ওর মায়ের অবশ্য এতে ভীষণ আনন্দ হতো। দিদিমাকে বলতে শুনেছে সে, 'জানাইয়ের আমার মা লক্ষ্মী এসেছে। বর্ধমান থেকে অণ্ডালে ট্রান্সফার হয়েছে। উপরি খুব। আমার গুরুর জন্মদিনে একটা সোনার লকেট দিয়েছে জামাই। পান চিবিয়ে পা ছড়িয়ে গল্প করতেন ওর দিদিমা পড়শীদের কাছে। ছুটিতে কৃষ্ণনগরে মামাবাড়ি যেতো সুশান্ত। সেখানে শুনতো। ঘুষখোর বাবার উপযুক্ত সন্তান দিদিমাকে লকেট ঘুষ দেবার জন্যে ভালো-মন্দ খাবার আর যত্ন-আত্তি কম হতো না সুশান্তর।

সেইদিন থেকে সুশান্তর জেদ চেপেছিলো আর যাই হোক বাবার পছন্দে কোনো কাজ সে করবে না। চাকরী নিয়েও অনেকদিনই মালিকের কথা শোনেনি সে। ওর বাবা বিয়ে দিতে চেয়ে-ছিলেন প্রথমে এ্যাকাউন্টান্ট শিবদাস বাবুর টেনিস খেলোয়াড় মেয়ের সঙ্গে। তারপর একজন বড়ো কোল ডীলারের মেয়ের সংগে। বিয়ে করেনি সুশান্ত। শেষে নিজে দেখে বিয়ে করে এনেছিলো।

ওর বাবার ঘরে মিটিংগুলো হতো অদ্ভুত ধরণের। কী করে ওয়াগন সাইডিং-এ দিতে দেরি

করে সাপ্লাই করেকদিন আটকানো যায়, তারপরে বাজারে দাম চড়ানো—অনেক কিছু আলোচনা হতো। কখনো কখনো একদিনের আলোচনায় সব সেটল্ হতো না। দু-তিনদিন মিটিং লাগতো।

ইয়ার্ডে এতো ওয়াগন দিনের পর দিন খালি পড়ে থাকতো। কিন্তু একটা দুটো এ্যালটমেন্টের জন্য কতো না সাধ্যসাধনা। কাগজে বের হতো—ওয়াগন সর্টেজ। ডিবেট হতো পার্লামেন্টে ; কিন্তু সুশান্ত জানতো, এর সবটা সত্যি নয়।

ন্যাশনালাইজড্ হবার পর চেহারা বদলে গেছে। অনেক অফিসারের সেই কাজের উৎসাহ নেই। যাদের মনে আনন্দ তাদের আবার উৎসাহ দেবার লোক নেই। সুশান্ত এদের মধ্যে একজন। এসময় যদি সাবিত্রী পাশে থাকতো। না, সেসব কথা ভেবে কী হবে। নবীন কবে আসবে সেই চিন্তাতেই সুশান্ত ছটফট করে। অন্তত, একটা কিছু জানতে পারতো। নবীনের একথা কি সত্যি যে সাবিত্রী ওকে নিয়ে আসবার জন্যে সুশান্তকে যেতে বলেছিলো? কি জানি, হয়তো বলেছিলো। বেশি রাত করেই ঘুমিয়ে পড়লো সুশান্ত।

॥ সাত ॥

অনাদি আঢ্যের সামনে বিপদ বাড়ছে এখন। মামারা মালিক হিসেবে কিছু কমপেনসেশন পাবেন, তাছাড়া টেক ওভারের আগে যা লুটেপুটে খেয়েছেন, তা কম নয়। এছাড়া, অনেক কোম্পানীর কাগজ আছে ওদের কাছে। কিন্তু অনাদি আঢ্যের কী হবে? হয় জেল, নয়তো সারাজীবন সুশান্তর ভৃত্য হয়ে থাকতে হবে। মদের টাকা, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করার বন্দোবস্ত যা মামাদের দৌলতে বরাদ্দ ছিলো অনাদির, সেসবও বন্ধ। কুকাজ অকাজ করাবার কিঙ্করও অনুচর ছিলো কালুরাম, সেও বেপাত্তা।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলে, আগে একবার কলকাতা গিয়ে মামার সঙ্গে কথা বলে আসবে। তারপর সুশান্তর স্ত্রীর ব্যাপারটাও ভালো করে যাচাই করে আসবে।

দেরাজগুলোয় পুরোনো কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পুরোনো শুভবিবাহ লেখা কার্ড বের করলো। সেই কার্ডেই বিবাহবাসরের স্থান হিসেবে সুশান্তর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা ছিলো। আলমারির দেরাজ দেখে একগাদা বাজে ছবির থেকে খুঁজতে খুঁজতে সুশান্তর বিয়ের পর দেওয়া কোলিয়ারীর পার্টি থেকে সুশান্ত আর সাবিত্রীর ছবিটাও বের করে নিলো।

তারপর কী ভেবে নিয়ে ঢকঢক করে হুইস্কি খেলো খানিকটা। বেরিয়ে সোজা চলে এলো ফুলমার ঘরে।

ফুলমা ওর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই আলাদা ছোট একটা কোলিয়ারীর একরুমের কোয়ার্টারে থাকে। ওর বাবার কোয়ার্টারে এখন যে দারোয়ান নিযুক্ত হয়েছে, সে থাকে।

সবে সকাল হয়েছে। কোলিয়ারীর আশে পাশের গাঁগুলোর ক্ষেতমজুর আর ছোটখাটো হাট দোকান করা ব্যবসায়ী যে যার পসরা নিয়ে রিক্সায়, ঠেলায়, গরুর গাড়িতে কিম্বা মাথায় নিয়ে বের হচ্ছে। অনাদি জীপটা চালিয়ে এলো ফুলমার কোয়ার্টারের সামনে।

দরজা ঠকঠক করছে, ফুলমা খুলে দিলো। সাবিত্রী না থাকলে সাধারণত একটু বেলা করে যায় ফুলমা সুশান্তর ওখানে। রান্না করার লোক ও চাকর আলাদা আছে সুশান্তর। তারাই সব কাজ করে। জল আনা, কাপড় কাচা, বাজার করা আর ফাইফরমাস খাটার কাজ করে ফুলমা।

দরজা খুলেই অনাদিকে দেখে বললে, 'এই সক্কালবেলা তুই কেন রে বাবু? আজকাল যে খুব আমার কাছে আসছিস। বেপার কি রে? আমার জন্য আবার তোর মন কেমন করছে নাকি? কতো মেয়েমানুষের তো সর্বনাশ করলি, এখন আবার আমার উপরে নজর এসেছে তোর।'

'ছি ছি। তোর মুখে খালি বাজে কথা ছাড়া কোনো কথা নেই। সকালবেলা দুটো ভালোকথা বলতে পারিস না?'

'লেকচার দিস না বাবু, কি বলতে চাস বল। আমার আবার কাজে যেতে হবে।' ফুলমা হাই তুলে বললে। ঘুমের রেশ তার কাটেনি এখনো।

'তোকে একটা কাজ করতে হবে। খুব শক্ত কাজ। পারবি? অনেক টাকা দেবো।'

'কী কাজ। আমাকে দিয়ে আবার তোর কী কাজ? হামি ময়না লই বাবু, ফুলমা। যার নিমক খাই তার কাজই করি।'

ময়না মারা গেছে। কালুয়ামের বোন ছিলো সে। খুব দুশ্চরিত্র মেয়ে। অনাদি একে নিয়ে ফুর্তি করতো, আর একে দিয়ে অনাসব কুলি-কামিনের মেয়েমানুষদের সর্বনাশ করতে চাইতো। একদিন এই ময়নাকেই কোলিয়ারীর লরি ড্রাই-ভারের বৌ কুপিয়ে মেরে ফেলেছিলো। তার পর থেকে সে জেলে আছে। কোলিয়ারীর লরি ড্রাইভার লাখন সিং-এর হিন্দুস্থানী বৌটার ওপর নজর পড়লো অনাদির। ময়না এসে ওর সঙ্গে ভাব করা শুরু করে একদিন কথায় কথায় টাকার কথা বলে প্রস্তাব করলো। লাখনের বৌ মতিয়া ময়নাকে আসতেও বলেছিলো পরদিন দুপুরে। ঐ সময় লাখনা চলে যায় লরি নিয়ে আসানসোল, অণ্ডালের সাইডিং-এ। ফিরতে রাত হয়।

মতিয়া এমন করে ময়নাকে বলেছিলো, ময়নার বিশ্বাস হয়ে গেলো। মতিয়ার জন্য শাড়ি, আলতা কিনে ময়না এলো ভরদুপুরে। জীপে বসে অনাদি। কলোনীর এদিকটা এসময় নিঝুম।

মতিয়ার ঘরে ময়না ঢুকলো। মতিয়া ওর জন্য পান, জল এনে রাখলো। বললো, 'তুই যা দিদি। হামি তৈরি হয়ে নিই। নতুন কাপড়টা পরেই যাবো, নতুন জীবন তো।

ময়না পানটা কেবল মুখে দিতে যাবে, বাস, লাখন সিং-এর ভোজালিটা দিয়ে পেছন দিক থেকে এক কোপ ময়নার ঘাড়ে। চিৎকারে লোকজন এসে পড়লো। তখনো কুপিয়ে চলেছে মতিয়া। যেন চামুণ্ডার মূর্তি ধরেছে, হাসছে আর বলছে, 'কতো লোকের রক্ত সেব করলি তুই, এবার তোর রক্ত হামি সব শুষে লিবো। বোল বোল বোলরে ময়না। তোর নাম ময়না রেখেছে কোন শালারে! হামার ঘরটা ভাঙবার জন্য তোর চাল সব খতম কইরা দিলাম।

যার নিমক খাই তার কাজই করি

পুলিশ, আর কলোনীর সব লোক যখন এসে পড়েছে—তখন ঘরের দাওয়ায় রক্ত। চিৎকার শুনেই অনাদি জীপ নিয়ে পালিয়ে গেছে।

থেমেছে মতিয়া। ভোজালিটা এক পাশে ফেলে রেখে রক্তগুলো কপালে মেখে বললে, 'চলুন

বৃহত্তর কলকাতাবাসীদের কাছে কলকাতার নব পরিচয় তুলে ধরছেন সি. এম. ডি. এ।

আজ যে কলকাতার রাস্তাঘাটে বর্ষার সময় কম জল জমছে, সেটা সবাই জানেন।

কিন্তু পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধিতে আমাদের অবদান জানেন কি? বস্তী উন্নয়নে আমরা কি করেছি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, সাবওয়ে নির্মাণে আমাদের পরিকল্পনা কি; সে সম্বন্ধে জানেন কি?

এগুলি জানা দরকার। আপনাদের চিঠি পেলে আমরা জানাবো। ভুল বোঝাবুঝির অবসান দরকার।

CMDA

ভোলানাথ সেন
চেয়ারম্যান, সি. এম. ডি. এ
৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭

তরুণ অপেরা
১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা ৬
১৩৮২ সালের বলিষ্ঠ প্রযোজনা
শম্ভু বাগ রচিত
ক্রীতদাস
সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য
●
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের
বলিদান
নব রূপায়ণ—হারু রায়, সুর—দুর্গা সেন
নির্দ্দেশনা ও অভিনয়ে—শান্তিগোপাল

লোকশিক্ষার ধারক ও বাহক
মঞ্জুরী অপেরা
৩৩১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
৩টি ভিন্নধর্মী নাটকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি
মহাকবি কালিদাস
এক যে ছিল কন্যা
অভিশপ্ত ফুলশয্যা
শ্রেষ্ঠাংশে :
বাণীবিনোদ—শক্তি ভট্টাচার্য্য
চিত্র ও মঞ্চখ্যাত—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত সুধাকর—কিতীশ রায়
কিন্নর কণ্ঠী—সাহানা বোস
সরোজ বিশ্বাস, অরুণ মুখার্জ্জী, রাজা ঘোষ,
অন্নদা চক্রবর্ত্তী আরও অনেকে—
ম্যানেজার—মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা, পরিচালক—ছবিরাণী

সাব, হামাকে থানায় নিয়ে চলুন। হামার লাখনার দোষ নাই। হামি একটা মতলব খতম করেছি আপনার হামার সব বইনের ইজ্জত বাঁচাতে।' পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেলো।

রটে গিয়েছিলো একথা কোলিয়ারীতে। কয়েকটা ইউনিয়ন মালিককে জানিয়েছিলো অনাদিকে সরাবার জন্যে। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে মতিয়ার স্টেটমেণ্ট অনাভাবে রেকর্ড হলো। কোর্টে কিছুই প্রমাণ হলো না। মতিয়ার জেল হয়ে গেলো।

ফুলমার মুখে মতিয়ার কথা শুনে চমকে উঠলো অনাদি। মনে পড়ে গেলো সেই দিনের কথা। বললো, 'আরে না না, তা কেন হবে। তোর কোনো নুকসান করবো না আমি। তোকে একটা ছোটো কাজ করতে হবে। তুই কালকে রাতে জোর করে বেশি রাত পর্যন্ত সুশান্তর বাড়িতে থাকবি। তারপর রাত বাড়লে চিল্লাতে শুরু করবি। লোকজন যাবে, তখন বলবি যে, সুশান্ত তোর ওপরে জুলুম করতে চেয়েছিলো। এর থেকে বেশি তোর কিছু করতে হবে না। তোকে এক হাজার টাকা দেবো। কতো তাড়ি খাবি তুই? তোর সারাজীবনের তাড়ি খাবার টাকা পেয়ে যাবি।'

'ওঃ এই কাজ। তা টাকা কখন দিবি বাবু। আগে না পরে?'

'তিনশো টাকা আগে দেবো, বাকি টাকা পরে।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে টাকাটা দিয়ে যাস।'

'কাজটা করতে হবে কিন্তু'—বলে আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত বোলাতে শুরু করলো অনাদি। ফুলমা ভ্রুকুটি করে বললো, 'এটা আবার কি আদর হচ্ছে নাকি রে বাবু। হাত ছাড়, এসব হামি ভালোবাসি না।'

'আমার সতীলক্ষ্মীরে। তাড়ি খেয়ে যখন হুঁশ থাকে না, তখন টের পাস না কারা কী করে। আর এখন একেবারে সম্মান চলে যাচ্ছে!'

'তাড়ি খেয়ে হুঁশ হামার কোনো দিন যায়নি বাবু। তোদের হুঁশ চলে যায়। হামি বাগ্দী, তাড়ি হামার রক্তে আছে। হামার ইজ্জত নিয়ে হামলা হলে হামি তার বদলা নিই বাবু।'

আঁতকে উঠে হাত সরিয়ে নিয়ে অনাদি বললে, 'ঠিক আছে, কাল সকালে আসবো টাকা নিয়ে। কাল রাতে সুশান্তর বাড়ির কাছে ক্লাবের ফাংশান আছে। লোকজন থাকবে। হল্লা করবি সেই সময়। কেমন?

'সেটা কেমন কথা। বাবু যদি ঐ ফাংশানে চলে যায়, তাহলে কেমন করে হবে?'

'যাবে না। কাল রাত নটা পর্যন্ত কোলিয়ারীতে কাজ আছে। অনেক মিটিং আছে বড়ো

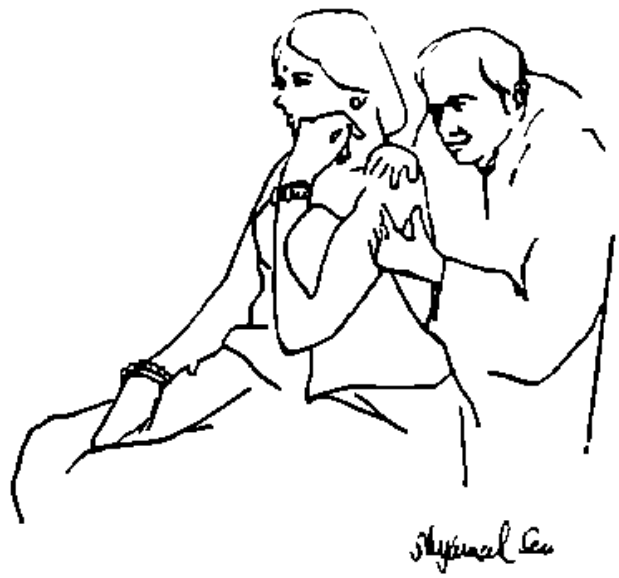

আমার সতী লক্ষ্মী রে !

সাহেবদের সঙ্গে। ও ফিরবে নটা দশটা নাগাদ। আর ফিরলেই তুই শুরু করবি।'

মুচকি হেসে ফুলমা বললে, 'ঠিক আছে'। অনাদি বেরিয়ে গেলো।

সুশান্ত বসে কাগজ পড়ছিলো বারান্দায়। ফুলমা ঢুকলো ঘরে। সুশান্ত বললো, 'আজ যে এতো দেরি করে, কাল বেশি খেয়েছিলি নাকি?'

'না বাবু, বেশি খাবো পয়সা কুথায়?'

'যেদিন বেশি খেতে ইচ্ছে হবে, পয়সা চেয়ে নিস, পয়সা দেবো।'

'একটা কাজ করলে তো এখন অনেক টাকা পাই।' বলেই মুচকি হাসতে লাগলো।

'হাসছিস যে বড়ো। কী কাজ?'

'ভীষণ বড় কাজ। বলতে পারবো না...

'বল না, আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি।'

'ঘরের ভিতর আয় বাবু, বলছি।'

'বাবা, তোরও প্রাইভেট কথা!' কাগজটা নিয়েই ঘরের ভিতর ঢুকলো সুশান্ত।

ঘরে ঢুকতেই ফুলমা ওর পা ধরে কেঁদে বললে, 'তুই ইখান থেকে চলে যা বাবু। তুর এখানে ভালো হবে না।'

'কীরে, কাঁদছিস কেন? বল কী হয়েছে। কেন আমি যাবো? ভালোই তো আছি।'

ফুলমা অনাদি আচ্যের সব কথা খুলে বললো। সুশান্ত সব শুনে বললো, 'ওঃ, এই কথা। তা তুই তো বোকা। আগে তিনশো টাকা নিয়ে নে।'

না বাবু, ওসব কাজের মধ্যে কোনো চালাকিতে আমি নেই। বৌদিদিকে নিয়ে তুই কোথাও চলে যা। ও অনাদি একদিন তোকে মেরে ফেলবে।'

'ঠিক আছে তোকে ভাবতে হবে না। যা করবার আমি করবো। কাজ কর গিয়ে, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

যথারীতি সকালবেলা নবীন চলে এলো শান্তিনিকেতনে। মেলার সব দোকানগুলো এখনো খোলেনি। দোকানের কাজ করা লোক ছাড়া তেমন কোনো ভিড় নেই।

সাবিত্রী সেই সাতসকালে স্নান করে একটা হাল্কা বেগুনি রঙের শাড়ি পড়ে থলে দাঁড়িয়ে সকালের কাগজ পড়ছে। নবীন আসতেই বললে, 'একেবারে পাকেচক্রে তো আপনি। চলুন, কোথাও বসা যাক।'

'তোমার যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে আমার ওখানে চলো না!'

'বাবাঃ, সেই হোটেলে!'

'থাক, তার চেয়ে বরং একটু বেড়িয়ে নিই।'

'কোথাও বসুন, কথা বলা যাবে'—গাছের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সাবিত্রী বললো। আমার চিঠিটা অসমাপ্ত, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি।'

'বুঝতে দিলাম কোথায়, যে বুঝবেন? বসুন এখানটায়।' গাছের নিচে সিমেন্টে বাঁধানো বেঞ্চে বসলো ওরা।

সাবিত্রীই শুরু করলো, 'মাড়োয়ারী লোকটাই আমার নাম রেখেছিলো সাবিত্রী। আসলে আমার নাম ছিলো মালা। আমার অন্নপ্রাশনে এই নামটাই বোধহয় রেখেছিলো বাবা-মা। কারণ, আমার গলায় যে ছোটবেলায় লকেটটা ছিলো, সেটাতে এই নাম লেখা ছিলো। মাড়োয়ারীর ভগবানের দেবদেবীর নামে ভীষণ আসক্তি, তাই আমার নাম দিয়েছিলো সাবিত্রী। আমার সাত বছর বয়সে মাড়োয়ারীর সঙ্গে কলকাতায় আসি। সারাদিন ব্যবসায়ে মত্ত থাকলেও, পিতৃস্নেহ ওঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। ওঁর সংসারেও কেউ ছিলো না। দু'চারজন ভাই-টাই ছিলো, তারাও ব্যবসা দেখতো।

কলকাতায় এসে জানলাম, আমার একজন মামা আছেন। সেই মামাও কোনো সূত্রে জেনেছিলেন যে, আমি বেঁচে আছি এবং এই মাড়োয়ারীর কাছে আছি। মামা খুব ভালোমানুষ ছিলেন না। মদ, জুয়া, রেস সবকিছুতে তাঁর আসক্তি ছিলো।

মাড়োয়ারীর হলো মুস্কিল। তিনি কোনো লিখিত কাগজে আমাকে মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। মুসলমান ফকির এসে তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলো। ফলে, প্রায়ই নাকি মামা এসে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন। মাড়োয়ারী সুখনারায়ণ দাস একদিন মামার পা ধরে কান্নাকাটি করলেন। আমি স্কুল থেকে ফিরে দেখি ড্রইংরুমে বসে সুখনারায়ণ দাস একজন পাতলা মতো ধুতিপরা লোকের পা ধরে কাঁদছেন। তাঁকে বলতে শুনলাম, হামি মরিয়ে যাবো সুজনবাবু, হামাকে মাফ করুন। সাবিত্রী হামার মা। ওকে হামি এতোটুকু থেকে মানুষ করিয়েছি।

সেই লোকটি তার উত্তরে বললো, কেঁদে কী হবে? বাঙালীর মেয়েকে নিয়ে তুমি যে ব্যবসা করছো না কী করে বুঝবো?

সুখনারায়ণ বললেন, ছি-ছি, এতো বড়ো খারাপ কোথা না বলে আপনি হামাকে মারিয়ে দেন বাবুজী। বেওসা হামরা করি, কিন্তু হামাদেরও দিল আছে। বাচ্চাকে লিয়ে পেয়ার আছে। সাবিত্রী হামার মা। আপনি টাকা লিবেন মাসে মাসে, হামি যতোদিন বাচি লিয়ে যাবো। কিন্তু সাবিত্রীকে লিয়ে যাবেন না।

লোকটি বললে, ঠিক আছে। তাই হবে। দু' হাজার টাকা প্রতি মাসের দু' তারিখে নিতে আসবো। কান আমার গরম হয়ে গেলো নবীন-বাবু। তারপর সুখনারায়ণ দাসকে রাতে বললাম, বাবুজী ভাই আমার কথা আছে। ছোটোবেলা থেকেই আমি ওকে বাবুজী ভাই বলে ডাকতাম। আমি বললাম যে, সেদিনের সব কথা আমি শুনেছি দরজার পাশ থেকে।

সুখনারায়ণজী কেঁদে উঠলেন শিশুর মতো। আমাকে সব বললেন, আমার পরিচয় আমি জানলাম। কেঁদেছি সারারাত মা-বাবার কথা ভেবে। লকেটটা বের করে দিয়েছিলেন বাবুজীভাই। ছোটবেলার লকেট, নাম লেখা—মালা। সুজন-বাবুর প্রতি মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। যিনি সম্পর্কে আমার মামা। কী করবো উপায় নেই। বাবুজীভাই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। অন্যদিকে এই ধরণের মানার কাছে থাকতে গিয়েও ঘেন্না। শেষে থেকে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো সাবিত্রীর।

'এরপরের কথা শুনলে আমার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি আর থাকবে না নবীনবাবু।'

'তুমি যামাখা মন খারাপ করছো। সবার জীবনেই দুঃখ থাকে।'

'এরপর গগন মিত্রের মেয়ে হয়ে গেলাম' আমি, কলেজে পা দিতে না দিতেই। গগন মিত্র ছিলো বাবুজীভাই-এর লিগ্যাল এ্যাডভাইজার। আমি চিনতুম না। মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসতে দেখেছি। বাবুজীভাই-এর তখন খুব অসুখ, যায়-যায় অবস্থা প্রায়। বেশ কিছু কাগজপত্র তখন সই-টই করতেন বাবুজীভাই। একদিন আমায় ডেকে বললেন বাবুজীভাই—সাবিত্রী মা, হামি তো আর বাঁচবো না। ক্যানসার হয়েছে ব্লাডে। তোর কিছু ভাবনা নেই। যা রেখে যাবো, সারাজীবন খাবি। কিন্তু একটা বেবস্থা করে যাবো মা। গগনবাবুর ঘরে গিয়ে এখন থেকে থাকবি। নামী লোক। বড়া ব্যারিস্টার। ও তোকে মেয়ের মত রাখবে। ওর কেউ নেই, একটা ছেলে ছাড়া। ওর ইচ্ছে, ঐ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে।

মাথা নীচু করে রইলাম। জীবনটা যার এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে ভেসে চলেছে তার পক্ষে মুসলমান ফকির থেকে শেঠ সুখনারায়ণ দাস, আর শেঠ সুখনারায়ণ থেকে গগন মিত্রের ঘরে যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

একদিন সেই গগন মিত্র এলেন। আমাকে ডেকে বললেন, তুমিও আমার কাছেই থাকবে। কিছু বুঝতে পারলাম না। বাবুজীভাইয়ের মরবার আগে জেনেছিলাম আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে অনেক টাকা, সোনা, সবকিছু গগনবাবুকে দেওয়া আছে। আমার বিয়ের পর নাকি বাবুজীভাইয়ের বিজনেস থেকে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা আমি

পাবো। বাবুজীভাই মারা গেলেন। বাবুজীভাইয়ের ছোট ভাই ব্যবসা দেখতে শুরু করলো। আমার কাছে রোজই ওদের টাকার থলি আর কাগজ নিয়ে আসতো। দু-একদিন সই-টই করেছি চেক। তারপর উকিল ডেকে ওকেই পাওয়ার অব এ্যাটর্নি করে দিয়েছি। ভালো লাগতো না আমার ওসব। কাপড়, তেল, সাবানের বড়ো ব্যবসা চলতো বাবুজীভাইয়ের নামে।

গগনবাবুর বাড়ি একদিন চলে এলাম। বাবুজীভাই-র ছোট ভাই হরিনারায়ণ দাসের খুব সম্মতি ছিলো না। কিন্তু বাবুজীর ইচ্ছা, তাই পূরণ করলাম। তারপর শুরু হলো আমার নতুন জীবন। প্রথম মাসখানেক বেশ ছিলাম। গগনবাবুর সঙ্গে সকালে ব্রেকফাস্ট হতো। ওর ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। রাতে ওদের সঙ্গে আর খুব যোগাযোগ হতো না। হয়তো মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি নিজের পড়াশুনো করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো একের পর এক আসতে শুরু করলো। একদিন ঘুম ভেঙে দেখি আমার পাশেই শুয়ে গগনবাবুর ছেলে। আমি সম্পূর্ণ অন্য অবস্থায়!

শুনেছিলাম এরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। একটু ঘাবড়ে গেলাম। তারপর রাত হলেই আমার বিভীষিকা হতো। তখন কলেজ ছুটি। বাইরে যাবার কাজ কম। কোর্টও ছুটি।

নবীনবাবু, আপনাকে কী করে বোঝাবো যে, আমি হায়েনার গর্তে ঢুকে পড়েছিলাম। হায়নার সন্তান আর হায়নার চরিত্র এক। আমার নারীত্বের সবটুকু কেড়ে নিয়েছে গগন মিত্র আর তাঁর ছেলে।

'কী বলছেন আপনি?' নবীনের বিস্মিত ও আহত প্রশ্ন।

'ঠিকই বলছি। দুজনেই লম্পট। দুজনেই ছিলো শয়তানের থেকেও ঘৃণ্য। এই রাতে যদি গগনবাবু আসতেন তো পরের রাতে তাঁর ছেলে। তারপর আমার যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি মা হয়েছি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেছি। আমার কলেজ ইউনিভার্সিটি সব গেছে। তখন গগন-বাবুরা অন্য শিকার পেয়েছে।

উপকার তিনি করেছেন। সমাজে আমাকে মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছেন। এইভাবে আমার বিয়েও দিয়েছেন। ওঁর নিকট বন্ধুদের বলতেন যে, দত্তক মেয়ে। আর সাধারণে জানতো যে আমি ওর নিজের মেয়ে।

একবার ভাবলাম যে, বাবুজীভাইয়ের ছোট ভাইকে সব জানাবো। সে তখন কী একটা ব্যাপারে এ্যারেস্ট হয়ে জেলে। আমার চারদিকে তখন অন্ধকার। সুশান্ত যেদিন আমায় দেখতে এলো ওর বন্ধুদের সঙ্গে, সেদিন ঘরে বসে ওর লম্পট ছেলে স্বপন মিত্র আর ওদের বন্ধুবান্ধব। আমি একটা একজিবিশানের পুতুলের মতো মুখ নেড়ে-চেড়ে আমার দায়িত্ব সারলাম। আমি জান-তাম, এবার আর আমি হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছি না, আর একজনের সর্বনাশ করতে চলেছি।

আমার বিয়ের জন্য কম করে পাঁচলক্ষ টাকার জিনিস ছিলো। বিয়েতে খরচ হলো সব মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা। এমন কি, আমার জন্য যে সোনাগুলো দিয়েছিলো বাবুজীভাই, তারও সব আমাকে দেয়নি। আমার সেই মামা সুজনবাবু আর গগনবাবুরা একত্রে সবই ভাগ করে নিয়েছেন।'

নবীন বললে, 'আশ্চর্য! এতো বড়ো একটা ঘটনা, একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত, কয়েক বছর ধরে এতো বড়ো একটা শহরের ওপর হয়ে গেলো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ নবীনবাবু। এতো বড়ো ঘটনা কেন বলছেন। এতো ছোটো ঘটনা। এবার নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গেছেন? বলুন, আমার এই পরিচয় পেলে সুশান্তর বাবা, সুশান্ত, ওর ছোটো ভাই প্রশান্ত —ওদের কাছে আমার স্থান কোথায় হবে?'

না, মানে, যা হবার তা হয়ে গেছে। সবাই মানুষ। তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তাকে সারাজীবন সাজা দেওয়া যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি সব। আজই বর্ধমানে যাবো। সুশান্তকে সব বুঝিয়ে বলবো। ওর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে

মিশেছি, ওকে আমি জানি। ও ভীষণ ভালো-মানুষ। ওর হৃদয় আছে। ও নিশ্চয়ই সব জেনেও তোমাকে ডাকবে সাবিত্রী। তুমি আমার বোন। সমাজে স্বপন মিত্তিরই সব নয়। তাহলে সমাজটা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে যেতো। তুমি কেঁদো না বোন। আমি সুশান্তকে বোঝাবার দায়িত্ব নেবো।'

'না, নবীনদা। কাঁদবো কেন? কান্না হাসি সব আমার শেষ। আমি কী দেবো সুশান্তকে? আমার দেবার কিছু নেই। আমার সব সঞ্চয় শেষ। কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবার আমার কিছু কাগজপত্র নিতে। ওদের চোখ এড়িয়ে কোন-রকমে এসেছি।'

'তবে বিয়ের পর কিন্তু তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হয়নি সাবিত্রী।'

'তা আমি জানি। কিন্তু এবার গিয়েছিলাম লড়তে। আশ্রয়প্রার্থী হয়ে নয়। সাপিনী হয়ে ছোবল দিতে। গিয়ে দেখলাম গগনবাবুর ক্যান-সার। ওটা বাঁচবে না বেশিদিন। আর স্বপনের লিভার সিরোসিস। ওটাও বাঁচবে না। তাই জোর করে আঘাত না করে নিজের কাগজগুলো সব গুছিয়ে নিলাম। হরিনারায়ণকে সব কাগজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাবো।'

'না, তা হয় না সাবিত্রী। তাহলে আমি কিন্তু দুঃখ পাবো। তুমি বরং কিছুদিন আমার বোনের বাড়ি দুর্গাপুরে গিয়ে থাকো। তারপর তোমাকে আমি এসে নিয়ে যাবো। আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'রাজা ইদিপাসের কাহিনী পড়ানো হতো আমাদের ইংরিজী ক্লাসে। কিন্তু সে তো অভিশাপ ছিলো। আমার কেন এমন হলো? জানো নবীনদা, আমি প্রায়ই রাজা ইদিপাসের গল্প স্বপ্নে দেখি। সেখানে মাকে নিয়ে ব্যভিচার করেছে পুত্র। আর এখানে মেয়েকে ভোগ করেছে পিতা পুত্র দুজনেই। এটাও একটা গ্রীক কাহিনী হতে পারতো না কী নবীনদা?'

নবীন কেঁদে ফেললো। 'কেন কষ্ট পাচ্ছো নিজেকে নিয়ে সাবিত্রী? তোমার যা গেছে তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা না করে, যা আছে তাকে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা কোরো।'

সেদিন রাতেই ওরা কলকাতা এসে হরি-নারায়ণের জন্য দুদিন অপেক্ষা করে, তাকে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে পরদিন ভোরে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে রওনা হলো দুর্গাপুরে। ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে সেই সাতসকালে স্টেশনে এসে হাজির হরিনারায়ণ। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট-এর কাছে এসে বললো, 'দিদি, বেওসা সব তোমার। যখন যা দরকার হামাকে লিখো। হামাকে ফলস করে হয়রান করে জেল খাটালো সেই সুজনবাবু। ওকে আর টাকা আমি দিই না।'

সাবিত্রী বললে, 'ওই টাকাটা তুমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পাঠিও। যাদুজীভাই বলতেন, এদের চাঁদা দিলে সেই চাঁদায় কাজ হয়।'

'জো হুকুম দিদিভাই।' সময় হয়ে গেছে, ট্রেন ছেড়ে দিলো। দুর্গাপুরে স্টিল প্রোজেক্টেই নবীনের ভগ্নীপতি থাকেন। সাবিত্রীকে সেখানে এনে তুললো নবীন। তারপর বাসে করে নবীন চলে গেলো রাণীগঞ্জ।

অনাদি আঢ্যা কোলকাতা এসেছে। উদ্দেশ্য মহৎ নয়। প্রথমতঃ পরামর্শ করা মামাদের সাথে, জাল সার্টিফিকেট বাঁচাবার কোন পথ আছে কি না, দ্বিতীয়তঃ, চুরি করা জিনিস হজম করবে কেমন করে সে বিষয়েও পরামর্শ নেওয়া দরকার।

অনাদি আঢ্যার মামার আরও পাঁচটা ব্যবসা আছে। কাজেই কয়লাখনি জাতীয়করণ হবার জন্য সে পথে বসেনি। কিন্তু কয়লাখনির হিসেব বাঁচিয়ে যে কালো টাকা আসত তাতে ভাটা পড়ল।

অনাদিকে সরাসরি বললেন ওর মামা, "চেষ্টা অনেক করেছিলাম মিনিস্টারকে পটাতে। শালা কোন কিছুতেই ভিজল না। জাত শয়তান মালিকদের। তা নাহলে এক কোটি টাকার তিন বছরের বন্দোবস্ত করার কথা ভেবেছিলাম তাতেও চিঁড়ে ভিজল না।"

"মিনিস্টার পর্যন্ত পৌঁছানই গেলো না। কুমারমঙ্গলমের এত তেজ আগে জানলে আমরা অন্য রাস্তা নিতুম।"

"কিন্তু মামা আমার কি হবে? ইনভেস্টিগেশনের পুলিশের ভদ্রলোককে ত অনেক টাকা খাওয়ালাম। এখন শুনছি সে শালাও নাকি ট্রান্সফার হবে।"

"এর জন্য তুমি দায়ী"—বেশ রেগেই ওর মামা বললে।

"বারে আমি কি করব।"

"কি আবার, ওসব অফিসারের ঘড় আর মাথাটা আলাদা করে অজয়ের তীরে ফেলে দেবার রেওয়াজটা ভুলে গেলে নাকি। এর আগেও ত শ্যামল ফাদিরা কোলিয়ারীর একাউন্ট্যান্টকে তাই করা হয়েছিল।"

"কিন্তু মামা কালুরামের লোকেরা আর সেই সাহস নিয়ে বোধ হয় কিছু করতে পারবে না।"—অনাদি বললে।

"দরকার হলে কোলকাতা থেকে লোক যেত। থাকগে সেসব কথা। এখন যে কাগজগুলো সরাতে বলেছিলাম সেগুলো সব ঠিক আছে ত।"

"হ্যাঁ, সে সব আমি সঙ্গে করেই এনেছি। শুধু পারচেজের কাগজগুলো ডুপ্লিকেট সই করিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু পারচেজের অফিসার বিনোদবাবু কুমারডিহির কোলিয়ারীতে গেছে ওখানকার পারচেজ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে। ওরা দুজনে প্ল্যান করে সব করেছে ত।" এ কথা বলে একটা ছোট্ট ব্যাগ এগিয়ে দিল অনাদি ওর মামা নিশানাথের দিকে।

কয়লাখনি জাতীয়করণ হবার পর বেশ-কয়েকমাস ধরেই এ সব অন্যায় চলছে সাম্রাজ্যের শেষ সম্পদটুকু নিঃশেষে ভোগ করার স্পৃহায়। পরাজিত, অপমানিত বাদশাদের মোসাহেবের দল সেই জঘন্য কাজেই ব্যস্ত।

একটু পরেই একজন লোক এল একটা স্লিপ নিয়ে ওর মামার কাছে। নিশানাথ বললে, "পাঠিয়ে দাও" নিশানাথের লিগ্যাল এ্যাডভাইসারের জুনিয়র এল।

"নমস্কার নিশানাথবাবু, স্যারের ত শরীর খারাপ তাই ব্রিফটা প্রাইমারিলি আমাকেই দেখতে বললেন। তবে স্যারের এ্যাডভাইস হোল কোর্টে কনটেস্ট করা। অনেক নাকি ত্রুটি আছে আইনটাতে। আমরা জিতেও যেতে পারি।"

"তাই নাকি? তাহলে ত আমাদের এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলতে হয়। মাদারবনীর মালিকরা অবশ্য সেকথাই বলছিল। তা গগনবাবু সুস্থ হয়ে উঠছেন তো শীগগীর?" নিশানাথ বললে গগনের জুনিয়রকে।

"চেষ্টা ত চলছে। তবে ওর ছেলেরও অসুখ কিনা। একসঙ্গেই দুজনে ভুগছে।"

"ভোগ করলে একটু ভুগতে হয়, বুঝলেন। ওতে কিছু হয় না। সেই মেয়েটি ত' দিব্যি এখন বিয়ের পর অন্যখানে চলে গেছে। বিপদ বেঁচেছে গগনবাবুর, কি বলেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ।" বেশ রসিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন নিশানাথবাবু।

মাথাটা নীচু করেই গগন মিত্রের জুনিয়র বললে, "সেসব ঝামেলা আর নেই। তবে দিনকয়েক আগে নাকি সেই মেয়েটি এসেছিল ওর কাগজপত্র সব নিয়ে যেতে। আজকাল কোলিয়ারীতেই নাকি থাকে। সেখানেই নাকি বিয়ে হয়েছে।" জুনিয়র ভদ্রলোক বললে।

চোখটা নেচে উঠল অনাদির এতক্ষণে। জিজ্ঞেস করল,

"কোলিয়ারী। কোন কোলিয়ারী বলতে পারেন? কি নাম মেয়েটির?"

"সাবিত্রী, তবে কোথায় কোন কোলিয়ারী সে সব আমি জানি না। ছেলেটি নাকি মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার"—লিগ্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট গগনের জুনিয়র বললে।

"মামা, সুশান্তর গিন্নী বোধ হয়, ওর নামটাও সাবিত্রী না কি একটা বোধ হয়। হুররে,

কিছু পয়েন্টস পেলামে বোধ হয়।" বেশ বিজয়ীর মত বললে অনাদি।

"তোর আবার এতে কি লাভ হল?"

"সেটা আমার ছেড়ে দাও মামা। তা তোমার এই গগন মিত্রের বিষয়টা একটু জানতে পারি?" উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনাদি।

"ওসব কথা এনাকেই জিজ্ঞেস কর। বয়সে ত এখনও তোর মামা আমি, কি বলেন অতনুবাবু? আমি বরং অন্য কাজে যাই—আপনি অনাদিকে এ বিষয়ে অবহিত করুন। যদি ওর কোন কাজে লাগে।" এই বলেই হাসতে হাসতে নিশানাথবাবু বেরিয়ে গেলেন।

নিশানাথবাবু চলে যাবার পর অনাদি আদ্যোপান্ত সাবিত্রীর ঘটনা ও গগনের চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বলল, "এই তাহলে সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান।" এবার অনাদি যেন শিকার পেয়েছে জালে। মাচা বেঁধে বসেছিল। সব বুঝি এবার ধরা পড়বে। সন্ধ্যে হতে না হতেই গগন মিত্রের বাড়ী এসে হাজির হল।

বেয়ারা ওকে একেবারে গগন মিত্রের ঘরে নিয়ে গেল। তিনি বিলক্ষণ অনাদি কি জাতের মানুষ হতে পারে তা বুঝতে পারলেন। প্রথমে কিছু ভাঙ্গতে চাইছিলেন না, তারপর যখন অনাদি নিজেই বললে যে, সে তার মামা ও জুনিয়র অতনুর কাছ থেকে অনেকটা জেনেছে, তখন গগন মিত্র বললে, "আপনি বরং এ বিষয়ে আপনার ছেলের কাছে শুনুন, এ বিষয়ে আমি আর কেন বলি। হাজার হলেও আমার বয়স হয়েছে ত? তবে দেখবেন এসব ব্যাপারে জড়াবার চেষ্টা করবেন না। আপনার মামা আমার বহুদিনের ক্লায়েন্ট ও বন্ধুস্থানীয়।"

"না না সে কি হয়? এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আসলে মেয়েটার যেমন দোষ তেমনি ওর কর্তার। আমি চাইছিলাম একটু টাইট করতে। দুনিয়াকে ওরা ধরা জ্ঞান করে না।"

স্বপন মিত্র ইঁনিয়ে বিনিয়ে টাকার বিনিময়ে অনেক কিছুই বললে।

তারপর ব্যাগ থেকে দুটো ভাল হুইস্কির বোতল বের করে অনাদি বললে, "আপনার জন্যই এনেছি। খুব বেয়ার ব্রান্ড। আমি নিজে আনিয়েছি।" নানাভাবে প্রলোভিত করে যে সব ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারল অনাদি স্বপনের কাছ থেকে তাই যথেষ্ট সুশান্ত ঘোষকে বিব্রত ও অপদস্থ করার জন্য।

স্বপনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসে অনাদি ফিরল বাড়ীতে, তখনও ওর মামা বসে। "কি হে, কিছু হল, এত রাতে এলে যে?"

আজ্ঞে বাজীমাৎ মামা। একেবারে কেল্লাফতে। দেখব শালা সুশান্ত ঘোষকে এবার। বড় দেমাগ ব্যাটার। গভরমেন্টের দালাল হয়ে গেছে শালা।" বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল অনাদি।

"আরে অত রাগ কোরো না আবার, এখন বুদ্ধি করে সব করতে হবে। আগে এসব কথা সুশান্তকে শান্তভাবে বলে দেখ, রিঅ্যাকশন ভাল কিনা। যদি মন্দ দেখি তখন না হয় অন্য কথা ভাবা যাবে, এখন আর এসবে দরকার কি?" পরামর্শ দিলেন অনাদিকে ওর মামা।

অনাদি আঢ্যের শয়তানী বুদ্ধিটার যেন শান পড়ল। মামার সঙ্গে পরামর্শ করেই রাতে গিয়ে পার্ক হোটেলে বসে মদ গিলল অনেকক্ষণ ধরে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল সীতারাম ঢনঢনিয়াকে। এই সীতারাম ঢনঢনিয়ার সঙ্গেই ওদের কালো টাকার ব্যবসা চলত। কত যে মিথ্যে ভাউচার হয়েছে ঢনঢনিয়ার নামে কম্পানী প্যাচরের নাম করে তার ঠিকানা নেই। ঢনঢনিয়ারও বেঁচেছে ইনকামট্যাক্স আর টাকা এসেছে দু হাত ভরে অনাদি আঢ্যদের। অবশ্য ওয়াগন বুকিং-এর সময় আর ওয়াগন না দেবার বাহানায় দু' পয়সা গুপ্তসবাবু, ষ্টেশনমাষ্টারও পেয়েছেন।

সীতারাম ঢনঢনিয়া এসে অনাদির কাছে বসল, "কি হল সব বলুন ত অনাদিবাবু"?

"আর কি হবে, গভরমেন্ট শালা সমাজতন্ত্র করছে।"

৺শারদীয়ায় সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে—

নাট্য ভারতী এবং প্রদীপ অপেরা

প্রশান্ত চৌধুরীর
লাল পাথর

রবীন ব্যানার্জীর
বেইমান
নির্দেশনা—শেখর গাঙ্গুলী
শ্রেঃ— শেখর গাঙ্গুলী
ও
শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

রবীন ব্যানার্জীর
ভোলা মাষ্টার

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ফুলেশ্বরী
শ্রেঃ—মনোরঞ্জন চক্রবর্তী,
কল্পনা নায়েক ও শান্তনু ঘোষ।

৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন : ৫৫-৮১২৮

"কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস।"

—আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋষি বঙ্কিমের সেই কালজয়ী সৃষ্টি

কৃষ্ণকান্তের উইল

যুগোপযোগী নাট্য রূপান্তরিত হয়ে
সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে

ষ্টার থিয়েটারে

প্রতি বৃহঃ ৬।টা।
শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩টা, ৬।। টায়।

প্রধান নাট্য-উপদেষ্টা : মহেন্দ্র গুপ্ত
নাট্যরূপ : কুনাল মুখার্জি
নির্দেশনা : রঞ্জিৎমল কাঙারিয়া

রয়েল বীণাপাণির ৮১'র চমক্

বিশ্বজিতের ঐতিহাসিক
"রক্তনদীর ধারা"
সুর—অমিয় ভট্টাচার্য্য

কানাই নাথের সামাজিক
"সতী না অসতী ?"
সুর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

চলছে ৮১'র হিট্
"সোনাডাঙ্গার বউ"
নির্দেশনা ও শ্রেষ্ঠাংশে—ভ-প-ন কু-মা-র
গোরাশশী, সাধন, গৌতম, প্রতিমা, লতিকা, আলপনা
প্রযোজক—ডি. ভট্টাঃ পরিচালক—সুদাস চক্রবর্তী
১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ ৫৫-৭৫৫২

"ভয় পাবার কিছু নেই—এর মধ্যেও টু-পাইস হবে। শুধু কায়দা করে নিজেদের লোক-গুলো ঠিক জায়গায় রেখে দিন তারপরে ডি ও স্লিপ কেটে মাল বের করে এনে কি করে কোথায় কি দামে বেচা যায়, ওটা হামি ঠিক বাতলে দোব।"

সত্যিই হয়েছিল তাই। হু হু করে কয়লার দাম বাড়তে শুরু করেছিল। জাতীয়করণের পর দাম বৃদ্ধি কেন এই বিষয়ে সম্পাদকীয় কলমে অনেক লেখাও বেরিয়েছিল, কিন্তু ডি ও স্লিপের কারসাজি আর মাল বের করে এনে বাইরে যেমন খুশী তেমন দরে বিক্রির ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা রইল। ওদিকে রেলের কিছু কিছু লোকও সম্বন্ধ হয়ে গুডস ইয়ার্ডের ওয়ার্ক স্লো পদ্ধতি চালু করল।

অনেক পরে অবশ্য সি এম এ এসে একে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করল।

নবীন সকাল থেকেই বসে বসে ভাবছিল সব খবর সে সুশান্তকে জানাবে না। স্কুলে গিয়েও স্কুলের কাজে মন দিতে পারল না। স্কুল থেকেই সুশান্তকে ফোন করল, সুশান্ত সেখানে নেই। তারপর ঠিক করল নিজেই বরং সুশান্তর বাড়ী চলে যাবে সন্ধ্যেবেলায়। সেটাই বরং ভাল হবে। আবার কিছুক্ষণ পরেই ভাবল না তা ঠিক হবে না, বরং সুশান্তকে খেতে বলা যাক রাতে। খাওয়া-দাওয়ার পর সব বলা যাবে। আসলে কিছুতেই সুশান্তকে এসব খবর দেবার মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারছিল না নবীন। সাবিত্রীকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে নিজে, কিছু ভাববার নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এসে যেন সত্যিই কেমন বাধো বাধো লাগছে। নবীন নিজের গিন্নীকেও এসব কথা বলেনি। কি জানি শেষে পাঁচকথা হয়ে যায়। আসলে নবীনকে দেখলেই ত সুশান্ত বলবে সাবিত্রীর কথা, কারণ এবারই ওকে আনবার কথা ছিল।

স্কুল থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল নবীন। অন্যান্য টিচারও একটু অপ্রস্তুত হল ওর ভাবগতি দেখে। কোনদিন এত অন্যমনস্ক নবীনকে কেউই দেখেনি। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে সোজা কোলিয়ারী অফিসে চলে এল। সেখানে এসেই শুনল সুশান্ত নীচে নেমেছে কি একটা ইন্স-পেকশনের জন্য। সময় নষ্ট না করে একটা চিঠি ওর উদ্দেশ্যে লিখেই বাড়ী চলে এল। নবীনের বউ ত দেখে অবাক।

"কি আজ এত সকাল সকাল এলে যে? ছুটি হল নাকি?"

"না ছুটি নয়, এমনি এলাম। একটু বাজার করে। রাতে সুশান্তকে খেতে বলেছি"

"তা সে তো আমায় সকালেই বললে হত। আমি লোক দিয়ে সব আনিয়ে নিতুম। তোমার খালি খালি স্কুল কামাই দিয়ে আসতে হল। তা কি ব্যাপার গো। কোন কিছু হয়েছে নাকি?"—কৌতূহলের চোখে জিজ্ঞেস করল নবীনের স্ত্রী। সেও লক্ষ্য করেছে কোলকাতা থেকে আসবার পর থেকেই নবীন যেন কেমন একটু চিন্তিত। ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কারণ সেটা নবীন বেশী পছন্দ করে না। তবুও এবার 'মানসী' নিজেই উপযাচক হয়ে বললে, "তা সাবিত্রীদি এলো না যে এবারও, অনেকদিন থাকবে নাকি বাপের বাড়ী?"

নবীন একটু বিচলিত হল। সামলে নিয়েই বলল, "না, মানে, আসবে নিশ্চয়ই, তবে বহুদিন পর গেছে ত বাড়ীর লোকজনও ছাড়ছে না, তাছাড়া সুশান্তকে বোধ হয় ওরা আশা করছে।"

নবীন সবটা এড়িয়ে গেলেও মানসী কিন্তু একটু আঁচ করতে পারল যে কোথাও কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। তবুও নবীন অসন্তুষ্ট হতে পারে ভেবে এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

সুশান্ত খবর পাঠিয়েছিল, দেরী করে আসবে। এলোও তাই। বেশ দেরী করতে শীতের রাতে একেবারে নিঃঝুম হয়ে গেল জায়গাটি। নিজের গাড়ী করেই এল। হেড লাইটের আলো আর হর্নের আওয়াজেই নবীন টের পেল সুশান্ত

এসেছে। নিজে গিয়ে দরজা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল।

সুশান্ত এসে বসতেই, নবীনের স্ত্রী মানসী বললে, "কি গো ঠাকুরপো, বউকে কি তালাক দিলে নাকি? সে তো তুমি না গেলে আসবে না। বারে বারে আমার কর্তাকে ঝামেলায় ফেল কেন বলতো?" বলেই হেসে উঠল।

সুশান্তও সামান্য হেসে বললে, "তোমার কর্তার সঙ্গেই নাকি আজকাল বনিবনা বেশী হচ্ছে। সাবধানে রেখো—শেষকালে কোন বিপদ না হয় তোমার— আমার কি, আমি তো পুরুষ মানুষ।"

"যত সব কথা শিখেছ তুমি বাবু। জিভের গোড়ায় এতটুকু যদি লজ্জা থাকে"—মানসী হাসতে হাসতেই নিজের কাজে চলে গেল খাবার সাজাতে।

খেয়ে দেয়ে নবীনের ঘরে এসে বসল সুশান্ত।

"কি ব্যাপার বলতো, তোকে এবারও ফেরত দিল। ও যদি আসতে না চায় কি দরকার আমাদের বিরক্ত করার। যেদিন মন চাইবে আসবে। কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব মনিঅর্ডার করে।" —নবীনকে প্রশ্নচ্ছলে কথাগুলো রাখলো সুশান্ত।

কি জবাব দেবে নবীন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না। মনের প্রস্তুতি এখনও হয়নি। খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "না তেমন কিছু নয়, তবে তোকে ওর ভুল বুঝলে চলবে না। এত ভাল মেয়ে খুব কম দেখেছি চোখে।"

"বাপরে বাপ, একেবারে যে নারীচরিত্রের বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছিস তুই। তা আমি তো খারাপ কিছু বলিনি", সুশান্ত বললে।

"একটা কথা বলব সুশান্ত?"

"বল"।

"আগে আমাকে অভয় দে যে তুই কথা রাখবি",

"রাখার মত হলে রাখব, তা নাহলে রাখব না।"

"তাহলে শর্ত করছিস।"

"কেন শর্তহীন হলে কি তোর পক্ষে সেল করতে সুবিধে হয়?"

"না মানে এমন কিছু জিনিস আছে যাকে একবার গ্রহণ করলে বর্জন করা যায় না, কিন্তু তাকে মেনে নেবার মন তৈরী করতে হয়"।

"বেশ ত বলনা, কি ব্যাপার, কি করতে হবে।"

"ধর সাবিত্রী যদি তোর কাছে কোন কিছু স্বীকার করে, তুই ওকে ক্ষমা করবি ত?"

"ক্ষমার মত হলে নিশ্চয়ই করব। তা না হলে করব না।"

"আবার শর্ত।"

"কেন শর্তহীন হলে কি ক্ষমাটা সার্থক হবে? তাহলে তাই হবে।"

"না ঠিক আছে এমন কিছু না। এমনি বললাম। আজ যাড়ী যা সুশান্ত। শুধু বললাম সাবিত্রীর মত মেয়ে এ জগতে বিরল।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে যখন কথা বলবি না তখন আমি চললাম। তবে সাবিত্রীকে আনতে যেতে আমি পারব না, কারণ আমার অনেক কাজ এখন নবীন"। সুশান্ত চলে গেল।

সুশান্তকে সব বলতে চেয়েও বলতে পারল না নবীন। কোথায় যেন বাধল। সারারাত ঘুমুতে পারল না। মানসী সব বুঝতে পারল, ওদের কথা-বার্তা সবই শুনেছে মানসী দরজার আড়াল থেকে। যা ভেবেছিল তাই। নিজেই এবার নবীনকে শুয়ে শুয়ে বললে,

"আমি কিন্তু সব শুনেছি। কি হয়েছে বল ত?"

সবটাই মানসীর কাছে খুলে বলল নবীন, অন্ততঃ একজনের কাছে বলে মনের ভেতরটা হাল্কা করতে চায় নবীন। প্রথমটায় মানসীও চমকে উঠে-

ছিল। সব শুনবার পর বললে তা দুর্গাপুরে রেখে এলে কেন? আমার এখানেই না হয় আনতে। ওর কি দোষ। এমন করে কত মেয়ের সর্বনাশ যে কত শয়তান করছে তার ঠিকানা কজন রাখে? সুশান্তবাবু ভালো লোক, ওকে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই মানিয়ে নেবে।

"কিন্তু সাবিত্রীর প্রচণ্ড ভয় যে এটা সম্ভব হবে না" নবীন বললে।

"আমাদের চেষ্টা করতেই হবে। আর কিছু না হলে ওকে আমাদের কাছে এনে রাখব। এমন একটা মেয়ে এখন যাবে কোথায়? আর তাছাড়া অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়ে গেছে ওর।" মানসীর সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল সাবিত্রীর উপর।

কোলকাতার কাজ সেরে অনাদি আঢ্য এক কোলডীলারের সঙ্গে গাড়ী করেই বর্ধমান রওনা হল। অনাদি আঢ্যর শক্তি যেন অনেক বেড়ে গেছে গগন মিত্রের বাড়ীর সব কাহিনী জোগাড় করার পর থেকে। টাকার লোভ দেখিয়ে ওর মামার কাছ থেকেও তথ্য জোগাড় করেছে অনেক। ওর মামা অবশ্য বিকৃত তথ্য দিয়েছে ওকে আরও বেশী করে। ও ন্যাকি আডোয়ারীর রক্ষিতা হিসেবে কাজ করেছে এসব মিথ্যে খবরও দিয়েছে ওকে ওর মামা।

অনাদি আঢ্যর টার্গেট সাবিত্রী নয়। টার্গেট হল সুশান্ত। এসব ভয় দেখিয়ে নিজের প্রমোশনের রেকমেণ্ডেশন আর কিছু রেকর্ড পাচারের সহযোগিতা এই দুটোই মাত্র পাওনা অনাদির, অন্য কিছু নয়।

দুর্গাপুর ব্রিজের কাছে বিকেলের দিকে বেড়াতে আসে সবাই। নবীনের ভগ্নীপতি, বোন সবাই সাবিত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এল ব্রীজের ধারে। ব্রীজের কাছেই গাড়ী থামিয়ে সিগরেট নিচ্ছিল একজন লোক হঠাৎ তার নজর গেল সাবিত্রীদের প্রতি। চিনে ফেলল সাবিত্রীকে অনাদি। ইচ্ছে করেই চেপে গেল, তাহলে শান্তিনিকেতন থেকে এইখানে এসে আরও একটা লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাবিত্রী তখন নবীনের ভগ্নীপতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। ওর বোন বোধহয় দাম দিতে গেছে আইসক্রীমওয়ালাকে। সাবিত্রীও এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখে ফেলল অনাদিকে। গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে। চোখে চোখ পড়তেই অনাদি গাড়ীতে ঢুকে পড়ে ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বলল।

গাড়ীটা চলে গেল কিন্তু এক নূতন দুশ্চিন্তা এল সাবিত্রীর মনে। কোলিয়ারীতে থাকতেই শুনেছে সব কাহিনী অনাদির। লোকটা শুধু খারাপ তাই নয়, সুশান্তকে একদম পছন্দ করে না।

সাবিত্রীকে বিচলিত দেখে নবীনের ভগ্নীপতিই জিজ্ঞেস করল "কি হয়েছে বলুন তো? শরীর খারাপ নয় তো? চলুন বাড়ী যাওয়া যাক।"

"না এমনি, কিছু না, একথা বলে ওদের সঙ্গে বাড়ী চলে এল সাবিত্রী। নবীনের বোনকে নবীন সবই বলে এসেছিল। সে অবশ্য তার স্বামীকে কিছু জানতে দেয়নি।

সাবিত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল নবীনের বোন, "যে লোকটাকে দেখে আপনি চমকে গেছেন, তাকে আমিও দেখেছি আপনার দিকে তাকাতে। কিন্তু লোকটা কে? এত ভয় পেয়ে গেছেন কেন", জানতে চাইল নবীনের বোন সাবিত্রীর কাছে।

সাবিত্রী অবশ্য খুলে কিছু না বললেও যা বোঝাল তার অর্থ হচ্ছে যে নবীন কিছু ভাল একটা করবার আগেই লোকটা গিয়ে সর্বনাশ করে না বসে কোলিয়ারীতে। কারণ সাবিত্রী যে এখানে আছে সেকথা সুশান্তকে জানাতে চায়নি সাবিত্রী, এমন কি নবীনও।

নবীনের বোন ওকে অভয় দিয়ে বললে, "কিছু ভাবতে হবে না, দাদা সব ম্যানেজ করবে। ও যখন তোমার কেস নিয়েছে তখন আর ভয় নেই।"

অনাদি আর সোজা কোলিয়ারী না গিয়ে সরাসরি অন্ডালে বিরাজ ঘোষের বাড়ী চলে এল। তখন সন্ধ্যা উতরে সবে রাত শুরু হয়েছে।

অসময়ে অনাদিকে দেখে বিরাজবাবু ত অবাকই হলেন। "তা হঠাৎ কি মনে করে? এ পথ ত ভুলেই গেছেন আপনারা, আরে বাবা কোল-মাইনস টেক ওভার হলেও আমরা ত এখনও আছি। একেবারে ভুলে গেলেন। তা খবর সব ভালো তো। সুশান্ত ভাল আছে?"

"না মানে আমি কোলকাতা থেকে আসছি। কদিন আগেই বেরিয়েছিলাম কিনা। মামা ডেকে-ছিলেন। তা আপনার কাছে একটা জরুরী খবর দিতে এলাম। একান্ত গোপনীয়।"

সেই রাতেই অন্ডালের স্টেশন মাস্টার বিরাজ ঘোষের কাছে "সাবিত্রী উপাখ্যান" বর্ণনা করল অনাদি। মূল সত্যের উপরে রং যে চড়াল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি নবীনকে কেন্দ্র করেও অশ্লীল সব মন্তব্য করল অনাদি। শান্তিনিকে-তনের মেলাতে নাকি নবীনই সাবিত্রীকে নিয়ে গেছে। এবং অনাদি আসবার আগে পথে দুর্গা-পুরের ব্রীজে অন্য পুরুষের সাথে ঘুরতে দেখেছে সাবিত্রীকে।

বিরাজ ঘোষের মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তারপর আবার ঘটনা সব জানাজানি হয়ে গেল। অনাদির চরিত্র ভালভাবেই জানতেন বিরাজবাবু। একাধিক অন্যায় আর দুর্নীতির প্রধানতম সাক্ষী হল এই অনাদি আঢ্য। বিরাজবাবু নিজেও ওর মামার সঙ্গে গুডস ইয়ার্ডের লেনদেনের ব্যাপারে যে জড়িয়ে আছে সে খবর রাখে অনাদি।

রেলের চাকরীর টু পাইস থেকে বেনারীতে অনেক ধানের জমি করেছেন বিরাজবাবু। এ সংবাদও অনাদি জানে। কিন্তু সুশান্ত সব জানে না। ভিজিলেন্সে খবর হলে সত্যিই বিরাজবাবুর বিপদ হতে পারে। অনাদির কাছ থেকে সব শোন-বার পর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল বিরাজবাবুর। তবুও অনাদির হাত ধরে বললেন, "দেখো বাবা, সুশান্তর যেন কোন সর্বনাশ না হয়, ওকে দেখো বাবা।"

মুচকি হেসে অনাদি বললে, "সে আর বলতে, আমাদেরই ত ভাই। তা আপনার জমির ধান এবার ভাল হচ্ছে ত?"

শুনিয়ে দিল অনাদি বিরাজ ঘোষকে যে জমির ব্যাপারটা ভালভাবেই অনাদি জানে।

অনাদি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বিরাজ-বাবু চুপ করে বসে থেকে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। এ সময়ে বাড়ী থেকে বের হতেই ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আবার স্টেশনে যাচ্ছ কেন?"

"ডিভিসন অফিস থেকে একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের খবর আসবে, তাই যাচ্ছি। একটু পরেই আসব।"

স্টেশনে এসে চুপ করে নিজের ঘরটায় বসে রইলেন বিরাজবাবু। নিজেই ভাবতে লাগলেন সংসারের কথা, সেই ইংরেজের সময়ে একটা ছোট্ট পোস্টে রেলের চাকরী পেয়েছিলেন বিরাজবাবু। ভীষণ দারিদ্র আর অনাহারের মধ্যে দিন কাটত। একে একে এই সংসারকে বড় করলেন, ছেলেদের মানুষ করলেন তবুও শান্তি কিন্তু পেলেন না বিরাজবাবু। স্টেশনকে কেন্দ্র করে যত ব্যবসা তার সব কিছুতে ভাগ নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সংসারের জন্যই করেছেন। কে বোঝে তার কথা। আজ অনাদিও তাকে ব্লাকমেল করতে চায়। সুশান্ত সব জানতে পেলে ঘৃণা করবে। মাথায় হাত দিয়ে টেবলের উপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল ছিল না বিরাজবাবুর. পয়েন্টসম্যান এসে বললে,

"বাড়ী যাবেন না হুজুর, আজ ত আর কোন ট্রেন নেই।"

"হ্যাঁ চল, বাড়ী যাই, এমনি ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলাম।"

বিরাজ ঘোষের সংসারে ইঞ্জিনের কালো

ধোঁয়ার মত অন্ধকার যেন ঘিরে বসল চারদিক থেকে।

নবীন সামন্তর বাড়ী থেকে আসবার পর থেকেই সুশান্ত বুঝতে পেরেছে যে সাবিত্রী কোন ব্যাপার নিয়ে হেঁয়ালি করতে চাইছে, আর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এমন কিছু যা নবীনও খুলে বলছে না।

বিয়ের পর থেকে সংসারে যে কয়মাস এক সঙ্গে থেকেছে সুশান্ত তার মধ্যে একদিনও মন প্রাণ খুলে সাবিত্রী কথা বলেনি, হাসেনি। সব সময় নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে রাখত। ইঞ্জিনীয়ার হলেও সুশান্ত এই দশকেরই একজন যুবক। কিছুটা যে বুঝতে পারেনি তা নয়। তবে কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে সব ব্যাপারটা।

ফুলমা এসে বললে,

"নবীন মাষ্টার তো চলে এল, বৌদিদিমণি ত এলে না গো দাদাবাবু। তুমি যাওনা কেনে? তুমি গিয়ে আন?"

"এবার তোকে পাঠাব রে ফুলমা", সুশান্ত হাসতে হাসতে বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে মাইনসে চলে গেল ডিউটিতে। সুশান্তর অফিসের সামনে ভীষণ ভীড় মজুরদের। সামনে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার দাঁড়িয়ে। সুশান্ত আসতেই সব চীৎকার করে উঠল।

আসলে সেই যে কোলিয়ারীতে খুনের পর কালুরাম ফেরার হয়েছে তাকে গ্রেপ্তারের দাবীতেই এই হৈ চৈ চলছে। কারা নাকি গতকাল রাতে কালুরামকে অনাদির বাড়ীতে অনেক রাত্রে যেতে দেখেছে। ওদের বক্তব্য হল যে ম্যানেজমেন্ট সব ব্যাপারটা চেপে দিয়ে ওকে প্রোটেকশন দিতে চাইছে। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের কথা শোনে কে? আসলে শ্রমিকরাও বুঝতে শিখেছে যে সুশান্ত অনাদি আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের পছন্দ করে না, তাই এখানে এসে চীৎকার করার উদ্দেশ্য হল সুশান্তর অতিরিক্ত সহানুভূতি আদায় করা।

সুশান্ত জীপ থেকে নেমে সবাইকে শান্ত হতে বলে বললে যে এটা তার কাজ নয়, এটা পুলিশের কাজ। তবে সে জানাবে পুলিশকে দ্রুত এর বিহিত করতে। এই বলে সবাইকে সে কাজে যেতে বলল।

শ্রমিকদের ভীড়টা চলে যাবার একটু পরেই অনাদি এসে ঢুকল সুশান্তর ঘরে। অনাদিকে বসতে বলে আবার নিজের কাজে মন দিল সুশান্ত।

অনাদি সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে হাত বাড়িয়ে ধরল সুশান্তর দিকে।

"নো, থ্যাঙ্কস"।

অনাদি বেশ অসন্তুষ্ট হল। এবার একটু গলাটা কেশে নিয়েই বললে, "আমার বিরুদ্ধে এই যে মিছিল করে আপনার সামনে সব আসছে, এটা কি ভাল জিনিস সুশান্তবাবু। আমরা সব একই সহকর্মী",

"আপনার বিরুদ্ধে ত কেউ আসেনি। আপনি ভুল বুঝছেন অনাদিবাবু"।

"আমার বিরুদ্ধে না হলে কালুরামকে জড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ওরা চীৎকার ত করছিল। আপনার কিন্তু ওদের সামনে গিয়ে বক্তব্য রাখা ঠিক হয়নি সুশান্তবাবু", বেশ রাগতস্বরেই বললে অনাদি।

কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় এগুলো বোঝার বয়স ও যোগ্যতা দুই-ই আমার আছে অনাদিবাবু। তাছাড়া কালুরাম খুনের আসামী তাকে ধরতে হবেই। সে এ এলাকায় এসে অশান্তি বাড়াবে। আপনিও ওকে প্রশ্রয় দেবেন না, এতে মাইনসের ডিসিপ্লিন থাকবে না", বহুদিন পর আজ অনাদিকে স্পষ্ট করেই কথাগুলো শুনিয়ে দিল সুশান্ত।

"বেশ ঠিক আছে সুশান্তবাবু। জিনিসটা এবার বোধগম্য হল। সরকার মাইনস হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মামার কর্মচারীরাও যে সুর বদলাবে এটা আমার জানা ছিল। তবে এত তাড়াতাড়ি বদলাবে বুঝতে পারিনি",—কথাটা বলেই বেরিয়ে

যাচ্ছিল অনাদি। সুশান্ত বললে, "থামুন এক মিনিট অনাদিবাবু। কথাগুলো যখন বললেন সেজন্যই আপনাকে একমিনিট থামতে বললুম। মামাদের কর্মচারী আর সরকারের কর্মচারীর মধ্যে যে পার্থক্যটা থাকা উচিত সেটা কিন্তু শুধু আমার জন্য নয়। আপনার জন্যও। সরকারের নিয়ম-কানুনগুলো আপনাকেও মেনে চলতে হবে। না জানিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন কোন দরখাস্ত না করেই, এগুলো কিন্তু মামাদের রাজত্বের নিয়ম। সরকারের নয়। একটা এক্সপ্লানেশন পাঠিয়ে দেবেন। চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে দিতে হবে আজই।"

অনাদি বেরিয়ে গেল রেগে অস্থির হয়ে, নাঃ, এবার আর একে শিক্ষা না দিয়ে থাকা যায় না! সাক্ষাৎ সর্বনাশ করে ছাড়বে আমার, এসব কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের টেবলে গিয়ে বসল অনাদি। একটু পরেই ফোন করল সুশান্তকে।

"আপনি আমায় গাল দিচ্ছেন দিন কিন্তু আমি আপনার হিতৈষী সুশান্তবাবু। আপনার বন্ধু নবীনবাবু আপনার স্ত্রীকে নিয়ে শান্তি-নিকেতনে দুর্গাপুরে বেড়াচ্ছে তাদের আপনি অন্যায় দেখছেন না, যত অন্যায় আমার দেখছেন।"

"শাট আপ, ননসেন্স।" রেগে উঠল সুশান্ত। অবাক হয়ে গেল আস্পর্দা দেখে অনাদির। কি জানি কোলকাতা গিয়েছিল শয়তানটা হয়ত কোন খবর এনেছে। নবীনের স্কুলে ফোন করল সুশান্ত। খবর এল নবীন নেই, দুদিনের ছুটিতে নাকি দুর্গাপুর গেছে। কি এখন করবে ভেবে উঠতে পারছে না সুশান্ত। কোল মাইনসের এত কাজ, নূতন উদ্যোগ, উৎপাদন বৃদ্ধি করা, শ্রমিকদের শান্তি ফিরিয়ে আনা এত মধ্যে অনাদি কালুরামের শয়তানী, সাবিত্রীর রহস্য, নবীনের হেঁয়ালী সব মিলিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড চক্রান্ত শুরু হয়েছে সুশান্তর বিরুদ্ধে। ডাকবে নাকি অনাদিকে, সব শুনবে? নাকি, অনাদি আবার পেয়ে বসবে নাতো? নবীনকেও পাওয়া গেল না।

অনেক ভেবেচিন্তে আবার অনাদিকেই ফোন করল:

"অনাদিবাবু আছেন?"

"বলছি।"

"আমি সুশান্ত ঘোষ, বড় উত্তেজিত ছিলাম, ভীষণ বোধহয় চেঁচামেচি হয়ে গেল। আপনি বিকেলে একবার আসুন না আমার কাছে। বিকেলে, কথা আছে।"

"না, না, তাতে কি আছে, নিশ্চয়ই যাব।"

নবীনকে মানসী পরামর্শ দিয়েছে সকাল-বেলায়, 'তুমি বরং সাবিত্রীদিকে নিয়ে এসো। এভাবে সব কিছু গোপন করে রাখলে ভুল বুঝবে সুশান্ত ঠাকুরপো।'

মানসীর কথাটা মনঃপূত হল নবীনের। তবুও ভাবলে একবার অন্ডালে সুশান্তদের বাড়ী হয়ে যাবে। একটু ঘোরা হলেও বরং ওর বাবার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াটাই ভাল।

নবীন যখন অন্ডালের রেল কোয়ার্টারে বিরাজবাবুর সন্ধানে এসে হাজির হল, তখন বিরাজবাবু ষ্টেশনে ডিউটিতে চলে গেছেন। বাড়ীতে প্রশান্ত ছিল। প্রশান্তর কাছে বাড়ীর কুশল জানতে চাইতেই ও বলল—যে সেদিন রাতে অনাদি আঢ্য চলে যাবার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে বিরাজবাবু। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। তেমন উৎসাহ আর নেই কোন কাজে বা কথায়।

প্রশান্তকে কিছু জানতে না দিয়ে নবীন ষ্টেশনে এল। বিরাজবাবু তখন নিজের কাজে ব্যস্ত। নবীনকে দেখেও যেন চিনলেন না এমন ভাবটা করলেন।

নবীন একটু থেমেই এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাকাবাবু, আমি নবীন এসেছি।'

"বসো বাবা, বড্ড কাজ পড়েছে।" ছোট্ট উত্তর বিরাজবাবুর।

একটু পরেই কাজ হালকা করে পাশের ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে বসলেন বিরাজবাবু, তার পরেই

ডাকলেন নবীনকে। নবীন ঢুকতেই বার বার করে কেঁদে বললেন বিরাজবাবু। "কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে যে আমার সংসার ভেঙ্গে গেল। শেষ পর্যন্ত তুমিও সুশান্তর সংসারে আগুন দিলে"—

কিছুই বুঝতে পারল না নবীন। কি সব বলছে কাকাবাবু। ইঞ্জিনের ঘসঘস শব্দে বিরাজ-বাবুর সব কথা বাইরে আসতে পারছিল না। নবীন বললে, আপনি কি বলছেন কাকাবাবু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নবীনকে বসিয়ে রেখে সংক্ষেপে জানাল বিরাজ অনাদির কথা। যা জেনেছে তা সংক্ষেপে জানাতে গিয়েও চোখের জল চেপে রাখতে পারল না। "তোমরা ত জান নবীন, এই সংসারের সবাইকে সুখী করতে আমি ভালমন্দ সব কাজে হাত দিয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীও আমাদের ঠকাল।"—

আপনি যা শুনেছেন তা সবটা ঠিক নয় কাকাবাবু। তাছাড়া অনাদির চরিত্র ত জানেন, ভিলকে তাল বানিয়ে কাজ করে অনাদি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন কাকাবাবু।

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের আর কোন ভেদাভেদ নেই আমার কাছে নবীন। আমার যা হবার তা হয়েছে। এবার সুশান্তর কপাল ভেবেই আমার যা ভাবনা। আমায় আর বোঝাতে এসো না।"— ঘর থেকে বেরিয়ে কালো কোটটা গায়ে চড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ইয়ার্ডের দিকে চলে গেলেন বিরাজবাবু।

সেদিকটায় অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ট্রেনে চেপে বসল নবীন, দুর্গাপুরের পথে।

সদা সরল শিক্ষক, বন্ধুর সংসারের এ কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল সে। এমনটা স্বপ্নেও ভাবেনি। শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর সঙ্গে নবীনের সম্পর্ক নিয়েও মন্তব্য করেছে অনাদি। কত নীচ আর স্বার্থপর এই লোকটা। এতক্ষণে বোধহয় সুশান্তর কানেও সব তুলেছে। ট্রেনের কামরাতেই একটা লোক তাকিয়েছিল নবীনের দিকে বাঁকা চোখে। চোখ চাইতেই দেখল "কালুরাম।"

কালুরাম ফেরার হয়েও কাছাকাছি অঞ্চলেই ঘুর ঘুর করছে। কালুরামকে দেখে চিন্তিত হল নবীন। এ আবার এ পথে কেন? ভয় কেটে গেল। দু' স্টেশন বাদেই কালুরাম নেমে গেল।

দুর্গাপুরের বাড়ীতে এসে যখন নবীন পৌঁছেছে তখন রাত হয়ে গেছে। ওর ভগ্নীপতি বাড়ীর সবাইকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। চাকরের কাছ থেকে কথাটা শুনে ভালই লাগল নবীনের। তবু যা হোক কটা দিন এখানে শান্তিতে আছে।

ওরা সিনেমা থেকে এসে নবীনের দেখা পেয়ে বেশ উৎসাহিত হল। বিশেষ করে সাবিত্রী।

নবীনের বোন বললে, "কিরে দাদা সুশান্ত-বাবু এলেন না।"

"না, ওর আজ কাল পরশু তিনদিনই ইন্স-পেকশন। ওর পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।" নবীন উত্তর দিল।

তা খবর সব ভাল ত? ওর ভগ্নীপতি বললে।

"হ্যাঁ সব ভাল, সাবিত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। কালই সকালে আমরা রওনা হব।"

নবীনের মুখের এই কথাটা শুনে ঘরের ভেতরে ভীষণ খুশী হল সাবিত্রী। তাহলে সুশান্ত সব জেনেছে এবং মেনে নিয়েছে।

নবীন পড়েছে সবচেয়ে সমস্যায়। মানসী ছাড়া কাউকেই সে খুলে কিছু বলতে পারেনি। বিরাজবাবু বুঝতে চায়নি কথা। সুশান্তকে বলব বলব করেও বলতে পারেনি। অনাদির কথা ভাব-ছিল নবীন। শয়তানটা যদি সুশান্তর কাছে গিয়ে সব লাগায় তাহলে কি হবে?

অনাদি যখন বিকেলবেলা সুশান্তর ডাকে ওর কোয়ার্টারে এল সুশান্ত তখন রেডিওগ্রাম ছেড়ে গান শুনছিল।

প্রগতির অগ্রদূত

নিউ প্রভাস অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

এ বছরের দুটি শ্রেষ্ঠ নাটক

মা সারদামণি

রচনা : রবীন ব্যানার্জী • সুর : প্রতাপ চক্রবর্তী

নাট্য নির্দেশনা : পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের ধারাপাত

রচনা ও পরিচালনা : বীর সেন

সুর : পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঃ পূর্ণেন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ভট্টাচার্য, বেলা দেবী ও চন্দ্রশেখর দে

কৃষি সংবাদ

সার্টিফায়েড গম বীজ বুনে ফলন বাড়ান

উন্নত মানের বীজ মানেই বেশী ফলন। তাই গম চাষেও উন্নত মানের সার্টিফায়েড বীজ বুনলে, বাজারের সাধারণ বীজের ফসলের চেয়ে অনেক বেশী ফলন পাবেন। সার্টিফায়েড বীজ কিনতে খরচ কিছু বেশী হলেও, বাড়তি ফলনের দরুণ মোট লাভ অনেক বেশী হবে। আপনার ঘরে রাখা নিজের ফসলের গম বীজও ২।৩ বছর অন্তর সার্টিফায়েড বীজ কিনে বদলে নিন।

সোনালিকা ও জনক জাতের সার্টিফায়েড গম বীজ এগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, মার্কেটিং ফেডারেশন, এন·এস·সি·ও টি·ডি·সির ডিলারদের কাছে পাওয়া যাবে। সোনালিকা ও জনক জাতের সার্টিফায়েড গমবীজ বুনে আপনার আয় বাড়ান।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

ভাণ্ডার পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের পঁচিশ লক্ষ সমবায় সদস্য এবং অগণিত সমবায় অনুরাগীদের একমাত্র মুখপত্র ভাণ্ডার আমাদের সকলের।

ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সমবায় পত্রিকা ভাণ্ডারের প্রথম প্রকাশ ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসে। গত আগষ্ট মাসে, ১৯৭৪ থেকে ভাণ্ডার পুনরায় নব পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাণ্ডারের গ্রাহক হউন। ভাণ্ডারে প্রকাশের জন্য সংবাদ ও রচনা পাঠান। ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিন। বার্ষিক চাঁদা—২০ টাকা, প্রতি সংখ্যা—২ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (অষ্টমতল)

কলিকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক প্রচারিত।

২৯শে আগষ্ট থেকে সগৌরবে চলছে !

ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা একটি নতুন রসের ছবি !

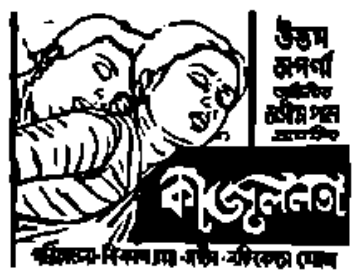

উত্তরা, উজ্জলা, পূরবী

ও অন্যত্র।

বিশ্ব পরিবেশনা : চন্দ্রিমা পিক্চার্স : কলিকাতা-৬৯

অনাদি আসতেই ওকে ভেতরে এনে বসাল। অনাদিই প্রশ্ন করল, "তা গান বাজনার খুব শখ বুঝি আপনার?"

'না মাঝে মাঝে শুনি'।

"তা ভাল, তা ভাল, মনের কষ্ট নাকি গান বাজনা শুনলে মাঝে মাঝে দূর হয়।"

কথাটা খুব ভাল লাগল না সুশান্তর। উঠে গিয়ে রেডিওগ্রামের রেকর্ডটা বন্ধ করে দিল সুশান্ত।

ইতিমধ্যে চা-জলখাবার দিয়ে গেল, ফুলমা। যাবার সময় কটমটিয়ে তাকাল অনাদির দিকে।

'হ্যাঁ কি যেন বলছিলেন সকালে অনাদি-বাবু।' সুশান্তই কথাটা পাড়লে।

অনাদি মুখ নীচু করে বললে, "আই এ্যাম ভেরি সরি সুশান্তবাবু। ব্যাপারটা নেহাত জানা-জানি হয়ে গেল তাই আর কি?"

সুশান্ত উঠে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এসব কথা ওর সামনে বসে শোনারও মানসিকতা নেই।

অনাদি ভাবলে, যাক বাগে পাওয়া গেছে সুশান্তকে। ইনিয়ে বিনিয়ে সব শোনাল সুশান্তকে। তারপর ছবিগুলো বের করলো। স্বপন মিত্রের অন্যায় অত্যাচারের ছবি তুলেছে গগন মিত্র, গগন মিত্রের ছবিগুলো নিয়েছে স্বপন মিত্র। আধুনিক সভ্যতার ভদ্রলোকের পোষাকপরা দুই নরপিশাচ।

এবার আর সহ্য করতে পারল না সুশান্ত ঘুরে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে বললে, "থামুন অনাদিবাবু, অনেক হয়েছে, আপনি এবার আসতে পারেন।"

"আই এ্যাম রিয়ালি সরি স্যার। তবে আমি আপনার হিতৈষী, কেউ জানবে না কথা।"—অনাদি বিনয়ের সঙ্গে বললে.

"আপনার আর কিছু বলার আছে? প্লিজ এবার আসুন"

"নিশ্চয়ই স্যার, তবে আমার ডিগ্রিটার বিষয়ে যে এনকোয়ারী হচ্ছে সে ব্যাপারে একটা রেকমেণ্ড-শেন বাকী ছিল, আর এ্যাকাউণ্টেণ্ট বাবুকে যদি আপনি একটু বলে দেন তাহলে ষ্টোরের রেকর্ড-গুলো আমি সরাতে পারি। অনেক টাকার ব্যাপার তো, প্রায় বাইশ লক্ষ টাকার ফলস্ পারচেজ রেকর্ড আছে। মামা বলেছিল ওসব নিয়ে যেতে।

আমি অবশ্য এসব হয়ে গেলেই আপনাকে এই ছবি টবি সব দিয়ে যাব। আমার এসব নোংরা জিনিস ভাল লাগে না।" —এক নিঃশ্বাসে নিজের প্লানগুলো সব বলে ফেলল অনাদি।

এবার সুশান্ত আর ধৈর্য রাখতে পারল না, "হোয়াট, ইউ স্কাউণ্ড্রেল, ইউ ক্রিমিন্যাল, ইউ ওয়ান্ট টু ব্লাকমেল মি? কালই আপনার রেকমেণ্ডেশন আমি নাকচ করে দেব।"

আপনার অশেষ ক্ষমতা স্যার, তাছাড়া এমন সতী লক্ষ্মী স্ত্রী যাঁর তার ক্ষমতা ত দিনে দিনে আরও বাড়বে। ভেবে দেখবেন প্রস্তাবটা। একথা বলেই কোনমতে পালিয়ে এল অনাদি।

বোবা হয়ে গেল সুশান্ত। ড্রয়ার থেকে বিয়ের এ্যালবামটা বের করে ছিঁড়ে ফেলল সব। ওর আর সাবিত্রীর ছবিটাকে টেবল থেকে নামিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল।

সব দেখল ফুলমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলেই দেখল মানসী দাঁড়িয়ে। মানসী আগেই ভেবে নিয়েছিল যে সাবিত্রী আসবার আগেই সুশান্তকে সব বলা দরকার। তা নাহলে কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না ত।

মানসীকে ড্রইং রুমে বসিয়ে আস্তে করে ফুলমা সব বলল। অনাদি আসবার ও চলে যাবার সব কিছুই বলল মানসীকে।

মানসী বললে, "তুই যা না, ঘরের ভেতর গিয়ে আমার কথা বল না ঠাকুরপোকে। দেখিস ঠিকই ডাকবে।"

ফুলমা বললে "তুই কাল আয় না বাপু! সাহেব এখন রেগে টং"।

"কাল বড় দেরী হয়ে যাবে। তুই যা গিয়ে বল আমার কথা।"

মানসীর কথা ভয়ে ভয়ে এসে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল ফুলমা সুশান্তকে। সুশান্ত হাঁ না কিছুই করল না। জানালার দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে চুপ চাপ সিগারেট ধরিয়ে।

মানসী এবার নিজেই ঢুকলে. "অনাদিকে একঘণ্টা শুনতে পেরেছ. আমায় নিশ্চয়ই দশ মিনিট শুনবে ঠাকুরপো। অনাদি যা বলেছে তা সত্য নয়।"

"তাহলে কি সত্য?" চেঁচিয়ে উঠল সুশান্ত।

"জানি তুমি উত্তেজিত। তবুও বলছি তোমাকে এক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। তোমার বিচারের ওপর সাবিত্রীর জীবন। ও নির্দোষ। এমন নির্দোষদের উপর যাদের অত্যাচার চলে. অপরাধী তারা। ওর কোন দোষ নেই।" সব কথাই আস্তে আস্তে বলে চলল মানসী।

যাবার সময় বলে গেল. তুমি কিছু বললে না ঠাকুরপো। আমি সত্য কথা বলছি। তোমার বন্ধু নবীন আর আমি আমরা তোমাদের সুখ চাই। অশান্তি চাই না। তোমার বন্ধুর চরিত্রকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। ওকে তুমি ছোটবেলা থেকে জান।

সাবিত্রীর নিজের হাতে লেখা এই চিঠিটা পড়বার চেষ্টা কোরো। এতেই ওর আত্মকথা সব লেখা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার তোমার উপর। আমি চললাম"—মানসী চলে গেল।

ফুলমা সেদিন অনেক রাত করে বাড়ী গেল। সুশান্ত শেষে সাবিত্রীর চিঠিটা পড়ল।

কি করবে সুশান্ত। একদিকে সাবিত্রীর চিঠি আর নবীনের বক্তব্য অনাদিকে অনাদির কথা আর ছবিগুলো। কোনটা সত্যি?

ফুলমা এসে দাঁড়াল। সে এসব কিছুই জানে না। এসে বলল, "তুই বাবু অনাদির কথাগুলো মানিস না। ও তোর ভাল কোনদিনই চায় নাইরে। ওটা শয়তান।"

ঠিকই তাই। ব্লাকমেল করতে এসেছিল বোধ হয় অনাদি। নবীন অনাদির মধ্যে অনাদিদের বিশ্বাস করলে যে ঠকতে হয় এটা মেনে নিল সুশান্ত।

নিজেই উঠে বললে, "আমায় খেতে দে ফুলমা। আমার খিদে পেয়েছে"। ফুলমার মুখে হাসি ফুটল। বুঝতে পারল ফুলমা যে সাহেবের রাগ পড়েছে।

রাতে উল্টে পাল্টে দুবার সাবিত্রীর পুরো চিঠিটা পড়ল সুশান্ত। নিজেই আবার ড্রয়ার থেকে বের করে এনে ছবিটা টেবলে রাখল। কুড়িয়ে নিল সব ছেঁড়া এ্যালবামের টুকরোগুলো।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খুশী খুশী মন সুশান্তর। আজ দুর্গাপুর থেকে নিয়ে আসবে সাবিত্রীকে। সুশান্ত যে কি বলবে সাবিত্রীকে? ক্ষমা করেছে সে এই কথা? না তা বলা যায় না। অপরাধও সাবিত্রীর নয়। তাহলে কি বলবে? থাকগে আসুক তো আগে।

ফুলমাকে অনেক বাজার করতে আর রাঁধতে বলে গেল সুশান্ত। মানসীকেও খবর দিতে বলল।

দিল্লীর অফিসাররা সব এসেছে মাইনসে। মাইনসের ভেতরের যন্ত্রপাতি, অফিস রেকর্ড সব ইন্সপেকশন চলবে। কুমারমঙ্গলমের অর্ডার। কোন জিনিস যেন নষ্ট না হয়। বেশ কয়েকটা খনিতে স্যাবোটাজ শুরু হয়েছে।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার অসুস্থ। এই সুশান্তকেই অফিসিয়েট করতে হচ্ছে। সুশান্তকে নামতে হবে আজ নীচে। সারাদিন সব ইন্সপেকশন করে তার পর উঠে আসবে। সঙ্গে এ্যাসিস্ট করার কথা আরো অনেকের। অনাদিরও নাম আছে।

এসেই লিস্টটা দেখে অনাদির নামটা কেটে দিল। মাইন ম্যানেজার বললে, "ওর নাম কাটবার দরকার নেই। সকালেই দরখাস্ত পাঠিয়েছে যে ও অসুস্থ হয়েছে, আসতে পারবে না।"

খুশী হল সুশান্ত, "ভালই হয়েছে। ওর দরকার নেই।" পুরোদমে কাজ চলছে খনির। সবাই বেশ টিপটপ। তারপর আবার দিল্লীর কর্তারা এসেছেন।

মানসী দুবার ফোন করেছিল সুশান্তর অফিসে। ওর পিয়ন ধরেছিল, জবাব দিয়েছে যে "বিকেলের আগে ফিরবে না, সারাদিন নাকি সব ইন্সপেকশন আছে নীচে।"

বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই ভূমিকম্পের মত শব্দ হল মাইনসে। চারদিকের বিপদসংকেত বেজে উঠল। সর্বনাশ হয়েছে। চারদিক থেকে মাইনসেফটির লোকজন, মজদুর সব ছোটাছুটি শুরু করেছে। লিফটের কাছে প্রচণ্ড ভীড়। ভেতরে বোধহয় বিস্ফোরণ হয়েছে কোথাও।

অফিসের লোকেরাও সব বেরিয়ে পড়ল।

কর্মব্যস্ত কয়লাখনির সব মানুষগুলোর চোখে ঘন অন্ধকার নামল।

সবাই হায় হায় শুরু করেছে। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসের সামনে সিকিউরিটির পুলিশরা সব ঘিরে।

লিফটের কাছেও আরও ভীড় বেশী। সুশান্তর পিয়নও ছুটে গেল। সুশান্ত নীচে নেমেছে সেই সকালে। এখনও আসেনি। চতুর্দিকে খবর চলে গেছে। আশেপাশের খনিগুলোতেও। পুলিশ, ফায়ার স্টেশনের লোকেরা, মাইনসেফটির লোক কেউ বাদ নেই। দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

আর কি চীৎকার কুলিদের বউদের যারা নীচে নেমেছে সকালে।

কয়লাখনির বাঁচার স্বাদে বিষ মেশাল যেন কারা। একটার পর একটা করে লোক তুলে আনার উদ্ধারকার্য শুরু হয়ে গেছে। বেশ জোর কিছু হয়েছে।

ঘণ্টাখানেক পরে দিল্লীর দু-একজন অফিসারের সঙ্গেই সুশান্তর কালিমাখা রক্তাক্ত দেহটা উঠে এল স্ট্রেচারে করে। সুশান্তর পিয়ন পাগল হবার উপক্রম।

এদের এক্ষুনি পাঠান হবে কোল মাইনসের হসপিটালে সেখান থেকে কেস বুঝে কোনটা যাবে কোনটা যাবে টাটার হসপিটালে। দুর্গাপুর থেকে সাবিত্রী যখন এসে পৌঁছাল সুশান্তর কোয়ার্টারে তখন ফুলনা কাঁদছে অঝোরে।

নবীন ঢুকতেই টের পেয়েছিল যে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবুও ভেবেছিল হয়ত সুশান্ত কোয়ার্টারেই থাকবে। এ সময় সাধারণতঃ খেতে এলে সুশান্ত কোয়ার্টারে বিশ্রাম করে।

সাবিত্রী এতক্ষনে কেঁদে উঠল। স্বামীর অস্তিত্বের অনুভূতি আর স্ত্রীর মনের যন্ত্রণা এই দুই-এর প্রকাশ পেল সাবিত্রীর জীবনে এই প্রথম। সুশান্তকে তার কিছুই বলা হল না। মানসী ভরসা জোগাল সাবিত্রীকে। চল না ভয়ের কিছু নেই। সব নাকি উঠিয়ে আনছে, সবাই নাকি চোট পেয়েছে শুধু। আমি ফোন করেছিলাম সুশান্ত ঠাকুরপোকে উঠিয়ে এনেছে।

ওই ট্যাক্সিটাকে নিয়েই খনির কাছে চলে এল নবীন সাবিত্রীকে নিয়ে। চারদিকে কর্ডন সবাইকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সেখান থেকে নবীন নিজেই গিয়ে খবর আনল যে সুশান্তদের নাকি আসানসোলের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ্যাম্বুলেন্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে।

সেই রাত্রেই ওরা এল আসানসোলের হসপিটালে। দেখা করা বারণ, কারণ বিপদ এখনও কাটেনি। সারারাত হসপিটালের বারান্দায় বসে সাবিত্রী, নবীন আর মানসী। পরদিন সকাল আটটায় যখন জ্ঞান এলো সুশান্তর তখন ডাক্তার অনুমতি দিল সাবিত্রীকে দেখবার।

চোখ মেলে চেয়ে দেখল সুশান্ত সাবিত্রীকে। সামান্য হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু মাথায় এত যন্ত্রণা যে হাসি ফোটাতে পারল না মুখে।

নার্স এসে বললে, আর নয়। বেশীক্ষণ থাকলে নার্ভে স্ট্রেন পড়বে। এবার চলুন।

নবীনদের থাকার ব্যবস্থা আসানসোলেই করে দেওয়া হল কোল মাইনসের তরফে। ফুলমাও এসে হাজির হয়েছে। এসেছেন বিরাজবাবু, প্রশান্ত সবাই।

সুশান্তকে বাঁচান যায়নি। শেষ রাতে ওর কাছে ছিল নবীন আর বিরাজবাবু। ভীষণ হেমারেজ হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। তবুও মৃত্যুর আগে কথা বলতে পেরেছিল সুশান্ত। যদিও ভীষণ অস্পষ্ট।

বিরাজবাবুকেই বলল সুশান্ত, "আমি ত যাচ্ছি বাবা, অনেকদূরে। সাবিত্রীকে দেখো, ওর কোনো দোষ নেই। ওর অনেক কষ্ট। ওকে তোমরা দেখো।" আর কোন কথা বলতে পারেনি সুশান্ত।

সাবিত্রীর যখন সকাল হল, তখন সুশান্ত আর দিনের আলোতে নেই।

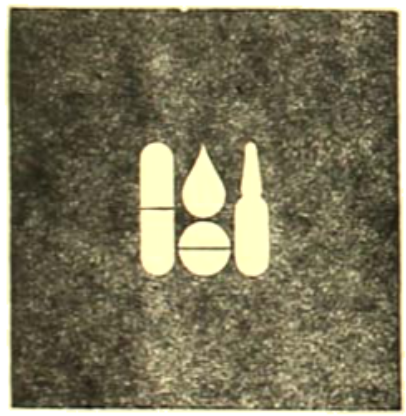

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্

আপনাদের সেবায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

হে বঙ্গের নবীন যুবক!

গৌরকিশোর ঘোষ

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি ইহাকে অপরাজিত চিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, 'নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব', তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা—এই মহৎ সৃষ্টিকার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এজন্য আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো, এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না।"

২· "আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্য ব্যয় নয়, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনও ঠিকানা পান না।"

এবং ৩ "তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন-কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য ও প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

হে নবীন যুবকবৃন্দ,

উপরে যে তিনপ্রস্থ উদ্ধৃতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পেশ করলাম, আশা করি তার মধ্যেই আমার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনপ্রস্থ উদ্ধৃতির মধ্যে রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বাংলার যুবকদের জন্য যে পথনির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, আজ, বাহাত্তর বছর পরেও, দেখা যাচ্ছে, তার প্রয়োজন ফুরোয়নি। আজও দেখা যাচ্ছে যুবকদের সঙ্গে কাজ, এবং কাজের সঙ্গে দেশ বা দশের কল্যাণ যুক্ত হতে পারেনি। এটা আমাদের সকলের পক্ষেই দুর্ভাগ্যের কথা।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, অনেক যুবকের মধ্যেই কাজ করার একটা সদিচ্ছা আছে। কর্তব্য কাজও নানাদিকে ছড়ানো। আবার সেই কাজগুলোও এমন যে তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ। তবু, কী আফশোষ, আজ পর্যন্ত আমরা এই তিনে যোগ ঘটাতে পারলাম না। ফলে গত ছাব্বিশ বছরে আমাদের যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, আমরা তার থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ বৃটিশ রাজের আমল থেকে আমাদের এই স্বদেশী রাজের আমলে অনেক বেশী বেড়েছে। কিন্তু তা যে আমাদের, বিশেষ করে একালের যুব-সমাজের চেতনায় বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি তার প্রমাণ আমাদের ক্রমবর্ধমান

নৈরাশ্যের ব্যাপকতার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশে কাজ যে হচ্ছে, ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কর্মকাণ্ডের পরিধি প্রতিদিনই যে বেড়ে যাচ্ছে, এটা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না বা বিশ্বাস করতে চায় না। কেন? কাজের চেয়ে কাজের ত্রুটিটাই বা আমাদের চোখে এত বড় হয়ে ওঠে কেন?

এর নানা ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব। তবে যে ব্যাখ্যাটি আমার কাছে প্রধান বলে মনে হয় তা হল এই: আমাদের দেশে উন্নয়নমূলক যা কিছু ক্রিয়াকাণ্ড এ যাবৎ হয়েছে, তা সবই হয়েছে সরকারী টাকায়, সরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা। আমরা যারা নৈবাৎ কোনও না কোনও উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত আছি বা হয়ে পড়েছি তা বেতনভুক্ত চাকুরিয়া হিসাবেই। ফলে উদ্যোগ আমার কাছে কোনও অর্থই বহন করে আনেনি। আনে না। ঐ এক মাস বা হপ্তাওয়ারি মাইনের খামের মধ্যে নিয়মিত প্রাপ্ত নোটের বান্ডিলটি ছাড়া।

আমরা যদি এমন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করতে পারতাম যে আমাদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, পুঁজি সংগ্রহ, নকশা তৈরি এবং কাজ, এসব অঞ্চল ভিত্তিতে হবে এবং সর্বস্তরের কাজেই ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর পুরুষ-নারীকে ডেকে এনে জুড়ে দিতে পারতাম তাহলে, একমাত্র তাহলেই, আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে যে আমরা যুক্ত আছি এই বোধটা জেগে উঠত। 'এটা আমাদের উদ্যোগ', এই চেতনা জাগত। আমি কখনোই একথা বলতে চাইছি না যে সব উদ্যোগই শুধুমাত্র স্থানীয় লোকের পরিকল্পনায়, স্থানীয় লোকের সংগৃহীত পুঁজিতে এবং স্থানীয় লোকের শ্রমে করা সম্ভব। যেমন বড় বড় শিল্প কারখানা। বড় শিল্প ছাড়া উন্নয়নের যে আরও অজস্র ক্ষেত্র আছে, সেইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সৃজনী শক্তির সঙ্গে তাদের উন্নতির উদ্যোগ-আয়োজনগুলিকে নিশ্চয়ই জুড়ে দেওয়া যায়। যদি আমরা জুড়ে দিতে পারি, তাহলেই 'এটা আমার কাজ' ইংরেজিতে যাকে 'সেনসে' অফ পারটিসিপেশন' বলে, এই বোধটা আমার মধ্যে জন্মাবে। এবং তার থেকেই 'এটা আমার দেশ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেনসে' অফ বিলংগিং', এই চেতনাটি আমাদের হৃদয়ে ফুটে উঠবে।

এখন এই চেতনা আমাদের মধ্যে নেই কারণ দেশে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড হচ্ছে তাতে সমাজের লোক হিসাবে পালনীয় আমার কোনও ভূমিকা নেই। চারদিকে নানা কাজকর্ম হচ্ছে অথচ তার কোনোটাতেই আমার জন্য কোনও ঠাঁই নেই, এই ঘটনাটা আমাকে নিজের কাছেই মূল্যহীন করে তুলছে। এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। তাই আমার নিজের কাছে নিজের মূল্য ঠিক রাখবার জন্যই আমাকে সমালোচনার ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে। আমি যদি নবীন যুবকদের মনস্তত্ত্ব মোটামুটি বুঝে থাকি তবে তা হল এই। সমালোচনার জন্যই যাকে সমালোচক সাজতে হয়, সব কিছুকে নস্যাৎ করাই তখন তার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এর থেকে আসে অশ্রদ্ধা, নৈরাশ্য, বিতৃষ্ণা এবং সর্বোপরি উদ্যমহীনতা। এখন আমাদের অধিকাংশ নবীন যুবক এইসব সর্বনাশা ব্যাধিতে ভুগছেন। আমাদের যুব সমাজকে এইসব ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করতে না পারলে আমাদের ঘোর অকল্যাণ।

এই ব্যাধির আরেকটি উৎস আছে। যেটি হচ্ছে সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব। সরকার-বৈরিতা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার। অন্য পরে কা কথা, আমাদের দেশে যারা ক্ষমতায় আসীন, সেই দলের যুবাগোষ্ঠীর ভিতরেও দেখি সরকার বিরোধী মনোভাব। এবং এই মনোভাব এঁরা গোপন করারও চেষ্টা করেন না। প্রকাশ্য সভা সমিতিতে এদের নেতৃবৃন্দ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে এমন ভাবে বক্তৃতা করেন যে শুনলে মনে হয়, সরকারের নীতি যেন এদের নীতি নয়। এরা যেন বিরোধী দলেরই মুখপাত্র।

এইসব নেতারা জানেন, প্রকাশ্য সভায় সর-

কারের বিরোধিতা করলে জনপ্রিয়তা বাড়ে। সেই কারণেই সরকার এবং জনপ্রিয়তা, এই উভয় কূল রক্ষার জন্যই আজকালকার কংগ্রেসী যুবনেতারা হামেশাই দ্বৈত ভূমিকার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফল বর্তমানকালের যুবকদের পক্ষে হয়েছে মারাত্মক। কংগ্রেসী যুবা ও ছাত্ররা এই দোটানায় পড়ে আজ বিভ্রান্ত ফলে তারা নৈতিক বল হারিয়ে ফেলে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছেন।

আমরা যদি এইসব যুবকদের কাজে লাগাবার জন্য একটা সৃজনাত্মক কার্যক্রম খাড়া করতে পারতাম তবে হয়ত বিভ্রান্তি, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, হতাশা ইত্যাদি থেকে জাত সরকার-বিরোধিতার ব্যাধি থেকে এইসব যুবককে রক্ষা করা যেতো।

আমি এতক্ষণ দুটি প্রধান কারণ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি, কোনও সৃজনধর্মী ভূমিকা না পেয়ে আমাদের নবীন যুবারা কীভাবে আজকের সমাজ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। ফলে তারা কেমন করে কিছু-না-হওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে সার্থক হবার চেষ্টা করতে লেগেছেন। অবশ্য একথা যেন কেউ মনে না করেন, এ কালের যুবকরাই কেবল সৃজনধর্মী ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এদের পূর্বসূরীরা দেশহিতে সৃজনাত্মক কাজে খুব আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে কথা আমি বলিনি। আমার বলবার কথা বরং এই: সমাজ গড়ার ভূমিকা থেকে আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়কে দীর্ঘকাল ধরেই সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমরাও সেই লিগ্যাসি বহন করেছি। আমার অনুজ প্রতিমেরাও সেই লিগ্যাসি বহন করে চলেছেন। অর্থাৎ সমাজ গঠনের কাজে যুবকদের ডাক এর আগে পড়েনি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের চোখে এই ফাঁকিটা ধরা পড়েছিল। তিনিই একমাত্র মনীষী যিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ভেবেছেন, সমস্যাটি আবেগবর্জিতভাবে বিচার করেছেন এবং সমাধান বাতলিয়ে গিয়েছেন। এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা সেদিনও এড়িয়ে চলেছি, আজও নানারকম বিশেষণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে আমাদের চেতনার আড়ালে ঠেলে দিয়েছি। তাতে তাঁর কোনোই ক্ষতি হয়নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের যৌবনটাই ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে।

আজ নেতাদের মুখ থেকে যুবশক্তি কথাটা বারবার যখন শোনা যাচ্ছে, তখন বোঝা যাচ্ছে যুবকদের উপর তাঁদের নজর পড়েছে। এবং যুবকদের কাজে লাগাতে হবে, এমন কথাও মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে। এইসব কথা এতই আকাশ বিহীন যে এসবের উপর আমার মত পোড় খাওয়া এক প্রৌঢ়ের পক্ষে ভরসা রাখা শক্ত। কিম্বা এইটুকু হয়ত বলা যায় যে উপর বরফের কোথাও একটা সদিচ্ছা উঁকি ঝুঁকি মারছে। কিন্তু এটাও তো সত্য যে শুধু সদিচ্ছায় জল গলে না।

আজকাল অনেক যুবনেতাও দেখি কাজ কাজ করে খুব চীৎকার করছেন। কিন্তু কী কাজ তাঁরা করবেন, তার স্পষ্ট চেহারা কোথাও ভেসে বেড়াতে দেখিনে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল—হে বঙ্গের নবীন যুবকবৃন্দ, আমাকে ক্ষমা করবেন যদি এই কথার দ্বারা আপনাদের রোষ আকর্ষণ করে থাকি,—যে এজিটেশনটা আদৌ কোনও কাজ নয়।

যদি কাজ করতে চান তবে এজিটেশনের মনোবৃত্তি সর্বাগ্রে ত্যাগ করুন, কেননা এজিটেশনের মনোবৃত্তি, কাজ করার মানসিকতাকে নষ্ট করে ফেলে।

দ্বিতীয় কথা এই: "আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন—ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে।..." রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে বোঝা দরকার।

আমরা কোন কাজ হাতে তুলে নিতে পারি, সেইটে বাছাই করার জন্যই নিভৃত চিন্তার প্রয়োজন। আমাদের দেশ এখন উন্নয়ন-উন্মুখ। তাই অজস্র কাজ চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। এর

মধ্যে এমন একটিকে বেছে নিতে হবে, যা আমার সাধ্য, যার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে সার্থক করে তুলব। এবং যা হবে আমার উপজীবিকা। অর্থাৎ উটের মতই আমাকে চলতে হবে প্রতিকূল পরিবেশে, কাঁটার কোপ খেয়ে করতে হবে ক্ষুন্নিবৃত্তি, পান করতে হবে নিজের কুঁজের জল এবং পিঠে তুলে নিতে হবে দায়িত্বের বিপুল বোঝা। বলাই বাহুল্য এই উটের সাধন বড় সহজ সাধন নয়। কারো উপর নির্ভরতা নয়।

আমরা কেবল এ যাবৎ চেয়েই এসেছি, শুধু করেছি দাবী। আজ আর সে সহজ সাধন চলবে না। নীরবে দায়িত্বের বোঝা বইতে হবে উটের মত। তবেই আমরা পার হতে পারব মনে-মনে প্রাণে-প্রাণে ছড়িয়ে আছে অবিশ্বাসের যে বিস্তীর্ণ সাহারা মরুভূমি। একবার যদি আমরা অবিশ্বাসের মরুভূমি নিজের উদ্যোগে এবং চেষ্টায় পার হতে পারি, হার না মানি তবেই পৌঁছতে পারব আত্মবিশ্বাসের মরুদ্যানে। সফলতার প্রথম ধাপে।

যে কোনও একটা কাজ বেছে নিন, নিরক্ষরদের পড়ানো, বস্তি সাফাই-এর কাজ, মেয়েদের স্বাস্থ্যবিধি শেখান, সমবায় বিপণি খুলুন, কিম্বা গ্রহণ করুন এক গ্রামের ভার। অত্যন্ত সামান্যভাবে গ্রহণ করুন এক ব্রত। তারপর সাধ্যজীবনের সাধনায় এগিয়ে চলুন ব্রত উদ্‌যাপনের পথে। এ কাজ হঠাৎ-উৎসাহ-বশে করে ফেলা কোনও বীরত্বব্যঞ্জক কাজ নয়। রুটিনে বাঁধা নিরুত্তেজ কাজ। আপনি তো কিছুই ছিলেন না, এই কাজের সাধনায় মগ্ন হলে কিছু হয়ে উঠবেন। এই মাত্র মজুরি।

With Best Complimento of

ROHTAS INDUSTRIES LIMITED

DALMIANAGAR BEHAR

Manufacturers of :

A WIDE RANGE OF QUALITY PAPERS AND BOARDS

উপন্যাস

যে নর্তকী ইতিহাসের

শ্রীপারাবত

তোমাদের শোনাতে চাই না আমার কাহিনী। আমি তো বাদশাহজাদী নই। জাহানারা, রোশেনারা, গউহারা বেগম—কিংবা পক্ষে নাদিরা বেগম হয়েও জন্ম নিতাম যদি, অনেক গরম-মশলা, অনেক পেস্তা-বাদাম, কিসমিস, আখরোট আর আঙ্গুর-রসের নেশা ধরা স্বাদ পেতে। আমার কাহিনীতে ওসব কিছুই পাবে না।

আমি পথের নর্তকী। তিনকুলে কেউ নেই। নর্তকী কিংবা গায়িকা হতে পেরেছিলাম ওস্তাদজীর অনুকম্পায়। উদয়পুরে নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিল আমাকে এক মুঘলসেনা। আগ্রার পথে তার হাত ধরে যখন যাচ্ছিলাম, ওস্তাদজীর নজরে পড়ে যাই। তিনি আমায় আশ্রয় দেন, গান শেখান নিজে। নাচ শেখারও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী হয়ে নিজের জীবিকার পথ বেছে নিতে পারি। পথ একটাই রয়েছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমল থেকে একটি প্রথা চালু রয়েছে। সন্ধ্যার পর দেশের নামকরা সুন্দরী ও কুমারীর দল বাদশাহের অবসর বিনোদনের বিরাট প্রকোষ্ঠে একবার দর্শনের জন্য হাজির হয়। বাদশাহ এতে খুসী হন এবং এই সামরিক উপস্থিতির ফলে প্রাপ্তিযোগ ঘটে। এই সময় দেশের নামকরা আমীর ওমরাহের দৃষ্টিতে পড়ে ভবিষ্যতের পথ বড় সুগম হয়ে ওঠে। নাচের জন্য সমঝদারের বাহবা মেলে, গানের জন্যে মেলে রসিকজনদের প্রশংসা। জীবন হয় ধন্য।

ওস্তাদজী আমার মঙ্গল চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বোধ হয় নিজের মঙ্গল চাই না। কিল্লা আর হারেমের কথা শুনলে আমার ভয় হয়। মনে হয় এই বিশাল দেশের তুলনায় হারেমের স্থান কতটুকু? ভাবি, সারা দেশের রক্ত চুষে হারেম তার মনোলোভা টুকটুকে রঙ নিয়ে সবাইকে প্রলুব্ধ করছে। সমস্ত ঘাম-ঝরা মানুষের দেহের চর্বি সংগ্রহ করে সেখানে রোশনাই জ্বালানো হচ্ছে। ভাবতে গেলে মন বিষিয়ে ওঠে।

তাই ওস্তাদজীর জীবিত কালেই তাঁর স্নেহ ভালবাসাকে উপেক্ষা করে পথে নামলাম। আগ্রার পথঘাট আর প্রান্তর হল আমার নৃত্যের প্রাঙ্গণ আর সুরেলা কণ্ঠের জলসাঘর। শাহানশাহ কিংবা বাদশাহজাদা নয়, পথের ধূলিমাখা সাধারণ মানুষ হল আমার নৃত্যের দর্শক আর সঙ্গীতের শ্রোতা।

অনহৃদয়ে ওস্তাদজী প্রাণত্যাগ করলেন। সংসারে তাঁর কেউ ছিল না। আমি আশ্রিতা হয়েও ছিলাম তাঁর কনাসম। তাঁর শবদেহ জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদলাম, কিন্তু তাঁর একমাত্র ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারলাম না।

গুলরঙ আমার একমাত্র বন্ধু এই নির্বান্ধব আগ্রা নগরীতে। ওস্তাদজীর মৃত্যুর পর যমুনার তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে গুলরঙের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলাম। সেও নর্তকী। তবে তার দৃষ্টি-

ভংগী সম্পূর্ণ পৃথক। সে উচ্চাশায় ভরপুর। আর সেই উচ্চাশার সোপান হয়েছে দেওয়ান-ই-খাসের প্রথম ধাপ থেকে।

আমাকে কিল্লায় নিয়ে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। এখন একাই যায়। আর প্রতিদিন এসে উত্তেজিত কণ্ঠে এক একটি ঘটনার বিবরণ দেয়। আমাকে শুনতে হয় সব কথা শুধু তাকে উৎসাহ দেবার জন্য। সে আমাকে যেমন ভালবাসে আমিও যে তাকে তেমনিই ভালবাসি।

তবু সে মাঝে মাঝে বুঝতে পারে আমার আগ্রহ অকৃত্রিম নয়। মুখ লাল হয়ে ওঠে তার। গম্ভীর হয়ে বলে—তুই আর যাই করিস, আমাকে ঠকাসনে চঞ্চল-বাঈ। চমকে উঠে বলি,—আমি? তোকে ঠকাবো? ভাবতে পারলি?

—ভাববো কেন? দেখছি—নিজের চোখে দেখছি।

—ভুল দেখছিস।

—না।

—মিথ্যে বলা তোর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার কান্না পায়। আমি তো সত্যিই ওকে ঠকাতে চাইনি। আনন্দ দিতে চেয়েছি। চুপ করে থাকি।

এইভাবে একদিন কথা কাটাকাটির পর সে বের হয়ে গেল। অপরাহ্ণ হয়ে গেল তবু ফিরল না। ভয় হয়—সে কি একেবারে চলে গেল?

যমুনার কালো জলের ওপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আশেপাশের বিটপ শ্রেণী সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করার জন্য নিস্পন্দ নিথর। দূরে জুমা মসজিদের আজান ধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। আকাশের বুকে একসারি বলাকা উড়ে চলে ত্রাস্ত পাখায়।

সহসা মনে পড়ে গেল বাদশাহজাদা দারা-শুকোর সাদির আয়োজন হচ্ছে বলেছিল গুলরঙ। নিশ্চয় সেই ব্যাপারে কিল্লায় খোঁজ খবর নিতে গিয়েছে। গুলরঙ বলেছিল জাহানারা বেগমের ওপর দারাশুকোর সাদির ভার দিয়েছেন শাহান-শাহ্ শাহ্জাহান। তাঁকে সাহায্য করছে হারেমের পরিচারিকাদের প্রধান সিতি-উন-নিসা। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই কন্যাপক্ষের গৃহে বিরাট শোভা-যাত্রা সহকারে "সচক" পাঠানো হবে। কন্যার নাম গুলরঙের মুখে শুনেছি। নাম তার করিম-উন-নিসা। দাক্ষিণের নবাব সুলতান পরভীজের কন্যা। পাত্রীর আর এক নাম নাকি নাদিরা বেগম।

গুলরঙ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ওস্তাদজীর কথা ভাবতে বসি। তিনিই আমার নাম রেখেছিলেন চঞ্চল-বাঈ। জানতেন আমি কোন হতভাগ্য রাজ-পুতের কন্যা। তাই আমাকে পিতাজী সম্বোধন করতে শিখিয়েছিলেন। ওস্তাদজীকে পিতাজী বলেই ডাকতাম।

চিন্তায় বাধা পড়ে। দরজায় করাঘাত। গুল-রঙ এসেছে নিশ্চয়। বেশ উত্তেজিত করাঘাত। কোন মজার সংবাদ এনে থাকবে। বাদশাহজাদার সাদির দিন ঘনিয়ে আসছে তো।

দরজা খুলে আঁতকে উঠি। সভয়ে দু-পা পেছিয়ে যাই। সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরিচিত বলিষ্ঠ এক পুরুষ।

পুরুষটির মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। সে দু-পা এগিয়ে আসে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

—হেঁ হেঁ, মিথ্যা বলেনি দেখছি। অপ্সরাই। অপ্সরাবাঈ।

—কে আপনি? আপনি কে?

—আমি? চিনতে পারবে না অপ্সরাবাঈ।

—কি চান আপনি?

—শুধু তোমাকে।

—না—

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে পুরুষ। প্রতি মুহূর্তে আমার ভয়, এই বুঝি সে তার অতি সুদৃঢ় দুবাহু বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলল। তবু হিমশীতল দেহ নিয়ে একচুলও নড়তে পারি না।

—ভয় নেই অপ্সরাবাঈ। তোমার ক্ষতি করব

—কেন এসেছেন তবে?

—দেখতে।

—কি? কি দেখতে?

—তোমাকে।

আবার অট্টহাসি। উঃ কী বীভৎস হাসি। আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়।

শেষে হাসি থামায় পুরুষটি। গম্ভীর হয়। ধীরে ধীরে বলে—ব্যক্তিগতভাবে তোমার ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই।

আমি নির্বাক হয়ে থাকি। শুধু পেছনে কোন একটি অবলম্বন পেয়ে চেপে ধরি।

—আমি খোজা অপ্সরাবাঈ।

বুকের ভেতরটা হাল্কা হয়ে যায়। শীতল দেহে জীবনের লক্ষণ ফিরে আসে।

খোজা লক্ষ্য করে। বলে—তবে অন্যভাবে ক্ষতি করতে পারি। তোমায় তুলে নিয়ে হারেমে ফেলতে পারলে পৃথিবীর কেউ কখনো এই সুন্দর মুখখানা দেখতে পাবে না। বাদশাহজাদা সুজা এই রকম এক মুখের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—না। এ সর্বনাশ তুমি করো না।

—নিশ্চয়ই না। আমি শাহানশাহের হারেমের খোজা। মতলব খাঁ আমার নাম। দারাশুকোর সাদির পরে তাঁর হারেমের ভার পড়বে আমার উপর।

আমি নীরব থাকি।

—কী অপ্সরাবাঈ, শুনে আনন্দ হচ্ছে না?

—আমার না হোক। তোমার যে কত আনন্দ বুঝতে পারছি। তোমার উন্নতিতে আমি খুশী ভাই।

কথাটা ভেবে বলিনি, কিন্তু ফল হলো অবিশ্বাস্য। ওই অমিত বলশালী ব্যক্তি সহসা কেঁদে উঠল। কী করব ভেবে ওঠার আগেই সে আমার একটি হাত বশ করে চেপে ধরে বলে,—এমন কথা কেউ বলেনি বহিন। তোমার প্রাণ আছে, তাই মনের প্রাণের কথা এত চট করে জেনে ফেললে।

বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে। মনের ত্রাস কোথায় উধাও হয়ে যায়। মতলব খাঁ কিছুক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—গুলরুখ তোমার এখানে থাকে?

—হাঁ.

—সেই তোমার কথা আমাকে বলেছে।

—সে তলে-তলে আমার শত্রুতা করে তাহলে?

—শত্রুতা? বলছ কি তুমি?

—তাহলে আমার কথা বলতে গেল কেন?

—তোমার ভালোর জন্যে।

—হারেমে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখা ভাল?

মতলব হেসে আকাশ ফাটায়। বলে,—আরে না না. বাদশাহজাদার সাদির দিনে কত জেনানার দরকার হবে। বাছাই করা নর্তকী আসবে। মেহেদি রঙে অতিথি অভ্যাগতদের আঙুল রাঙিয়ে তুলতে হবে, তুমি তাদের একজন হবে। একি কম সৌভাগ্য। সারা হিন্দুস্থানে কয়জন নর্তকী ভাবী শাহানশাহের সাদিতে যোগ দিতে পারে?

চুপ করে থেকে বলি—আচ্ছা ভাই, আমার নাম অপ্সরাবাঈ. একথা কে বলল?

—কে আবার? আমিই তো রাখলাম। এমন অপ্সরার মত রূপ।

—বাঃ। সুন্দর নাম রাখতে পার তো? এই নামই থাক, মতলব একসময় বিদায় নেয়।

অবশেষে সেই শুভ দিনটি এল। হৈহৈনো বন্দী উৎসবের সুনির্বাচিত দিনে দারাশুকোর সাদি। তাঁর আর একটি পোষাকী নাম গুল ই আওয়ালিন্ ই গুলিস্তান ই শাহী।

দুরু দুরু বুকে জীবনে প্রথম গুলরঙের পেছু পেছু কিল্লায় প্রবেশ করলাম। চারদিক উৎসবমুখর। বাজী পুড়ছে নিরবচ্ছিন্ন।

আমি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে বিহ্বল—আড়ষ্ট। গুলরঙ কিন্তু বেশ সপ্রতিভ।

সে আমাকে খুঁচিয়ে বলে,—অমন ন্যাকা হয়ে থাকিস না। দেখতে পাস না তোর দিকে কত পুরুষের চোখ? অন্ধ নাকি?

গুলরঙ আমাকে মেহেদী রঙে পূর্ণ একটি সুবর্ণ পাত্র এনে দেয়। সে ফিস ফিস করে বলে—তোকে বড্ড হিংসে হচ্ছে।

—কেন রে?

—চোখের মাথা খেলি নাকি? তোকে সবাই যে গিলছে।

—যাঃ!

—সাবধান। সুজার নজরে পড়লে রক্ষা নেই তোর। মুরাদও কম যায় না। তবে আওরঙজেবের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিস।

—দারাশুকো কোথায়?

—কেন?

—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—সর্বনেশে ইচ্ছে। অমন ইচ্ছের কথা মুখেও আনিস নে আজ।

—কেন?

—তোকে দেখে যদি মজে যায়?

—যাঃ।

—চল্।

—কোথায়?

গুলরঙ হেসে বলে,—চল্ তো—

সে আমাকে বেশ কিছুটা ভেতরে নিয়ে যায়। চারদিকে রঙ-বেরঙ-এর ঝাড় বাতি। চিরাগদানিগুলো আনন্দে মাতোয়ারা।

এক জায়গায় থেমে গুলরঙ বলে—চেয়ে দেখ।

দেখি একজন সুপুরুষ তার দুখানি হাত সামনে ধরে রেখেছে। একটা অতি সূক্ষ্ম পর্দা ঝুলছে। তারই পশ্চাতে হারেমের বহু সুন্দরী। তাদেরই একজন তরুণটির হাত মেহেদী রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

মুহূর্তে বুঝলাম ইনিই দারাশুকো। চোখের পলক পড়ে না। মনের মধ্যে বাদশাহজাদাদের যে ছবি এতকাল আঁকা ছিল, ইনি তো তেমন নন।

গুলরঙ আমার গা টিপে বলে—মরণ হল নাকি তোর?

আমার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাই। গুলরঙের আর্ত স্বরে যখন সচেতন হই, তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

আমি পিছন ফিরতেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসে,—শোনো।

বাদশাহজাদা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ান। রমণীকুলের কাকলি স্তব্ধ হয়ে যায়।

শুধু একজন সুমিষ্ট কণ্ঠে বলে আজকের দিনে অন্তত অন্য দিকে চাইতে নেই দারা।

—অল্প সময় নেব জাহানারা।

একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে আমাকে নিয়ে যান দারাশুকো। চরম শাস্তির অপেক্ষায় মাথা নত করে দাঁড়াই।

—তুমি কে?

—সামান্য নর্তকী বাদশাহজাদা। আমার অন্যায় হয়েছে।

—কোন অন্যায় হয়নি, ভয় পেও না।

অবাক হয়ে চকিতে দারাশুকোর চোখের দিকে তাকাই। সে চোখ স্নিগ্ধ—কোমল। পাষাণ ভার নেমে যায় বুক থেকে।

—তোমার নাম?

—অপ্সরাবাঈ।

—সুন্দর নাম, সার্থক নাম, কিন্তু এখন

আমি কথা বলতে পারবো না। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা নাম দিলে তুমি রাখবে?

—হুকুম করুন।

—হুকুম নয়—অনুরোধ।

একি! কী শুনছি আমি। ভাবী শাহানশাহ অনুরোধ করছেন একজন নর্তকীকে?

—আমার পরম সৌভাগ্য বাদশাহজাদা।

—তোমার নাম দিলাম রাণাদিল। আমি চলি। এই নামেই তুমি পরিচিত হয়ো। তাহলে তোমাকে খুঁজে পেতে পারি।

বাদশাহজাদা চলে গেলে গুলরঙ ছুটে এসে বলে—চলে যেতে বললেন তো? বেশ হয়েছে। কত করে বললাম তখন—

—কিন্তু তিনি যেতে বলেন নি।

—বলেন নি? কি বললেন তবে?

—শুধু নাম জানতে চাইলেন।

—আর কিছু না।

জীবনে প্রথম গুলরঙের কাছে সত্য ঘটনা গোপন করলাম। ঘাড় নেড়ে জানালাম, আর কিছুই তিনি বলেন নি।

চারদিকে আনন্দের জোয়ার। সেই জোয়ার উত্তাল হয়ে ওঠে শাহানশাহের নাটকীয় এক ঘোষণায়। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর কিল্লার নর্তকীদের নাচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা শুধু হাজিরা দিয়ে প্রাপ্য পাওনা নিয়ে যেত। এতে তাদের দিন চললেও মনে ছিল অতৃপ্তি। আজ শাহানশাহ ঘোষণা করলেন মমতাজ বেগমের মৃত্যুর আগের মত আবার নাচগান শুরু হবে আজ থেকে। তাঁর দ্বিতীয় ঘোষণা বাদশাহজাদা দারা-শুকোই ভাবী উত্তরাধিকারী তাঁর।

তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাথায় স্বহস্তে শেহরা পরিয়ে দিয়ে বলেন—এই একই শেহরা ঠিক এমনি-ভাবে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। সেদিন তোমার মা মমতাজ বেগমের সঙ্গে আমার সাদির দিন।

পথের পড়ে পাওয়া মেয়ে আমি। পথের প্রতি আমার আন্তরিক টান। তাই বাদশাহজাদার সাদির দিনের আড়ম্বর আমার মনে নেশা ধরাতে পারেনি।

আগের মতই আমার পায়ের উজ্জ্বল নূপুর ধূলিমলিন হয় প্রতিদিন। আমার ছায়া প্রাসাদের প্রস্তর নির্মিত মসৃণ মেঝেতে প্রতিবিম্বিত না হয়ে পথের ওপর ভেসে ওঠে। আমার চতুর্দিকের আব-হাওয়া সুরা আর বসরার আতরের সুবাসে আমো-দিত হয় না। ঘামে-ভেজা এক অক্লান্ত জীবনের গন্ধ আমাকে প্রেরণা দেয়। আমার কপালে যে স্বেদবিন্দু গড়িয়ে পড়ে তাতে মিশে থাকে রঙিন ধূলিকণা।

আমি সুখের গান গাই। দুঃখের গান গাই। বিশেষ করে প্রেমিক বিদেশে কিংবা যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে বিদায় নেবার সময় প্রেমিকার মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই অবাস্তব বেদনার কথা গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলি। কারণ পুরুষরা তাদের বিরহে প্রেমিকার মনের যাতনার কথা শুনতে ভালবাসে। কিংবা রমণীর ভীড়ে গাইলে, প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানে প্রেমিকের অন্তরে তীব্র জ্বালার কথা উজাড় করে দিই। এতে মেয়েরা খুব তৃপ্তি পায়। বড় অসহায় তারা। ক্ষণিকের তরেও তারা যদি অনুভব করে তাদের জন্যে পুরুষেরা কতখানি কাতর হয়, তাদের প্রভাবও পুরুষের ওপর অপরিসীম, তাহলে তাদের পরিতৃপ্তির সীমা থাকে না। জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের যে আর কিছুই সম্বল নেই।

গুলরঙ আমার ওপর চটে আমার অজ্ঞাতে একদিন তার সব কিছু নিয়ে কুটির ছেড়েছে, সে ভেবেছিল বাদশাহজাদার সাদির জাঁকজমক দেখে আমি পথ ছেড়ে হারেমের দিকে পা বাড়াব। সে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তার উন্নতি হয়েছে। সুজা এখন তার উপর সব চাইতে সদয়।

গুলরঙ চলে যাওয়ায় আমি আরও মুক্ত। পথের মানুষদের কাছে আমার পরিচয় রাণাদিল। নর্তকী রাণাদিল। আগে লোকে চঞ্চলবাঈ বলে

চিনত। এখন তারা জানে, ও—নাম ভুল। ভুল নাম বলত তারা।

যমুনা তীরে একটি ছোট মেলা বসেছে। এই মেলার কোন ধারাবাহিকতা নেই। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে এ-ধরনের মেলা আগ্রা নগরীর রাস্তায় যখন-তখন বসে থাকে। ভীড়ও কম হয় না।

যমুনার তীরের এই মেলায় মত মেলায় থাকে সাধারণের ক্রয় যোগ্য দ্রব্য সম্ভার। তাদের চাহিদা পূরণ হয় এতে। তাছাড়া রয়েছে লাঠি-খেলা, কুস্তি আর ফকির-সাধুর আকর্ষণ। এতে আড়ম্বর নেই, অথচ এর প্রয়োজন অত্যধিক।

আমার উপস্থিতি এইসব মেলাতেই হয়ে থাকে। আমি ভালবাসি আসতে।

এক জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে রয়েছেন এক সাধু। কিছু কিছু মানুষ ভীড় করেছে সেখানে। সাধু চিমটের ডগা দিয়ে ছাই তুলে নিয়ে সবার হাতে একটু-একটু করে দিয়ে চলেছেন। তারাও সাধ্যমত কড়ি ফেলছে। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে। কেউ কেউ প্রণাম করছে।

পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক মোল্লা। তিনি যেতে যেতে থেমে গেলেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করলেন,—কী হচ্ছে এখানে?

ভক্তের দল বলে, —ওঁর ধুনির ছাই-এ অসুখ সেরে যায়।

—ঝুট—সব ঝুট।

সাধু নড়ে চড়ে বলেন—কখনো না।

মোল্লা কটূক্তি করে ওঠেন।

সাধুও ক্ষিপ্ত হন।

একজন ফিসফিস করে বলে, —এবারে সাধু টের পাবে।

—কেন? কেন?

—কাজী মহম্মদ জালালকে চোখ রাঙালে নিস্তার নেই।

হঠাৎ দেখা গেল ঝগড়া করতে-করতে সাধু চিমটে দিয়ে কাজীকে এক খোঁচা লাগিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে। কাজী সাহেবের সঙ্গীরা সাধুকে পেটাতে থাকে। সাধুর শিষ্যবর্গও নিস্তার পায় না।

আমি আর থাকতে পারি না। ছুটে যাই ওদের মধ্যে। সাধু আর কাজীর ভেতরে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, —আপনারা মারামারি করবেন না কাজী সাহেব। সাধুজী আপনি শান্ত হোন। এই মেলা নষ্ট করবেন না।

কিন্তু কোথা থেকে একটা লাঠির আঘাত আমার মাথায় এসে লাগে। মাথা ঘুরতে থাকে। চোখে অন্ধকার দেখি। তারপরই গলগল করে রক্ত বেয়ে পড়ে কপাল থেকে।

দুই পক্ষই দেখলাম, একজন রমণী এইভাবে আহত হওয়ায় হকচকিয়ে গেল। সাধু তাঁর ধুনি নিভিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। কাজী সাহেব চলে গেলেন ঠিক বিপরীত দিকে।

অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করি। তবু গরীবদের এই সমাবেশে এ-ধরণের তিক্ততা দেখে আমার কান্না পায়। একটি 'শের' জানতাম আমি। তার সুরও দিয়েছিলাম নিজে। মনে মনে ভাবি, নর্তকী হলেও পৃথিবীতে দেখার মত কি কিছুই নেই আমার? আমার এই মাথার আঘাত যেমন আরও দু-চারটি মাথার আঘাতকে বাঁচিয়েছে, তেমনি আমার সঙ্গীত কি সহস্র মানুষের মনকে বাঁচাতে পারবে না?

কষ্ট হয়। খুবই কষ্ট হয়। তবু গেয়ে উঠি—

হিন্দু কহে সব হাম বড়ে
মুসলমান কহে হাম
এক-মুঙ্গু কো দো ফোদ হৈ
কৌন জিয়াদা কৌন কম।
কৌন জিয়াদা কৌন কম
কহনে নাহি কাজিয়া
এক রাম কা ভগৎ হৈ
খুদে রহমন—সে রাজিয়া।

আমার যন্ত্রণা তীব্র হয়ে ওঠে। শরীর অবসন্ন বোধ হতে থাকে। কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে আসে। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টায় গেয়ে চলি। কারণ আমি লক্ষ্য করি সম্বেবের আবহাওয়া অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কাজী ও সাধু বিদায় নেবার পর অভাবী মানুষেরা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আমি অতি কষ্টে নৃত্যের তালে-তালে ঘুরে সরে আসি। পা অবশ হয়ে আসলেও থেমে পড়ি না। আমার চারদিকের ভীড় বাড়তে থাকে। সেই ভীড়ে বিস্ময়, ভীতি আর সব কয়টি চোখে বিহ্বলতা।

রক্ত করার বিরাম নেই। আর পারি না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। অস্পষ্ট দেখতে পাই কয়েকজন আমার দিকে ছুটে আসছে। কেন আসছে? তারপর সব অন্ধকার হয়ে যায়। কিছু আর মনে নেই।

একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে আমি চোখ মেলি। কী যেন স্বপ্ন দেখছিলাম একটু আগে? মনে নেই। চিন্তাপ্রবাহে কেমন একটা ওলট-পালট ভাব। তবে একটা মধুর আবেশ আমাকে ভরিয়ে রাখে। অথচ কেন এই আবেশ বুঝতে পারি না।

চোখ মেলতেই সামনের ছোট প্রদীপটা জ্বলতে দেখি। ভাবি, প্রদীপটা জ্বলছে কেন? আমি কি নিভিয়ে দিয়ে ঘুমোই নি? সেটি নেভাতে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পারি না। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি মাথায়। কাতরোক্তি করে শুয়ে পড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় মেলার কথা। সাধু আর কাজীর কথা। আর আমার নাচের কথা।

কিন্তু আমি নিজের ঘরে কিভাবে এলাম? বড় বড় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখি এক জন পুরুষ নিশ্চল মূর্তির মত অদূরে বসে রয়েছে। চিনতে পারি না। আলো বড় অস্পষ্ট। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। উঠতে গিয়ে যেটুকু শক্তি ক্ষয় হয়েছে তাতে দৃষ্টি আরও আবছা হয়ে গিয়েছে।

রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে আমার দু-চোখের কোল বেয়ে। মুছে ফেলব তেমন শক্তি নেই—ইচ্ছাও নেই। নিশ্চল পুরুষ-মানুষটি নিশ্চয় খুব সহৃদয় ব্যক্তি। আমাকে অচেতন অবস্থায় কুটিরে পৌঁছে দিয়ে কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে চলে যান নি। আমার সেবায় ব্যস্ত রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে চেনেন। নইলে আমার কুটির খুঁজে পেতেন না। অথচ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না।

দেওয়ালের গায়ে পুরুষটির কম্পিত ছায়া পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে আসছেন। আমি সাধ্যমত আমার ডান হাত একটু উঠিয়ে তাঁকে আহ্বান জানাই।

তিনি আমার হাতটি ধরে ফেলে পাশে বসেন। তাঁর মুখ প্রদীপটিকে ঢেকে দিল। দেখতে পাই না ভাল করে। তাঁর গা থেকে একটি স্নিগ্ধ সুবাস আমার নাকে লাগে। আরাম বোধ করি।

অস্ফুট কণ্ঠে বলি,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমার প্রাণদাতা আপনি।

—না রাণাদিল্। যারা বাঁচিয়েছে তাদের আমি অনুসরণ করেছিলাম মাত্র। আমি তোমার কুটির চিনতাম না।

—কে? কে আপনি? আপনার পরিচয়?

—তুমি কি আমায় চিনতে পারবে?

—আপনার স্বর আমার খুবই পরিচিত। কিন্তু তা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। অথচ কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

—সম্ভবত অন্য কারও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিল রয়েছে। তুমি আমায় চেনো না।

—কখনো আপনাকে দেখিনি?

—হ্যাঁ, দেখেছ বটে। অনেকদিন আগে। তেমন কিছু নয়। তাতে মনে থাকে না।

—আপনার কণ্ঠস্বর ঠিক বাদশাহ্জাদা দারাশুকোর মত।

নিউ গণেশ অপেরা

৩১১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১২৯৫

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের

ময়নামতির মাঠ

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের

কথার দাম

শান্তি চক্রবর্ত্তীর

জারাক খাঁ

সুরে—মনোজ পাল ও বৈদ্যনাথ সরকার

নাট্য নির্দ্দেশনায় ও অভিনয়ে—মোহিত বিশ্বাস স্বপন কুমার (ফিল্ম), হিমাংশু দাস, শক্তি চ্যাটার্জী, তারক দাস, (মটর) জয়দেব দাস, সত্যেন দে, অমর রায় চৌধুরী, তারা দেবী, মৌসুমী চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, সবিতা চ্যাটার্জী ও অনিল রায়।

প্রোঃ শ্রীগোষ্ঠ বিহারী ঘোষ

প্রযোজক : —শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষ

: ৩৮২ সালের বলিষ্ঠ নাট্য সম্ভার :—

নারায়ণ দত্ত প্রণীত বাস্তবধর্মী সামাজিক আলেখ্য—

"আপনজন"

দুর্গাদাস মাল রচিত সামাজিক নাটক—

"এই দেশেরই মেয়ে"

সনৎ তরফদার বিরচিত ঐতিহাসিক নাটক—

"ঘুমাও তুমি প্রিয়া"

নন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত ভবিষ্যমূলক নাটক—

"সাধক সর্ব্বানন্দ"

শ্রেষ্ঠাংশে—গৌর ব্যানার্জী, কালীনাথ দত্ত, মহাদেব দে, শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জী, আভা মণ্ডল, কাবেরী বসু ও চিত্র, মন্থ ও বেতার খ্যাত—ঠাকুরদাস মিত্র।

তত্ত্বাবধায়ক—গোপাল দে, পরিচালক—জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী

উপদেষ্টা—দিলীপ বিশ্বাস।

যাত্রার ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে

যাত্রা শিল্পের দুটি নাম

শিল্পী তীর্থ * অগ্রগামী

এ মরসুমের জনচিত্তজয়ী পালা

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত অরুণ রায়ের তথ্য অবলম্বনে

বিবি আনন্দময়ী

সুর : শ্যামল মিত্র (ফিল্ম)

সূর্যসারথী রচিত ও পরিচালিত

ফকির বিদ্রোহ

পালা : আনন্দময়

সুর : দুর্গা সেন

গঙ্গাযমুনা

সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

স্বত্বাধিকারী : শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

পরিচালক : শ্রীদীনেশ নন্দী

৩৩৩বি, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫০৫৭১

আমি মা হতে চাই

রচনা : কানাই নাথ

সুর : পঞ্চানন মিত্র

নাট্য নির্দেশনা :

পান্না চক্রবর্তী

স্বত্বাধিকারী : শ্রীদীনেশ নন্দী

পৃষ্ঠপোষক : শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

মোহন অপেরার

আন্তরিকতাপূর্ণ—৩

ব্রজেন দে'র

সীতার বনবাস

সুর—পঞ্চানন মিত্র

আনন্দময়ের

যোগবিয়োগ

গীত / সঙ্গীত প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

আনন্দময়ের

অন্নপূর্ণার মন্দির

সুর—পঞ্চানন মিত্র

ফোন : ৫৫-৫৪১৩

—আশ্চর্য!

—কেন? একথা বলছেন কেন?

—তুমি আমায় মনে রেখেছ রাণাদিল্? কণ্ঠস্বর পর্যন্ত।

—বাদশাহ্‌জাদা?

আমি চোখ বন্ধ করি। চোখের জল বাঁধ মানে না। এতক্ষণে মনের মধ্যের মধুর আবেগের স্মৃতি অল্প-অল্প স্মরণ হয়।

—আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি রাণাদিল্। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

—অপমান? এ আপনি কী বলছেন বাদশাহ্‌জাদা? আর কৃতজ্ঞতা! আমার প্রতি? না না—

—তুমি আমার কথার এতটা মূল্য দিয়েছ, অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশা করনি। তুমি হারেমে না গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াও।

—আপনার কথার মূল্য? কোন্ কথা বাদশাহ্‌জাদা?

—যে নামে তুমি সবার কাছে প্রিয়, সেই নামে পরিচিত হতে আমিই বলেছিলাম রাণাদিল্।

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। অথচ লজ্জা আমাদের অঙ্গের ভূষণ হবার কথা নয়। আমরা পথের নর্তকী। আমাদের লজ্জা দেখাতে হয় অভিনয়ের ছলে। সেই লজ্জাকে সত্যি বলে কল্পনা করে নিয়ে অনেকে খুশী হয়।

—বল রাণাদিল্, এতটা মূল্য কেন দিলে?

এ আমি কোন্ আগুনের খেলা নিয়ে মত্ত হয়েছি? এ যে সর্বনেশে খেলা। ছি ছি, দারা-শুকোর সংগে সস্তা প্রেমের খেলা আমি খেলতে পারি না। তেমন হলে দেওয়ান-ই-খাসের সেই ঘটনার পরে সুজার হারেমের এককোণে আমার স্থান হয়ে যেত। আমি নর্তকী। কিন্তু অন্তরে আমি নারী। নারীত্বের অবমাননা সহ্য করার ভয়ে বাদশাহ্ আর আমীর ওমরাহ্‌র মন জয়ের চেষ্টা করিনি। ওস্তাদজীর ইচ্ছা সত্ত্বেও নয়। আমি পথে বার হয়েছি।

—বল রাণাদিল্।

—কি বলব বাদশাহ্‌জাদা?

—আমার অনুরোধের এতটা মূল্য দিলে কেন?

—ভয়ে।

দারাশুকোর মুখ দেখতে পাই না। সামনা নীরবতার পরে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। ভেবে-ছিলাম সেই স্বরে থাকবে আত্মপ্রসাদ। পরিবর্তে, অদ্ভুত একটা বেদনার রেশ ফুটে উঠল।

—ভয়ে। ও—

—আপনাদের যে ভয় করতে হয় বাদশাহ্‌-জাদা। একথা কি আপনার জানা নেই? শুনেছি তাতেই আপনাদের আনন্দ।

—হাঁ! তা বটে। আচ্ছা, এখন আমি যদি বলি, ও-নাম বদলে দাও। দেবে?

—না।

—ভয়ে? ভয়েও দেবে না?

—আমি যে ও-নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছি। আমি বদলাতে চাইলেও অন্যেরা শুনবে কেন?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন দারাশুকো। তারপর বলেন,—তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রাণাদিল্। তুমি কথা বোলো না।

—না বাদশাহ্‌জাদা। আমার ভাল লাগছে। কিন্তু আপনি কষ্ট পাচ্ছেন এই পরিবেশে।

—আমি সব পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারি। আমি ফকির সাধুদের আস্তানায় অনেক সময় রাত কাটাই। তুমি সংকুচিত হয়ো না। তোমার খাবার আনতে পাঠিয়েছি। এলেই চলে যাব।

—এত দয়া আপনার?

—দয়া! আমি তোমার প্রীতি আরও এক ব্যাপারে কৃতজ্ঞ।

—একি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। যমুনার তীরে যে-মেলায় তুমি গাইছিলে, সেখানে এক ফকির সাহেবের আসার কথা ছিল। তাই আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে

দেখি তিনি আসেন নি। ফিরে আসছিলাম। সেই সময়ে ভেসে এলো তোমার গানের কলি। ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠল আমার, গানের কথা শুনে। ঠিক যেন আমার মনের কথা। আর কী মিষ্টি গলা। তুমি নর্তকী আমি জানি। কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় তুমি সংগীতজ্ঞা। আমার এই ছদ্মবেশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম। তোমার ক্লান্ত মুখ দেখে চমকে গিয়েছিলাম। তবু গান শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

—আমায় চিনতে পারলেন আপনি?

—না। চেনা সম্ভব ছিল না ওই অবস্থায়। কিন্তু নাম শুনলাম তোমার। দেখলাম ওদের তুমি অতি পরিচিত। ওদের প্রত্যেকের মুখে তোমার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। নর্তকী রাণাদিল্। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরাধরি করে একটি শকটে তুলে তোমায় ওরা এখানে নিয়ে এল। আমি অনুসরণ করলাম।

আমার হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে আবার অশ্রু উদ্গত হয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল।

—ওরা তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে রাণাদিল।

—ওরা আমায় রেখে চলে গেল?

—যেতে চায়নি। আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি। নিজের পরিচয় দিতে ওরা ভীষণ অবাক হল। তারপর একান্ত অনিচ্ছায় চলে গেল। ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা মন্তব্য শুনলাম,—ওদের তো হাজার নর্তকী রয়েছে। তাতেও সন্তুষ্ট নন? আমাদের মাত্র রাণাদিল্। তাকে ছিনিয়ে নিতে চান। আমি জবাব দিতে পারিনি। মন্তব্যকারীকে খুঁজে বার করার চেষ্টাও করিনি।

আমি চুপ করে থাকি।

—তোমাকে অনেক খুঁজেছি রাণাদিল্। কিন্তু পথে খুঁজিনি। জানো, সুজার হারেমে গুপ্তচর লাগিয়ে খোঁজ নিয়েছি?

—কিন্তু কেন?

প্রদীপের আলো নিভু-নিভু। দারাশুকোর ছায়া দেওয়ালে অস্থির ভাবে কাঁপতে থাকে। দূরে কোথাও নহবৎ-এর আওয়াজ শোনা যায়।

—জানিনা। এখনও বলতে পারছি না। তবে আজ তোমাকে খুঁজে পেয়েছি। সুযোগ হলে বলব।

—আপনি আবার আসবেন?

—হ্যাঁ।

—নাদিরা বেগম—

দারার মুখে হাসি ওঠে। সেই হাসি আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাইনা।

—আমি জানি রাণাদিল্, একথা উঠবে। তুমি কি জানোনা, আমাদের রক্তের বাঁধ-ভাঙা নেশা একটি নারীর দ্বারা কখনো মেটে না?

তাঁর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক উত্তেজনায় আমার দুর্বল শরীর কেঁপে উঠল। বার বার মন্ত্রোচ্চারণের মত আপন মনে বলতে থাকি,—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো—তাইতো। আমার ভুল—মস্ত ভুল।

—তুমি কিছু বলছ রাণাদিল্?

—না বাদশাহ্জাদা।

—তুমি কিছু মনেও করছ না?

—ঠিক জানিনা।

—নিশ্চয়ই করছ। শোনো রাণাদিল্, নিষ্ঠুর সত্যি কথাটা বললাম এই মাত্র। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক তা নয়। বেভাবে বললাম, অন্তত সেভাবে নয়। নাদিরাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। এর মধ্যে খাদ নেই।

একি রাক্ষসী! তোর ভেতরে হিংসে উঁকি দেয় কেন? ছি ছি, এই তোর মন? এরই বড়াই করিস? টুঁটি চেপে ধর। এই মুহূর্তে টুঁটি চেপে ধর। নইলে ওই হিংসে তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে —ডুবিয়ে মারবে।

—আপনার—আপনার কথা শুনে শ্রদ্ধা হচ্ছে বাদশাহ্জাদা।

শ্রদ্ধা? ও। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা থাকবে তো?

—থাকবে না? আপনি—

—থাক। প্রশংসা শুনতে চাইনা। শুধু বলতে চাই নাদিরাকে ভালবেসেও সেই প্রথম দিন তোমাকে দেখা মাত্র এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। সেই আকর্ষণ একবিন্দুও কমেনি—বরং বেড়েছে।

হায় ঈশ্বর! এ আবার কোন ধরনের কথা? এমন কখনো শুনবো ভাবিনি। পুরুষের হৃদয়কে কি ভাগ করা যায়? হয়তো যায়। নারী হয়ে কি করে বুঝব? কিংবা হয়ত নাদিরার প্রতি ভালবাসা, আর আমার প্রতি শুধু মুঘল রক্তের নেশা। না। আমি ওই মধুর কণ্ঠস্বরে ভুলব না। আমি শক্ত হব।

—রাত হল বাদশাহজাদা।

—হাঁ।

সেই সময় একজন এসে খাবার এনে রাখে। এরপর দারাশুকো বিদায় নিল।

পথ আমার আশ্রয়। পথ আমার বন্ধু। পথই আমার প্রভু।

মাথার আঘাত ভাল হতে আবার পথে নেমে পড়ি। দারাশুকোর সেদিনের উপস্থিতি আমার অন্তরে যে প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তাই বলে, দিনের পর দিন তাঁর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে জীবন কাটানোর কথা কল্পনা করতে ভীত হই।

যতদিন শয্যায় পড়ে ছিলাম, পথের জন্য ভাবতে হয়নি আমাকে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পথ্য নিয়মিতভাবে পেয়েছি। তখন প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না।

আমার পথের বন্ধুরাও আমার জন্যে বেদানা, পেস্তা, কিসমিস এবং আরও অনেক কিছু রেখে যেত। বাদশাদজাদার অনুগ্রহের পথ্য আমি কয়েকদিন খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। একটু সবল হতেই সেগুলোকে এক-পাশে সরিয়ে রেখে পথের বন্ধুদের দেওয়া জিনিষ খেতে সুরু করলাম।

একদিন একটি যুবক কিছু ফল এনে আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। সে হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—বসো।

যুবকটি বসে। বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশী। সে আমার মাথার দিকে চেয়ে থাকে। চুলের ভেতর দিয়ে সেখানকার কাটা দাগ দেখা যায়।

—তুমি আর একদিনও ফল এনে দিয়েছিলে। কেন দাও?

—দেবনা, বলছ রাগানিল?

—দেবেনা কেন? না দিলে আমি তো পেতাম না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

—তুমি কেন অমন সুন্দর গান গাও। কেন নেচে বেড়াও পথে পথে?

—নইলে চলবে কি করে?

—শুধু তাই?

যুবকটির মুখ ব্যথায় ভরে ওঠে। আমার কষ্ট হয়। আমার লজ্জা হয়। তার শেষের কথাটি যেন একটি আর্তনাদ।

আমি বলি,—আমার ভাল লাগে।

এবারে মিষ্টি হেসে সে বলে,—আমারও তাই।

—কি?

—ভাল লাগে।

—কি ভাল লাগে?

—তোমায় দিতে।

—কেন?

যুবকটি ভেবে-ভেবে উত্তর খুঁজে পায় না। এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সে আশা করেনি। শেষে অস্পষ্ট স্বরে বলে,—তা তো জানি না।

পুরুষের প্রথম যৌবনের এ-ও এক ধরনের উচ্ছ্বাস। যে-নারীর ভেতরে সে সামান্য বিশেষত্ব দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। হয়ত এই আকর্ষণের ভেতরে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতভাবে কাজ করে নারীর দেহ। হয়ত কেন? পুরুষের প্রতি

নারীর আকর্ষণও কি তাই নয়? পার্থক্য শুধু পুরুষেরা বোধ হয় স্পষ্ট বুঝতে পারে। নারীরা পারে না। দারার প্রতি আমার আকর্ষণ কিসের জন্য জানি না। নারী বলেই সম্ভবত।

অনুকম্পা জাগে মনে। যুবকটিকে সাহায্য করার জন্যে বলি,—আমি যদি না বাঁচতাম?

—ও কথা বোলো না রাণাদিল্।

—কেন?

—শুনলে কষ্ট হয়।

—এত?

—হ্যাঁ।

—তুমি বিবাহিত?

—একথা বলছ কেন?

—না, এমনিতে।

—না। শোনো রাণাদিল্। আমি তোমার গান ভালবাসি, তোমার নাচ ভালবাসি।

নির্লজ্জের মত মুখ ফসকে বার হয়,—আর আমাকে?

—খুব। যার নাচ-গান ভালবাসি, তাকে ভালবাসব না?

সেই সময়ে দারাশুকোর লোক এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে তার প্রতিদিনের মত নানান ধরনের দ্রব্য।

সে চলে গেলে যুবকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকে। ওগুলোর পাশে তার প্রদত্ত সামগ্রী নিষ্প্রভ দেখায়। সে সহসা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি তার আনা ফল কয়টি হয়ত তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হয়।

আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। চিৎকার করে উঠি,—দাঁড়াও।

সে থমকে ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের দিকে চায়।

—ওগুলো কোথায় নিয়ে চললে?

—আমার অন্যায় হয়েছে রাণাদিল্। বাদশাহজাদা তোমার দেখাশোনা করছেন জেনেও এই তুচ্ছ ফল কয়টি আনা উচিত হয়নি। আমি যাওয়াকুব।

—না।

যুবকটি অদ্ভুত হেসে ওঠে। ঠিক শাণিত ছুরি।

—হাসছ কেন?

—এমনিতে রাণাদিল্।

—না। বলতে হবে। বলতে হবে তোমায়।

—লাভ নেই রাণাদিল্। আমি চলি।

—তুমি আমায় ভালবাস?

—সেটাও অন্যায়। তোমার মত নর্তকীকে সারা দেশের মানুষের ভালবাসাও আটকে রাখতে পারবে না। তারা বড় দুর্বল—বড় অসহায়।

—মিথ্যে কথা।

—জানি না তুমি মন থেকে বলছ কিনা। হয়ত মন থেকেই বলছ! তবে কথাটা বলে রাখলাম—অনেক পরে তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

—কতই বা বয়স তোমার? এই বয়সে খুব বেশী বুঝতে শিখেছ ভাবো?

—না রাণাদিল্, এটা বুদ্ধির কথা নয়। মনের কথা। মন বুদ্ধির চেয়ে জ্ঞানী।

—কে তুমি? তোমার নাম কি?

—আমার নামটুকু জানতে পারো। আবদুল্লা। সাধারণ মানুষ। পেটে খাই।

—তুমি এভাবে আমার অপমান করলে আবদুল্লা?

—না তো? তোমায় আমি সম্মান করি রাণাদিল্। বাদশাহজাদা যাকে অনাদর করতে পারেন না সে সম্মানের পাত্রী।

এবারে কান্নায় ভেঙে পড়ি। কাঁদতে কাঁদতে বলি,—সম্মান না, ছাই। তুমি একবারও বুঝতে চাইলে না, তোমাদের আমি কতটা ভালবাসি। একবারও জানতে চাইলে না একা কেন রাস্তায় রাস্তায় নাচি—গাই। হারেমে কি আমার জায়গা হতো না? তোমরা শাহজাদা আর বাদশাহজাদা? দের চেয়েও নিষ্ঠুর। তাঁদের চেয়েও হৃদয়হীন।

—না।

—আলবৎ। নিজের চোখে একবার গিয়ে দেখে এসো পাশের ঘরে। প্রথম দু-চারদিন ছাড়া ওদের দেওয়া জিনিষ একবারও স্পর্শ করিনি। তোমাদের দানে আমাদের দিন চলছে। তোমাদের কেউ যেদিন না আসে, আমি সেদিন অভুক্ত থাকি।

যুবক থ' হয়ে যায়। সে পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে বার হয়ে এসে অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবে আমার হাতদুটো তুলে নিয়ে বলে,—রাণা-দিল্, আমাকে ক্ষমা কর।

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে আবদুল্লা।

—জানি। কিন্তু তুমি জান, আমি তোমার দেহের জন্যে তোমাকে ভালবাসি না। ক্ষমা কর।

—করেছি আবদুল্লা। আসলে আমিই অপরাধী। কেন জান?

—কেন?

—পায়ালুকো আমায় আকৃষ্ট করেন।

—ও।

—তাই বলে আমি হারেমে যাবো না আবদুল্লা। কয়েক দিনের মধ্যে আমায় আবার পথে দেখতে পাবে।

কথা বলতে কেন যেন বড় কষ্ট হচ্ছিল। তবু তরুণটিকে চলে যেতে দিতে ইচ্ছে হল না। তার একখানা হাত চেপে ধরে রাখলাম।

—ছেড়ে দাও রাণাদিল্। আমার অনেক কাজ।

—আবার আসবে তো?

—সে কথা তুমি জান। তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে চিরকাল। শুধু আমার কেন, আমার মত প্রতিটি মানুষের, যারা তোমার নাচ দেখেছে, গান শুনেছে।

আবদুল্লা চলে যায়।

সুস্থ হয়ে আবার পথে নামি। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়।

রাণাদিল্ ফিরে এসেছে। আমাদের রাণাদিল আবার ফিরে এসেছে।

বাজারের চত্বরে আমি নেচে চলি, আর আমার গায়ের ওপর মুহুর্মুহু রুমালে বাঁধা অর্থ এসে আছড়ে পড়ে পায়ের কাছে স্তূপীকৃত হয়। নেশা লাগে আমার।

কিন্তু নাচের শেষে ঘরে ফেরার পথে মন উদাস হয়ে যায়। বড় একা আমি। পৃথিবীতে শুধু গুলরঙ ছিল আমার হিতার্থী। সেও ছেড়ে গিয়েছে।

তবে মাকে দারা এসেছিল একদিন। বলে গিয়েছে আবার আসবে। সে আসবে জানি। আমার মন বলে, সে আসবে।

কিছুদিন পরেই সন্ধ্যার পরে একটি শকট এসে থামল আমার কুটিরের সামনে। একজন খোজা এসে কুর্নিশ করে জানায়, বাদশাহজাদার বজরা যমুনার তীরে অপেক্ষা করছে। আমার নিমন্ত্রণ।

বুক কেঁপে ওঠে। তোমরাই বল কী করি আমি? ওকে আমি সব দিয়ে ফেলেছি। ও যদি বার বার আমার কাছে আসে, চোখে সেই দৃষ্টি ফুটে ওঠে, যে দৃষ্টির অর্থ ভালবাসা এবং আরও কিছু, তাহলে কি করে নিজেকে সংযত রাখব? তোমরাই জবাব দাও। নিজেকে অঞ্জলি দেবার প্রলোভন থেকে বারবার সংযত হয়েছি। কিন্তু কতবার?

আমি নিজেকে সজ্জিত করে নিয়ে শকটে গিয়ে উঠি। ঈশ্বর আমাকে যে ভাবে নিয়ে চলবেন, সেই ভাবেই চলব। বাদশাহজাদার আমন্ত্রণ প্রত্যা-খ্যান করার স্পর্ধা আমার নেই।

তীর থেকে দারা হাত বাড়িয়ে আমাকে বজরায় তোলে। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

সে মুখ নীচু করে আমাকে দেখার চেষ্টা করে বলে,—তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন রাণাদিল্?

কেমন যেন ভিজে ভিজে—

—ভয়ে বাদশাহজাদা।

—আমার ভয়ে?

—হ্যাঁ।

—আর একদিন ঠিক এই কথা বলেছিলে।

—হ্যাঁ।

—তবে তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি। আমি ঠিক এমনটি চাইনি। এবারে দারার হাত চেপে ধরে বলি —না।

—কেন? এ ও কি ভয়ে?

—না।

—তবে?

—কী জানি?

—কিন্তু এভাবে বন্দিনী হবে কেন?

অনেক কষ্টে বলি,—ভাল লাগে।

—সে কি! ঐকবার বললে, ভয়। এখন বলছ ভাল লাগে কোনটা সত্যি।

—দুটোই।

—আশ্চর্য?

—না।

—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার হাত ঠাণ্ডা থাকলে আমি চুপচাপ বসে থাকবো।

—ঠাণ্ডা নেই।

—দেখি? তাইতো?

—আমার ভাল লাগতে ভয়। খারাপ লাগাতেও ভয়।

—ও, তাই বুঝি। সুন্দর, নতুন কথা।

আমার হাত ধরে দারা ভেতরে নিয়ে যায়। অপূর্ব কারুকার্য শোভিত সব পর্দা আসবাবপত্র।

—এখানে বসো রাণাদিল্।

বজরা দুলতে থাকে। রাতের যমুনার জল আরও মসীলিপ্ত।

আমার হৃদয়েও বজরার দোলন।

দারা সহসা বলে ওঠে,—তুমি ছাড়া আমার গতি নেই রাণাদিল্।

—কেন? নাদিরা বেগম? পুরোনো হয়ে গেলেন।

—না।

—তবে?

—তোমরা দুজনকে ভালবাসার কথা বিশ্বাস করো? করো না জানি। মা দুজন সন্তানকে ভালবাসেন, এ কথা বিশ্বাস করো? নিশ্চই কর—এ কথা জানি। তোমাকে আর নাদিরাকে আমি ভালোবাসি একথা বিশ্বাস করার চেষ্টা করো।

দূর থেকে কোন মাঝির কণ্ঠসঙ্গিত ভেসে আসে। ভাঙা গলার উদাস সুর।

—রাণাদিল্, চুপ করে আছো কেন? অসুবিধা হচ্ছে?

—না।

—তবে?

—ভাবছি, নাদিরা বেগম ভাগ্যবতী।

—কিংবা আমি ভাগ্যবান।

—তাও, কিন্তু আমার প্রতি আকর্ষণ? কেন? সংগীত? নৃত্য।

—হ্যাঁ। কিন্তু আরও কিছু।

—রূপ? আমার সেই রূপ রোদে পুড়ে মলিন বাদশাহজাদা। আমার দৈহিক সুষমা হারেমের সবচেয়ে কুৎসিত রমণীর মতও নয়।

—অতটা ভাবিনি, তোমার প্রতি আকর্ষণের পেছনে কোন কারণ আমি জানি না।

বজরা কোথায় বয়ে চলে জানি না। রাতে ঘরে ফিরবো তো? না ফিরলেও ক্ষতি নেই। সম্মুখের পুরুষটি নির্ভরযোগ্য। তবে উষ্ণতা আমার প্রিয়। সে আমাকে কতটা ভালবাসে জানি না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস সে আমায় ভালবাসে। তা যদি না হত এতক্ষণ এই অতুলনীয় সংযম নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি নারী হয়েও এই প্রিয়তম পুরুষটির সান্নিধ্য চাইছি। অথচ সে দূরত্ব বজায় রেখেছে। শুধু নারী বলেই নিজে থেকে এগিয়ে যেতে পারছি না।

—রানাদিল্।

—বল।

একি? মুখ ফসকে কি বার হল। আমি কি

উন্মাদিনী হলাম? এই একটি শব্দের অর্থ পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ বাচ্চাও যে বুঝে ফেলতে পারে।

—তুমিও রাণাদিল্।

—হাঁ দারা, আমিও।

যমুনা কি উজান বইছে? জানি না। আকাশে এতক্ষণে কি এক ফালি চাঁদ ও উঠেছে? জানি না। বাইরে প্রকৃতি কি শান্ত শ্রীনিয়ে বিরাজ করছে? বলতে পারি না। ঝড় উঠেছে কি? কে জানে? আমি কোথায়—স্বর্গে না, মর্তে? অত হিসাব নেবার অবস্থা আমার নেই। আমার দেহ ও মন এক অপূর্ব ছন্দে দোলায়িত হতে থাকে। এ ছন্দের মূর্ছনাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কোথায়? এমন তো কখনো ঘটেনি জীবনে।

একটা সুর অনুরণিত হতে থাকে অবিরত। কী সেই স্বর্গীয় সুর? ওস্তাদজী এরকম সুরের সন্ধানতো কখনো দেননি। না না, এতো দারার মধুর কণ্ঠস্বর। সে আমায় কী যেন বলে চলেছে। কী বলে চলেছে? প্রয়োজন নেই শোনার। না শুনেও বুঝতে পারছি।

কতশত মুহূর্ত পার হয়ে গেল। শেষে এক সময় দেখি দারা আমার হাত বুকে তুলে নিয়েছে। সে আমার মুখের সামনে মুখ এনে চোখের পানে চেয়ে কী যেন দেখছে। লজ্জায় চোখ বন্ধ করি।

আর সেই মুহূর্তে বুঝতে পারি, আমি আর আগের রাণাদিল্ নেই। আমার সব অহমিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভোরের অনাঘ্রাত কুসুম বলে নিজেকে আর ভাবতে পারবো না। আমি অতি সাধারণ এক নারী—নরের সাহায্য ছাড়া সে-নারী পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। আমি কেঁদে উঠি।

দারার শত সোহাগেও আমার কান্না থামে না। বলি—এ আমি চাইনি দারা। আমি চাইনি।

—কি চাওনি রাণাদিল্।

—আমি উপপত্নী হতে চাইনি। আমি পৃথিবীতে একটু সম্মান চেয়েছিলাম।

উপপত্নী? এ কথা বললে তুমি?

—হাঁ, তাছাড়া কি? আমি আত্মহত্যা করব। অন্য পথ নেই।

—যদি থাকে?

—নেই।

—যদি বেগম হও।

—আমি অন্ধ নই। নর্তকী কখনো মুঘল বংশের বেগম হতে পারে না। তাই আমার বাঁচা হবে না।

—কিছুদিন সময় দাও।

এরপর বেশ কিছুদিন দারার তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। রাতের অনিদ্রার মধ্যে মোহমত্ত মস্তিষ্কে আমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিল, হারেমের কোমল পালংকে দিবানিদ্রার পর সেই আশ্বাস মন থেকে তার ধুয়ে মুছে গিয়েছে ভেবেছিলাম।

কিন্তু না। ভুল ভেবেছিলাম। কিছুদিন পরেই মতলব খাঁ এসে বলল,—বাঈজি, শিগগির হারেমে চল।

—কেন বন্দী করে রাখার জন্যে? দারার হুকুম?

—ছি ছি। তুমি শোনোনি?

—কী?

—বাদশাহজাদা গুরুতর অসুস্থ।

চমকে উঠি—বলি,—আমাকে হারেমে ঢুকতে দেবে?

—তোমার অপেক্ষায় সবাই বসে আছে।

—কেন?

—তুমিই যে সব্। তোমাকে বেগম করার কথা শাহানশাহকে বলতে গিয়ে বাদশাহজাদা অপমানিত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর পীড়া। দেহ শয্যায় মিশে গিয়েছে এই বিল দিনে। শুধু তুমিই তাঁকে রক্ষা করতে পার।

—হারেমে গেলে, ওরা আমাকে আর ফিরে আসতে দেবে না ভাই।

—ফিরে আসবে কেন? ওখানেই থাকবে তো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্যসংবলিত প্রবন্ধ, খ্যাতনামা লেখকবৃন্দের রচনা, সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি।

প্রতি সংখ্যা—১৫ পয়সা বার্ষিক—৭·৫০ টাকা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী পাক্ষিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা বার্ষিক—৫ টাকা

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর. এন. মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

প. ব (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩১১৭।৭০

দৃঢ়কণ্ঠে বলি—না। উপপত্নী হয়ে আমি থাকব না। দারার মৃত্যু হলে, আমি অনায়াসে আত্মহত্যা করতে পারব।

মতলব খাঁ উত্তেজিত হয়ে বলে—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

আমার কথা বুঝতে পারলে না? শাহানশাহ তোমাকে বেগম করার অনুমতি দিয়েছেন। বাদশাহজাদার প্রাণ তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশী মূল্যবান। বাইরে তাকিয়ে দেখ একবার। হারেমের শকট নিয়ে এসেছি।

এক মুহূর্ত দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে অতি সাধারণ পোষাকে শকটে গিয়ে বসি। দারাকে বাচাতে হবে। দারা আমার দারা। আমার জন্যে সে মরতে বসেছে। ওঃ ঈশ্বর ওকে বাঁচাও। শকট এতো ধীরে চলছে কেন?

—মতলব, একটু জোরে চালাতে বল ভাই।

চুপ। ভাই বলোনা আর। তুমি বেগম। সহিস শুনলে আমার জান্ চলে যাবে।

——ছুটে চলে শকট—

দারা সুস্থ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমি হারেমে থেকে যাই। নর্তকী রাণাদিল এখন বেগম রাণাদিল।

-তবু মনের মধ্যে বিবেকের কাঁটা সব সময় খচখচ করে। মনে হয় দারাকে আমি ছিনিয়ে নিয়েছি সুন্দরী আর মধুর স্বভাবের নাদিরার কাছে।

প্রায় দশদিন কেটে গেল তবু নাদিরাকে চোখের দেখা দেখতে পেলাম না। শুনেছি তিনি নাকি হারেমের বিমার-খানায় আশ্রয় নিয়েছেন। আমার নিজস্ব দুই পরিচারিকা ফতেমা আর গুল সুলতান একথা বারবার আমাকে শুনিয়েছে।

কর্তব্য স্থির করে ফেলি। এক সন্ধ্যায় নর্তকীর বেশ পরিধান করে দারার উপহার দেওয়া একজোড়া নূপুর ওড়নার প্রান্তে বেঁধে ফেলি। তারপর ফতেমাকে আদেশ করি, আমাকে বিমার-খানায় নিয়ে চল।

চোখ বড় বড় করে ফতেমা বলে, সেখানে নাদিরা বেগম আছেন।

—তর্ক করো না। যা বলছি কর।

অবিশ্বাস সত্ত্বেও ফতেমা একপা দুপা করে আমাকে বিমার-খানার দরজার সামনে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

তাকে বলি—নাদিরা বেগমকে গিয়ে বল, নর্তকী আকাশ-বাঈ এর বলের একজন নর্তকী তাকে নাচ দেখাতে চায়। তিনি অনুমতি দিলে সে কৃতার্থ হবে।

ফতেমা কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে প্রবেশ করে। আমার আদেশ পালন না করে তার উপায় নেই।

নাদিরা বেগম আমাকে দেখেন নি। তিনি আমায় চিনতে পারবেন না। কিছুক্ষণ পরে ফতেমা বাইরে এসে বলে—তিনি রাজী হয়েছেন।

আমি ওড়নার প্রান্ত থেকে নূপুর খুলে নিয়ে পায়ে বেঁধে ফেলি। তারপর নৃত্যের তালে প্রবেশ করে পালংকের সামনে গিয়ে নাদিরা বেগমকে অভিবাদন করি।

—তুমি কে?

—আমি নর্তকী বেগমসাহেবা।

—আমি এখানে আছি, কে বলল তোমাকে?

—আমার সই আকাশ-বাঈ হারেম থেকে শুনে গিয়েছিল আপনি অসুস্থ। আমি আপনাকে প্রাণদিয়ে ভালবাসি। তাই, শুনে ছুটে এলাম। আপনাকে যদি একটু আনন্দ দিতে পারি।

—প্রীত হলাম, নাচ দেখাতে পার।

পথের রাণাদিল আমি, বহুদিন পরে নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে উন্মত্ত হলাম, কল্পনা করি, এই হারেমের অস্তিত্ব নেই। এই আড়ম্বর সব মিথ্যে। এটি প্রশস্ত পথ আমার চারিদিকে ঘামে ভেজা মানুষের ভীড়। এই ভীড়ে আবদুল্লা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কতক্ষণ নেচে চলি, কতক্ষণ গাই খেয়াল থাকে না। মাঝে মাঝে কানের ভেতরে জনতার বাহবা ধ্বনি প্রবেশ করে।

শেষে এক সময় নাচ থামাই। খেয়াল হয় দুর্জয় আগ্রা-কিল্লার হারেমের এক বিরাম-খানায় এতক্ষণ নৃত্য করছিলাম।

বিস্ময়-মাখা নয়নে নাদিরা বেগম আহ্বান করেন—কাছে এসো নর্তকী।

তিনি আমার চিবুক ধরে বলেন,—তুমি এক অসাধারণ শিল্পী,—আমি মুগ্ধ। কী চাও?

—যা চাই দেবেন বেগম-সাহেবা?

—নিশ্চয়।

—আপনার বিশ্বাস আর ভালবাসা।

নাদিরা বেগম স্মিত হেসে বলেন,—তাই দিলাম। তোমাকে দিতে একবিন্দু আপত্তি নেই। শিল্পীকে সব দেওয়া যায়।

—আমি ধন্য।

—এবারে কী উপহার চাও বল।

—কিছু না। আর কিছু চাই না। সব পেয়েছি।

—সেকি। নর্তকী হয়ে উপহার চাও না? কী নাম যেন তোমার?

এবারে আমার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নাদিরা বেগমের দুই পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে বলি,—রাণাদিল্।

—রা—না—দি—ল্?

—হ্যাঁ। আমায় ভালবাসুন বেগম সাহেবা। আমি নর্তকী। আর কিছু নই। আমায় বিশ্বাস করুন।

নাদিরা বেগমের ওপর হারেমের যুগ যুগের অতৃপ্ত আস্বাদের এতটুকুও প্রভাব নেই। তিনি সরল সহজ স্নেহময়, তাই আমাকে আপন করে নিতে তাঁর এতটুকু বিলম্ব হল না।

হারেমের ভেতরে ছোট একটি দল রয়েছে, যারা কাজ হচ্ছে দারার সম্পর্কে নানান মন্তব্য চালু করা। এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে দারার চরিত্র —হনন, দলটির নেত্রী রোশেনারা। সে আওরাঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থক।

একটি মন্তব্য বেশ চালু হয়ে গেল দেখলাম, যে দারা হচ্ছে শাহানশাহের চীন দেশ থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য চারা গাছ। ঝড় জল আর দমকা হাওয়া থেকে তাকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন শাহজাহান। একটু অযত্ন হলেই শুকিয়ে যাবে।

মনটা গুমরে ওঠে এ কথা শুনে। নাদিরা বেগমকে বলতে, তিনি বললেন,—অমন আরও শুনবে রাণাদিল্। কান দিও না। তবে ওদের রটনার মধ্যে একটিকে সত্যি বলে জেন।

—কোনটি।

—দারা এত জ্ঞানী হয়েও ভাবে তার চেয়ে বুদ্ধিমান পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

—আপনি এ কথা বলছেন।

—না বলে উপায় নেই রাণাদিল্, প্রমাণ আছে, আরও একটি সাংঘাতিক দোষ আছে তাঁর। ফকির কিংবা জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ-গননাকে নির্বিচারে বিশ্বাস করে। সে নিজেও মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, ফকির সাহেবদের মত। আমার প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর এই উপসর্গ শুরু হয়েছে।

—ওইসব গননা সত্যি হয়?

—দু একটা সত্যি হয়ে যায় হয়ত। কিন্তু তাতে এসে যায় না। সম্প্রতি ওকে রোশেনারার দল আবার কাফের বলতে শুরু করেছে। অনেকে বিশ্বাসও করতে আরম্ভ করেছে।

—উনি কাফের? কেন একথা বলে ওরা?

—হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করেছে বলে। কাশীতে গিয়ে এই কাজ করেছে। ও বলে, সব ধর্মের মধ্যেই ভাল জিনিষ আছে। জেনে নিতে ক্ষতি কি? কিন্তু সবাই ওর মত উদার নয়। আওরঙ্গজেব সহ্য করতে পারে না তাই।

আমার চিন্তা গভীর হয়।

নাদিরা বেগম সহসা আমার কাছে এসে হেসে বলেন,—তুমি তো এবারে কান্দাহারে যাচ্ছ দারার সঙ্গে।

—কান্দাহার? কেন?

—পারস্যের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে আওরঙ্গজেব হেরে গিয়েছে। তাই দারা যাচ্ছে।

—ও। কিন্তু আমি কেন? আপনি?

নাদিরা তার উদরের উপর হাত রেখে বলে—আমি তো যেতে পারছি না।

তা বটে। নাদিরা বেগম গর্ভবতী।

—তোমাকে দারার ওপর নজর রাখতে হবে, যাতে সাধু কিংবা ফকিরদের ওপর বেশী নির্ভরশীল না হয়।

—আমি কি পারব?

—তোমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবু চেষ্টা করতে হবে।

—বেশ। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।

যুদ্ধ অভিযানে সংগিনী হওয়ার কথা কল্পনাও করিনি জীবনে। আজ আমি তাই। দারার সংগিনী। শুধু দারা আর আমি। কী আনন্দ। নাদিরা বেগমের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছি। দারা কিছুদিনের জন্যে একা আমার।

ভাবি, যতই উদার হোক নারী, তার মনের ভেতরে অনাদি কাল থেকে ঈশ্বর যে বীজ বপন করে দিয়েছেন, তাকে উৎপাটিত করা যায় না। তাই নাদিরার কৃপায় দারার সংগিনী হয়েও, নাদিরা কাছে নেই বলে মন আনন্দে উজ্জ্বল।

চারিদিকে শুধু নতুনত্ব। অচেনা পথ, অচেনা পর্বত, অচেনা গিরিবর্ত্ম, সরোবর। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখি। পাশে দারা। তার একটি হাত আমার কাঁধের উপর রক্ষিত।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলি,—যুদ্ধ—অভিযানের সময় অধিনায়কের মুখে এমনি হাসি খুশী থাকে বাদশাহজাদা।

দারা উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে। বলে,—কেন য়াণাদিল, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—খুব। কিন্তু এই যুদ্ধ—অতবড় দায়িত্ব।

—যুদ্ধে আমরা জয়ী।

—আগেই বুঝে ফেলেছ?

—হাঁ।

বুঝলাম ফকিরসাহেবদের গণনার ফল বলছে দারা। বলি,—তোমার কত জ্ঞান। কত কিতাব পড়েছ। সেইসব পড়েই বুঝি বোঝা যায় যুদ্ধের ফল কি হবে?

—না য়াণাদিল। পৃথিবীতে অনেক অলৌকিক ব্যাপার আছে।

—সত্যি? আচ্ছা আজ সন্ধ্যার পর আমরা যেখানে শিবির ফেলব সেখানে কি দেখব বলতে পার?

দারা আবার হেসে উঠে বলে,—এখুনি বলে দিতে পারি। ও পথ তো চেনা। কতবার গিয়েছি—এসেছি। কোথায় শিবির স্থাপিত হবে আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে।

লজ্জা পাই। এ-পথ আমার কাছে নতুন এবং রোমাঞ্চকর। কিন্তু মুঘল বাহিনী ও সেনাধ্যক্ষদের কাছে বোধহয় এর সব প্রতিটি গাছ-পালাও অতি পরিচিত।

—লজ্জার কিছু নেই য়াণাদিল। তবু অনেক অজানা কথাও আমি বলে দিতে পারি।

—কি রকম?

—যেমন ধর, কান্দাহারে মাত্র সাতদিন আমরা থাকব।

—কেন?

—যুদ্ধ হবে না বলতে গেলে। কারণ পারস্যের শাহ জীবিত নেই।

—সে কি? খবর পেয়েছ?

—না। বললাম তো, খবর না পেয়েও বলা যায়। এ সবের জন্য রয়েছেন আখবার—ই—দুয়াত। অনেক মোল্লা আমার সঙ্গে আছেন। আর রয়েছেন হিন্দু জ্যোতিষী ইন্দরজিৎ।

মনে মনে ভাবি, সর্বনাশ। জ্যোতিষ নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছেন বাদশাহজাদা দারাশুকো? নাদিরা বেগমের আশংকা মোটেই অমূলক নয় দেখছি।

দারার বুকে মাথা রেখে বলি,—আচ্ছা, বলতে পারো, আজ যেখানে শিবির ফেলা হবে সেখানে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে কিনা?

—নিশ্চয় পারবো। দুপুরের বিশ্রামের সময় আমি ওঁকে দেখতে বলবো।

দারা শকট থেকে নেমে যায় একটু পরে। সে আবার আসবে। মাঝে মাঝে সে অশ্বারূঢ় হয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে আসে।

আমার শকটের চালক সব সময় দেখি মাথায় এবং মুখে কাপড় জড়িয়ে রাখে। গতকাল লক্ষ্য করেছিলাম সন্ধ্যার পর সে মুখের কাপড় খুলে ফেলে। কেন বলতে পারি না। হয়ত তার ওষ্ঠদ্বয় নেই—দাঁত বার হয়ে থাকে। নিজের কুৎসিত রূপ দেখাতে চায় না। কিন্তু এমন হলে দারাশুকোর বেগমের চালক হিসাবে তাকে কি নির্বাচিত করা হতো? বোধ হয় না। সম্ভবত সে সূর্যের উত্তাপ সহ্য করতে পারে না কিংবা ধুলো থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

দারা ফিরে আসে বেশ কিছুক্ষণ পরে এবং হাসতে হাসতে। এসে বলে,—তোমার প্রশ্নের জবাব মিলেছে রাণাদিল।

—কোন প্রশ্ন?

—আজ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে কি না। ওঁরা সবাই বললেন কিছুই ঘটবে না।

—বাঁচলাম। আচ্ছা তোমার সংগে এত কামান নিয়েছো কেন? পারস্যের শাহ তো মৃত।

—ওগুলো নিতে হয়। মুঘল-অভিযানের শোভা। নাম জানো ওগুলোর?

—না।

—পারস্যের শাহ আব্বাস এসবের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। এই যে দেখছো হাতীর মতো কামানটা ওটার নাম কিল্লা-কুস। ছেচল্লিশ সের ওজনের গোলা ছুঁড়তে পারে।

—সর্বনাশ।

—ওটার পাশেই ফত-মুবারক। পঁয়তাল্লিশ সের ওজনের গোলা ছুঁড়তে পারে। ওদিকের ঐ যে দেখছ অশ্বত্থ গাছের কাছে? ওটার নাম তোপ-ই-দারাশুকো।

—তাই নাকি? আমার গর্ব হচ্ছে কিন্তু।

—হওয়ারই কথা। ওর পাশেরটি গড়-জয়ন।

সন্ধ্যায় আমার শকটের চালককে চিনে ফেলি। অন্ধকারের মধ্যে মুখের কাপড় খুলে ফেলে শকটের দড়ি জড়ো করছিল। ভেবেছিল কেউ দেখবে না। আমি দেখে ফেললাম। পাশে কেউ ছিল না।

—ডাকি—আবদুল্লা।

চমকে ওঠে চালক। কথা বলে না।

—বলি,—এখানেও তুমি?

—হাঁ বেগমসাহেবা।

—চুপ কর। তোমার মুখে ও ডাক শোভা পায় না। নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। কিন্তু এখানে কেন এলে?

—তোমার জন্যে রাণাদিল্। তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো? যদি কখন আবার পথে নেমে গান গাও। যদি কখন দারাশুকো তোমার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে হারেম থেকে তাড়িয়ে দেন।

হেসে ফেলি, বলি,—তুমি দেখছি মনে মনে আমার সর্বনাশ কামনা করে চলেছ বেশ।

আবদুল্লার মুখেও প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটে ওঠে।

আমি আবদুল্লাকে পর্দার পাশে ডেকে তাড়াতাড়ি ফকির সাহেবদের ভবিষ্যৎ—বাণীর কথা বলি।

তাকে অনুরোধ করি—তুমি একটা ঘটনা ঘটিয়ে নিতে পার আবদুল্লা?

—পারি বৈকি।

আমি নিজেও অনুভব করি, সে পারে, বলি —কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে পারবে না। তোমার গায়ে কোন আঁচড় যেন না লাগে।

সেই সময় দারা শুকোকে আসতে দেখে আবদুল্লা কাজে ব্যাপৃত হয়। আমি হাত দিয়ে তুলে ধরা পর্দা ছেড়ে দি।

গভীর রাতে সহসা হৈ হল্লায় দারার ঘুম ভেঙে যায়। আমি জেগেই ছিলাম আবদুল্লার কীর্তির অপেক্ষায়।

দারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলে,—রাণাদিল উঠে পড়। আগুন—আগুন লেগেছে।

—কেন অমন করছ। শুয়ে পড়।

—তুমি ঘুমের মধ্যে কথা বলছ রাণাদিল। ওঠো আগুন লেগেছে।

—লাগতেই পারে না। কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে না। ফকির সাহেবরা বলেছেন। শুয়ে পড়।

দারার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় আমার কথা শুনে।

আগুন লেগেছিল ফকির সাহেবদের শকট গুলোতে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অশ্ব ও বলদের দড়ি কেটে দিয়েছে কে, তারা ছুটে পালিয়েছে আগুনের ভয়ে।

আবদুল্লা সত্যিই অসাধারণ। একা একা বসে হাসি সামলাতে পারি না।

কান্দাহারের তৃতীয় অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ আমি তোমাদের দেবো না। কিংবা সেই অভিযানে তখতেতাউসের ভাবী উত্তরাধীকারীর নির্জন সংগে কতটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল সে কথাও বলব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে যুদ্ধ নায়ক যুক্তি, বাস্তব বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সিপাহসালার নির্বাচন ইত্যাদি সব কিছুতেই ব্যর্থতা দেখান, তিনি ব্যক্তি হিসাবে যত মহৎ-ই হোন না কেন, তাঁর সংগে বিপদ সংকুল শিবিরে থাকার মত বিড়ম্বণা আর নেই। আবদুল্লা প্রতিটি ক্ষেত্রে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দারার ভুল গুলো আর কপাল চাপড়ে আফসোষ করেছি।

ফিরে এসে বাঁচলাম। নাদিরার জিনিস নাদিরাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তোমরা ভাবছ, জিনিষটি একলা নাদিরার কিনা। আমার যদি হয় চার আনা, তবে তার বারো আনা।

কেন?

এই কেনর উত্তর নেই। উত্তর পেতে হলে আমার বুকের মাঝখানে ঠিক এইখানে কান পাতো। শুনতে পাও কিছু? শূন্য কলসের মত ফাঁপা আওয়াজ? হ্যাঁ। নাদিরার বুকে এখন শব্দ পাবে না। সে পরিপূর্ণ। অথচ রাতের পর রাত দারার সংগে কাটিয়েও আমার কোল ভরে উঠল না। দারা হয়ত নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে না আমার বেলায়, তাঁর বিবেক বোধহয় বাধা দেয়। নর্তকীর সন্তান তখতেতাউসের জন্যে রক্তপাত ঘটাবে? কিন্তু একটি কন্যা? সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতাও কি আমার নেই?

কান্দাহারের ব্যর্থতার পর সব কিছুতেই যেন ধস নেমেছে। ধস নেমেছে শাহানশাহের শাসনের শৃংখলায়, ধস নেমেছে সিপাহী আর সেনানায়কদের আত্মবিশ্বাসের মূলে, আর ধস নেমেছে আমার মনে।

এদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে রোশেনারার গোষ্ঠী। তারা এখন অনেক সময় প্রকাশ্যেই কান্দাহার-অভিযান নিয়ে আলোচনা করে। দারা সম্বন্ধে নানান আজগুবি গল্প ছড়ায়, আমি ও বাদ যাই না। অথচ কিছু বলতে পারি না। সবচেয়ে বিস্মিত হই জাহানারার ধমকেও রোশেনারাকে শান্ত হতে না দেখে।

এই সময় মতলব খাঁ একদিন আমার দর্শন-প্রার্থী হয়ে এল।—বেগম সাহেবা।

—না। বাহিণ।

আবেগে মতলব থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে বোধহয় কল্পনা করেনি, আমি তাকে এখনোও ভাই বলে স্বীকার করি—এতদিনের বেগমগিরির পরেও।

—বাহিণ আবদুল্লা বলে কাউকে চেন?

উৎসুক হয়ে বলি,—হ্যাঁ। কেন?

—সে তোমার সংগে দেখা করতে চায়।

—কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

—নিশ্চয়ই হবে। মতলব থাকতে ভেবো না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যমুনার তীরে নিয়ে যাব।

সেখানে ইবাদতখানা রয়েছে বহু পুরোনো। তুমি সেখানে যেতে চাইবে।

কারও সন্দেহ হল না এতে। আমি আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করলাম।

আবদুল্লা যে কথা বলল, তাতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ওমরাহ, রাজা উজির এবং নবাবরা অধিকাংশেই নাকি দারার প্রতি বিরূপ, আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে থাকলেও, তার প্রতি সবার শ্রদ্ধা।

—একজনও কি দারাকে ভালবাসে না আবদুল্লা? তার মনকি কেউ চিনতে পারল না?

হ্যাঁ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে ভালবাসে। তাঁকে ভালবাসে সারা হিন্দুস্থানের সাধারণ লোকে। কিন্তু তখতেতাউস রাখতে হলে এদের ভালবাসার মূল্য কানাকড়িও নয়।

—উপায়?

উপায় জানি না। তবে মতলবের মাধ্যম তোমার কাছে আমি সারা দেশের সংবাদ পাঠাবো। তুমি চেষ্টা করে দেখ দারাশুকোকে সময় মত বোঝাতে পারো কিনা। আমি যে-সংবাদ দেব, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াতে পারো কিনা।

জানি না পারবো কিনা। জান আবদুল্লা, ওর ভেতরেও সুপ্ত তৈমুর রয়েছে। কিন্তু সেই তৈমুর জেদী আর উন্মত্ত তৈমুর। জেগে ওঠে মাঝে মধ্যে। যোদ্ধা তৈমুর লঙ আর নিষ্ঠুর তৈমুর লঙ কখনো জাগেনি।

দারাশুকোর এই অবস্থার জন্যে শাহানশাহ নিজেই সবচেয়ে বেশী দায়ী।

—কেন আবদুল্লা?

—তাঁর পুত্র সোলেমানশুকো এখন কাবুলের শাসনকর্তা। তাই সে এখন বারোহাজারীর পদমর্যাদা ভোগ করছে। সিপার পেয়েছে আট হাজারীর পদমর্যাদা। অথচ দেখ সুজা, আওরঙ্গজেব আর মুরাদের বড় ছেলেদের দশা। তারা সবাই মিলেও সিপারের ধারে—কাছে যেতে পারে না। এতে কি শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি?

—ঠিকই বলেছ আবদুল্লা।

—আমি চলি রাণাদিল্। আর দেখা করব না। কিন্তু শত্রুর গতিবিধির খবর সব সময় জানিয়ে যাব। আমার একটি বড় দল রয়েছে। আমরা দারার হিতৈষী। হয়ত এতে মুক্তি নেই। তবু--

আবদুল্লা, আমার নাচ না দেখতে পেয়ে গান শুনতে না পেয়ে তোমার বড় কষ্ট—তাই না?

হ্যাঁ রাণাদিল।

সুযোগ পেলে তোমায় শোনাব। নিশ্চয়ই শোনাব। কিন্তু বয়স যে বেড়ে যাচ্ছে। পারবো তো?

পারবে। আগের মত অতটা না পারলেও, অল্প সময়ের জন্যে পারবে। অভ্যাস করে নিলে বেশীক্ষণও পারতে পার।

—আমি কথা দিলাম আবদুল্লা।

কিন্তু আমার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। ফকির সাহেবদের ভবিষ্যৎ বাণী দারার কাছে ঈশ্বরের বাণীর মতই অমোঘ। তার মনে এ সম্বন্ধে কোন রকম ফাটল ধরানো গেল না।

ফলে, যা হবার তাই হল। নাদিরাকে নিয়ে দারা আগ্রা ছাড়লে। আমি থেকে গেলাম অন্যান্য আরও সব বেগমদের সঙ্গে। তাদের কেউ কেউ নয়া বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠল।

শেষে আওরঙ্গজেব আগ্রার দরওয়াজায় এসে আঘাত হানল।

আমি লিখতে জানি না। মুঘল বংশেতো আমার জন্ম নয়। জন্ম হলে কিছুটা লিখতে পারতাম, বংশপরম্পরায় এরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে চেষ্টা করলেই লিখতে পারে।

যা ঘটেছে তোমরা সবাই জান। তাই বলে আমি কীভাবে হারেম ছেড়ে গোপনে আবদুল্লার

আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হলাম সে কথা বলার কি প্রয়োজন আছে? না নেই। কারণ আমার বংশ পরিচয় নেই। ইতিহাসে আমার স্থান নেই।

তবে আবদুল্লার আশ্রয়ে যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম তাই বলি।

রাতে হুমায়ুনের সমাধির স্বপ্ন দেখলাম। একা প্রবেশ করলাম সেই সমাধিতে। অদূরে শেষ শয্যায় শায়িত হুমায়ুনের প্রস্তর নির্মিত বেদী। মনে হল, খুব পরিচিত স্থান। অদেখা নয়—অচেনা নয় মোটে।

একপা একপা করে এগিয়ে গেলাম, সহসা মন দ্বিধায় ভরে উঠল। কেন যাব হুমায়ুন শাহের কাছে? দারার মত তিনিও বিতাড়িত হয়েছিলেন বলে? তাঁর মত দারাও হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাক, এই প্রার্থনা জানাতে?

হয়তো তাই, মনে মনে ভাবলাম, এরচেয়ে লাহোরে গিয়ে মৈন মীরের সমাধির পাশে বসে প্রার্থনা করব। তাই ভাল।

ফিরে আসছিলাম। সেই সময় তার ডাকে সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল।

—রাণাদিল।

একি? এখানে সে কী করে আসবে? এই ডাক বহুদিন আগে যমুনার ঢেউ-এ নৃত্যশীল বজরার মধ্যে শুনেছিলাম।

থেমে পড়ি। চারদিকে ভালভাবে চাই। কেউ নেই কোথাও। আমার মনের ভুল? নিশ্চয়ই তাই। এখানে দারা আসবে কি করে? দাদার কিল্লা থেকে বিদায় নিয়ে এতক্ষণে সে কোন গিরিপথ ধরে পারস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

চলতে শুরু করি।

—বেওনা রাণাদিল।

চিৎকার করে কেঁদে উঠি। কোথায় তুমি? কোথা থেকে কথা বলছ? দেখা দাও। আমি আর পারি না।

স্তব্ধ সমাধি স্থান। জবাব পাই না দারার।

দারা তুমি কি আছ এখানে? এই সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছ? নাদিরা বেগম কোথায়? বল। কোন ভয় নেই। আমি একা। দারা—

আমার রোদন-ভরা কণ্ঠস্বর সমাধি সৌধের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে মাথা কুটে মরতে থাকে।

আমি নিশ্চয়ই সুস্থ নই। আমার মাথা খারাপ হয়েছে। তাই দারার স্বর ভেসে আসছে আমার কানে। আমি পালাই।

—রাণাদিল, তুমিও ছেড়ে যাচ্ছ? নাদিরা নেই। সে মৈন মীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

লুটিয়ে পড়ি।

সেই সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়। চেয়ে দেখি আবদুল্লা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে রেখেছে।

—আবদুল্লা।

—তুমি কাঁদছিলে রাণাদিল। বোধহয় ঘুমের ঘোরে।

—আবদুল্লা, ওর কেউ বেঁচে নেই।

—তেমন খবর এখনো পাইনি।

—আমি জানি—আমি জানি আবদুল্লা। আমায় হুমায়ুনের সমাধিতে নিয়ে চল।

নীরব আবদুল্লা। কী-ই বা বলবে?

খবর আরও বেশ কয়েকদিন আসে না। তারপর একদিন আবদুল্লার সব সঙ্গী একে একে ফিরে এল।

তোমরা সবাই জান কী ঘটেছিল। সে কথা বলে তোমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করতে চাই না।

দারার কথা স্বতন্ত্র। সে বীর। কিন্তু নাদিরার কথা ভাব। বেচারা দাদারে পৌঁছোবার আগেই ইহলোক ছেড়ে গেল। তার দেহাবশেষ লাহোরের মৈন মীরের সমাধির পাশে স্থান পেয়েছে এই যথেষ্ট।

দারাকে তোমরা চেন না। কত বড় জ্ঞানী ছিল সে। অথচ মনটি শিশুর মত। জেদ ও ছিল শিশুর মত। তখ্‌তে তাউসে বসার মত কুটিল মন নিয়ে সে জন্মায়নি।

আজ তোমাদের সংগে গোপনে চলেছি হুমায়ুনের সমাধিতে। আমার স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। হুমায়ুনের সমাধি আমার কাছে তীর্থ স্থান।

ওকি! তোমরা ও ভাবে চেয়ে রয়েছ কেন আমার দিকে? নায়ী হয়ে সমবেদনা জানাতে চাও? আবদুল্লার পরিচিত তোমরা সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পাগল হয়নি। পাগল হলে সমাধিতে পৌঁছতে পারতো না।

হিন্দুস্থানে রটেছে দারা কাফের। কিন্তু তোমরা জান কি দারার শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন্ কথা উচ্চারণ করেছিল? ভূতলে পড়েই বলে উঠল কালিমা—ই—সাহাদাত।

দারার শির হুমায়ুনের সমাধির পাশে অবহেলিত অবস্থায় প্রোথিত রয়েছে। তাই আমি যাচ্ছি। আমার পাগল হলে চলবে না—মরলেও চলবে না। ওই মুখে কত সোহাগের বাণী উচ্চারণ করত সে। কত মিষ্টি কথা।

তোমরা ওভাবে আবার চাইছ? আমার হাসি পাচ্ছে। আমি ইচ্ছে করলে সত্যিই হাসতে পারি। দেখবে? না থাক।

এই তো সেই জিনিষ। আবদুল্লা এনে দিয়েছে। যত্নের ধনের মত সব সময়ে সংগে রাখি। তাই আমি হাসতে পারি।

এটা বিষবড়ি।

With best compliments from :

NEW CENTRAL JUTE MILLS COMPANY LIMITED

Factory : BUDGE BUDGE, 24-PARGANAS

Regd. Office : 21, CLIVE ROW,
CALCUTTA-70000!

Producers of :

CARPET BACKING, JUTE MATTING, JUTE YARN ETC.

প্রফুল্ল রায়

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এই কারাভেল প্লেনটা বম্বে থেকে সোজা কলকাতায় যায় না। মাঝখানে আধঘণ্টার জন্য নাগপুরে থেমে কিছু যাত্রী নামিয়ে কিছু কুড়িয়ে আবার আকাশে ওড়ে। এর পর আর থামাথামি নেই এবার তার একমাত্র ঠিকানা ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট।

বম্বে থেকে সকাল সাতটায় প্লেনটা ছেড়েছিল। এক ঘণ্টা বাদে এইমাত্র সেটা নাগপুরে ল্যান্ড করল। এখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

প্লেনটার মাঝামাঝি জায়গায় জানালার ধার ঘেঁষে বসে ছিল সমরেশ। বাইরে সকালবেলার উজ্জ্বল রোদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অল্প দূরে হলুদ রঙের এয়ার পোর্ট বিল্ডিং-এর লাউঞ্জে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবকে হয় সী-অফ নইলে রিসিভ করতে এসেছে।

নাগপুর ছুঁয়ে বম্বে-ক্যালকাটার ফ্লাইটটায় তেমন ভিড় থাকে না। কলকাতায় যাত্রীরা ডাইরেক্ট ফ্লাইট অর্থাৎ বম্বে থেকে যে প্লেনগুলো সোজা কলকাতায় উড়ে যায় সেগুলো বেশি পছন্দ করে। সমরেশ যদিও বম্বে থেকে কলকাতাতেই ফিরছে তবু এই ভায়া নাগপুর ফ্লাইটটাই বেছে নিয়েছে। তার খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই ধীরে সুস্থে কলকাতা পৌঁছুতে পারলেই হল।

যাই হোক, তাদের প্লেনটা নাগপুরে নামতেই এয়ারপোর্টের কুলীরা সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল। এই ফ্লাইটটায় এখানকার যাত্রীই থাকে বেশি সিঁড়ি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে তারা নেমে গেছে। এমন কি যে দু-চারজন কলকাতায় যাবে তারাও নেমে পড়েছে। আধঘণ্টার মতো প্লেনটা এখানকার রানওয়েতে ডানা মেলে পড়ে থাকবে। কে আর এতটা সময় প্লেনের পেটের ভেতর চুপচাপ বসে থাকতে চায়। তাই ওরা দলবেঁধে একটু ঘুরে আসতে গেছে।

সমরেশ কিন্তু নড়েনি জানালার কাচের বাইরে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে বসেই ছিল। তার বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। চওড়া চওড়া হাড়ের ওপর শক্ত মজবুত চেহারা, লম্বাটে মুখ, মাঝারি চোখ, গায়ের রঙ তামাটে। সমরেশের চোখের নিচে, ঘাড়ে, গলায় এবং পেটে চর্বির থাক জমেছে। এসব অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ লাউড-স্পীকারে এয়ার হোস্টেসের ঘোষণা শোনা গেল। বোঝা গেল একটু পরেই প্লেনটা কলকাতার দিকে উড়বে।

ইতিমধ্যে যারা রানওয়েতে নেমে গিয়েছিল

তারা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে তাদের সঙ্গে দু-চারজন নতুন প্যাসেঞ্জারও।

সমরেশ জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে ভেতরে তাকাল। অন্যমনস্কর মতো এদিক সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তার দৃষ্টিটা ওধারের সীটে থমকে গেল।

সমরেশ যেদিকে বসে আছে সেখানে পর পর তিনটে সীট। তারপর যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য প্যাসেজ। প্যাসেজের ওধারে আবার তিনটে সীট। সেই সীট তিনটেয় তিন চার বছরের একটি বাচ্চা, সমরেশের সমবয়সী একটি সুপুরুষ চেহারার ভদ্রলোক আর ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের একটি মহিলা বসে আছেন। মনে হল ওরা স্বামী-স্ত্রী এবং বাচ্চাটি ওদের ছেলে।

ভদ্রলোকটি জানালার পাশের সীটে বসে আছেন, মহিলা মাঝখানের সীটে আর এদিকে প্যাসেজের ধারে সীটটায় তাদের বাচ্চাটা। মহিলা স্বামীর দিকে ফিরে গল্প করছিলেন ; তাই তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ভদ্রলোক অল্প অল্প হাসছেন, হয়ত স্ত্রীর কোন মজার কথায়। বাচ্চাটা ভীষণ ছটফটে। বার বার সীট থেকে নেমে পড়ছে, তক্ষুনি আবার উঠছে। সামনের সীটের ব্যাকে খবরের কাগজ টাগজ থাকে ; সেসব টানাটানি করছে। সব মিলিয়ে বেশ সুখী পরিবার। সুখের কথা তো চিৎকার করে বলে দিতে হয় না। সেটা যারা সুখী তাদের চোখেমুখে কথার বার্তায় চলায় ফেরায় লাবণ্যের মতো লেগে থাকে যেমনটা ওদের রয়েছে।

বম্বে থেকে সমরেশ যখন প্লেনে উঠেছিল এদের দেখা যায় নি। ওধারের সীটগুলো ফাঁকাই পড়েছিল। তার মানে ওরা এই নাগপুর থেকে উঠেছে।

এবার হোস্টেসের গলা আবার শোনা গেল। সে জানাচ্ছে, এখনই প্লেনটা আকাশে উড়বে ; টেক-অফের আগে যাত্রীরা যেন যে যার কোমরে বেল্ট বেঁধে নেয়।

ছেলের কোমরে বেল্ট বাঁধার জন্য মহিলা ব্যস্তভাবে এদিকে ফিরলেন আর তখনই সমরেশ তাঁকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু খেলে গেল।

কতকাল—কতকাল পর অঞ্জনাকে দেখল সমরেশ? স্পষ্ট মনে আছে—পুরো আট বছর।

আটটা বছর খুব কম সময় নয়। তবু দেখামাত্রই অঞ্জনাকে চিনতে পেরেছে সমরেশ। পানপাতার মতো মুখ, মসৃণ গলা, ডান গালের নিচের দিকে মুসুর ডালের মতো লালচে জড়ুলটা, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে থাক থাক চুল—সব তেমনই আছে। শুধু আরেকটু মোটা হয়েছে সে। গায়ের রঙ এমনিতেই পাকা গমের মতো ; রঙটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। এ সবই অঢেল সুখ আর পরিতৃপ্তির লক্ষণ।

অঞ্জনা সমরেশকে দেখতে পায় নি, ছেলের বেল্টটা বেঁধে দিয়ে আবার স্বামীর দিকে ফিরে গল্প জুড়ে দিল। এদিকে প্লেনটা প্রকাণ্ড বাজপাখির মতো রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় আকাশে উঠে এল। সমরেশের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সময়ের অনেকগুলো স্তর ঠেলে কয়েক বছর পেছনে ফিরে গেল সে।

বছর এগারো অর্থাৎ প্রায় এক যুগ আগে অঞ্জনাকে বিয়ে করেছিল সমরেশ। ভালোবাসার বিয়ে নয় ; মা-বাবা দেখেশুনে আনুষ্ঠানিকভাবে অঞ্জনাকে বধূবরণ করে ঘরে তুলেছিলেন।

বিয়েটা কিন্তু তিন বছরের বেশি টিকল না। তার কারণ সমরেশ নিজে আর তার প্রচণ্ড ঢাকাঙ্ক্ষা।

সমরেশ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ; ইচ্ছা করলে মোটামুটি একটা ভালো চাকরি যোগাড় করতে পারত সে। কিন্তু চাকরিতে কটা পয়সা আর পাওয়া যায়! ঘষতে ঘষতে রিটায়ারমেন্টের আগে হয়ত মাইনেটা তিন চার হাজারে উঠবে। কিন্তু এতে খুশী না সমরেশ। তার অনেক অজস্র টাকা চাই।

চাকরি না নিয়ে ছোটখাটো একটা ফ্যাক্টরী খুলেছিল সমরেশ। সেখানে মেসিন পার্টস তৈরি হত। বিয়ের সময় কারখানাটা এতই ছোট ছিল যে তাকে নিয়ে সেখানে ওয়ার্কারের সংখ্যা তখন মোটে পাঁচ।

নতুন কারখানা ; ভালো চলত না। বাজারে গুডউইল তৈরি না হলে কে আর অর্ডার দেবে। সমরেশ অর্ডারের জন্য দিনরাত চারদিক চষে বেড়াত কিন্তু লোকের কাছ থেকে মৌখিক সহানুভূতি পাওয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না।

মনে আছে একদিন দুপুরে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা অফিসে দেখা করার কথা ছিল। ওরা বাইরে কিছু মালপত্রের অর্ডার দেবে। যদি অর্ডারটা পাওয়া যায়, এই আশায় যাওয়া আর কি।

বাড়ি থেকে সমরেশ বেরুতে যাবে, মা এসে বললেন, 'বউমাকে ওর কাকার বাড়িতে একটু দিয়ে যা ; বার বার ওরা খবর দিচ্ছেন।'

অঞ্জনার এক কাকা তখন পার্ক সার্কাসে থাকতেন। সমরেশ বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো একটা কাজে বেরুচ্ছি।'

'সঙ্গে করে নিয়ে যা ; কাজটা সেরে পৌঁছে দিস।'

খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, তবু অঞ্জনাকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে নিতে হল। ক্যামাক স্ট্রীট থেকে পার্ক সার্কাস কতই বা দূর! মা যা বলেছেন সেটাই সুবিধাজনক। ক্যামাক স্ট্রীটের অফিসে গিয়ে রিসেপসানের কাছে ভিজিটরদের জন্য যে ফোমের চেয়ারগুলো রয়েছে সেখানে অঞ্জনাকে বসতে বলবে সমরেশ ; তারপর কাজকর্ম চুকিয়ে সোজা পার্ক সার্কাস।

সেই অফিসটায় এসে রিসেপসানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে অফিসারটিকে সমরেশ চায় তিনি লাঞ্চে বেরিয়ে গেছেন ; ঘণ্টাখানেকের আগে ফিরবেন না। অগত্যা সমরেশ অঞ্জনাকে নিয়ে অপেক্ষা করেছিল।

পুরো একটি ঘণ্টা বাদে অফিসারটি—নাম মনে নেই, পদবী মালহোত্রা—ফিরে এসেছিলেন। মালহোত্রার সঙ্গে পরিচয়টা ছিল। কেননা আগেও অনেকবার অর্ডারের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে সমরেশ। যাই হোক রিসেপসানের কাছে তাকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন মালহোত্রা ; তার আগেই অঞ্জনার ওপর তাঁর চোখ পড়েছিল।

মালহোত্রার মতো অফিসার তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়বেন, ভাবতে পারে নি সমরেশ। সেও উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেখাদেখি অঞ্জনাও। সমরেশ বলেছিল, 'গুড আফটারনুন স্যার—'

মালহোত্রাও 'গুড আফটারনুন' জানিয়ে বলেছিলেন, 'কতক্ষণ বসে আছেন?' তিনি সমরেশের সঙ্গেই কথা বলছিলেন কিন্তু চোখদুটো ঘুরে ঘুরে অঞ্জনার দিকেই চলে যাচ্ছিল।

সমরেশ বলেছিল, 'এই খানিকক্ষণ।'

'আসুন।'

মালহোত্রা অনেকবার ঘুরিয়েছেন কিন্তু অর্ডার টর্ডার দেন নি। তাঁর কাছে এরকম সহৃদয়তা আশা করে নি সমরেশ। সে অবাকই হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বিগলিতও। অঞ্জনার দিকে ফিরে বলেছিল, 'তুমি এখানে একটু ওয়েট কর, আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

মালহোত্রা অঞ্জনাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইনি?'

সমরেশ বলেছিল, 'আমার স্ত্রী—'

'আপনি তো অদ্ভুত লোক! স্ত্রীকে এখানে বসিয়ে রেখে যেতে চাইছেন! কোন মানে হয়!' বলেই অঞ্জনার দিকে তাকিয়েছিলেন মালহোত্রা, 'আপনিও আসুন ম্যাডাম—'

নিজের চেম্বারে নিয়ে মধ্যবয়সী মালহোত্রা প্রচুর গল্প করেছিলেন, দীর্ঘকাল কলকাতায় আছেন বাংলাটা জলের মত বলতে পারেন। তাঁর গল্পের বেশির ভাগই অঞ্জনার সঙ্গে।

শুধু গল্পই করেন নি, কফি আর কাজু-

বাদামও খাইয়েছিলেন মালহোত্রা এবং যেজন্য সমরেশের বার বার এই অফিসে আসা সে সম্পর্কে একটা কথা মুখে থেকে বার করবার আগেই সেই অর্ডারটা দিয়েছিলেন।

সমরেশ বুঝতে পেরেছিল, এটা অঞ্জনার জন্যই সম্ভব হয়েছে। সে সঙ্গে না থাকলে অর্ডারটা কিছুতেই পাওয়া যেত না।

অনেকক্ষণ পর অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে সমরেশ বলেছিল, 'কনগ্র্যাচুলেশন—'

অঞ্জনা বলেছিল, 'হঠাৎ!'

'তোমার ওই বিউটিফুল মুখখানার জন্য। ওটা দেখেই তো মালহোত্রা ফ্ল্যাট হয়ে অর্ডারটা দিল।'

অঞ্জনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, 'বাজে ইয়ার্কি করবে না।'

সমরেশ আর কিছু বলেনি। তবে এটা সে ঠিক করে ফেলেছিল ওই সুন্দর মুখটাকে কাজে লাগাবে। ওটাই হবে তার অ্যাম্বিশান বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি।

মালহোত্রাকে দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর অঞ্জনাকে বুঝতে না দিয়ে একেকটা অফিসে নিয়ে যেত সমরেশ। সর্বত্র না হলেও বেশির ভাগ জায়গাতেই এতে কাজ হয়ে যেত।

প্রথম দিকে না পারলেও পরে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল অঞ্জনা। আজকালকার মেয়ে হয়েও ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ কনজারভেটিভ। বুঝে ফেলার পর সমরেশের সঙ্গে কোন অফিসে যেতে চাইত না। বলত, 'আমি কেন ওসব জায়গায় যাব। ওটা আমার কাজ নয়—তোমার।'

সমরেশ বলত, 'আমার কাজ কি তোমার নয়? প্লীজ আমাকে একটু সাহায্য কর।'

সমরেশ কখনও তার হাতে-পায়ে ধরে, কখনও নকল অভিমান দেখিয়ে, কখনও বা রাগা-রাগি করে আবার নিয়ে যেত।

এ ব্যাপারটা মা-বাবার চোখেও পড়েছিল। তাঁরাও খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঘরের বউ কেন এভাবে বাইরে বাইরে ঘুরবে? সমরেশ তাঁদের গ্রাহ্য করত না। এই নিয়ে গোটা বাড়ির আব-হাওয়া ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছিল।

এদিকে উচ্চাশার সিঁড়ি বেয়ে টকাটক ওপরে উঠতে শুরু করেছিল সমরেশ। পুরনো ফ্যাক্টরীর এক্সপ্যানসান তো হয়েছিলই; নতুন আরও দুটো ফ্যাক্টরী খুলেছিল সে। সুতরাং হুড়হুড় করে টাকাও আসছিল।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের নিয়ম অনুযায়ী নানা ব্যাপারে এবং স্বার্থের কথা ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতাওলা লোকদের পার্টি টার্টি দিতে হত সমরেশকে। অন্যের পার্টিতেও তার ইনভিটেশন আসত। তার একার না, সঙ্গে অঞ্জনারও।

অঞ্জনা পার্টিতে যাওয়া একেবারেই পছন্দ করত না। ইংরেজিতে যাকে হাউস ওয়াইফ বলে অবিকল তাই হতে চেয়েছিল সে। জীবনের উদ্দেশ্যটাই ছিল তার অন্যরকম; সমরেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পার্টিতে যাওয়ার আপত্তিকর কারণটা এই-রকম। যারা সেখানে আসত পেটে দুইস্কি পড়লেই তাদের বেশির ভাগই আর স্বাভাবিক মানুষ থাকত না। টলতে টলতে মাছির মতো তারা অঞ্জনাকে ঘিরে ধরত। গায়ে টায়ে হাত দিয়ে নানারকম অসভ্যতা করত, ড্রিঙ্ক টিঙ্ক করাতে চাইত। আর ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যেত অঞ্জনা। সমরেশকে বলত, 'এখানে আমি থাকব না; আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। লোকগুলো ভীষণ নোংরা আর ইতর।'

সমরেশ ততদিনে ড্রিঙ্কের অভ্যাস করে ফেলেছে। জড়ানো স্বরে সে বলত, 'এত পিউরি-টান কেন তুমি? আমাদের নিজেদের ইন্টারেস্টেই এসব দরকার। ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নেবার চেষ্টা কর।'

সমরেশ যত খেলাচ্ছলে পার্টি টার্টি, ড্রিঙ্ক ইত্যাদি নিয়েছিল অঞ্জনা কিছুতেই তা পেরে উঠ-ছিল না। প্রথম দিকে সে কাঁদত আর বলত, 'দয়া

করে এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও।' কিন্তু অঞ্জনাকে এসব থেকে মুক্তি দেবার কথা তখন ভাবতে পারত না সমরেশ। কেননা তার ফাইনান্সীর যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা অঞ্জনার জন্যই। তার সামনে যে উচ্চাশা সেটা সোজা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে ; হাউইয়ের মতো এ্যাম্বিশানের শেষ মাথায় না পৌঁছনো পর্যন্ত সে অঞ্জনাকে ছাড়তে পারে না।

প্রথম প্রথম ছেড়ে দেবার জন্য কান্নাকাটি করলেও পরে, ক্ষেপে উঠেছিল অঞ্জনা। তখন প্রায় গায়ের জোরেই তাকে পার্টি টার্টিতে নিয়ে যেত সমরেশ। দু জনের সম্পর্কটা খারাপ হতে হতে ক্রমশঃ বিস্ফোরণের মুখে এসে পড়েছিল।

এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একটা বড় অর্ডার ধরার জন্য বিরাট এক কোম্পানির ডাইরেক্টরের সম্মানে সমরেশ পার্টি দিয়েছিল। সেখানে ড্রিঙ্ক ছাড়াও ফ্লোর ড্যান্সের ব্যবস্থা ছিল। খানিকটা নেশা করার পর ডাইরেক্টর হয়ত বায়না ধরলেন অঞ্জনার সঙ্গে নাচবেন। অঞ্জনা বলেছিল সে নাচতে জানে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডাইরেক্টর নেশার ঘোরে একরকম জোর করেই তাকে নাচের পার্টনার করে নিয়েছিল। তারপর নাচের সময় কী হয়েছিল সমরেশ জানে না, হঠাৎ অঞ্জনার উত্তেজিত কিন্তু চিৎকারের শব্দে সবার সঙ্গে সে-ও চমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তখন উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে অঞ্জনাকে। সে চেঁচাচ্ছিল, 'অসভ্য জানোয়ার।' বলেই সেই ডাইরেক্টরের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল। ফলে পার্টিটা ভেঙে যায়। ডাইরেক্টর ভদ্রলোক গালে হাত বুলোতে বুলোতে তখনই চলে গিয়েছিলেন ; তাঁর পিছু পিছু অন্যান্য গেস্টরা।

যে কারণে এই পার্টির ব্যবস্থা চোখের সামনে তার যখন বারোটা বেজে গেল তখন আর মাথার ঠিক ছিল না সমরেশের। বাড়ি ফিরে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল সে। অশ্লীল ইতর ভাষায় সমানে গালাগাল দিয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনাও সেদিন তাকে ছেড়ে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যের মতো একটা ভারী ফ্লাওয়ার ভাস ছুঁড়ে মেরেছিল সমরেশ ; সেই আঘাতে মাথা টাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল অঞ্জনার। পুরো একটি দিন তার জ্ঞান ছিল না ; বেহুঁস হয়েছিল সে।

জ্ঞান ফেরার পরের দিনই জব্বলপুরে মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছিল অঞ্জনা। সেখান থেকে ডাইভোর্সের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল এবং বছরখানেক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পর কোর্ট থেকে পাকাপাকি বিবাহ বিচ্ছেদটা হয়েই গিয়েছিল।

তারপর কত বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে নিজের পছন্দমতো এক এয়ার হোস্টেসকে বিয়ে করেছে সমরেশ। তাকেও এ্যাম্বিশানের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। তাতে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর দিক থেকে কোন আপত্তি হয় নি। বরং খুশী হয়েই সমরেশকে সাহায্য করেছে সে।

এই দু নম্বর স্ত্রীটি অর্থাৎ রীনা স্বভাবের দিক থেকে অঞ্জনার একেবারে উল্টো। বিয়ের আগে থেকেই ড্রিঙ্কের অভ্যাস ছিল তার ; পার্টি টার্টি দারুণ পছন্দ করে সে। এ্যাম্বিশানের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করলেও রীনা ফ্যামিলি লাইফ বলে কোন বস্তুই দিতে পারে নি সমরেশকে। তাছাড়া রীনার অসংখ্য পুরুষ বন্ধু ; হুটহাট সে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ; ফেরার কোন ঠিকঠিকানা নেই। যখন ফেরে একেবারে বেহুঁস মাতাল। পারসিসিভ সোসাইটি বলে যে কথাটা আছে রীনাকে দেখলে তার পুরোপুরি আভাস পাওয়া যায়।

জীবনের চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা বছর কাটিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো আজকাল প্রায়ই অঞ্জনার কথা মনে পড়ে যায় সমরেশের। তখন সে ভাবে টাকা-পয়সা-প্রতিষ্ঠা অনেক কিছুই সে পেয়েছে, আবার হারিয়েছেও অনেক কিছুই।

এদিকে দেখা যাচ্ছে অঞ্জনাও আবার বিয়ে করেছে। নতুন স্বামী এবং ছেলে নিয়ে সে খুবই খুশী আর পরিতৃপ্ত। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে

অদ্ভুত এক ঈর্ষা ছুঁচের মুখের মতো তাকে যেন বিঁধতে লাগল।

কতক্ষন বাদে মনে নেই. হঠাৎ হাঁটুর কাছে কার নরম হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল সমরেশ। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখতে পেল সেই বাচ্চা ছেলেটা প্যাসেজ পেরিয়ে কখন যেন এধারে চলে এসেছে। গোলগাল ফুটফুটে চেহারা ছেলেটার; মাথায় রেশমের মতো চুল। অবিকল অঞ্জনার মুখটা যেন বসানো।

সমরেশের মনে পড়ে গেল টেক-অফের আগে ছেলের কোমরে বেল্ট বেঁধে দিয়েছিল অঞ্জনা। তার মানে প্লেন আকাশে ওঠার পর ওটা খুলে দিয়েছে। আর ছাড়া পেয়েই বাচ্চাটা ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে।

চোখ জুড়িয়ে দেবার মতো ছেলে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা বলল, 'বাবুই। এবার তোমার নাম বল—'

'আমার নাম নেই।'

'ও।' গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বাবুই বলল, 'আমি ওখানে বসব—' সমরেশ জানালার ধারের যে সীটটায় বসেছিল সেটা দেখিয়ে দিল সে।

সমরেশ এ পাশের সীটে সরে এসে নিজের সীটে বাবুইকে বসিয়ে দিল।

গোল কাচের জানালার বাইরে তাকিয়ে বাবুই বলল, 'এটা আকাশ—না?'

প্লেনটা প্রায় দশ পনের হাজার ফুট ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। চারদিকে সকালের মেঘশূন্য ঝকঝকে নীলাকাশ। উজ্জ্বল ঝলমলে রোদ ছাড়া কোথায়ও কিছু চোখে পড়ছে না। তবে অনেক নিচে সরু ফিতের মতো দু-একটা নদী, মাঝে মাঝে দাবার ছকের মতো খোপকাটা উপত্যকা কিংবা সমতলভূমি দেখা যাচ্ছিল। সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, এটা আকাশ।'

'আকাশ কী?'

'ও একটা জিনিস?'

'আচ্ছা তুমি হাট্টিমা পাখি দেখেছ?'

একটু হেসে সমরেশ বলল, 'দেখেছি।'

বাবুই খুশী হয়ে বলল, 'ও, দেখেছ তাহলে। তোমাদের ঘুড়ি আছে?'

আকাশ থেকে হাট্টিমা পাখি, সেখান থেকে ঘুড়ি—চোখের পলক পড়তে না পড়তেই এক বিষয় থেকে অন্যেক বিষয়ে চলে যাচ্ছে বাবুই। কি ভালো যে লাগছে ছেলেটাকে। সমরেশ বলল, 'হুঁ। অনেক—'

প্রচণ্ড উৎসাহে জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল বাবুই, হঠাৎ ওধার থেকে একটি পুরুষের গলা ভেসে এল, 'বাবুই—বাবুই—'

সমরেশ ওপাশে তাকাতেই দেখতে পেল সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ অঞ্জনার এখনকার স্বামী ছেলের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি হাসলেন, 'ছেলেটা খুব বিরক্ত করছে তো?'

'না, বিরক্ত করবে কেন? খুব ভাল ছেলে।' বলেই দ্রুত একপলক অঞ্জনাকে দেখে নিল সমরেশ। অঞ্জনা তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। খুব সম্ভব এইমাত্রই তাকে দেখেছে সে। ভয়, উৎকণ্ঠা—সব একাকার হয়ে তার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। বম্বে-ক্যালকাটা রুটের এই ফ্লাইটে সমরেশের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে—অঞ্জনা হয়ত ভাবতে পারেনি।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। নিজের ছেলেকে আমি চিনি—ভীষণ দুষ্টু।' ছেলেকে বললেন, 'চলে এসো বাবুই—'

বাবুইয়ের যাবার ইচ্ছা ছিল না। সে বলল, 'আমি দুষ্টুমি করছি না বাপি।' সমরেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'করছি?'

'একেবারেই না।' সস্নেহে বাবুইয়ের গালে

একটা টোকা দিয়ে সমরেশ ভদ্রলোককে বলল, 'এখানে থাক না।'

'বলছেন যখন,—থাক। তবে পাঁচ মিনিটেই মধ্যেই বক বক করে কানের পোকা বার করে ফেলবে।'

সমরেশ হাসল ; কিছু বলল না। তারপরেই দ্রুত আরেক বার অঞ্জনাকে দেখে নিল। আগের মতোই ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বসে আছে সে। অঞ্জনার ভয়ের কারণটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। সে হয়ত চায় না, এখনকার স্বামীর কাছে সমরেশের আসল পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বেশ আলাপী। ছেলের দৌলতে যখন যোগাযোগটা হয়েই গেছে তখন হয়ত সমরেশের সঙ্গে গল্পটল্প করার ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর। বললেন, 'কলকাতা যাচ্ছেন?'

এটা বলার জন্যই বলা। কেননা ভদ্রলোক বেশ ভাল করেই জানেন ট্রেনটা কলকাতা ছাড়া আর কোথাও যাবে না। যাই হোক, সমরেশ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ'।

'ওখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।

ভদ্রলোক এবার বললেন, 'আমার নাম ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী। অনেকদিন পর কলকাতায় যাচ্ছি—সে আফটার এ্যাবাউট সিক্স, সেভেন ইয়ার্স।'

ভদ্রলোক আলাপটা বেশ জমাতেই চাইছেন মনে হচ্ছে। নিজের নাম যখন বলেছেন তখন ভদ্রতার খাতিরে সমরেশকেও তার নাম বলতে হয়। কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল সমরেশ। অঞ্জনা কি ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ীকে তার ডাইভোর্স এবং আগেকার স্বামীর কথা বলেছে? যদি এসব গোপন করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে থাকে সে? এ সম্বন্ধে সমরেশের কোন ধারণাই নেই। যদি আগেকার বিয়ের কথা সে বলেও থাকে আচমকা স্ত্রীর প্রথম স্বামীকে মুখোমুখি দেখে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই সুখী হবে না। অঞ্জনা যদি বলেই থাকে তার নামটা হয়ত মনে করে রেখেছেন ইন্দ্রজিৎ। নিজের আসল নাম বলে অঞ্জনাকে বিপন্ন করতে ইচ্ছা হল না সমরেশের। দ্বিধাদ্বিতের মতো সে বলল, 'আমার নাম বাসুদেব সেন।' বলেই লক্ষ্য করল ভয় আর উদ্বেগের মধ্যেও অঞ্জনার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার মতো কিছু ফুটে উঠেছে।

ইন্দ্রজিৎ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সমরেশ আবার বলে উঠল, 'আপনারা কি নাগপুরেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমরা প্রবাসী বাঙালী। আমাদের দুটো জেনারেশন ওখানে কেটে গেল। তারপর কলকাতার খবর বলুন—'

'মোটামুটি ভালই।'

এরপর এলোমেলো নানা প্রসঙ্গ উঠল—পলিটিকস, আন-এমপ্লয়মেন্ট রেনডেন, প্রবাসী বাঙালীদের সমস্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভিন্ন কথার ফাঁকে হঠাৎ একবার সমরেশ বলে ফেলল, 'এতদিন পর কলকাতায় যাচ্ছেন—নিশ্চয়ই কোন কাজে?'

'আর বলবেন না মিস্টার সেন ; সব আমার স্ত্রীর জন্যে।' বলেই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে আপনাদের আলাপই করিয়ে দেওয়া হয় নি। ইনি আমার স্ত্রী অঞ্জনা।' অঞ্জনার দিকে ফিরে বললেন, আর ওঁর নাম তো শুনেইছো।'

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল সমরেশ ; আবার তলায় তলায় কিছুটা মজাও লাগছিল। কে ভাবতে পেরেছিল, অঞ্জনার সঙ্গে এভাবে নতুন করে পরিচিত হতে হবে। বিমূঢ়ের মতো দুই হাত জোড় করে সমরেশ বলল, 'নমস্কার—'

অঞ্জনার হাতদুটোও যুক্ত হয়ে যন্ত্রচালিতের মতো বুক পর্যন্ত উঠল ; সে কিছু বলল না। শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে রইল।

ইন্দ্রজিতের গলা আবার শোনা গেল, 'বুঝলেন স্যার, আমার এই স্ত্রীটিকে নিয়ে আর পারা যায় না। সামান্য একটু ব্লাড সুগার হয়েছে আমার, দুদিন রেসপিরেসনের অল্প অল্প ট্রাবল

হয়েছিল। এজন্য ছ' সাতশো মাইল দৌড় করিয়ে আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। নাগপুরে বড় বড় অনেক ডাক্তার আছে কিন্তু কারো ওপর ওঁর বিশ্বাস নেই। কলকাতায় ওর এক মামা আছেন—নামকরা স্পেশালিস্ট তাঁকে না দেখানো পর্যন্ত ঘুম হচ্ছে না। বলুন তো এই অত্যাচারের কোন মানে হয়!'

মানে যে যথেষ্টই হয় সেটা বুঝতে পারছিল সমরেশ। ইন্দ্রজিত যে অত্যাচারের কথা বললেন সেটা নেহাতই কথার কথা। আসলে স্ত্রীর উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার জন্য ভদ্রলোক খুবই খুশী। মুখে যা-ই বলুন ভেতরের সুখটুকু তিনি ঢেকে রাখতে পারছিলেন না ফিনকি দিয়ে সেটা বেরিয়ে আসছিল।

ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ক্লান্তি বোধ করতে লাগল সমরেশ। এই সুখী পরিতৃপ্ত মানুষটা ক্রমশঃ আরো বেশি করে তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। অথচ এই সুখ এই তৃপ্তি তারই তো পাওনা ছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমরেশ বলল, 'কলকাতায় কিছুদিন থাকছেন তাহলে?'

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'এই দিন কুড়ির মতো। আমরা থাকছি সাদার্ন এ্যাভেনিউতে। আলাপ টালাপ হল, আসুন না একদিন। এলে খুব খুশী হব।' বলে বাড়ির নম্বরটা দিয়ে দিল।

সমরেশ দ্রুত একপলক অঞ্জনাকে দেখে নিল। তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছে। চোখের দৃষ্টি মরা মানুষের চোখের মতো স্থির। সমরেশ বুঝতে পারছিল অঞ্জনা চায় না সে তাদের ওখানে যায়। সে ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে বলল, 'আমি ব্যবসা-ট্যাবসা করি। নানারকম ঝামেলায় থাকতে হয়। আপনাদের ওখানে যাওয়া হয়ে উঠবে কি?'

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'ঠিক আছে; আপনার যেতে যখন অসুবিধা তখন আমরাই না হয় যাব। আপনার ঠিকানাটা বলুন।'

আবার সমরেশের চোখ অঞ্জনার দিকে ফিরল। এবার মনে হল তাকে যেন কোন বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমরেশ বলল, আসবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে। আমার ঠিকানাটা লিখে নিন।' বারো নম্বর, কালিদাস আড্ডি রোড; শ্যাম-বাজার' সঠিক নয়, ইচ্ছা করে মিথ্যা ঠিকানাই দিল সমরেশ।

ডায়েরী আর পেন বার করে টুকে নিতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। সেই ফাঁকে সমরেশের চোখ আবার অঞ্জনার দিকে ফিরে গেল। অঞ্জনা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল; তার দৃষ্টিতে এখন যা ফুটে উঠেছে তার নাম অসীম কৃতজ্ঞতা।

সমরেশ ভাবতে লাগল, অঞ্জনাকে সে সুখী করতে পারেনি কিন্তু ইন্দ্রজিৎ পেরেছেন। ওদের কাছে গিয়ে শুধু শুধু জটিলতা বাড়িয়ে কী লাভ? অঞ্জনার সুখ আর তৃপ্তিকে সে কেড়ে নেবে না।

With best Compliments of

DUNCAN BROTHERS & CO., LTD.

HINDUSTAN TIMES HOUSE

12TH FLOOR

18-20 KASTURBA GANDHI MARG

NEW DELHI-110001

১৯২১ সালে প্রস্তাবিত ডায়মণ্ডহারবার রোডের সম্প্রসারণের কাজ আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্যায়ের কাজও অচিরেই শুরু হবে। রাস্তার দোকানদারেরা নিজেদের দোকান নিজেরাই ভেঙ্গে রাস্তা উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন। বেহালা পৌরবাসীরা এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন মহাশয়ের দক্ষ পরিচালনায় **P.W.D.** এবং **C.M.D.A.** দিবারাত্র কাজ করে চলেছেন। এরা বেহালার উন্নত জনজীবনে বিপ্লব ঘটাতে চলেছেন। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের এরা সকলেই পুরোহিত। আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সকলকে জানাই।

মানিকলাল চ্যাটার্জী
পৌরপাদ
সাউথ সুবারবান ম্যুনিসিপ্যালিটি।

হরিপদ ভরসা

বিমল মিত্র

পুজোর মরশুম যত এগিয়ে আসে ততই বুক কাঁপে। ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে, খিদে কমে যায়, রাত্তির ঘুম উড়ে যায়। কেবল মনে হয় এই বুঝি আবার কেউ গল্প চাইতে এলো।

এ প্রতি বছরই হয়, আবার প্রতি বছরই কোনও রকমে তা কেটেও যায়। তখন আবার সব ঠাণ্ডা। স্টলে-স্টলে শারদীয়া সংখ্যাগুলো ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে, একটাও বিক্রি হয় না। এ ১৯৫৪ সাল থেকে দেখে আসছি। তারপর এই কুড়ি বছরে লোকসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু ক্রেতা তেমন বেড়েছে বলে শুনিনি।

এই ক' বছর আগে হঠাৎ মিনি-পত্রিকা প্রকাশের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে মিনি-পত্রিকা। সামনে লোক বসে থেকেছে আর একটার পর একটা মিনি-গল্প লিখে দিয়েছি। এখন তাদের হাত থেকে বেঁচেছি।

হুজুগের দেশ বাঙলাদেশ। আদিযুগ থেকে এই রকম একটা-না-একটা কিছু নিয়ে হুজুগ এসেছে আবার একদিন তা চলেও গেছে। এক-কালে দেশে চরকা-কাটার হুজুগ এসেছিল। তখন যেখানে যার বাড়িতে গেছি দেখছি লোকে চরকা কাটছে। তারপর থেকে হুজুগ দেখেছি আর ভেবেছি এ-হুজুগও চলে যাবে। সত্যিই সে-হুজুগ একদিন চলে গেছে। কিন্তু সে-হুজুগ যেতে-না-যেতে আবার আর একটা নতুন হুজুগ এসে হাজির হয়েছে। এমনি বরাবর।

কিন্তু সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করবার হুজুগটা আর গেল না।

মাঝখান থেকে যত মুশকিল হয়েছে আমার। আমি কোথাও যাই না, কারো সঙ্গে মিশি না। সভা-সমিতির নাম শুনলে কুষ্ঠ-রোগীর মত তাকে এড়িয়ে চলি। কিন্তু সাহিত্যটাকে যখন নেশা-পেশা করে নিয়েছি তখন তা এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। শুনেছি আমার গল্প নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা টাত্রা হয়, কিন্তু তা দেখ-বার সময় ও সুযোগ বড় একটা পাই না। আমার খাটার কপাল, খাটতে খাটতেই আমার জীবন শেষ হয়ে এল। এখন আর সেই আগেকার মত রাত জাগতেও পারি না, রাত জাগতে ভালোও লাগে না। কেবল মনে হয় যদি মনের মত বই কিছু পড়তে পেতুম। সত্যি তার মতন সুখ আর কিছুতে নেই।

কিন্তু প্রতি বছরের মত এবারও পুজোর মরশুম আসবার সময় হয়ে এলো। আর সুরু তাগাদা। পুজো-সংখ্যায় গল্প লেখবার তাগাদা। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। বজ্রাঘাতে মারা গেলে ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তা হলো না। আমি বেঁচে রইলুম আর গল্প প্রসব করার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলুম।

এইসব বিপদের দিনে আমার হরিপদই ভরসা।

আপনারা সবাই জানেন আমার যত গল্প-উপন্যাস-কাহিনী সমস্তই আমার হরিপদর সাপ্লাই করা। হরিপদ আমার গল্পের এজেন্ট। আমার গল্প-উপন্যাসের প্লট-ট্রাট যা কিছু তা বরাবর সেই সাপ্লাই করে এসেছে আমাকে। গল্প অবশ্য ছাপা হয় আমার নামে, কিন্তু গল্পের মূল কাহিনীটা তার কাছ থেকেই শোনা। তার জন্যে সে টাকা নেয় বটে কিন্তু কখনও ভেজাল মাল সে খাটি বলে চালায় না।

একটা পত্রিকা আর কিছুতেই যখন আমাকে রেহাই দিলে না তখন আমার গল্প-সাপ্লায়ার হরি-পদকেই খবর দিতে হলো। হরিপদ বড় অভাবী

মানুষ। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে তার সংসার। কোনও বাঁধা আয়ও যেমন তার নেই তেমনি কোনও বাঁধা পেশাও নেই। সারা বছর ধরে সে নানা-রকম কারবার করে আর ছাড়ে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম বেচে সে, আষাঢ় মাসে আনারস, শ্রাবণের সময় পাঁপড়-ভাজা, ভাদ্র মাসে তাল, আশ্বিন মাসে শায়া-সেমিজ ফুক, এমনি নানা রকম তার কারবার। কখনও বা রাজমিস্ত্রীদের মজুর হয়ে ইঁট-চুণ-সুরকি-বালি বয় আবার দরকার হলে ঘরামির কাজও করে। অর্থাৎ এক-কথায় যাকে বলে গোল-আলু। ঝালে-ঝোলে অম্বলে সব তরকারি-তেই সে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে যে-কাজটা সে ভালো করে করতে পারে তা হলো গল্প বলা। আমি তাকে সেই বাবদ টাকাটা-সিকেটা দিই। হাজার হাজার বাজে কথা শুনতে শুনতে তার মধ্যে থেকে আমি আমার আসল কাজটা উদ্ধার করে নিই। তখন সে জানতেও পারে না যে কী রত্ন আমি তার কাছ থেকে পেয়ে গেলুম। যখন জানতে পারে তখন বলে—আপনি স্যার আমার বলা গল্পটা মেরে দিলেন? দিন, তাহলে আমার আমার মজুরির দিন—

তা আমি অকৃতজ্ঞ নই। তার দরকারের সময় আমি তাকে কিছু-কিছু দিই।

কিন্তু যেদিন সে জানতে পারলে যে আমি মোটা-মোটা বই লিখে মোটা-মোটা টাকা উপায় করছি তখন থেকে সে আগাম টাকা নিতে লাগলো।

সে বললে—আমি স্যার খেটে-খেটে গল্প বলবো আর আপনি পাখার তলায় বসে আরাম করে সে-গুলো কলমে লিখে হাজার-হাজার টাকা আয় করবেন, এ হতে দেব না। আপনাকে এবার থেকে আগাম টাকা দিতে হবে তার জন্যে—

তারপর থেকে আগাম টাকাই দিতাম হরিপদকে। তখন আর তার কোনও ক্ষোভ ছিল না।

এমনি করেই আজ চল্লিশ বছর ধরে চলে আসছিল। এই চল্লিশ বছরে আমার আর্থিক অবস্থা যত ভাল হয়েছে, তার আর্থিক অবস্থা তত খারাপ হয়েছে। দিন দিন তার অভাব বাড়ছিল আর উপার্জন কমে আসছিল। এক-একদিন খেতেই পেত না। ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে সে উপোস করতো মাঝে মাঝে। আমি যতটা পেরেছি, আমার সামর্থ অনুযায়ী তাকে সাহায্য করে এসেছি।

তা এবার খবর দেবার পরও যখন এলো না তখন একদিন নিজেই গেলাম তার বাড়ি। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। আমার বাড়ি থেকে পায়ে হাঁটা পথে মিনিট দশেক গেলেই তাদের বস্তি। বস্তির জল কাদা খানা খন্দ পেরিয়ে খুঁজে পেতে যখন তার বাড়িতে পৌঁছোলাম তখন দেখি সে তার বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছে। সে তুমুল ঝগড়া একেবারে। সে ছ'মাস বাড়িভাড়া দিতে পারেনি বলে বাড়িওয়ালা তাকে শাসাচ্ছে আর সেও খুব খিস্তি করছে।

ব্যাপারটা কী?

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারলুম বাড়িওয়ালা উৎখাতের মামলা করেছিল তার নামে। এখন ডিক্রি হয়ে গেছে, এইবার সেই ডিক্রি জারি হলেই হরিপদকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু বাড়ি ছাড়লে সে ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে যাবে কোথায়? কোথায় গিয়ে সে মাথা গুঁজবে?

আমি বাড়িওয়ালাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার হাতে কুড়িটা টাকা দিলাম। বললাম—আর কটা দিন সময় দাও ওকে, আমি তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে দেব, কথা দিচ্ছি—

বাড়িওয়ালা আমার কথা বুঝলো কি বুঝলো না জানি না, খুব শাসিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

তারপর আমি হরিপদকে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার তোমার হরিপদ, আমি তোমাকে খবর দিলুম আর তুমি একবার দেখাও করলে না আমার সঙ্গে? এদিকে আমি যে বিপদে পড়েছি—

হরিপদ বোধহয় তখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

তার বাড়িওয়ালাকে কুড়িটা টাকা দেওয়াতে সে বোধহয় তখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তবু গলা চড়িয়ে বললে—আপনি কেবল স্যার নিজের বিপদের কথাই ভাবছেন, আর আমার বিপদের কথাটা তো একবারও ভাবছেন না? আমার বউ আজ ছমাস শয্যাশায়ী, কী যে অসুখ তা ঠিক করতে পারছি না। ডাক্তার ডাকলে তো তিরিশটা টাকার ধাক্কা। তারপর আমার বড় মেয়েটা ছিল, সে তবু শাক পাতা কচু ঘেঁচু যা পেতুম দুটো রান্না-বান্না করে দিত। সে-ও স্যার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে—

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—পালিয়ে গেছে মানে?

হরিপদ বললে—পালিয়ে গেছে মানে পালিয়ে গেছে। এই রকম না-খেয়ে-খেয়ে আর কদ্দিন বাড়িতে খেটে-খেটে মরবে? কোনও ছোঁড়া-টোঁড়ার সঙ্গে সটকেছে বোধহয়। তা গেছে, ভালোই হয়েছে তার পক্ষে, বেঁচেছে সে—। তারপরে আমার একটা সাত বছরের ছেলে আছে, তা সেটা না-থাকারই মতন। কালকে আমার জামার পকেট থেকে একটা টাকা চুরি করেছিল বলে তাকে খুব মেরে-ছিলুম। সেই থেকে এখন পর্যন্ত আর তার পাত্তাই নেই! আর আমার এই অবস্থায় কিনা আপনি গল্প চাইছেন আমার কাছ থেকে? এখন গল্প মানুষের মাথায় আসে? তা আমার এই গল্প নিয়েই একটা গল্প লিখুন না, এ তো আমার নিজের জীবনের গল্প, খুব ভালো প্লট, লিখুন না এই নিয়ে। লিখলে আপনার খুব নাম হবে, দেখবেন। সব্বাই বাহোবা-বাহোবা করবে—বলবে একেবারে জ্যান্ত জীবনের গল্প।

বললাম—না না, এ-সব গল্প পুজোর সময় চলবে না হরিপদ। একটু প্রেমের গল্প-টল্প হলে ভালো হয়, সবাই এই দুঃখের মধ্যে একটু মজা চায় কিনা, দুঃখ-টুঃখ সব পুজোর সময়টায় একটু ভুলে থাকতে চায় সবাই বুঝলে না?

হরিপদ বললে—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মাথায় কি প্রেমের গল্প এখন ঢুকবে? এই বিপদের মধ্যে কি প্রেম-ট্রেম আসে? আপনিই বলুন? একদিকে মামলা, তারপর বউটা মরো-মরো, মেয়েটা পালালো, আবার ছেলেটারও পাত্তা নেই—

বললাম—একটু ভাবলেই ঠিক আসবে। তুমি আজ রাতটা একটু ভাবো। আমি না-হয় কাল সকালেই আবার আসবো—নেহাৎ বিপদে পড়েছি বলেই তোমার কাছে আসা, নইলে কি আমি বুঝতে পারছি না তোমার বিপদ—

হরিপদ হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললে। বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার, একটা অপ্রিয় কথা বলি। আপনার স্যার কিছুছু হবে না!

আমি তো অবাক। বললাম—তার মানে?

হরিপদ বললে—কী করে হবে? আপনি স্যার কোনও মীটিং-ফিটিং-এ যাবেন না, কোনও বড়-বড় লেখাপড়া জানা লোকেদের সঙ্গে মিশবেন না, কেবল আমার মতন ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলে কি কিছু হয়?

বললাম—আজ এতদিন পরে এ-সব কথা হঠাৎ বলছো কেন বলো তো হরিপদ?

হরিপদ বললে—এই চল্লিশ বছর ধরে তো আপনাকে দেখছি। আপনার কোনও উন্নতি হলো না। আপনারও হলো না, আমারও হলো না। হবেও না কোনওদিন। অথচ দেখুন অনাসব রাইটাররা কত টাইটেল-ফাইটেল পাচ্ছে। কত জায়গায় সভাপতি হচ্ছে, কত খবরের কাগজে নাম উঠছে! আর আপনি? আপনি খালি খান ইটের মত ঢাউস-ঢাউস নভেল লিখবেন রাত জেগে জেগে। অত যে খাটেন তার জন্যে আপনাকে কেউ পোঁছে? কেউ আপনাকে একটা ফুলের মালা-টালা দেয়? আমার অবস্থাও তাই। আপনি যেমন; আমিও তেমনি কাউকে খোসামোদ করতে পারি না বলে আমার কিস্সু হলো না। আমার সঙ্গে যারা একসঙ্গে কারবার করতে আরম্ভ করেছিল তারা সবাই বেশ ফুটপাথে পাকা স্টল তুলে দিব্যি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করছে আর দু পয়সা কামাচ্ছে—

THE 21-POINT ECONOMIC PROGRAMME AND ORISSA

We have taken steps to take over the surplus land beyond land ceiling and distribute these among the landless, especially scheduled castes and scheduled tribes.

- We have distributed 2.46 lakh acres of surplus Government land among 1.5 lakh landless including 83,000 scheduled tribes and over 34,000 scheduled castes.
- Rs. 15 lakh allocated for developing House sites distributed to rural workers in eight districts. 4,000 such sites have been developed. We have decided to provide developed sites and houses to 5 lakh families during the 5th Five Year Plan
- The difference existing in the wage rate of male and female labourers has been removed. The minimum wage rate for both has been fixed at Rs. 3/ per day. Steps already taken to ensure payment of minimum wages to labourers.
- 50,000 dug wells having irrigation potential for more than 50,000 hectares financed through co-operatives and commercial Banks.
- Legal provisions being made to protect the interest of small agriculturists from exploitations by money lenders.
- Supply of controlled commodities at reasonable price for students residing in hostels and approved lodging houses ensured.
- Arrangements made for supplying paper and exercise books at concessional rates to students. Supply of free text-books and writing materials to newly enrolled needy students including supply of free uniform for girl students is proposed.
- Text Book Banks to be set up in 600 High Schools and 70 Colleges this year.
- Stringent measures taken against black-marketeers, hoarders and smugglers. Distribution system of essential commodities streamlined.

আমার তখন এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় ছিল না। আর হরিপদরও তখন গল্প করবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না।

হঠাৎ হরিপদ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা স্যার, পুজো-সংখ্যায় রোমাঞ্চকর গল্প চলবে?

বললাম—তার মানে? ডিটেকটিভ-গল্প?

হরিপদ বললে—না, এই ধরুন খুন-খারাপি, আত্মহত্যা, এই সব?

বললাম—তা চলবে। লোকে ওসব গল্প খুব চায় পুজোর সময়। তাও আছে নাকি তোমার প্লটে?

হরিপদ বললে—যদি চান তো তার প্লটও দিতে পারি—কিন্তু তার জন্যে একটু বেশি টাকা দিতে হবে আমাকে। আপনি কত পাবেন?

বললাম—আমি একটা পয়সাও পাবো না এই গল্পের জন্যে। কিন্তু তোমাকে দেব। এই তো তোমার বাড়িওয়ালাকে তোমার হয়ে কুড়ি টাকা দিলুম, এর ওপর আরও কুড়ি টাকা না-হয় দেব—

হরিপদ বললে—কিন্তু আপনি এ-গল্প লিখে টাকা পাবেন না কেন?

আমি সব বুঝিয়ে বললাম। বললাম যে যে-পত্রিকায় এই গল্প লিখছি সেই-পত্রিকা বিক্রি করার পর যা লাভ হবে তার সমস্ত টাকা আমাদের রাজ্যপালের ত্রাণ-তহবিলে দান করা হবে গরীব-দুঃখীদের জন্যে। রাজ্যপাল সেই টাকাগুলো তোমাদের মত গরীব লোকদের সাহায্য করবার জন্যে খরচ করবেন! সেই জন্যেই আমরা কেউই কোনও টাকা নিচ্ছি না—

হরিপদ আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। তারপর বললে—সত্যি? সত্যি বলছেন আপনি? আমাদের মত গরীব লোকদের জন্যে সেই টাকা খরচ হবে?

বললাম—হ্যাঁ,—

হরিপদর কী হলো কে জানে? সে বললে—ঠিক আছে, তাহলে আমিও কিছু টাকা নেব না আপনার কাছ থেকে। ঠিক আছে, আপনি কাল সকালেই আসুন, আমি আপনার জন্যে একটা ভালো গল্প ভেবে রাখবো—

বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ হরিপদর বউএর কাতরানির শব্দ কানে এলো।

হরিপদ বললে—ওই শুনুন স্যার, আমার বউ কী রকম কাতরাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন তো, আমি আসি। আপনি কাল সকালে আসবেন—

হরিপদ চলে যাচ্ছিল। বললাম—আর একটা কথা শোন হরিপদ, দেখ, এখন তো দেশে জরুরী অবস্থা চলছে, এখন কাগজে যত লেখা ছাপা হচ্ছে সে সব খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেনসার করা হচ্ছে।

হরিপদ বললে—সেনসার? সেনসার মানে কী স্যার?

আমি মানেটা বুঝিয়ে দিলাম। এমন গল্প যেন সে দেয় যাতে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে। গল্পের মধ্যে দেশদ্রোহিতা থাকলে চলবে না এইটে তুমি মনে রেখো, বুঝলে?

হরিপদ বুঝলো। বললে—না না, সে-সবের ধার দিয়েও আমি যাবো না। আমি স্যার বরাবর যে-রকম গল্প আপনাকে সাপ্লাই দিয়েছি, সেই রকম প্লট সাপ্লাই করবো। স্বদেশী-বিদেশী ব্যাপারের মধ্যেই আমি যাবো না। আপনি স্যার নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আমার নিজের জীবনের গল্পই একটা ভেবে আপনাকে বলবো, আপনি কাল ভোর-ভোর একটু আসবেন—

ওদিকে তখন হরিপদর স্ত্রীর কাতরানি আরো জোরে শোনা যাচ্ছিল। হরিপদ আমাকে ফেলেই বাড়ির ভেতরে দৌড়লো।

গরজটা আমারই ছিল তাই পরের দিন ভোর বেলা উঠেই আমি হরিপদর বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

কিন্তু বাড়ির ভেতরে পা দিতেই আমি অবাক! দেখি প্রায় গোটাকতক পুলিশ আর জনা

পঞ্চাশ-ষাট লোক হরিপদর বাড়িটা ঘিরে জটলা করছে।

দূর থেকে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। ভিড়ের মধ্যে তখনও ঢুকতে পারছি না। যাকে জিজ্ঞেস করি তারই সময় নেই। শেষকালে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে মশাই এখানে?

ভদ্রলোক বললে—হরিপদ মাইতি বলে এক-জন লোক থাকতো এ-বাড়িতে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বললাম —সে কী? কেন?

কেন যে হরিপদ আত্মহত্যা করতে গেল বুঝতে পারলাম না।

একজন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—গলায় দড়ি দেবার আগে আবার নিজের বউকে খুন করেছে, জানেন?

আমি আরো হতবাক। ভাবলাম এ কী করলে হরিপদ। হরিপদর সংসারে অভাব ছিল দুঃখ কষ্ট ছিল, সবই ছিল। যেমন আর সব লোকের থাকে তেমনিই ছিল। কিন্তু তা বলে নিজের বউকে খুন করে আত্মহত্যা করবার মত এক রাত্রের মধ্যে এমন কী ঘটলো?

পুলিশরা তখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। ভিড় আরো বাড়তে লাগলো। আমি সকলকেই ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কেউই খুন আর আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে কোনও সদুত্তর দিতে পারলে না।

যখন হরিপদর মৃতদেহটা নিয়ে পুলিশ বাইরে এল আমি তার মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলাম। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা।

একজন পুলিশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—বলতে পারেন কেন এমন কাণ্ড করলে হরিপদ?

পুলিশ ভদ্রলোক বললে—সে সব পরে এন্-কোয়ারি হলে বোঝা যাবে—

তারপর জিজ্ঞেস করলাম—কিছু চিঠি-পত্র লিখে রেখে যায়নি মরবার আগে?

এর জবাবে পুলিশের কাছ থেকে কিছুই শুনতে পেলাম না। একজন বস্তির লোক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—হরিপদ একটা অদ্ভুত চিঠি লিখে রেখে গেছে মশাই—

জিজ্ঞেস করলাম—কী চিঠি? চিঠিতে কী লিখে গেছে?

লোকটা বললে—আমি দেখেছি সে-চিঠি। লিখেছে—"এবার গল্প পেলেন তো স্যার?"

তারপর লোকটা নিজেই আবার বললে—চিঠিটা পড়ে কেউ কিন্তু মানে বুঝতে পারছে না মশাই—

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম মানেটা। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। একা একা নিঃশব্দে আবার বাড়ির দিকে চলে আসতে লাগলাম।

With best compliments of :

R. S. AGARWALLA
8A, ALIPORE ROAD,
CALCUTTA-700027

With the best Compliments of :

The Alkali
AND
Chemicals Corporation India Ltd.
34, Chowringhee,
CALCUTTA-700016

Space Donated by
'UTTARA', 'SREE'

Management :
Exhibitors Syndicate Private Ltd.
87, Dharamtolla Street,
CALCUTTA-700013

"ভোলানাথ অপেরার"
১৩৮২ সালের বলিষ্ঠ ঘোষণা
নির্মল মুখার্জী রচিত ও নির্দেশিত
"স্বামীর কোলে মৃত্যু"
শ্রেষ্ঠাংশে—শম্ভু সিন্‌হা
কবিতা চক্রবর্তী মায়া পাল
তারা ভট্টাচার্য বলাই হালদার
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তারারাণী পাল
ব্রজেন দে এম. এ. রচিত, শম্ভু সিন্‌হা নির্দেশিত
"রাখাল বাদশা"
সিঁদুর নিওনা মুছে
চলছে—চলবে

With best compliments from :—

RISHI TEXTILES

Cloth Merchant & Commission Agents

NOORMAL LOHIA LANE.

CALCUTTA-700 007

With best compliments of :

JUNIOR BROTHERS

190.1. Rash Behari Avenue,

CALCUTTA-700029

With best compliments from

Annapurna Flower Mills

30 SHASTITOLA ROAD.

CALCUTTA-700011

With Best compliments from :

Bhagwandas Radhakrishna

73, JAMUNALAL BAJAJ ST.,

CALCUTTA-700007

বার্গম্যানের মুখ ও মুখোশ / পূর্ণেন্দু পত্রী

অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান : অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তব করি।

ঋ:খেদ ॥ ১ম সূক্ত

কেউ কেউ মনে করেন, তিনি মানুষ নন। দেবতা। কেউ কেউ মনে করেন তিনি দানব অথবা শয়তান। অন্য কারো কারো মনে হয় তিনি আধখানা মানুষ আর বাকি আধখানা নেকড়ে। মানুষের জন্যে, পৃথিবীর সভ্যতাকে উপহার দেওয়ার জন্যে কি খুঁজছেন তিনি? কেউ কেউ মনে করেন অমৃত। কেউ বিষ। কেউ মনে করেন হতাশা এবং বিপন্নতাবোধ। কেউ মনে করেন শুদ্ধ জ্ঞান এবং স্বচ্ছ বিবেক। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছিলেন অন্য কথা। 'বার্গম্যান খুঁজছেন ঈশ্বরকে আর ঈশ্বর খুঁজছেন বার্গম্যানকে'।

পৃথিবীর চলচ্চিত্রে আজ সবচেয়ে জটিল একটি নাম, বার্গম্যান। কিংবা বার্গম্যান কোনো নাম নয়। জিজ্ঞাসার এক বিরাট চিহ্ন। তাঁর চলচ্চিত্র যেন দেখার নয়। দর্শনের। তাঁর চলচ্চিত্রের মুখোমুখি দাঁড়ালে আমরা আক্রান্ত অথবা ভারাক্রান্ত হই এক বিশ্লেষণহীন বোধে। আমরা স্থাপিত অথবা উপস্থিত হই পৃথিবীর এমন এক কেন্দ্রে যার ঊর্ধ্বে আকাশ এবং ঈশ্বর, নিম্নে নরক এবং শয়তান এবং ডানদিকে অনোঘ মৃত্যু এবং বাঁদিকে অব্যাহত ও অব্যাহতিহীন জীবন। তাঁর চলচ্চিত্র মানুষকে আবেগে উদ্বুদ্ধ কিংবা কোনো বিশেষ আদর্শে উত্তেজিত করার জন্যে নয়। তিনি শুধু আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতে চান এক গভীর সতর্কতা এবং সংকেতের উপলব্ধি। না। তিনি সম্ভবত এর চেয়েও নির্মম। এক নির্বিকার হত্যাকারী। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে কত সহজে তিনি বলতে পারেন ফল্লনারের কাছ থেকে গ্রহণ করা সেই শিক্ষার কথা, 'তোমার সমস্ত প্রিয় কিছুকে হত্যা কর।' তিনি তাই করেও থাকেন সম্পাদনার মুহূর্তে। আপাতপ্রিয় দৃশ্য বা মুহূর্ত বা সংলাপের উপর নেমে আসে ঘাতকের হাতের কাঁচি। তারপর রক্তপাত। সেই রক্তপাত ও মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে নিজেই ভেঙে পড়েন হতাশায় এবং বেদনায়। যতক্ষণ না অপর কোনো চিত্রনাট্যে হাত দিতে পারছেন, এই হতাশা এবং বেদনা তাঁর গলায় জড়িয়ে থাকে ফাঁসির দড়ির মত। এই হত্যাকাণ্ড শুধু তাঁর নিজের ছবিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই হত্যাকাণ্ড আমাদের চেতনার স্তর পর্যন্ত ছড়ানো। কারণ চলচ্চিত্রের কাছে যেসব মনোমুগ্ধকর এবং প্রিয় প্রত্যাশা নিয়ে আমরা চোখ মেলে থাকি, আমাদের অজ্ঞাতসারেই তিনি সেগুলিকে হত্যা করতে থাকেন একে একে। আমরা জামা কাপড় পরেই চিত্রগৃহে ঢুকি। কিন্তু তাঁর ছবি দেখে যখন বাইরে আসি, তখন বুঝতে পারি, আমরা নয়। আমাদের আবার নতুন করে সভ্য এবং সভ্যতার যোগ্য হতে হবে।

এখন আমরা এই মানুষটির দিকে, যেমন করে ভাস্কর দেখতে হয়, তেমনি, চারপাশ থেকে তাকিয়ে দেখবো। শক্ত হাড়ের কাঠামো দিয়ে তৈরী তাঁর লম্বা চেহারা। জ্বলজ্বলে চোখ ছুঁচলো দাঁত। তাঁর মুখের দুটি দিক নাকি দু'রকম। ডান দিকটা মৃত্যুর মত শীতল এবং স্থির। বাঁ দিকটা জীবনের মত উচ্ছল এবং উষ্ণ। তিনি নাকি বাঁ চোখেই দেখতে পান বেশী। বেশী শোনেন বাঁ কানে। তাঁর হাসি নানান রকম। বেশীর ভাগ সময় তা বিষণ্ণ। দুমড়ে যাওয়া। ভয়াবহ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার মত। আবার কখনো তা ভালবাসায় ভর্তি। তখন যেন গাছের পাতায় রোদ। ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগে সবচেয়ে কম। এবং সেই অবস্থা খুবই মারাত্মক এবং ক্ষতিকর। তখন তিনি যে কোন ধ্বংসের জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। বরং প্রচণ্ড প্রস্তুত। হাতের টেলিফোনও সজোরে ছুঁড়ে মারতে পারেন দেয়ালে। টি ভি স্টেশনের কাচে কঠিন চেয়ার ছুঁড়ে মারাও অবাস্তব দৃশ্য নয়। ব্যবসার

ব্যাপারে তিনি নাকি ভীষণ বুর্জোয়া। আর প্রেমের ব্যাপারে প্রচণ্ড বোহেমিয়ান। বিয়ে করেছেন মোট পাঁচবার। ২৫ বছর বয়সে এলসে ফিসারকে। নর্তকী। ৮ বছর পরে বিচ্ছেদ। তখন তাঁদের একটি মাত্র কন্যা। ২৭ বছর বয়সে মঞ্চ পরিচালিকা এলেন বার্গম্যানকে। পাঁচ বছর পরে বিচ্ছেদ। এই পাঁচ বছরে ৪টি সন্তান। দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। ৩২ বছর বয়সে যাকে বিয়ে করলেন তিনি সাংবাদিকা। গুণ গুণে। ৯ বছর পরে বিচ্ছেদ। সন্তানের সংখ্যা এক। ছেলে। তারপর পিয়ানো-বাদিকা কাবি লায়েট। পঞ্চম স্ত্রী ইনগ্রিড। বার্গ-ম্যানের পূর্ব জীবনের প্রণয়ীরা যে সাতিই তাঁর প্রতি অনুরক্ত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর ছবি 'ক্রাইস এণ্ড হুইসপার'। এই ছবিতে কোন না কোন ভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি পূর্ব পত্নী। ইনগ্রিড এই ছবিতে তার সহকারী। চতুর্থ পত্নী কাবি এই ছবিতে বাজিয়েছেন পিয়ানো।

যদিও বিবাহিত স্ত্রী নয়, তবু বার্গম্যানের জীবনে লিভ উলম্যানের ঠাঁই অনেকখানি জায়গা জুড়ে। প্রথম আলাপ ১৯৬৫তে। ১৯৬৬-র ছবি পার্সোনা-য় তিনি পেলেন একটি প্রধান চরিত্র। তারপরের ছবি ১৯৬৮তে। দি সেম। সেখানেও লিভ। লিভের স্থান 'ক্রাইস এণ্ড হুইসপারে'ও।

কিছুদিনের অন্তরঙ্গতার ফলে লিভের গর্ভে বার্গম্যানের এক সন্তান জন্ম নেয়। লিভ তার জন্যে লজ্জিত নয়। স্বগর্বে জানালেন 'আমিই এটা ঘটতে দিয়েছি। এটা কোন অন্যায় নয়। আমি খুশী।'

লিভের নিজের দেশ নরওয়েতে এ নিয়ে গুঞ্জন হয়ে ওঠে গঞ্জনার মত তীব্র। লিভকে তিরস্কার জানানো হয় তীব্রভাবে। কেউ পরামর্শ দেয়, ঐ অবৈধ কন্যাকে বনে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। কেউ মন্তব্য করেন, লিভেরই উচিত আত্মহত্যা করা। একটা বেশ্যার মর্যাদায় বেঁচে কি লাভ? এত ধিক্কারেও কিন্তু লিভ বিন্দুমাত্র বিচলিতা নন। অতি স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ তাঁর উচ্চারণ।

'বার্গম্যান আমাকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। যা আগে ছিল না। তিনি আমাকে শিল্পী হিসেবে পরিণত করেছেন। আমি খুঁজে পেয়েছি আমার আত্মপরিচয়। আমার বিবাহিত জীবন ছিল সংকীর্ণ।'

লিভ-এর স্বামীর নাম হ্যানস্ জাকেব স্টাং। তিনি একজন ডাক্তার। মনোবিকলনবিদ। লিভের চেয়ে ৫ বছরের বড়। ৫ বছর তাঁরা ছিলেন দম্পতী। তারপরই বিচ্ছেদ। লিভ ছিলেন নরওয়ের একজন ক্ষমতাময়ী মঞ্চাভিনেত্রী। লিভ কথাটার অর্থ হল জীবন।

নিজের চলচ্চিত্র ছাড়াও বার্গম্যান তাঁর ছ ভাগে ভাগ করা টেলিভিশনের জন্যে যে ছবি তুলেছেন, লিভ রয়েছে সেখানেও। লিভ সেখানে মূর্তিমতী এবং বিবেকবতী নারী জাতির প্রতিভূ।

বার্গম্যান পছন্দ করেন না হৈ-হুল্লোড়। পার্টিতে যেতে চাননা সচরাচর। নিজেও পার্টি দেননা বাড়িতে। ঘুম থেকে ওঠেন সকাল সাড়ে সাতটায়। ন'টায় স্টুডিও-র গাড়িতে চেপে চলে যান স্টুডিওয়। বাড়ি ফেরেন পাঁচটায়। নৈশ ভোজের পর পরের দিনের কাজকর্মের কাগজপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে নেন। তারপর ঘুম।

"বার্গম্যান কাজকর্মে বিদ্রোহী শিশুর মত। অত্যন্ত অভিমানী, ভাবপ্রবণ, আবেগে প্রাণময়, অত্যধিক সংবেদনশীল, সহজেই রুষ্ট, সন্দেহপ্রবণ, জেদী, একগুঁয়ে, খামখেয়ালী। তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল।"

এই মন্তব্য সেভেনস্থ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সভাপতি আন্দ্রে ডিমলিং-এর। বার্গম্যানের প্রবল প্রতিষ্ঠার পিছনে এই মানুষটির উৎসাহ ও প্রেরণার পরিমাণ বিপুল। এবং এঁদের দুজনের বন্ধুত্ব, নানাসময়ের বিরোধ অথবা মতানৈক্য সত্ত্বেও, দীর্ঘস্থায়ী এবং নিবিড়। ডিমলিং এর বর্ণনায় যে বার্গম্যানকে আমরা দেখতে পাই, পরস্পর বিরোধিতার সে তো এক চরম দৃষ্টান্ত। তবুও এ তালিকায় একটি উজ্জ্বল বিশেষণ অনুপস্থিত। এবং সে সম্বন্ধে সত্য মন্তব্য করার

অধিকার এবং যোগ্যতা শুধু তাঁদেরই, যাঁরা দীর্ঘকাল স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেছেন তাঁর সংসারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, বিচ্ছেদের পর বার্গম্যানের কোন স্ত্রীই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। কারণ? 'আমরা অবসন্ন।' উত্তর শুনে মনে হবে যেন তাঁদের সমস্ত প্রাণশক্তি, রক্তের উষ্ণতা এবং ধমনীর স্পন্দন, বার্গম্যান গ্রাস করেছেন গভীরে। অথচ এই মহিলাদেরই যদি পুনরায় প্রশ্ন করা হয়, আপনারা কি এখনো বার্গম্যানের বন্ধু রয়ে গেছেন, উত্তরে শোনা যাবে এক অনায়াস হাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করা হোক, প্রেমিক হিসেবে তিনি কেমন?

উত্তর পাওয়া যাবে, প্রেমিক হিসেবে তিনি জ্বলন্ত আগুন। কিন্তু হৃদয়? হায়! সেতো বরফের মত ঠাণ্ডা। শুধু ঘরের পরাবৃত্ত নয়, তাঁর এই শীতল হৃদয় সম্বন্ধে অভিযোগ ঘনিষ্ঠ অনেকেরই। বন্ধুরা এবং বান্ধবীরাও। আর স্বয়ং বার্গম্যানকে যদি তাঁর ভূতপূর্বা রমণীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, উত্তরে তিনি জানান, "প্রত্যেকটি নারীই, যারা আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে, তাদের প্রত্যেকেই আমাকে মুগ্ধ করে। আমি চাই, এদের মধ্যে দু-একজনকে আমি হত্যা করি অথবা তারা কেউ আমাকে হত্যা করুক।"

মৃত্যুচিন্তা এবং ভয় যেন বার্গম্যানের বুকের দুদিকের দুটি ফুসফুস। আগে তাঁর অভ্যেস ছিল প্রত্যেক বসন্তকালে স্টকহলম-এর কোনো হাসপাতালে গিয়ে আত্মগোপন করা। তাঁর মনে হতো তিনি আলসারে আক্রান্ত। কিছুদিন চলতো এই কল্পিত আলসারের চিকিৎসা। হাসপাতালে শুয়েই ডিকটেশন দিতেন চিত্রনাট্যের। তাঁর সাম্প্রতিককালের এক উল্লেখযোগ্য ছবির জন্ম এক হাসপাতালেই। সে ছবি 'পার্সোনা'। ১৬৪তে 'নাউ এবাউট দি উওম্যান' ছবির পর হাতে দীর্ঘদিন কোন ছবি নেই। ছিল কেবল একটা চিত্রনাট্য। নাম 'দি ক্যানিবলস'। দীর্ঘ প্রায় চারঘণ্টার মত সময়ের ছবি হবে যেটা থেকে। সেই সময়ে হঠাৎ পড়লেন অসুখে। প্রথমে ঠাণ্ডা লাগা। তার থেকে জ্বর। তারপর নিউমোনিয়ার মত। তিনি তখন রয়্যাল ড্রামাটিক থিয়েটারের প্রধান। সেখান থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে ভর্তি হলেন হাসপাতালে। কবে সেরে উঠবেন কোন স্থিরতা নেই। শরীর একেবারে ভাঙা। কিছু পড়বার বা লিখবার বা শুনবার মত ক্ষমতা নেই। টি-ভি-র দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারেন না। ঘাড় ঘোরাতে গেলেই মাথা ঘোরে। সমস্ত রকম অনুভূতির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে ফোনে থিয়েটারে কাজকর্মের নির্দেশ পাঠান। এইভাবে চলছে। হঠাৎ একদিন বিবি এ্যাণ্ডারসন দেখা করতে এলেন বার্গম্যানের সঙ্গে। সঙ্গে নরওয়েজিয়ান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটি দল। তারা স্টকহলমে এসেছে শিক্ষা-সফরে। সেই দলের মধ্যে একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। লিভ উলম্যান। সংগে সংগে মাথায় এল 'দি ক্যানিবলস'এ এই অভিনেত্রীর জন্যে তিনি নতুন করে একটা ছোট্ট চরিত্র গড়বেন। লিভকে জানালেন, তুমি কি আমার পরের ছবিতে কোনো একটা চরিত্রে অভিনয় করবে? লিভ রাজী। বার্গম্যান 'দি ক্যানিবলস' চিত্রনাট্যের রং বদলাতে লাগলেন। এর কিছুদিন পরে তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং ডাক্তার স্তুরে হেলাণ্ডার-এর বাড়িতে বসে আছেন একদিন। ডাক্তার বার্গম্যানকে নিজের তোলা কয়েকটা স্লাইড দেখালেন। তারমধ্যে একটায় ছিল বিবি এবং লিভ প্রসংগ। স্লাইডে চোখ পড়ামাত্র চমকে উঠলেন বার্গম্যান। আশ্চর্য! এরা দুজনেই কী অদ্ভুতভাবে একরকম দেখতে। তারপর থেকেই তাঁর মাথায় ক্রমাগত ঘুরতে লাগল দুটি নারী চরিত্রের এই একাত্মতার চিন্তা। কিছুদিন পরে আবার ভর্তি হলেন হাসপাতালে। আর সেই সময়েই স্থির সিদ্ধান্তে এলেন এই বিষয় নিয়ে একটা চিত্রনাট্য লিখবেন, 'something about two people who lose their identities in each other...'

পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে 'পার্সোনা' ছবির জন্মকাহিনী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"একদিন আমি আমার সামনে দুজন মহিলাকে দেখেছিলাম। মহিলা দুজন কাছাকাছি বসে একে অন্যের হাতের সংগে নিজের হাত মিলিয়ে দেখছিলেন। আমি তখন ভেবে

Build a Better Bengal

Space donated by a well wisher.

With the best compliments

from

WELL WISHER

●

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ
হাসি আর গানে ভরা
অজয় দত্ত প্রযোজিত
অপর্ণা, রঞ্জিত, অনুপ, সুমিতা অভিনীত

রাগ অনুরাগ

পরিচালনা পীনেন গুপ্ত
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী
কাহিনী ও গান : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী (৩, ৬, ৮৬) ইন্দিরা (৩, ৬, ২), প্রাচী (২॥, ৩॥ ৮॥)

ইলোরা মায়া অলকা যোগমায়া
রমা • গৌরী মিলন প্রফুল্ল
শ্রীরামপুর টকীজ • চিত্রালয় অপরা
বাপ্পি (নাকতলা)
= দাক্ষায়ণী পিক্চার্স রিলিজ

With the best compliments from :

Rao Insulating Company Private Limited

MANUFACTURERS AND SUPPLIERS OF ALL TYPES OF ELECTRONIC PIECE PARTS. PRINTED CIRCUIT BOARDS AND SILVERED MICA CAPACITORS

Whitefield P. O., Bangalore District.

Works at :

1 **Gogineni puram. Gudur, Andhra Pradesh**
Phone No. 288 & 268

2. **Whitefield P. O. Bangalore District**
Karnataka State.
Phone No. 68218
TELEX—013-558

নিয়েছিলাম যে এ'দের মধ্যে একজন মূক অপরজন অবশ্য কথা বলতে পারেন। এই দেখা এবং ছোট্ট ভাবনাটি পুনরায় ঘুরে এল আমার মনে ; আমি ভাবলাম এবং অবাক হলাম ভেবে কেন এই চিন্তা আমার কাছে ফিরে এল। সম্ভবতঃ এই চিন্তা ঘুরে এল এই কারণে যে এর থেকে আমি কাজ শুরু করতে পারি। এখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ঐ দৃশ্যের নেপথ্যে অনেক কিছু রয়ে গেছে। এটা যেন কোন দরজার ওপর রাখা কোন এক দৃশ্য। এবং আপনি যদি যত্ন করে সেই দরজাটি খোলেন তাহলে দেখবেন এক লম্বা বারান্দা ক্রমশঃ চওড়া থেকে আরো চওড়া হয়ে গেছে। তখন আপনি দেখবেন দৃশ্যগুলি আপনা থেকেই অভিনীত হতে শুরু করেছে, মানুষ কথা বলছে এবং ঘটনা দুদিক থেকেই ঘটতে এবং এগোতে শুরু করেছে।"

চিত্রনাট্য রচনা বার্গম্যানের জীবনের একটা অন্যতম প্রিয় কাজ। যদিও বার্গম্যান শুধুমাত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার নন। তিনি সুইডেনের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং প্রতিষ্ঠাবান মঞ্চ পরিচালক। চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ এই দুটি বিপরীত শিল্প-মাধ্যমের প্রতিই তাঁর আবাল্য অনুরাগ এবং আনুগত্য। এ ছাড়াও তাঁকে প্রায় নিয়মিতই প্রোগ্রাম রচনা করতে হয় রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্যে। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনার আনন্দ স্বতন্ত্র। এবং এখানেও তাঁর চরিত্রের অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার ছাপ। এই প্রসঙ্গে ভিমলিন্ডের সাক্ষ্য সবচেয়ে প্রামাণিক। "আপনি কিছুতেই বলতে পারেননা যে বার্গম্যানের কোন্ পরিকল্পনার চেহারা কি দাঁড়াবে। এরমধ্যে কোন কোনটা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় এবং সেগুলির কথা ভবিষ্যতে আর শোনা যায় না। কোন কোনটি আবার চিত্রনাট্য লেখা হয়ে যাওয়ার পরেও বাদ পড়ে যায়। অন্যগুলি আবার সম্পূর্ণ পালটে যায়। 'আইলস অফ এ সামার নাইট' ছবির কাহিনী বার্গম্যান আমাকে আগে যা বলেছিলেন তার থেকে একেবারেই আলাদা। বার্গম্যান আগে যে কাহিনী বলেছিলেন তা নিয়ে অনায়াসেই তিনি নতুন আর একটি কমেডি তৈরী করতে পারেন এবং কেউই এ-দুয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারবেন না।"

বার্গম্যান সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় আজও অনেক দূরে। আরও অনেক গৌরবময় পতাকাকে আমরা উড়তে দেখবো তাঁর সৃষ্টিশীল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতে। আরও বহুকাল আমাদের হাঁটতে হবে তাঁকে অনুসরণ করে সেই সব পথে, যে পথ হাঁটার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং মারাত্মক। 'সবচেয়ে মারাত্মক পথগুলিই হাঁটার একমাত্র পথ' এ তাঁরই স্মরণীয় উক্তি। এইসব উক্তির জন্ম জীবনের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার কেন্দ্র থেকে। ব্যাপক এবং বহুবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই জীবনকে সংক্ষেপে জানার পক্ষে উপযোগী হবে ভেবে তাঁর জীবন, আদর্শ, সৃষ্টি ও সংকল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁরই বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও উচ্চারণকে একসূত্রে গাঁথা হল এইখানে।

চলচ্চিত্র ॥

যে জনসাধারণ আমার ছবি দেখেন, আমার অন্নবস্ত্র জোগান তাঁদের মনোরঞ্জন করা আমার কর্তব্য ও এটা তাঁদের অধিকার। একটু শিহরণ, আনন্দ বা তেজস্বিতা—এইসব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ছোঁয়া দিতে আমি দায়িত্বশীল। এবং সেই বোধই আমার কাজকর্মের রূপকে একমাত্র যুক্তি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমি প্রতিভাগত বেশ্যাবৃত্তিতে নামব। অন্তত সমস্ত পথে তো নয়ই, কারণ তাহলে আমি দ্বিতীয় অনুশাসনটি অমান্য করব। সেটি হল, তুমি তোমার শিল্প-বিবেককে মান্য করে চলবে।

শিল্প-বিবেক ॥

কখনই আমি নিছক অর্থ উপার্জনের জন্যে ছবি তৈরী করব না। কোনও দিনও না। আমার ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা জাগতিক অস্তিত্ব যতই বিপন্ন হোক, তবু কেউ আমাকে কিনে নেবে অর্থের বিনিময়ে, তা সে যত বড় অঙ্কেরই অর্থ হোক না কেন, এ আমি ঘটতে দেব না আমার জীবনে। ছবি তৈরী করাটা আমার বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতা। দ্রুতগতিময় জীবনকে বেঁচে নিতে গিয়ে আমি নৈতিকতা হারাই, তাহলে একজন মানুষ হিসেবে আমার অর্জিত মূল্য

ও গৌরবকেই হারিয়ে বসবো আমি, যে মূল্যবোধ আমাকে মর্মরিত করে রাখে আমার ছবি করার অধিকার সম্বন্ধে।

আর সেই কারণেই আমার প্রত্যেক ছবিই শেষ ছবি এই বোধটা মন থেকে মুছতে পারি না।

অনাহার! ও আমার খুবই পরিচিত। যতক্ষণ মানুষ তরুণ ও তাজা থাকে, ও জিনিষটা মন্দ নয়। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আমার জন্যে একটুকরো রুটি আছে, এই ব্যাপারে একটা স্থির বিশ্বাস সকলেরই থাকে। কিন্তু সমস্যা তখনই ভয়াবহ, যখন আরও অনেকগুলি মানুষ আমার উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তিগতভাবে আজ আর আমার কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। আস্তে আস্তে এই বোধটা আসে। ফারোতে আমার নিজের বাড়ি আছে, ঠিকই। এটা আমার কাছে অনেকখানি। আমার নিজস্ব ফিল্ম লাইব্রেরী আছে, যা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আছে গ্রামোফোন রেকর্ডের সংগ্রহ। আর বইপত্র। কিন্তু যে-কোনদিনই এইসব কিছু ছেড়ে চলে যেতে পারি। আমার অন্য কোনো রোজগার না থাকলেও, বাৎসরিক সরকারী গ্রান্টটা তো রয়েছে। সুতরাং ভিখারী হওয়ার ভয় নেই।

অতি প্রশংসা ॥

আমাকে প্রভাবিত করে না। সরাসরি আমাকে কেউ কোনো লেখাপত্র পাঠালে পড়ি। ওসব প্রশংসা মূলক রচনার জন্যে আমি নিজে ব্যতিব্যস্ত থাকি না। আমার মনে হয় ওসব যেন অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির উদ্দেশে লেখা। যখন কেউ সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত, এবং বিত্তে, এবং জীবনে যা কিছুর জন্যে সে সাধনা এবং সংগ্রাম করেছে, সব পেয়ে যাওয়ার পর, তার কাছে সব কিছুই অর্থহীন। শূন্য। তখন একমাত্র মূল্যবান কাজ হল জীবনের যাবতীয় সংকীর্ণতাকে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়া এবং বহু মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলা। এ ছাড়াও একটা দ্বিতীয় দায়িত্ব আছে। সেটাও প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। তা হোল নিজের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, আমি কি করছি এবং কি করছি না সেই বিষয়ে। কাজের ক্ষেত্রে কোনখানে হাঁ আর কোনখানে না বলছো এবং কাজের বাইরে জাগতিক প্রলোভনকে কিভাবে জয় করতে পারছো, সেইটেই বড় ব্যাপার। এ ছাড়া আর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই। আর সমস্ত কিছুই অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। যখনই আমি কোনো ফিল্ম ফেস্টিভালে যোগদান করতে গেছি, আমার উপর তার প্রভাব পড়েছে শোচনীয় রকম। এর ফলে আমার শরীর বেশ কয়েক মাস এমন ভেঙে পড়ে যে ছবির কাজ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়।

রাজনীতি ॥

পৃথিবীটা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমার ধারণাটা খুব শক্তই। আমাদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি অনেক রকম গোঁজামিলে ভর্তি এবং বাবহারের অযোগ্য। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের ধরণটা ঘরে এবং বাইরে, ব্যর্থতায় ভরা। সবচেয়ে বেদনার বিষয়, আমরা চাইনা এবং আমাদের সে রকম চাইবার ক্ষমতাও নেই, যাতে এগুলো বদলাতে পারে। বিপ্লবের পক্ষে খাটি সময়টা পার হয়ে গেছে। এবং আমাদের অস্তিত্বের গভীরে বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনো গভীর আস্থাও নেই। একটা পোকামাকড়ের পৃথিবী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে কোণে কোণে। একটা দিন আসবে যেদিন তারা পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের এই অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্তিত্বের উপর। এসব কথা বাদ দিলে, আমি একজন সন্ত্রান্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাট।

কৌতূহল ॥

আজকের মানুষ অনায়াসে বাতিল করতে পারে রসবোধকে। কারণ তার চারপাশের পরিবেশে প্রতিদিনইতো ঘটে চলেছে ভয়াবহ ট্রাজেডী। মানুষের আর সঙ্গীতের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ শব্দের বজ্রনির্ঘোষ প্রতিমুহূর্তেতো তার আছড়ে পড়ছে কানের পর্দায়। প্রয়োজন নেই কবিতারও। কারণ নতুন বিশ্ব-দর্শন মানুষকে বানিয়ে তুলেছে কাজের কলকব্জাময় এমন এক উপভোগ্য প্রাণী, যাকে কবিতার

প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বাধীন হয়ে গেছে বড় বেশী। খুব আনকোজনক এবং রুদ্ধশ্বাস ধরণের স্বাধীন। ধর্ম এবং শিক্ষা বেঁচে আছে শুধুমাত্র সেন্টিমেন্টের প্রয়োজনে। অতীতের প্রতি সামান্য ভদ্রতা দেখাতে। একদল অবসর লালিত এবং ক্রমাগত শংকিত মানুষের জীবনের খোরাক হিসেবে। এটা একান্তভাবে আমার নিজস্ব মত। অন্যের হয়তো আরও বাস্তব এবং ভারসাম্যময় দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে। এই সব দুর্ভাগ্যজনক কার্যকারণকে মেনে নিয়েও আমি যে ক্রমাগত শিল্প সৃষ্টি করতে চাইছি, তার কারণ একটাই, এবং তা হল কৌতূহল। সীমাহীন, চিরঅতৃপ্ত, প্রতি মুহূর্তে বিকশিত হতে চায় এমনি এক অদম্য অদম্য কৌতূহল। এই কৌতূহলই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কৌতূহল কখনো শান্তি দেয়নি আমাকে। এবং মানুষের বন্ধুত্বলাভের সেই আদিম পুরাতন আকাঙ্খাকে ক্রমাগত জাগিয়ে রাখে আমার মধ্যে।

লেখক নই ॥

আমার নিজের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই লেখক হওয়ার। গল্প, উপন্যাস, জীবনী এমনকি মঞ্চের জন্যেও নাটক লিখতে চাইনা। আমি শুধু ছবি করতে চাই। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ছবি, ছন্দ, চরিত্র এবং এদের সংঘাত, এইসবই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অত্যন্ত জটিল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যার জন্ম সেই চলচ্চিত্রই আমার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। ঐ মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই আমি মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই। আমি একজন চিত্রনির্মাতা। লেখক নই।

With best Compliments of :

MOHURGONG & GULMA TEA ESTATES

FARADAY HOUSE
P-17, MISSION ROW EXTENSION
CALCUTTA-13

With best compliments of

Essen Synthetics Private Ltd.

Small Scale Manufacturers of :

DIOCTYL PHTHALATE, DIMETHYL PHTHALATE and DIOCTYL PHTHALATE IN INDIA

Regd. Office
11/A, MALANGA LANE CALCUTTA-12
Phone—24-2766

City Office
COMMERCE HOUSE 6th Floor
2, Ganesh Chand a Avenue, Calcutta-13
Phone—23 0539, 0217

Works
1, SHYAMSUNDAR GHAT ROAD,
KHARDA, 24 PARGANAS
Phone—58-2053

With best Compliments

MAGNOLIA

12 K K & M. PARK STREET
CALCUTTA-16

With Best Compliments of

SHALIMAR WIRES & INDUSTRIES LTD.

27A CAMAC STREET,
CALCUTTA-700 016

Phone . 44-3375 Gram : PAPERWIRES
Telex : CUTSIZE CA 3103

Manufacturer/Exporter of

PAPER MACHINE WIRES CLOTH (METALLIC & SYNTHETIC) ;

DANDY ROLLS, and NICKEL SILVER WIRES, RODS and FLATTEND WIRES & STRIPS

MOST PEOPLE LOVE
ORANGE FLAVOUR

THAT'S WHY THEY LIKE FANTA
THE BRIGHT HAPPY TASTE
THAT MAKES EVERYTHING
MORE FUN

ORANGE
FLAVOURED
FANTA

TASTES SO GOOD IT'S FUN
TO BE THIRSTY !

"Fanta" is a registered trade mark of

The Coca-Cola Company

Authorised Bottler :
PURE DRINKS (CAL) PVT. LTD.,
CALCUTTA

ফিল্ম শুধুই ফিল্ম

সেবাব্রত গুপ্ত

আমি ফিল্ম খুঁজছি। কথাটা শুনে অনেকেই হয়ত হাসবেন। ফিল্ম তো আছে এদেশে, কত ফিল্মই তো তৈরি হচ্ছে। সেটা আবার খুঁজতে হয় নাকি? খুঁজতে হয় বৈকি। চলচ্ছবি মাত্রই কি ফিল্ম? চলচ্চিত্র বা চলচ্ছবি কতই তো হয়। এখানে অবশ্য নামটাই বড় কথা নয়। নাম তো অনেক। প্রথম যুগে বলা হত—টকি, বায়োস্কোপ। বাঙালী বাবুরা বলতেন বই। সিনেমা দেখে এসে বলতেন বই দেখে এলাম। এখনও অবশ্য বলেন। 'সিনেমা' কথাটিও শোনা যায়। 'মুভী' বা 'মোশান পিকচার' নাম দুটি প্রবন্ধেই বেশি লেখা হয়, বলার সময় লোকে সিনেমা-ই বলে। তবে ফিল্ম কি কোন আলাদা বস্তু? মোটেই তা নয়। যে নামেই উল্লেখ করা হোক বস্তুটা আসলে একই। তবু 'ফিল্ম' নামটার মধ্যে যেন একটা 'কনোটেশন' বা জ্ঞাতার্থ আছে। ছবি, ছায়াছবি, ছায়াচিত্র, চলচ্চিত্র, চলচ্ছবি কিংবা ইংরেজিতে মুভী, মোশান পিকচার, টকি, বায়োস্কোপ ইত্যাদি 'ডিনোটেশন' বা বাচ্যার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত পক্ষে সব নামই 'ডিনোটেটিভ'। 'ফিল্ম' বা 'সিনেমা'-ও বাদ যায় না। তবে ফিল্ম ও সিনেমা শব্দ দুটি অন্যান্য নামের চেয়ে যেন অতিরিক্ত কিছু বোঝায়। ফিল্ম যদি ফিল্ম-ই হয় তবে তাকে যে-নামই দেওয়া হোক ক্ষতি নেই। আসলে ফিল্মকে ফিল্ম হতে হবে। গোদারের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম। অর্থাৎ ফিল্ম শুধু ফিল্মই। ফিল্ম 'বই' নয়, কেবল ছায়াচিত্র বা চলচ্চিত্রও নয়। ছবি যদি চলে বা কথা বলে তবেই সেটা ফিল্ম হয় না।

ফিল্মের বিশেষ লক্ষণ তবে কী? কাব্যশাস্ত্র যাঁদের পড়া তাঁরা কি 'ধ্বনি'-র সঙ্গে বলতে পারবেন? তবে ফিল্ম যেহেতু একটা ফলিত শিল্প বা অ্যাপ্লায়েড আর্ট তার কিছু লক্ষণ বা চিহ্নের কথা হয়ত বলা যেতে পারে। এই লক্ষণগুলোও বদলায়। কারণ ফিল্ম মিডিয়ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রতি-নিয়তই চলছে। ইতালির সিনেমার যখন নিও-রিয়া-লিজম এল, এদেশে যখন আমরা প্রথম ডি-সিকার "বাইসিকল থীফ" দেখলাম তখন আমরা সিনেমার নতুন পরিচয় পেলাম। সিনেমার প্রকৃত লক্ষণগুলি চিনতে অসুবিধে হল না। সিনেমা বা ফিল্মের সংজ্ঞা যেন অনেকটা পালটে গেল। আমরা তো সিনেমাকে 'বই' বলতাম। মনে করতাম, সিনেমা একটা গল্পের বা উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্প বা উপন্যাসটা যেমন পড়েছি ছায়াছবির পর্দায় তেমনটি দেখলেই হল। তাতেই সন্তুষ্ট। অতএব সিনেমা 'বই'। সিনেমাকে নাটক বলতেই বা ক্ষতি কী ছিল? ধারণাটা কিন্তু আজকের দিনেও পাল্টায় নি। এই ধারণা শুধু দর্শকদেরই নয়, চিত্রনির্মাতা-দেরও রয়েছে। দেখেছি ব্যক্তিদের অনেকেই এখনও মনে করেন যে গল্প বা উপন্যাসের হুবহু রূপ দিতে পারলেই সেটা সিনেমা হল। যে-কোন গল্পের বা উপন্যাসের চিত্ররূপান্তরই সিনেমা। পাতার পর পাতা উল্টে পড়ে যাওয়ার মতো রীলের পর রীল দেখে যাওয়া। —সিনেমা যেন এর বেশি কিছু নয়। সিনেমা মিডিয়মের আলাদা "ডাইমেনশন" আর তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবে একটি ঘোড়া দেখতে যেমন হুবহু তেমন একটি ছবি আঁকলেই কি সেটা আর্ট হয়? তার চাইতে ঘোড়ার একটি ফটোগ্রাফ নিলেই হয়। আর্ট বাস্তবকেই প্রকাশ করবে তার নিজস্ব মিডিয়মে, অতিরিক্ত ব্যঞ্জনায়। ঘোড়ার অবিকল চিত্র তো প্রামাণিক ছবি, শিল্পসৃষ্টি নয়। তেমনি গল্পে যে-সব ঘটনা আছে সেগুলি অবিকৃত রূপে চলচ্চিত্রে দেখালেই কি সেটা সিনেমা হল? তার মধ্যে আর্ট কোথায়? শিল্পের নিজস্ব ধর্ম, স্বভাব বা লক্ষণ কোথায়? ফিল্ম কি একটি ব্যয়সেন্দ্রিয় আর্ট-মিডিয়াম নয়?

চলচ্চিত্রকার আসলে "রাইটার উইথ এ ক্যামেরা"। অবশ্য সব চলচ্চিত্রকারই তা নন। একটি বিদেশী পত্রিকা কয়েক বছর আগে পৃথিবীর দশ জন

শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের তালিকা রচনা করেছিলেন। তাঁদের "রাইটার উইথ এ ক্যামেরা" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের নাম ছিল। ক্যামেরার ভাষা—যাকে বলে "ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ"—আয়ত্ত করার চেষ্টা এদেশে হয়নি। যে-কারণে এদেশে ফিল্ম একটা আলাদা আর্ট মিডিয়ম হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যান্য দেশেও চলচ্চিত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সম্ভব হয়েছে তা নয়। তবে অন্যান্য দেশ এক্ষেত্রে অনেক আগেই এগিয়ে গেছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে সব দেশেই অল্প-বিস্তর কমার্শিয়াল সিনেমা আছে। তারই সঙ্গে রয়েছে "প্যারালাল সিনেমা", যাতে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়। অন্য সব উন্নত দেশের সিনেমায়—যদি সেটা তথা-কথিত অর্থে কমার্শিয়ালও হয়—ফিল্মের স্বাভাবিক গুণগুলি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে আমাদের দেশের ফিল্ম কিন্তু ততটা "ফিল্মিক" হয়ে উঠতে পারছে না।

ফিল্মের শর্ত লক্ষণ বা গুণ প্রকৃতপক্ষে কী সেটা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কোন লিখিত ব্যাকরণ নেই। বিভিন্ন পরীক্ষাকর্মের ভিতর দিয়ে নানারকম স্টাইলের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন রকমের প্রকরণও দেখা যায়। এই স্টাইল ও প্রকরণের বিভিন্ন নামও দেওয়া হয়। নামকরণের দায়িত্বটা সমালোচকদের। ওঁরাই ইতালির বিশেষ ধারায় সিনেমাকে 'নিও-রিয়ালিজম' আখ্যা দিয়েছিলেন। তার চেয়েও আধুনিক একটি স্টাইল দেখা গেল পরবর্তীকালে ফ্রান্সে। সেটাকে বলা হল নিউ ওয়েভ। ফরাসী "নিউ ওয়েভ" আধুনিক চলচ্চিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ পরিচালকরা কিন্তু কোন বিশেষ রীতিতে আবদ্ধ থাকতে রাজি নন। "ছাঁহিয়ে দু সিনেমা"—আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু ইংমার বার্গম্যানের ছবিকে ওই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। "উইন্টার লাইট" তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, নিজস্ব স্টাইলে তিনি ওই ছবি করেছেন। "সায়লেন্স" ছবিটাও তাই। সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালি"তে কেউ কেউ রেনোয়ার প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন। আমার মতে, সেটা দেখার ভুল। নতুন কিছু দেখলেই সমালোচকরা তার তুলনা খোঁজেন। তাই "নিও-রিয়ালিজম"-এর লক্ষণই হয়তো তাঁরা ওই ছবিতে দেখতে পেয়েছিলেন। কারণ 'নিও-রিয়ালিজম' ছাড়া আর কোন বড় রকমের স্টাইল তখন চোখের সামনে ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তীকালের ছবিকেও কিন্তু "নিউ-ওয়েভ"-এর শ্রেণীতে ফেলা যায় না। সত্যজিৎ রায়ের স্টাইল তাঁর নিজেরই স্টাইল, বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা পাল্টায়। যেমন চারুলতা-তে যে স্টাইল, প্রতিদ্বন্দ্বী-তে সেটা নেই।

ফিল্ম, আগেই বলেছি, এক জাতীয় আপ্লায়েড আর্ট। প্রয়োগ বা ট্রিটমেন্ট-এর মধ্য দিয়েই নতুন স্টাইল তৈরী হয়। নতুন ধারা ও রীতির নতুন নামকরণও ঘটতে থাকে। কিন্তু ফিল্ম কোন নিয়ম, নাম বা ব্যাকরণে বদ্ধ থাকতে পারে না। যে স্টাইলেই তৈরি হোক, ফিল্ম মূলত ফিল্ম হবে। কথাটার মধ্যে কোন হেঁয়ালি নেই। ফিল্ম তার নিজস্ব ভাষায় কিছু বলবে। ক্যামেরার ভাষা ও কলমের ভাষা এক নয়। এখানেই ফিল্মের স্বাতন্ত্র্য, ফিল্ম-আর্টের রাজ্য। ফিল্মে গল্পের অতিরিক্ত কিছু মিলবে, নতুন একটা 'ডাইমেনশন' পাওয়া যাবে। ফিল্ম, এক্ষেত্রে, শুধুই ফিল্ম।

Power Cables & Electricals Pvt. Ltd.

'POWR COURT'

20A, CAMAC STREET, CALAUTTA

DELTONS

Telephone (Pair) Cables, Switchboard Cables, Microphone Cables, Coaxial (RF) Cables, Television Cables, Flexible Wires, Auto Cables, Automatic Voltage Stabilizers and telephone Coiled Cords etc.

Manufacturers of :

CABLE ACCESSORIES

WE ALSO HELP
BUILD UP A NEW BENGAL

We finance
Co-operatives

We finance Engineers' Co-operatives
&
Industrial Co-operatives to provide gainful employment to the unemployed Youth of Bengal

We assist transport workers' through Co-operatives

We also help hold the price line through financing of Consumers' Co-operatives

WE ARE HERE TO SERVE BENGAL EVEN WITH OUR SMALL MEANS

K. D. Sengupta, M.L.A.

CHAIRMAN

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

24 A, WATERLOO STREET CALCUTTA-1.

যুবমানসে চলচ্চিত্র

উত্তমকুমার

সাহিত্যিক আমি নই, সাহিত্য আমার পেশা নয় বটে তবে সুসাহিত্য আমার নেশা। অসুবিধা সত্ত্বেও কলম ধরতে হচ্ছে, কারণ মনে অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। অভিনয়ের সাথে আমার অনেক দিনের নিবিড় সম্পর্ক তাই চলচ্চিত্রের ধর্ম আর কনটেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে মন চায়, মনে হয় যা পেলাম এই সব নয়, আরও অনেক কিছু দেবার আছে—জানার আছে—যা মনের গভীরে ভিড় করে আছে—সংঘাত করছে প্রতি-নিয়ত—প্রশ্ন করছে—উত্তর চাইছে। আমি শিল্পী, আমি এর ব্যতিক্রম নই তাই সর্বদাই সচেষ্ট। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি সেই জায়গায় যেখানে চলচ্চিত্র আপামর জনমানসে এবং যুবমানসের একটি শক্ত হাতিয়াররূপে ও ভবিষ্যৎ সুশৃংখল জীবনের সার্থক বন্ধুরূপে গণ্য হ'বে।

লেনিন বলেছিলেন, "of all arts cinema is the most important" এবং এ কথাটি বলেছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পের শৈশবে তার নির্বাক অবস্থায়। তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি যে উক্তি করেছিলেন তা আজ সার্থক। আজ চলচ্চিত্র এক শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম।

আজকাল যে কোন প্রেক্ষাগৃহের সামনে দাঁড়ালেই দেখা যাবে, দলে দলে তরুণ তরুণী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও সিনেমা দেখে ফিরছে। প্রায় সকলেই ঠিক বলে দেবেন, কোন হাউসে কি বই হচ্ছে, ক' সপ্তাহ চলছে এবং

তাতে কে বা কারা অভিনয় করছে, সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে চলচ্চিত্রের সামাজিক প্রভাব যুবমানসে অর্থাৎ চলচ্চিত্র বাস্তবক্ষেত্রে অনেকখানি আমাদের সবলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজ জীবনের ঘরে বাইরে আজ চলচ্চিত্রের এমনই অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। আমার মনে হয় চলচ্চিত্রের এই অসীম প্রভাব যুব সম্প্রদায়ের উপরই সবচেয়ে বেশি পড়ছে—কারণ অনেক—তবুও মনে হয় যন্ত্রণা-জর্জর সমাজ-জীবনে সিনেমা তাঁদের কাছে কিছুটা যন্ত্রণা উপশমের 'সেডাটিভ্' ওষুধের মতন কাজ করে। অস্বীকার করা যায় না এঁদের এই অশান্ত মানসিকতাকে, যা প্রতিনিয়ত নিজের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে—আসবার চেষ্টা করছে সঠিক পন্থায়, স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীতে ও চিন্তাধারায়।

সিনেমা মানেই ভাল গল্প, রসোত্তীর্ণ কাহিনী, অন্ততঃ এদেশে এখনো সিনেমার এইটিই প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। মুভি দর্শককে মুভ না করলে সেটা নাকি মুভি নয়, তাই গল্পও মেলেনা ফলে ক্রাইম, সেক্স ও গ্ল্যামার প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটি হাস্যকর জগা-খিচুড়ি তৈরী হয় যা জনমানসে চিরস্থায়ী আঁচড় কাটতে সক্ষম এবং অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলা ছবিও সময়ে সময়ে এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং যার ফলে গল্পের উপর প্রাধান্য কমে যায়। আমার মতে সিনেমা যখন সর্বাংশে সিনেমা নয় তখন গল্পের উপর জোর দিতে আপত্তি কি। সাহিত্য বিজ্ঞান ও ললিতকলার সংমিশ্রণে গঠিত এই চলচ্চিত্রশিল্প, এবং আমার মতে এখানেই শিল্পীর অভিনয়ের পূর্ণতা ও সার্থকতা।

লিখতে লিখতে বারবারই বাংলা ছবির সমস্যার কথাই আমার এসে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমার মোটেই অভিপ্রেত ছিলনা। বাংলাছবির সমস্যাগুলি কিন্তু সকলেরই জানা—প্রদর্শনের অব্যবস্থা, হিন্দীচিত্রের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়া, অতি ছোট বাজার ইত্যাদি। মূল সমস্যাকে অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাননা, সে হ'ল বাংলাছবির চিত্ত-বিনোদনের ক্ষমতা হ্রাস। এইবিনোদনীশক্তি কিভাবে ফিরে পাওয়া যায় তার জন্য সংচেষ্টার প্রয়োজন। বাধা অনেক জানি, তবুও আমাদের চেষ্টা করতে হবে, তৈরী করতে হবে ইণ্ডাষ্ট্রি; বাঁচাবার জন্য সুস্থ কমার্শিয়াল ছবি।

ডকুমেন্টারী ছবি চলচ্চিত্রের একটি অংগ, ব্যবসার ক্ষেত্রে সীমিত থাকার দরুণ ডকুমেন্টারী চলচ্চিত্র কাহিনী চিত্রের মত জনচিত্তে অতটা প্রসারতা বা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। অথচ ডকুমেন্টারী ছবির অসামান্য মূল্যকে অস্বীকার করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। "বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্বই চলচ্চিত্র" এবং মূলতঃ এই ধারণা থেকে ডকুমেন্টারী ছবি উদ্ভূত, কিন্তু কাহিনী চিত্রের সংগে এর অনেক বৈসাদৃশ্য। শিল্পী হিসাবে আমার মনে হয় যদি কোন সার্থক পরিচালক তাঁর ক্যামেরাকে নিছক নিউজরীলে পরিণত না করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন এবং বাস্তব জীবনের হতাশা, বঞ্চনা, ঘাত-প্রতিঘাত ও তাঁর ছোটবড় নানা সমস্যাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করতে সক্ষম হন তবেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীপ্রসূত পরিচ্ছন্ন ছবির জন্ম সম্ভব হবে এবং যা সত্য গতানুগতিক ছবি না হয়ে, একটি পরিষ্কার চিত্তবিনোদনকারী ছবি হ'বে। আমাদের জীবনযাত্রা আজ এমন জটিল যে দিনের অর্ধেক সময়েই আমরা কর্মের ঘানি টেনে মরছি, যার জন্য এই কর্মশ্রান্ত জীবনে কিছুক্ষণের জন্য হাঁপ ছাড়বার মনোবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি চলচ্চিত্র মানুষের এই একঘেয়েমী জীবনে কিছুটা উন্মুক্ত অবসরের সান্নিধ্য এনে দেয়। সুতরাং যদি entertainment picture-এর মধ্য দিয়ে আমরা শিল্পীসমাজ যুবসমাজকে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, উন্নতশুচিমুখী করতে পারি, জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রণোদিত করতে পারি তবেই শিল্পী জীবনের সার্থকতালাভ করা সম্ভব। বর্তমানে আমরা চলচ্চিত্রবিহীন সামাজিক জীবন কল্পনা করতে পারি না বলেই সমাজ জীবনের উপর এর গুরুত্বকেও অস্বীকার করতে পারছি না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই চলচ্চিত্রকে আজ আনন্দ দানের মধ্য দিয়েই যুবসম্প্রদায়কে

হতাশার গ্লানি থেকে টেনে এনে সুস্থ সমাজ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্বও এতটুকু কম নয় এবং প্রয়োজন হলে সরকারকে বিকৃত রুচির ছবি তৈরীর কাজ নির্মমভাবে বন্ধ করে দিতে হবে, নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে যুব-সম্প্রদায়কে বাঁচাতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীপ্রিয় দাসমুনসী ও শ্রীসুব্রত মুখার্জির নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ বাংলাছবির উন্নতমানের ক্ষেত্রে এদের সক্রিয়তা ও সহযোগিতা অনস্বীকার্য।

বেশি লিখলে পুনরাবৃত্তি হতে পারে ভেবে বেশি লিখব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এই প্রসংগে একটি কথা না লিখে পারছিনা কারণ তা না হ'লে অনেকের কাছেই হয়তো আমার বক্তব্য অপরিষ্কার ও দুর্বোধ্য হতে পারে। Entertainment picture বলতে আমি রুচিসম্মত প্রমোদচিত্রেরই কথা বলছি, মূলতঃ বাংলা ছবি নিয়ে আমার আশংকার কারণ এইখানেই। আমি বলতে চেয়েছি বাংলা ছবির লুপ্ত জীবনীশক্তি ফিরে পাওয়া দরকার। দর্শক আসলে অনেক রকমের। রুচি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী তাঁদের ভাগ করা যায়। শিল্প-সমৃদ্ধ ছবিরই খুব আসবে এমন ভরসা কোন কালেই ছিল না, এখনও নেই। আমি মনে করি রুচিসম্মত বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে এবং পরিচালনা অভিনয় থেকে শুরু করে যার প্রয়োগরীতির সঠিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে প্রমোদ চিত্র করতে হবে, ছবি দেখে দর্শক খুশিতে উছল হবেন, শুধু গান নয়, টেকনিক নয়, ছবির সংলাপও লোকের মুখে মুখে ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চলচ্চিত্র নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই এবং বেশির ভাগই এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। আর্ট ফিল্মের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে এবং সিনেমা নামক মিডিয়ামটি আর্টের পর্যায়ে আসল কিনা সেটাও আমাদের দেখা দরকার। তবে মনে হয় চলচ্চিত্রে মর্যাদার প্রশ্নও যেমন আছে তেমনি ইন্ডাস্ট্রিকে যথাযথ ভাবে চালিয়ে এর কলাকুশলীদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বকেও কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায়না! বাংলা ছবির নিজস্ব একটা অবেদন আছে এবং কিছু ক্ষেত্রে যদি এই সদ্গুণ বা আর্টকে নির্ভর না করে রুচিসম্মত প্রমোদ চিত্রের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায় আশা করা যায় ঐ শক্তি প্রয়োগে শিল্পগুণান্বিত ছবির সাম্রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করা যাবে। ছবির উপভোগ্যতা বাড়ানোটাই এখন কাম্য বা দায়িত্ব এবং আর্ট ও entertainment picture এর যদি যথাযথ সমন্বয় ঘটানো যায় তবে ভবিষ্যৎ যুব-সমাজে বাংলা ছবি নিয়ে নৈরাশ্য বা উদ্বেগের কোন কারণ নাও থাকতে পারে।

আশা রাখি, আশা রাখব যুবসম্প্রদায় এগিয়ে আসবে—চলার পথে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি আছে, তবুও নূতন দিনের নূতন সম্ভাবনার আশায় দিন গুণবো—দিন গুণছি।

Phone 58-3895

SANDHYA CINEMA

KHARDAH

B. T. ROAD, P. O. TITAGHUR,

24 PARGANAS.

With best compliments from :

RAI BAHADUR R. M. DASS & BROTHERS (PRIVATE) LIMITED

P-241, LAKE ROAD,
CALCUTTA-700 029

Agents of

SANTI TEA ESTATE (PRIVATE) LIMITED

AND

KAMINI TEA COMPANY (PRIVATE) LTD

With the best Compliments :

STAR LABORATORIES
[P] LTD.

128/3, HAZRA ROAD,
CALCUTTA-700026

কেয়ো-কার্পিন
আপনার চুলের
সত্যিকারের যত্ন নেয়

যে'র মেডিকেলের তৈরী

কড়চা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তার নাম আজরাইল

হাজি মেহের আলি কুলবেড়ের মাঠে ধান দেখতে গিয়েছিল। ক্যানেলের জলে চাষ। গতরাতে হঠাৎ তেত্রিশ মিনিটের বৃষ্টিতেই ক্ষয়াটে সবুজ রং জেলা ফিরে পেয়েছে। আসমান-জমিন জুড়ে এই রঙের খেলা হাজার বছর ধরে লোকের দেখেও তৃপ্তি নেই। এসে দেখে যায়। বাকি জীবন

এমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে যদি কাটানো যেত! সবুজ আগুনে চোখের বাইরে ও ভেতরে ঝলকঝক করে। রেলপার থেকে হঠাৎ একটা বেলেল্লা হাওয়া দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজি মেহের আলির টুপি কেড়ে কুলের কোপে ছুড়ে দেয়। বেতামিজ!

টুপি কুড়িয়ে মাথায় পরে দুহাত মুখের ওপর তুলে সে আল্লাতালাকে কিছু বলতে গিয়েই বাপ্ বলে পড়ে গেল। ভিজে দুর্বাঘাসের ওপর রক্ত মাখামাখি। তখনও হাজি মেহের আলির চোখের মধ্যে সবুজ ঝলকঝক আগুনটা কাঁপছে। পবিত্র আরবের বাজারে কেনা প্রকাণ্ড ঘড়ির কাঁটাদুটো কব্জিতে জ্বলজ্বল করছে।

তিনবার মক্কায় গিয়ে সে আল্লার ঘর দেখে এসেছে। শেষবার উড়োজাহাজে। সাত-সাতটা আসমানের ওপরে বেহেশত। হাজি মাত্র এক আসমান ওপরে যেতে পেরেছিল। এদানিং মসজিদের ভেতর এককোণায় মশারির মধ্যে 'এতেকাফ' বা নির্জন উপাসনাব্রত পালন করত। নাতিরা খাবার-দাবার রেখে আসত মশারির বাইরে। হাতমুখ ধোবার 'সেলেপ্‌চি' ছিল। জৈবকর্মের জন্যে মাটির হাঁড়িও ছিল। সাতদিন সাতটা রাতের ওই মহাব্রত আজ শেষ হয়েছে দুপুরে। বিকেলের নামাজ আজ সবার সঙ্গে পড়েছে। তারপর বাড়ি না গিয়ে সোজা কুলবেড়ের মাঠে।

মাঠের জন্যে মন কাঁদছিল মেহের আলির। সাতপুরুষে চাষবাস। তার আগে নাকি ছিল পাঠান জায়গীরদার। কোমরে তরোয়াল, মাথায় জরিদার মখমলের পাগড়ি। জায়গীরদারের বাপ এসেছিল পারস্য থেকে। তরোয়াল রেখে দিল্লির বাদশাকে সেলাম করেছিল।.....

এসব গল্পকথা গ্রাজুয়েট নাতি কামালের প্রচার। ডাক-নাম খোকা—খোকামিয়া। দাদু যখন কুলবেড়ের মাঠে ভিজে দুর্বার ওপর শুয়ে আছে, তখন সে মনিগ্রাম স্টেশনের প্ল্যাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে। সাড়ে পাঁচটার ডাউনে কে যেন আসবে। আনতে গেছে। প্ল্যাটফর্মের রেলিঙে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে সিগ্রেট টানছে। লাইনের বাঁকের মুখে ডাউনের ডিসট্যান্ট সিগনাল কাত হ'ল। দক্ষিণে শেষবেলার পাংশুটে আকাশে কয়েকপোঁচ ধোঁয়া। একঝাঁক বুনো হাঁস চলে গেল পাঁক পাঁক করে ডাকতে ডাকতে। কুলবেড়ের বিলে সিজন শুরু।.....

হাজির দুটো চোখ খোলা। চোখের মধ্যে শাশ্বত সবুজ শিখা, আসমানের ধূসর রঙ পিছলে যায় এমন তার জেল্লা। মুখের ওপর একটা গাংফড়িং উড়ছে। সাদা লক্কেথের বোরার রক্তের গন্ধ শুঁকছে একটা খর্বুটে ঘাস-ফড়িং। পা বেয়ে কয়েকটা লালপোকা নীলপোকা নির্ভয়ে উঠে গেল। পিঠের তলা থেকে ছত্রভঙ্গ কালো বিষ-পিঁপড়ের ঝাঁক হাতার ভিতর ঢুকে বুকঅব্দি চলে গেল। যার যতটুকু বিষ আছে, প্রাণভরে ঢালে।.....

হাজি মেহের আলি আল্লার জন্যে অতসব করেও শেষ আওয়াজ দিয়ে গেল—বাপ্! তার বাপ ছিল ফয়েজ আলি। ছোটখাটো ভাগচাষী। কুলবেড়ের মাঠ বাঁচাতে লিড নিয়েছিল সাতটা গাঁয়ের। সাড়ে ছ'ফুট উঁচু পাহাড় মানুষ। বাঁধের জন্যে প্রথম কোদালের কোপ মেরেছিল—আ—অ-ক্! মাটির পাতালে শয়তান থরথর করে কেঁপেছিল। তারপর মাঠ ঘিরে হাজারটা কোদাল উঠছে আর পড়ছে। মুথো ঘাসের চাবড়া উঠছে চড়চড়িয়ে। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্... চাপা আওয়াজ বাঁকের মতো অর্ধবৃত্তাকার—কী দিন কী রাত, কী জ্যোৎস্না কী অন্ধকারে প্রসারিত বিশাল মাঠে হাজার হাজার কোদালের আওয়াজ হাজি মেহের আলি আজীবন শুনেছে—এই সবের মধ্যে একটা আওয়াজ তার বাপেরও, এতে বুকের ছাতি কতটা বেড়ে যায়, বাবু তুমি, বুঝবে না।...

প্রথম শরতের শেষ বিকেলে ধর্মপ্রাণ নির্জন ব্রত-পালনকারী বুড়ো থুত্থুড়ে লোকটা কোপ খেয়েই তাই যেন তার আল্লার কথা ভুলে বাপ বলে ডেকে ওঠে।

বাঁধের বনকুল শেয়াকুল বৈঁচিঝোপের ওপর নতুন কুয়াসার লম্বা পোঁচ বুলে আছে। তারমধ্যে তিনটে কালো কালো ছায়া পালাচ্ছে। হলদে চাকাটা তখন মেনকানদীর ওপারে মাঠের শেষ মাথায় লাল হয়ে এগারো হাজার ভোল্ট এসি কারেন্টের শক খেয়ে আটকে গেছে। তাই নামতে বড় দেরী হচ্ছে। নামলেই তিনটে ছায়া কেউ দেখে ফেলার আগে কালো পর্দার তলায় লুকোতে পারবে। দম আটকে যায় এসব সময়। মাথার ঘিলুতে যা রক্ত চড়েছিল, ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে। স্বপ্নের মধ্যে দৌড়ানো।...

এদিকে হাজির লাস কথা বলছে: বাবু, তুমি

ইসলামী তত্ত্বকথা বুঝবে কি? 'মালেক-উল-মউত'—মৃত্যুর রাজা এক 'ফেরেশতা', তোমাদের হিন্দুধর্মে বলে দেবদূত। যমরাজের চেলা। আমাদের ওই একজন স্বয়ং মৃত্যুরাজ, 'আজরাইল' তাঁর নাম। কত চেহারায় তিনি প্রাণ কাড়তে আসেন।

...দাতার দাতা হাতেমতাই চলেছেন রাস্তায়। হঠাৎ দেখেন, একটা সাপ ক্ষেতের লোকটাকে কামড়ে দিল। লোকটা মরে গেল। দাতা হাতেমতাই অবাক, সেই সাপ মানুষের মূর্তি ধরেছে। পিছু ছাড়েন না হাতেম। কে ও? একখানে আরেকটা লোকের কাছে যেতেই সে সেই সাপ-লোকটাকে 'ভাই, তুই ও কী করেছিস' বলে ঝগড়া করতে লাগল। দুজনায় প্রচণ্ড ঝগড়া। তারপর সাপ-লোক, বড় ভাই তখন, ছোটর মাথায় টাঙির কোপ বসিয়ে দিল। দিয়ে তো পালাচ্ছে। হাতেম পিছু ছাড়েন না। একখানে ডালে বসে আছে এক কাঠুরে, কাঠ কাটতে উঠেছে গাছে। আজব লোকটা আচমকা পিঁপড়ে হয়ে কুটুস করে কামড়ে দিল। অমনি কাঠুরে গাছ থেকে পড়ে কলজে ফাটাল। হাতেম গিয়ে ধরলেন—বলোতো বাবা, কে তুমি?

...তো বাবুমশাই, এই ওনার রীতি। কখন কীরূপে আসেন! আমি আজ সত্তর বছরের খটখটে বুড়ো। শত্ত প্রাণ, যেতে চায় না নয়, আসলে ওনার আসার সময় হয় নি। বাবু, আমাকে একলাদোকলা ঘোরার ভয় দেখিও না। জানত আমার কোন দুষমণ নেই। যদি কেউ থাকে, জেনো তিনি আজরাইল। ছুতো খোঁজা ওনার স্বভাব, এই যা।...

নির্জনতাব্রতের আগের দিন অব্দি হাজি মেহের আলির ছিল এই বুলি। সাতকড়ি গোঁসাই গাঁয়ের ডাক্তার। হাজি-বাড়ির অসুখবিসুখের সঙ্গে নাড়ি গিঁট পাকিয়ে আছে। পরস্পর তুমিটা চলে, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়তেন। কোথায় কী আঁচ করে হুঁসিয়ারি দিয়েছিলেন, এখনও কেউ জানে না। জানলেও বিশ্বাস করবে না। সাতকড়ি গোঁসাই এখন ইয়াসিন কাজীর মেয়ের নাড়ি টিপে বাড়ি ফিরছেন। কুলপকেটে চারটে মুর্গির ডিম। কাজী নিষ্কর্মা ছিল, পোলিট্রি করেছে। রোজ ভোরের ট্রেনে দুশো ডিম চালান দেয় কলকাতায়। একমাইল রাস্তায় পিচ পড়েছে। রিকশো চলছে। একটা বাসও আসে যায় দিনে রাতে ছ'বার। কুলবেড়ের ক্ষেতের সব্জী ফলমূল দুহাতে নিয়ে পালাচ্ছে কলকাতা। মাসে মাছ ডিম দুধ, আর চালও। লোকাল পিপ্‌ল্‌ খাবে কী? ততো কাঁচা পয়সাই বা কোথায়? সাতকড়ি বকবক করছেন তখনও বারোয়ারি বটতলায় দাঁড়িয়ে।...হুঁঃ। দিলে তো তার বুদ্ধিয়ে মাথার ওপর। কুলবেড়ে ছিল আদাড় গাঁ, সেখানে শহর বসালে। এদিকে ভেতরে ছুঁড়োর কেত্তন অষ্টপ্রহর। আলো জ্বাললেই ছায়া। এ হয়েছে তাই।

ভাদ্রের পাকা বটফলের হলদে গুঁড়োতে লাল সিলেন্টের চক্কর মাখামাখি। মাথার ওপর পাখপাখালির চাঁচামিচিতে হুলুস্থুল পড়েছে। ঘরবাড়ির মাথায় ঘননীল চাপচাপ ধোঁয়া থেমে আছে। বৃষ্টির রস এখনও মাটির গা থেকে শুকোয়নি, যদিও রোদ চড়ো গেছে সারাটা দিন। দেখতে দেখতে রাস্তার ধারে শালকাঠের খুঁটির ডগায় খুচ্‌খাচ্‌ বাল্ব জ্বলে উঠল। পঞ্চায়েতের মিটারবক্সের কাঁটা জোরে ঘুরতে থাকল। এখন কৃষ্ণপক্ষ, ভাই। চাঁদওঠার তিনরাত পরে ওই হাসিটুকুন ফুটতে লোকের ঘুমের সময় হবে। সপ্তমী থেকে তো আর ফুটবেই না চতুর্দশীঅব্দি। প্রবাদের বয়স কম, কিন্তু হিসেবী।...

তখন কুলবেড়ের মাঠে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে একটা ক্ষ্যাপাটে লোক চেরা গলায় গাঁয়ের দিক মুখ করে চেঁচাচ্ছে: খোকা—আ-আ-আ! খোকা মিয়া—আ-আ-আ।

একটু দূরে একই বাঁধের ওপর নমাজ পড়তে পড়তে তিনজন ধার্মিক ক্ষেতমজুর দুকাঁধের দেবদূতদ্বয়কে মুখ ঘুরিয়ে সেলাম করার পর চমকায় এবং কান পাতে। শেষ বেলায় একটা বেতমিজ হাওয়া এসেছে উল্টো দিক থেকে। আর মাথার ওপর বুনো হাঁসের শনশনানি, কো-আ-কু! কো-আ-কু! কী হল, বোঝা যায় না।

বিল থেকে উঠে আসতে আসতে বাঁদী মেয়েরা থমকে দাঁড়ায়। জলভরা ধানক্ষেতে আলের কোলে শেষ আগাছা মুঠোয় কুড়িয়ে রেখেই কুলাইপাড়ার মুনিশটা ঘুরে তাকায়। জলেকাদায় নোংরা ভূতের মূর্তি।

খোকা—আ—আ—আ! খোকা মিয়া—আ—আ—আ! লালচাকাটা ইতিমধ্যে এগারোহাজার ভোল্ট এসি কারেন্টের থাবার বাদুড়ের লাস হয়ে নিঃশব্দে নীচের গর্তে পড়ে গেছে। শরতের ধোয়ামোছা তকতকে আকাশে নক্ষত্রের নীলামের ধুম পড়েছে। কোন কোণায় তাই ঢাকে গুড়-

গুড়ে কাঠি পড়ে। দূরদেশের পাহাড়ের শালবনে চরতে যাওয়া মেঘ মুখ তুলে ডাক ছেড়েছে। ডাকপুরুষের প্রবচন। আর কাশের ফুল চিরোল মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়েছে উল্টোদিকে। রাতে আবার বৃষ্টি নামবে। বর্ষের বেখাপচা টুকরো বালঝড়ে পাখিগুলোর কাজিয়া মিটমাট হয়ে এল। মাথা বাঁচাবার চেষ্টা এখন।...

রেললাইনে ধীরে সুস্থে এতক্ষণে আসছে আপ ফরাক্কা এক্সপ্রেস। মেনকার ব্রীজ ঝনঝনে উঠল এক লহমায়। ধান তোল্ তোল্, ধান তোল্ তোল্। মাঠের হৃদয়ে একটা কাঁপা শব্দ দুলতে দুলতে মিলিয়ে যায় দূরের আঁধারে।...

আপ ফরাক্কা এক্সপ্রেস

আপ ফারাক্কা এক্সপ্রেস আধঘন্টা লেট। প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। কী ভিড়, কী ভিড়! এখানেই গাড়ির অর্ধেক খালি হয়ে যায়। এরপর ফাঁকা মাঠে ঢিনের খেলনার মতো ঢল ঢল করতে করতে হাল্কা ট্রেন আরামে ছোটে। ফারাক্কা পৌঁছতে সেই রাত নটা।

ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল কামাল। ফার্স্টক্লাস কামরা মোটে দুটো। সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা দেখতে অদ্ভুত লাগে। ন্যাংটো কাচ্চাবাচ্চার পাল নিয়ে আধন্যাংটো মানুষগুলো ঘরে আগুন লাগার ভয় ও ব্যস্ততায় এ কামরা ও কামরা চুঁ মেরে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসে। দরজায় কে বলে উঠল—এ গাড়ি না, ফার্স্টক্লাস। বন্য কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ে তক্ষুনি—আমরা কি বানের জলে এসেছি! ওঠ্, ওঠ্। ওপরের লোকটা নামতে নামতে বলে—রেলে অরাজক পড়ে গেছে, শালা!

উঠতে গিয়ে জল ধসার চাপ। ছিটকে সরে দাঁড়ায় সবাই। ঠিক তাদের মতোই একটা দল পড়ি-কী-মরি করে নামছে। তারপর দরজায় এক ভদ্রমহিলা এলেন। মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন—কুলি, এই কুলি!

কামাল ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে ডাকে—কুলি! কুলি! মাসিমা, চিনতে পারছেন? আমি খোকা। কামাল।

একটুখানি তাকিয়ে হিরণ্ময়ী হাসেন।—কামাল! তুই? কতবড় হয়েছিস রে! চেনাই যায় না।

কিন্তু কুশল প্রশ্নের সময় নেই। দুর্মাল্য মোটে সতেজ। কামাল একটা নীলডাঁপরা দেশোহারা কুলির কাঁধ খামচে ধরে বলে—এধারে বাবা, এধারে। কোথায় ছুটেছ?

—বাবুই! তুই কী করছিস ওখানে? আমি দেখছি। নাম! হিরণ্ময়ী কাকেও বলেন। কুলি ওঁর পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে। কামরার ভেতর আলো কম। হুলুস্থুলে চলছে যেন। তোরঙ্গের ঘন্টান, চাপা দুমদাম শব্দ এটা-ওটা মালপত্তরের। কামাল প্রায় চেঁচিয়ে বলে—জানলা দিয়ে দাও। এই কুলি। মাসিমা, ওকে দেখিয়ে দিন।

এই সময় হাল্কা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়ায়। কাঁধজোড় চুল, টকটকে ফর্সা মুখ, লম্বাটে। হাতে খুপিমতো কুলি, কাঁধে কিটব্যাগ, আরও কী সব ঝুলছে—আরু, একটা ক্যামেরাও। কামাল একপলকে দেখে নেয়, হাতের মুঠোয় এখনও সানগ্লাস ভাঁজ করা। মাঠে পাখি উড়ে এসে বসার মতো শব্দহীন শান্ত দুটো পা পড়ল ভিজে সুরকিভরা চত্বরে। প্যাটপ্যাট করে এদিকওদিক দেখতে লাগল।

কম জিনিস আনেন নি হিরণ্ময়ী। বাক্সপেটরা মিলিয়ে দশটা মাল। গুণেগুণে মেলাচ্ছেন। দুটো মিনিট ফুরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের আপের মুখে নীচু সিগনাল সবুজ হতেই গার্ড হুইস্‌লে বাজিয়ে দিল। শেষবার চেঁচামেচি ছুটোছুটি, আগুন আগুন! একটা ফুকপরা চাষাভুষোর মেয়ে হিরণ্ময়ীর বড় সুটকেসে হোঁচট খেয়ে পড়েই আঞ্চলিক ভাষায় কেঁদে উঠল—ও রি মা রি! রি রে'র অপভ্রংশ। কামাল দেখে, মেয়েটি তাকে শান্তভাবে দুহাতে তুলে দাঁড় করিয়ে দিতেই একটা ধুমসী চাষীবউ লুফে নিয়ে গেল। ট্রেন শিস দিয়েছে। চাকায় টান পড়েছে। চাষীবউ পাদানিতে পা দেবার মুহূর্তে মাঃ মাঃ চেঁচিয়ে ওঠে চেরা গলায়। কেউ তাকে টেনে ধাবমান সভ্যতার গর্তে ঢুকিয়ে দেয়। মেয়েটি তাকিয়ে আছে সেইদিকে। অন্ধকারে মাঠের কিঁঝিডাকা ট্রাডিশন মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে কলকাতা চলেছে ফরাক্কায়।

—মা, ফারাক্কা এখান থেকে খুব কাছে না?

হিরণ্ময়ী মালের সামনে দাঁড়িয়ে হিসেব করছিলেন। হেসে ওঠেন।—নাও, এসেই ফারাক্কা!

কামাল জানায়—রেলে খণ্টা তিন। বাসে আরও কম।

—ওখানে পদ্মা না? খুব বড় নদ। ব্রিজ? আচ্ছা, কী ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে?

বড় অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর মেয়েটির। হিরণ্ময়ীর সেই এতটুকু পুঁচকে মেয়ে—দোলনায় শুয়ে পাড়া মাথায় করত। ভাবা যায় না, পনের বছর সময়টা কী ভাবে ঝটপট করে গেল। এতক্ষণে মিরাকল্ মনে হয় কামালের। ইস্! দিনগুলো কী ভাবে যে হু হু করে খরচ হয়ে গেল। কামাল একটু হেসে বলে—কাগজে আজকাল সর্বাকছুর ইমেজ দাঁড় করায়। ফরাক্কা একটা বিশাল ব্যাপার নিশ্চয়। ব্রাঁজ ব্যারেজ ফিডার ক্যানেল এলাহী স্কিম। কিন্তু তাহলেও দেশে চমৎকার টুরিস্পেট আছে। পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল। ফারাক্কা তেমন কিছু না। অবশ্য সূর্য ওঠার সময় পুবে তাকালে মুগ্ধ হবার মতো সিনটিন আছে।

হিরণ্ময়ীর মাল মেলানো শেষ। কুলি দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়।—মাইজি! রিকশো লাগবে তো? নাকি গাড়ি-উড়ি আছে?

হিরণ্ময়ী বলেন—রিকশো।

কামাল ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—ভাববেন না। বলা আছে। তবে মনে হচ্ছে, আরো তিনটে লাগবে। মাল ওঠাও, ব্রাদার!

বাবুই হাসে। ব্রাদার বলার ভঙ্গীতে। কামাল কুলির মাথায় মাল তুলতে তুলতে বলে—আজকাল ডেমোক্রেসির ব্যাপার। সবাই ব্রাদার। মাসিমা,আপনি ব্যস্ত হবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হিরণ্ময়ী অবাক হয়ে বলেন—তুই রিকশো করে রেখেছিস! বলিস কী?

—বারে! সোনাদা বলল, আপনার চিঠি এসেছে। চলে আসছেন আজ ফরাক্কা আপে।

—ও, তাই বল। সোনাই তোকে পাঠিয়েছে! কেন? ওর কী হল? অসুখ-বিসুখ নাকি?

কামাল একটু ক্ষুণ্ণ হয়। বলে—না তো! বিকেলে দেখা হল বাজারে। বললুম, মাসিমাকে আনতে যাবে না? বলল—

হিরণ্ময়ী আনমনে বলেন—উঁ?

সোনাদার কথাটা যেন ভুলেই গেল কামাল। মালের সঙ্গে হনহন করে সে এগিয়ে যায়। হিরণ্ময়ী ফোস করে নিশ্বাস ফেলেন। বাবুই বলে—সোনাদাটা কে?

—তোর মনে পড়বে না। দুএকবার গেছে, সে অনেক দিন আগে।

—আহা, লোকটা কে?

—তোর বাবার খুড়তুতো বোনের ছেলে।

অঙ্ক না কষে বের করা যায় না বুঝি? বাবুই খিলখিল করে হাসে।—বললেই পারো, আমার পিসতুতো দাদা!

হিরণ্ময়ী একটু বিরক্ত হন।—আমি তোর মতো অঙ্ক জানিনে। আত্মীয়কুটুম্বের বাড়ি কুটুম্বিতে করতেও আসিনি। সবাইকে তো চিনেই গিয়েছিলুম। আবার নতুন করে কী চিনবো? দেখছিস না— সোনাকে লিখলুম, স্টেশনে থাকবে। গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা করবে। কোথায় কী?

—ওই ভদ্রলোককে তো পাঠিয়েছেন!

—কামালকে? দুঃখে হাসেন হিরণ্ময়ী। এটুকু বুঝতে তার দেরী হয়নি যে কামাল নিজেই এসেছে খবর পেয়ে।

বাবুই বলে—ভদ্রলোকের নাম বুঝি কামাল?

—হ্যাঁ। মুসলমানপাড়ার। অবশ্য ওরা থাকে কুলবেড়েতে, আমরা যাব মনিগ্রামে। মধ্যে রাস্তা, দুধারে দুটো গ্রাম। গিয়েই দেখবি।...আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান হিরণ্ময়ী। ফের বলেন—এই ছেলেটাকে একরকম জোর করেই তোর বাবা স্কুলে এনেছিলেন। চাষী ফ্যামিলির ছেলে। ওর বাবা এখনও হয়তো মাঠে হাল টানে। তোর বাবা ওকে ওর দাদু হাজিসায়েবের কাছে ভিক্ষে নিয়েছিলেন বলা যায়। পড়ার খরচ সব আমার। তোমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

বাবুইয়ের জানবার ইচ্ছে বেড়ে যায়।—কেন? ওরা গরীব বুঝি?

—মোটেও না। বিরাট জোতদার। পাকা বাড়ি আছে। অথচ দেখবি, গেটে লাঙল ঝুলছে।...হিরণ্ময়ী হাসতে-হাসতে বলেন।—তোর বাবা ওদের বাড়ির গল্প করতেন।

বাবুই আস্তে বলে—ভদ্রলোককে মুসলমান বলে ভাবিই নি।

—কেন?

—না। মানে, ধুতি পানজাবি পরে আছেন!

হিরণ্ময়ী সতর্কার নিজের দেশের অন্যতম মানুষ হয়ে যান তক্ষুনি। অন্যরকম গলায় বলেন—আমি এই এলাকার মেয়ে, বাবুই। তুইও অবশ্য জন্মেছিলি এখানে। কিন্তু দুবছরের মেয়ে যখন, আমরা কলকাতা চলে গেলুম। তা যা বলছিলুম, এখানে মুসলমানরা পয়সা হলেই ধুতি পানজাবি পরে। শুনেছি, ইস্টবেঙ্গলে অন্যরকম। ওয়েস্টবেঙ্গলে——মানে আমাদের এই রাঢ় অঞ্চলে আবার পুরো অন্যরকম।

—মাসিমা! কামাল চলে এসেছে। আমার চেনাজানা বিশ্বাসী রিকশোওলা। ভয় নেই, কিচ্ছু হারাবেনা। আরও তিনজন জুটিয়ে আনলুম। ওহে, তোমরা ব্রাদার সব ভাগ করে নাও। কখনও লুটপাট করেছ? করনি? বলো কী ব্রাদার! মনে করো, লুটপাটের বখরা নিয়ে যাচ্ছ। হুঁ, ঝটপট!

হিরণ্ময়ী ও বাবুই একসঙ্গে হেসে ওঠেন। রেলকুলি আর কিছু না পেয়ে মাইজীর হাতের বড়সড় ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ায়।—মাইজী! ওটা দিন, লিয়ে যাই।

হিরণ্ময়ী আঁতকে ওঠেন।—না, বাবা। এটা থাক্। তুমি পয়সা নাও। কত রেট রে কামাল?

কুলি হাউমাউ করে বলে—রেট কেন মাইজী? ওরা মাল লিয়ে যাচ্ছে, এটা কানুন না আছে। আমি সব লিয়ে লিব।

কামাল পকেট থেকে দ্রুত একটা টাকা বের করে ওর হাতে গুঁজে দেয়। কুলি সেলাম করে চলে যায়। হিরণ্ময়ী বাধা দিতে গিয়ে দেন না। ছেলেটা এখনও সেইরকম আছে। তিনজন রিকশোওলা মালপত্তর ভাগাভাগি নিয়ে হাঁটতে থাকে। কামাল ওর সাইকেলটা নিয়ে এসে বলে—আসুন, মাসিমা। বাবুই, এস।

বাবুই বলে—আমার সঙ্গে কিন্তু ফরম্যালি পরিচয় হয় নি আপনার।

হিরণ্ময়ী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে সেটাই বলতে যাচ্ছিলেন, কামাল বলে ওঠে—কিচ্ছু দরকার নেই। পনেরটা বছর এমন ঝিলপকরে বেরিয়ে গেছে যে ফর্মালিটি গজাবার চান্সই নেই। তুমি সেই বাবুই। দোলনায় শুয়ে এন্তার চাঁচাতে। একদিন আমি একটা লাল টুকটুকে বল কিনে তোমার হাতে দিয়েছিলুম। বয়সের উল্টোদিকে হাঁটলে সব দেখতে পাবে। তখন আমিও হাফপেন্টুল পরতুম। দাঁড়ির গিট প্রায়ই খুলে যেত। সে এক সমস্যা। চেষ্টা করলে মনে পড়তেও পারে। পারে না?

বাবুই আস্তে মাথা দোলায়।—চেষ্টা করব। করতে হবে।

কথাটায় দুঃখের আঁচ সন্দেহ করে হিরণ্ময়ী বলেন—বাবুইকে যেন নির্বাসনে আনলুম, বুঝলি কামাল? খুব উৎসাহ তো দেখিয়েছে মুখে, কিন্তু ওর পাড়াগাঁ কি ভাল লাগবে! মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বাবুই।—আমার কিচ্ছু হয় নি।

হিরণ্ময়ী স্টেশনঘরের বারন্দায় পৌঁছে বলেন—হ্যাঁ রে কামাল, আজ তো খুব ঘটা করে মাসিমাকে নিতে এসেছিস, চিনতে পেরেছিস, তাও যথেষ্ট। কিন্তু এআজি মোট কখানা চিঠি লিখেছিস, কবার গোঁছস, হিসেব করবি কখন?

কামাল বলে—হিসেবের কী দরকার? আপনাদের আমি একটুও ভুলিনি। চিঠি—হ্যাঁ, অনেক-অনেক চিঠিলেখা উচিত ছিল। মুখে তো বলছি, পনের বছর। কিন্তু সেও তো কম নয়। কত কী সব ঘটে গেল লাইফে—সবার লাইফেই। আসলে জানেন, চাষাভুষোর ঘরে জন্ম, চিঠি লিখতেই কেমন আলসেমি জাগে। আর, আমার পূর্বপুরুষ তো তরোয়াল ধরতেন! খুকখুক করে হাসে সে।

বাবুই বলে—কী ধরতেন?

—সোর্ড। সেভেনটিন সেঞ্চুরিতে।...গেট পেরিয়ে ধাপে নামতে থাকে ওরা। নীচে সুরকি ও বালিভরা চত্বরে দুধারে তখনও কিছু রিকশো, ঘোড়ারগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাস বোঝাই হচ্ছে। স্টেশন থেকে একমাইল এগিয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক। চলে যাবে একেবারে পাঁচগ্রামের চৌমাথায়। সেখানেই রুটপারমিটের মেয়াদ খতম।

চারটে রিকশোর তিনটেতে মাল ঠাসা বোঝাই। একটাতে মা ও মেয়ে ওঠেন। রিকশো চলতে থাকে। আগের গুলোর মাল, পিছনে ওঁরা। পাশে সাইকেলে কামাল চলেছে। হিরণ্ময়ী দুপাশটা দেখতে দেখতে বলেন—এ কী রে কামাল! সবখানেই তো আলো জ্বলছে! ব্যাপার কী?

অন্ধকার জাঁকিয়ে আসছে। কিন্তু দূরের আলো এসে পিচের ফালিকে ধূয়ে দিচ্ছে। কামাল বলে—হ্যাঁ, ডানদিকটা রিফিউজি কলোনী এখন। বাঁদিকে ঘেঁটুবাবুরা হার্ডওয়ারের গোডাউন করেছেন সাতবিঘে জায়গায়। কম্পাউন্ড গেট লিট বালি চুণসুরকিও বেচেন। সুরকিকল করেছেন। ইটের ভাটা করেছেন পিছনে। শচীনবাবু আর আতাউর মিলে অয়েলমিল করেছে, ওইযে! ওটা হচ্ছে মালটিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি। আপনাদের বাজার গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তেমাথা অব্দি। ওই যে আলোগুলো দেখছেন। একছটাক জায়গা কোথাও খালি পড়ে নেই স্টেশনরোডের দুধারে। ভাদুড়ীবাবুরা পেট্রোল পাম্প করেছেন। ডানদিকে দীঘির চারপাড় জুড়ে ব্লক অফিস আর কোয়ার্টার। দিনে এলে চিনতেই পারবেন না। সিভিলাইজেশন সব বাঁজা ডাঙা, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় মুছে ফেলেছে। কালারফুল ব্যাপার। কিন্তু কনট্যাক্টও মারাত্মক। বড় রাস্তার—মানে হাইওয়ের ওপারে আমাদের কুলবেড়ের তেমন কোন চেঞ্জ নেই। শুধু একঘর বাবুরা দয়া করে রাস্তা ডিঙিয়ে গোটা আঠারো শালকাঠ নিয়ে গেছেন। ইলেকট্রিসিটি ছিটেফোঁটা পেয়েছে কুলবেড়ে। ঘটা করে উদ্বোধনও করিয়েছিলুম। কাকে দিয়ে জানেন?

হিরণ্ময়ী কমল আরও আনমনা। শুধু বলেন—উঁ?

কামাল হো হো করে হাসে। সাইকেলটা টাল খেয়েই সামলে নেয়।—হাজিসাদুকে দিয়ে। বুড়ো তো সুইচ টিপতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল হাউমাউ করে। আনন্দে। তিনবার মক্কা গেছেন। শেষবার প্লেনে। অনেক সিভিলাইজেশন দেখে এসেছেন, লোভ জেগেছে প্রচণ্ড।

—তোমার দাদু এখনও বেঁচে আছেন!

হুঁউ। সত্তর পেরিয়েও এখনও শালকাঠের মতো শক্ত। মাঠেমাঠে রোদ্দুরে সমানে ঘুরতে পারেন। জারেন্ট মানুষ। দেখেছেন তো। মনে পড়ছে না?

হিরণ্ময়ী আস্তে বলেন—পড়ছে। স্টেশনে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন আমাদের। তুমি সেদিন কিন্তু আসোনি, কামাল!

—আজ তো এলুম। দাদু দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

হিরণ্ময়ীর গলা ধরে আসে। সুখে কিংবা দুঃখে। মণিগ্রামে এতদিন পরে ফিরে আসছেন। সেদিনও অন্য কেউ আসেনি, মেহের আলি এসেছিল লাঠি হাতে—দুর্ধর্ষ মানুষ। না আত্মীয়স্বজন, না অন্য কেউ। আজও তাই। মেহের আলির নাতি এসেছে। না আত্মীয়স্বজন, না অন্য কেউ। হঠাৎ বলেন—শুনেছিলুম, স্কুলের নাম ওরা পাল্টে দিয়েছে!

কামাল একটু চুপচাপ প্যাডেল ঠেলার পর বলে—হ্যাঁ। এখন হয়েছে তারাসুন্দরী বিদ্যাপীঠ। অবশ্য আমাদের কয়েকজনের চাপে বাইরে ভিতের ওপর পুরনো ফলকটা রেখে দিয়েছে। একটা কামিনীগাছের ঝাড় বাড়তে বাড়তে ঢেকে ফেলেছে। তাতে কী? আছে তো।

বাবুই বলে—কী লেখা আছে ফলকে?

জবাব হিরণ্ময়ী দেন—তোর ঠাকুমার নাম। হরমোহিনী হাই ইংলিশ স্কুল। জেলার সবচেয়ে পুরনো স্কুল। নাইন্টিন এইটিনে হয়েছিল। আমার শাশুড়ীর বয়স নাকি তখন মোটে আঠারো উনিশ। শ্বশুরের চল্লিশ। তোর বাবার জন্মের পরই তোর ঠাকুমা মারা যান। তিন ছেলে দুই মেয়ে।

—তারা কোথায় আছে?

—আছে এখানে ওখানে। বলব'খন।

বাবুই একটু হাসে।—তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার কাছে এখনও ডার্ক। অবাক লাগে!

—তুই কি কখনও জানতে চেয়েছিস?

বাবুই মায়ের কণ্ঠস্বরে বিপদের আভাষ পেয়ে শশব্যস্ত বলে—না। কী দরকার?

কামাল আঙুল তুলে বলে—ওই যে স্কুল! চিনতে পারছেন? খেলার মাঠ অনেকটা বড়ো হয়েছে এখন। তারাসুন্দরীর জমি।

স্মৃতিকে গায়ের জোরে সরাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেন হিরণ্ময়ী। তা সম্ভব নয়। স্মৃতির ভিত্তিতেই তো বসতে এলেন আবার। চারপাশ থেকে শেকড়ের মতো ডালপালার মতো ওরা তাঁকে আঁকড়ে ধরবে, শুষে খাবে, পিষে মারবে—তা তো জানা!, জেনেও এলেন। নিয়তি ছাড়া কোন ব্যাখ্যা নেই। হিরণ্ময়ী অগত্যা হাসতে চেষ্টা করেন—তা কামাল, তোর দাদুর কথা বল্, শুনি।

কামাল হাসে। বিদ্যুতের ছটায় তার সাদাদাঁত ঝক-মক করে ওঠে। দূরের বুড়োবাসের কাঁর্তি শুনুন। লাস্ট-টাইম হুড়ে মারার আগে একটা নিকে করে বসালেন। সে এক হুইচই ব্যাপার।

—বলিস কী! তুই বাধা দিস নি?

—মোটেও না। বা রে! কেন বাধা দেব? ইসলামী আইনে নাযা পাওনা, তাতে এমন ধার্মিক মানুষ। আমি সামনে যেতেই প্রায় কেঁদে ফেললেন—আমার পয়গম্বরের বেলাইনটা কী করলুম ভাই? তুই তো শিক্ষিত ছেলে—বুঝিয়ে বল্। গরীবদুঃখী অরক্ষণীয়া মেয়ে—এত সব মিথ্যে কেলেঙ্কারি করে বেচারাকে কোণঠাসা করেছে। তার ওপর খান্দানী বংশ। আমাদের মতো লাঙলঠেলা চাষা তো নয়। বড় ভাগ্য যে চাষীর ঘরে আসতে চায়। এতে তো আমরাই জলে উঠলুম!...কামাল আবার হো হো করে হাসে।—বলুন, এমন যুক্তির পর আর বাধা দেবার কী থাকতে পারে? ওদিকে লাসী হাঁফানির রুগী। তিনিও দেখলুম রাজী। কনের—মানে, নতুনদাদীর বয়স কত জানেন? বড় জোর বত্রিশ।

বাবুই মাথা দুলিয়ে হাসে। হিরণ্ময়ীও। বলেন—কোন বাড়ির রে? চিনব?

—নিশ্চয় চিনবেন। মিলিটারিতে গিয়ে ঠ্যাং হারিয়ে-ছিল—সেই ফৈজু মিয়ার কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। খাসির মাংস বেচত। রোগা পাকাটি লোকটা। সারেবদের মতো চেহারা।

—তার বোন। ফৈজু সাইসাইড করেছিল ট্রেনে। ও তো বিয়েই করে নি। মদগাঁজা খেত। বড় বাউণ্ডুলে লোক ছিল। বোনের বিয়েও দিতে পারে নি। সংসারই চলত না। মুসলমানদেরও বরপণের রেওয়াজ আজকাল কড়া। তবে হিন্দুদের বরাবরই ওটা ছিল। ইসলাম ধর্মের উল্টো কারবার সব। যাই হোক, ফৈজু মারা গেলে তার বোনের অবস্থা সাংঘাতিক হল। প্রথম প্রথম লম্ফঝম্ফ খাটিয়ে মশ বজে থাকত। পরে চেঁকিতে ধান ভানার কাজ করতে থাকল। চেঁকিই বা কটা আছে? আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছিল চাল্লির মেসিনের দাপটে। তখন পর্দার লেবটুকু ফেলে দিয়ে ভিক্ষের নামল। হ্যাঁ—স্লেফ ভিক্ষে। আমার খারাপ লাগত। সাহায্য করতে গেলে পাছে ভাবে, কী মতলব—অগত্যা...বুঝলেন কিছু?

হিরণ্ময়ী হেসে বলেন—বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। তুই কি পেছনে ঘটকালি করেছিলি?

—হ্যাঁ। আর কী করব, বলুন?

—তা, ভালই করেছিস। ও রাজী হল?

—হবে না? জানেন? বিয়ের আগে দুদিন পেটে কাপড়বেঁধে কাটিয়েছিল!

—খুব ভাল করেছিস, বাবা।

—কিন্তু বাড়িতে দুবেলা চাপা অশান্তি। বাবা-কাকারা ঘোঁট পাকাচ্ছেন। নতুনদাদী থাকেন বাড়ির পিছনের একটা ঘরে। আমি ছাড়া কথা বলার লোক নেই। দাদু তো সারাদিন বাড়ির মধ্যে পা দিতেন না। খাবার সময় নতুন-দাদীর ঘরে বসে খেতেন। আবার বেরতেন। ফিরতেন অনেক রাতে। সম্প্রতি দিনসাতেক মসজিদে ঢুকেছিলেন—একরকম ব্রত আছে মুসলিমধর্মে। নির্জনে ঈশ্বরকে ডাকা-ডাকির ব্যাপার। আজ বিকেলে ব্রত শেষ হয়েছে। বেরিয়ে-ছেন শুনে এসেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

—হুঁ। দাদুকে বলবি, আমি এসেছি।

বাবুই হঠাৎ বলে—মা, আমরা কোথায় উঠব?

জবাব কামালই দেয়—নিজেদের বাড়িতে। আবার কোথায়?

হিরণ্ময়ী বলেন—সোনাকে লিখেছিলুম সব সাপ-সুতরো করে রাখতে। কী করেছে, কে জানে! ও তো এলও না স্টেশনে!

কামাল বলে—ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করেই এসেছি।

—চাবি কোথায় পেলি?

—কেন? সোনাদার কাছে। ও তো জানেন কেমন কুঁড়ের শিরোমণি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

—কামাল! ধরা গলায় হিরণ্ময়ী বলেন।—তুই হয় তো আরজন্মে আমার ছেলে ছিলি!

কামাল বলে—চিনেছেন এই যথেষ্ট! বাবা রিক্‌শো,

সামলে! ঢালে নামতে ব্রেক ধরো। পড়ে যায় না যেন।

সামনে চৌমাথা, উঁচু রাস্তা থেকে নাঁচুতে ডাইনে নামতে থাকে রিক্‌শোগুলো। কামাল একপাশে সাইকেল থামিয়ে পা বাড়িয়ে ছোট্ট সাঁকোর কার্নিশ ছুঁয়েছে। আবার সে হিরন্ময়ীর রিক্‌শোর পাশেপাশে যাবে। সামনে ডাল-পালাওলা বটের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন গেছে। বটতলায় আলো জ্বলছে। বিরিঞ্চিতলা এর নাম। শিবের লিঙ্গ আছে। ব্রহ্মচারীমশাই উঁচু বাঁধানো চত্বরে বসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে ছোট কল্কে টানছেন সুখে। চোখ খোলেন না। আজকাল কতলোক গাঁয়ে ঢোকে, বেরিয়ে যায়—তাতে ওঁর কী?

চৌমাথা থেকে কে সাইকেলে প্রচণ্ড জোরে আসছে। কামাল তাকায় ঘাড় ঘুরিয়ে। হিরন্ময়ীর রিক্‌শো সবে সাঁকো পেরিয়ে নামছে। বাবুই ব্রহ্মচারীকে নিষ্পলক দেখছে। কামাল সেই সাইকেলের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—মুকুল! অমন করে কোথায় যাচ্ছিস?

কামালের ছোটভাই মুকুলের সাইকেল লাফিয়ে এসে আটকে যায় সামনে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—থানায়। হাজিদাদু খুন হয়েছে। মাঠে পড়ে আছে। বাঁধের নীচে!

আবার চলে যায় সে। কামালের কলেজের পাশ দিয়ে এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ চলে যায়। তারপর মাঠটা ঝুলে পড়ে। হিরন্ময়ীদের রিকশো তখন কয়েক হাত দূরে সরেছে। মুখ ঘুরিয়ে উনি ডাকেন—কামাল! আসবে না আর?

মুখ তোলে কামাল। ভাঙাগলায় কোনরকমে বলে—আসছি। আপনারা এগোন। তারপর সে সাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। সামনে বাতাস। গাছপালায় রাস্তার আলো টেরচা গিয়ে পড়েছে। তলায় অন্ধকার। জোনাকি জ্বল-জ্বল করে ঘুরছে। কামাল মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে প্যাডেল ঠেলে। অন্ধকার, বিদ্যুতের আলো, আকাশের নক্ষত্র, পীচের পথ—সবকিছু জুড়ে চাপচাপ রক্ত গড়াতে গড়াতে আসছে।

সামলে নিতে শরীর ঝাঁকুনি দেয়। এই অদ্ভুত সময়ে কেন কে জানে, তার হঠাৎ মনে পড়ল, নতুনদাদীর বাচ্চা হবে।

সাপ! সাপ!

—ওই ভদ্রলোক, মানে তোমার বিগত জন্মের ছেলে...

হিরন্ময়ী ঘুরে মেয়ের দিকে তাকান। বাবুইয়ের চুলে ঝুল, নাকের ডগায় ময়লার ছোপ, দাদুর মস্তো ফটো টেবিলে শুইয়ে সাফ করছে। ওকে এসব করতে বলা হয় নি, নিজে থেকেই হাত লাগিয়েছে। দেখে ভালই লাগছে হিরন্ময়ীর। কাছে গিয়ে বলেন—কী রে? কামালের কথা বলছিস?

—হ্যাঁ। নামটা কিছুতেই মনে থাকছে না। কামাল।

—কেন? কী করল কামাল?

—কিছু করে নি।...বলে বাবুই ছবিটা টেবিলে দাঁড় করিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে। কিছু হটে এসে দেখতে থাকে দাদুকে। পাশেই জানলা। সকালের রোদ গত সন্ধ্যার একাকার ভূগোল বইয়ের মানচিত্রকে এখন রঙ ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে যেটা যেমন, তেমন করে সাজিয়ে ফেলেছে। ছত্রখান ভাবটা যায় নি। ঘরবাড়ির সঙ্গে গাছপালা জড়িয়ে-সড়িয়ে রয়েছে। বাবুই ভেবেছে, সে বাইরের মানুষ, তাই। এই ভূগোলের ভেতর ঢুকে যেতে পারলে প্রত্যেকটার আলাদা বৈশিষ্ট্য সে জেনে ফেলবে।

কোথাও নতুন গেলে সব কিছু চোখের ওপর কঠিন হয়ে পিচটির মতো অনেকটা সময় আটকে থাকে যেন। বাবুই বরাবর দেখছে এটা। কিন্তু এখানে সারা সকাল চোখ থেকে ওই কঠিনতা ছাড়াবার চেষ্টা করছে। ভালবাসবার সাধাসাধনা করছে ভারগাটাকে। আর এই ঘর, এ তো আমারই। এখানেই দোলনায় শুয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করতুম—তাই না?

দৃশ্যটা অবিকল দেখেও স্বপ্নের মতো লাগে। বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার ব্যাপার যেন। অথচ বিশ্বাস করতেই হবে। বাবুই নিজের মনের মধ্যে খুব আস্তে বলে ওঠে, সব সত্যি ছিল।

ইতিমধ্যে অনেকে এসে দেখাসাক্ষাৎ করে গেছেন। রাত নটাআন্দি বেশ ভিড়ও হয়েছিল। সেই ভোরবেলা থেকে আরও কতজন এল। এসব দেখেশুনে অবাক হয়েছে বাবুই। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের একটা তফাত খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে তার কাছে। কিন্তু এই সব মানুষের মধ্যে উজ্জ্বলতা এত কম, এত ফ্যাকাটে আর ঘুমঘুম আচ্ছন্নতায় ঢাকা ওরা, খুব সহজে ক্লান্তি

এসে যায়। রাতে শোবার পর হিরন্ময়ী বলেছিলেন—সবই অভ্যাস, সয়ে যাবে। সেই কথাগুলো থেকে শক্তি কুড়িয়ে নিয়েছে বাবুই। অথচ সবকিছুর তলায়-তলায় কেমন শূন্যতা অনুভব করছে—একটা অতল খাদে শূন্যতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। তার ওপর তারা দুজনে মাজিকের কারবার বসত বাঁধল।

এখানকার মাটিতে নেমেই প্রথম মানুষ ওই মুসলমান ছেলেটি. রীতিমতো রিসিভ করে নিয়ে এল যে, তাকে অবলম্বন করা দুজনের পক্ষেই স্বাভাবিক। ঘুরেফিরে তাই যেন ওর কথা মনে পড়ছে। কাল সেই যে হঠাৎ চলে গেল, এখনও আসেনি সে। রাতেই জেনেছে, ওর হাজি-দাদু খুন হয়েছে। বাবুইয়ের কাছে এটা খবরের কাগজে একটা খবর পড়ার মতো। আজকাল প্রতিদিনই তো কাগজে এই! বাবুই কখনও খুন হতে দেখেনি কাউকে। শুধু একবার বাসের তলায় একটা চাপা পড়া মানুষ দেখেছিল—দেখেছিল বলা ভুল, ভিড়ই দেখেছিল। ভিড়ের মধ্যে কোথাও লাসটা ছিল। উঁকি মেরে দেখার ইচ্ছে ছিল, সাহস ছিল না। এখানেও ব্যাপারটা তাই।

—জেঠিমা!

হিরন্ময়ী চিনতে চেষ্টা করেন। পরক্ষণে চেঁচিয়ে ওঠেন—ডাং না? তুই কত বড় হয়েছিস রে!

বাবুই ঘুরে দেখে, একটি যুবক সিঁড়ি থেকে সবে উঁচু বারান্দায় উঠে আসছে। একমাথা চুল। অবিকল চৌরঙ্গী এলাকায় ঘুরেবেড়ানো মড—হাতিপাতলুন, আঁটো লম্বাটে জামা, গোঁফ, হিল তোলা জুতো। সে একটু ঝুঁকে হিরন্ময়ীর পা ছোঁয়। হিরন্ময়ী আশীর্বাদ করেন।

—ছিলুম না। বাইরে থেকে এখনই ফিরে শুনলুম, আপনি এসেছেন।

—বাবুই, এই সেই ডাং! তোকে বলতুম না? বাড়ুয্যেদের...

বাবুই কথা শেষ করার আগেই বলে ওঠে—বলেছ।

—ডাং, বাবুইকে চিনতে পারছিস না?

—নাঃ! কেমন করে চিনব। মনেই নেই।

—নেই মানে? একবার ওকে ফেলে দিয়েছিলি মনে আছে?

ডাং ও হিরন্ময়ী হাসতে থাকেন। বাবুই ভাবে, তার অতীত সময়ের ওপর ক্রমশ এভাবে আলো পড়তে শুরু করছে। এ ভারি অদ্ভুত লাগে। একসময় কত সব মানুষ আর ছোটবড় কত ঘটনা নিয়ে সে পৃথিবীতে থেকেছে, একেএকে জানলে নিজের জীবনী অন্যভাবে পড়তে হবে তাকে।

ডাং বলে—কামালের সঙ্গে দেখা হল একটু আগে। ওর কাছেই শুনলুম। বলল, আপনাকে যেন বলি—কিছু ভাববেন না। ও দশটার মধ্যেই ফিরবে। থানাপুলিশ নিয়ে ছোটাছুটি করছে। শুনেছেন তো ওর হাজিদাদু মার্ডার হয়েছে?

হিরন্ময়ী মাথাটা দোলান।—কুলবেড়ের লোকগুলো এখনও তাই আছে। খুনোখুনি আর মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা!

—ভীষণ! ডাং বলে।—আজকাল তো আরও বেড়েছে বরং। দলাদলি, দাঙ্গা। আপনি তো জানেন, এলাকার মুসলমানরা বড্ড দুর্ধর্ষ। আমার তো মাঝেমাঝে মনে হয়, পাকিস্তানে বাস করছি!

বাবুই বলে ওঠে—কেন!

—দেখবেন। এলেন তো!

হিরন্ময়ী ব্যস্তভাবে বলেন—ও কী রে! ওকে আপনি-টাপনি করছিস কেন? ও তোর কত ছোট! তুই তোকারি করবি।

ডাং স্মার্ট হয়ে বলে—চেনাজানা হলে তখন দেখা যাবে, কী বলেন?

বাবুইয়ের উদ্দেশ্যে বলা। বাবুই শুধু মাথা দোলায়। তবে বড় বড় চোখে একটা উদ্দেশ্যহীন বিশাল দৃষ্টি ভেসে আছে এখন। বিকারহীন মনে হয় মুখটাকে।

—ডাং, তুই বস্ বাবা। খবরাখবর বল্। তোর বাবা-মা, কেমন আছেন? বাবা তো এখনও একবার আসবার সময় করতে পারলেন না।

ডাংকে একটা পুরনো হাতলভাঙা চেয়ার টেনে দেন হিরন্ময়ী। ডাং বসতে দ্বিধা করে না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে দোলাতে থাকে।—বাবা আসেননি? আসবেন। ভেন্ডার নিয়ে ব্যস্ত তো ব্যস্ত। সিমেন্ট-পাইপের কারখানা খুলতে চান। দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন।

দুজনে পরস্পর পারিবারিক খবরাখবরে জমে উঠলে বাবুই বেরোয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে নামে। উঠোনে এক-সময় লাইমকংক্রিটের আস্তর ছিল। ফেটে ও চাবড়া উঠে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। আগাছা ও ঘাস গজিয়েছিল.

শ্যাওলা জমেছিল—কামালের লোকেরা সব সাফ করে ফেলেছে। তার চিহ্ন চোখ এড়ায় না। কোণার কুয়োতলায় যায় বাবুই। জবা ও শিউলির গোড়ায় টাটকা আবর্জনা চাঁই করা রয়েছে। তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে শিউলি পড়েছে। কুয়োতলার গোল চত্বরেও সিমেন্টের আস্তর আর টিঁকে নেই। কিন্তু শিউলি সব ঢেকেছে। উঁকি মেরে বাবুই দেখে, তলায় নিজের চেহারাটা উল্টো হয়ে দুলে আছে, কোন্ উল্টো জগতে। হঠাৎ গা শিউরে ওঠে তার। সেই উল্টো জগতের ওপর পা আটকে যেমন সে ওখানে ঝুলে আছে, আবছা শৈশবেও তেমনি করে তার পা দুটো যেন আটকে পড়বার ভান করছে এখানে আসার পর। কুয়োর দেয়াল আঁকড়ে ধরে থাকে সে। জলে পাতা ভাসছে। বুজকুড়ি উঠছে। পচা গন্ধ এসে লাগে। এই কুয়োটার কথা বলছিলেন হিরন্ময়ী। সাফ করাতে হবে। টিউবেল বসানোর হাঙ্গামা অনেক। অত টাকা খরচ করারও সঙ্গতি আপাতত নেই।

কিন্তু কুয়োটা ব্যবহারযোগ্য হলে কী ভাল না লাগবে! বাথরুম বলতে কিছু নেই। পাশেই খাটা পায়খানা এবং তার গায়ে একটুখানি ঘেরা জায়গা ছিল মেয়েদের স্নানের জন্য। ওপরটা খোলা। এখনও তেমনি আছে কতকটা—তবে পাঁচিল একদিকে ভেঙেছে। মেঝেয় ঘাসের জঙ্গল। তার ওপারে উঁচু পায়খানায় উঠার সিঁড়ি। সিঁড়িটা আশ্চর্য, অক্ষত আছে। তার কাঁধ ছুঁয়ে একটা আগাছা উঠেছে। হিরন্ময়ী বলছিলেন—আগে এটাই ঠিকঠাক করা জরুরী। আপাতত দু'একটা দিন প্রিমিটিভ ওয়েতে চলবে। সেটা কী তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মেয়েকে। খিড়কির ধারে একটা ছোট পুকুর আছে। তার একদিকে বাড়ির পাঁচিল, বাকি তিনদিকের পাড়ে ঘন ঝোপঝাড়। তার মধ্যেই! গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু উপায় কী? বাবুইয়ের মনে হয়েছিল, রাতারাতি তারা যেন ফুটপাতের বাসিন্দা হয়ে গেল। এবং হয়তো সেজন্যই তার মধ্যে একটা মরীয়াধরণের কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাজে নামার মতো ক্ষমতা এসে গেছে। তবে এখনও কোন শারীরিক রহস্যময়তার ফলে জঙ্গলে গিয়ে জৈবকৃত্যে উদ্যোগী হবার লক্ষণ বাবুই দেখছে না। অবশ্য, ইতিমধ্যে আনুষঙ্গিক তরলপদার্থ পরিত্যাগের ব্যাপারটা উঠোনের কোণায় সদানিকাশী ড্রেন থাকায় যথেষ্ট। বাড়িতে মা ও মেয়ে ছাড়া আপাতত কেউ ছিল না সাতটাঅব্দি। সাতটার পর একটা লোক এসে খবর দিয়ে গেছে, একজন ঝির ব্যবস্থা হয়েছে। শিগ্‌গির এসে যাবে সে।...

এইসব ভেবে মানেমানে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে বাবুই। আবার মরীয়া হয়েও উঠছে। সে তো পরিষ্কার জানে, এত বড় পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে তারা দুজন একা—তাদের সত্যিকার অর্থে আপন কেউ নেই। ছিলও না। কলকাতায় ওই একাকিত্ব নিয়েই দুটি মানুষ এতকাল কাটিয়ে এল।

—বাবুই! যেখানে সেখানে পা দিস নে! পোকামাকড় থাকতে পারে। হিরন্ময়ী কথাটা ধুয়োর মতো আওড়ে যাচ্ছেন। আবার বললেন।

ডাং বলে—এখনও অনেক কাজ বাকি আছে দেখছি।

হিরন্ময়ী বলেন—হ্যাঁ। কামাল ব্যবস্থা করেছিল কিছুটা। হঠাৎ হাজি খুন হয়ে যেতেরা ব্যস্ত ওদিকে। গাঁয়ের মধ্যে শুনেছি, ওদের ফ্যামিলিটাই নাকি বরাবর খুব নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ওরা কারও সাতেপাঁচে থাকত না। অথচ...

-হাজিটা আসলে ভেতর ভেতর বড় পাজি ছিল, জেঠিমা। আপনি জানেন না, বুড়োবয়সে কী কীর্তি করে বসেছে।

হিরন্ময়ী অন্যমনস্কভাবে বলেন—শুনেছি।

—আমার ধারণা, ওর ছেলেরা—মানে কামালের বাবাকাকারাই লোক দিয়ে খুন করিয়েছে। ওরা সব পারে।

হিরন্ময়ী চমকে উঠে বলেন—যাঃ! কী বলছিস!

—আপনি তো জানেন না এসব গ্রাম্য ব্যাপার। বিশেষ করে মোহামেডানদের কোর্টে যত মামলা হয়- তার নাইনটি নাইন এ্যান্ড হাফ পারসেন্ট ওদের। আর রাঙ্গা খুনোখুনির কথা তো আলাদা! লেগেই আছে। যত বড় মোগল এম্পায়ারের ব্যাপারটা দেখুন না! বাবা ছেলেকে, ছেলে বাবাকে মার্ডার করেছে—বন্দী করেছে।

মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে কুলক্ষেড়ের মুসলমানদের সম্পর্ক বুঝতে না পেরে হিরন্ময়ী বলেন—কী জানি বাবা! হাজিরা বরাবর আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। আর কামালকে তো দেখেছি অটুকুন থেকে।

—কামাল ছেলেটা ভাল। দৈত্যকুলে রিয়েল প্রহ্লাদ বলতে পারেন। ও অবশ্য আমার দুবছরের সিনিয়ার। তবু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। খুব জলি ছেলে! মডার্ণমাইন্ডেড। প্রগ্রেসিভ। সোশাল ওয়ার্কে জড়িয়ে

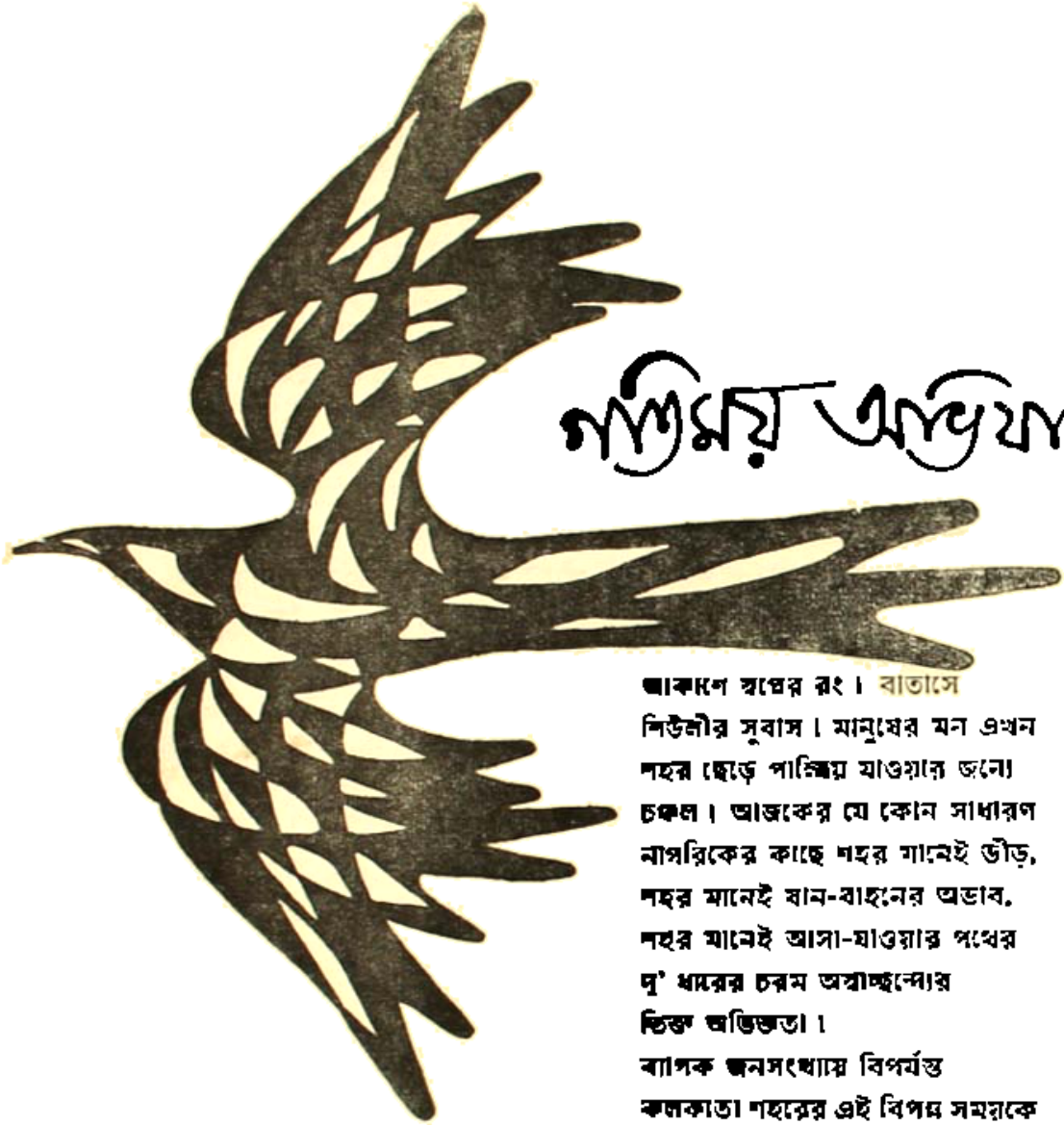

গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের
তিক্ত অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে
পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।

MJ

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ে)

থাকে। রিয়েলি জেঠিমা, ও যেন ভুল করে মুসলমানের ঘরে জন্মেছিল!

ডাং হো হো করে হাসে। হিরণ্ময়ী আস্তে বলেন—জন্মটন্ম কথা নয়, বাবা। আসলে ভালমন্দ নানারকম মানুষ থাকে সংসারে। মুসলমান হলেই যে আলাদা মন থাকবে, তার মানে নেই। তোর জ্যাঠামশাই বলতেন কথাটা।

ডাং হাসতে হাসতে বলে—কামাল নিজেই কথাটা বলে। বুঝলেন ? ও বলে...

হঠাৎ বাবুই চেঁচিয়ে ওঠে—মা, সাপ! সাপ!

বারান্দা থেকে দুজনে দৌড়ে উঠানে নেমে যান। কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে বাবুই আঙুল তুলে সাপটাকে দেখাচ্ছে। দিশেহারা চেহারা। কাছে গেলে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—কোপ থেকে বেরুল এক্ষুনি! ওই যে! কী বড় সাপ। পাইথন!

ডাং সাপটাকে দেখে বলে—না। ঢামনা। বিষ নেই। ইঁদুর খেয়ে বেড়ায়। সে একটা ইট তুলে প্রচণ্ড জোরে সাপটার মাথা লক্ষ্য করে ছোড়ে। ইটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সাপটা পাঁচিলের ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে লেজের ডগাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত ঝেড়ে ডাং বলে—লাঠিকাঠি সবসময় হাতের কাছে রাখবেন। বাড়ির চারপাশে যা জঙ্গল!

বাবুই সরে আসে। ওজন হঠাৎ কমে গেছে যেন, নিজেকে হাল্কা লাগে তার। এতক্ষণ একটা টুকটুকে লাল গাংফেড়িংকে লক্ষ্য করছিল। অবাক্‌চুলের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল সেটা। টের পাচ্ছিল, এখানে মানুষের খুব কাছাকাছি আরেকটা জগত আছে। শিউলির ঝাঁক, অস্পষ্ট সুগন্ধ, পাঁচিলের ওপরে রোদ গায়ে নিয়ে ছুটে বেড়ানো শালিক পাখি—সব মিলিয়ে প্রকৃতির সাজানোগোছানো একটা সংসার এবং তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে একটি বহিরাগত মেয়ে। কিন্তু এত নির্জন আর এত শব্দহীন যে সাউন্ডপ্রুফ ঘরে আটকে থাকার মতো লাগে। দম আটকে যায়।

হিরণ্ময়ীর মুখের রঙটা ফিকে হয়েছে এতক্ষণে এই প্রথম। একটা সাপ কি সত্যিকার অবস্থাটার ওপর থেকে একটুখানি চাদর সরিয়ে ফেলল? নোংরা তোষকের মতো এই নতুন জীবনটা মনকে তেঁতো করে দিয়েছে। তিনি ভেতর চলে যান।

ডাং বলে—বাবুইপাখির রিয়েল নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

—পাখি মানে? বাবুই একটু হাসে, আনচ্ছনেসেও।

—আপনার নামে নাম। পড়েনান পদো? বাবুইপাখরে ডাক বলছে চড়াই.....

—কুঁড়েঘরে থেকে করো শিল্পের বড়াই।

—দারুণ! দারুণ! সাপটাপ দেখেও মেমরি গুলিয়ে যায়নি দেখছি। ইউ উইল সারভাইভ।

বাবুই বলে—কেন? এখানে সারভাইভ করা খুব কঠিন নাকি?

—আপাতত আপনার পক্ষে—কঠিন নিশ্চয়। দেখলেন না, একটা সাপই রেভোলিউশন!

—আমি ভয় পাইনি।

বাবুইয়ের কথাবার্তার ভঙ্গীতে ডাং একটু দমে যায়। বলে—না, ভয় পাবার কী আছে!

—বরং আপনিই দেখলুম, সাপ দেখেই আনব্যালান্সড হয়ে ঢিল ছুড়ে বসলেন।

—দ্যাটস দ্য হিউম্যান হ্যাবিট! দ্রুত রিঅ্যাক্ট করা। যাক্‌ গে, আপনার নামটা জানতে চাইলুম। হ্যাঁ, আগে আমারটা বলা উচিত। বাঁতশোক বানার্জি। আমায় সবাই ডাং বলে ডাকে,কারণ আমি লম্বা. সোজা, খুব জোরে মুভ করি। ডাংগুলি বলে একরকম খেলা আছে পাড়াগাঁয়ে—দিশী ক্রিকেট বলা যায়। দেখাব'খন।...ডাং গড়গড় করে বলে যায় এসব কথা। সে নিজের স্মার্টনেস দেখাবেই. এমন ভঙ্গী। এই ব্যক্তিত্বের অস্পষ্ট লড়াই ও বয়সে স্বাভাবিক হয়তো।

বাবুই নির্বিকার মুখে বলে—আমার নাম বর্ণালী রায়চৌধুরী। আমাকে কেন বাবুই বলা হয়, জানি না। বাবুই পাখি আমি এখনও দেখিনি। কিছু মিল নিশ্চয় ছিল।

সে খিড়কির দরজার দিকে এগোচ্ছে দেখে ডাং বলে—ওদিকটা জঙ্গল। যাবেন না। বরং, সদর দরজা দিয়ে গেলে আমি আপনাকে মোটামুটি সব দেখাতে পারি।

বাবুই ঘুরে একটু হাসে।—কী দেখাবেন?

—আপনি কোথায় এসেছেন, সেটাই। তাছাড়া, আমাদের বাড়িও খুব বেশি দূরে নয়। ঘুরে আসতে পারেন। বলব জেঠিমাকে ?

বাবুই দ্রুত ভেবে নিয়ে নিজেই মাকে ডাকে।—মা, আমি একবার বেরোচ্ছি।

বারান্দায় বেরিয়ে হিরণ্ময়ী বলেন কোথায় আর যাবি? পাড়াগাঁ। ডাং নিয়ে যেতে চাচ্ছে বুঝি? তবে

যা না। ঘুরে আয়। শিগগির চলে আসবি কিন্তু। বাবা তাং ওকে একবার গ্রামটা দেখিয়ে নিয়ে এসো। বাড়িতে পৌঁছে দিও কিন্তু। বাবুই, যা। দাদার সঙ্গে ঘুরে সব দেখে আয়।...ফের হেসে বলেন—নতুন করে অক্ষর পরিচয় হোক্। থাকতেই যখন হবে।...

কুলবেড়ের জন্মকথা

মাণগ্রামের পশ্চিমে এখন যেখানে জাতীয় সড়ক, তার ওধারে একসময় ছিল ঢালু বাঁজা একটা বাহান্ন একর ডাঙা জমি। ঘুটিঙ আর কাঁকরে ভরা বনকুলের বেঁটে ঝাটো অজস্র ঝোপ গজাত সেখানে। শরতে কুলের ঝোপে ফুল ফুটত। হেমন্তঅব্দি মৌমাছি আর হরেকজাতের পোকামাকড়ের ভিড় জমে যেত। গুণগুনানিতে অস্থির। শুড়িখানার হল্লা। শীত থেকে বসন্ত তারপর হলদে কুলের বাজার বসত থরেবিথরে। নানান গাঁয়ের গরীব গুরবো মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা মন্দ ছিল না। এই বনকুলের জঙ্গলের মালিক ছিলেন রায়চৌধুরীরা। কুলের জন্যে কর নেওয়ার লোভ ছিল না তাঁদের। কিন্তু গ্রীষ্মে কুলের গাছের গিঁটে-গিঁটে যে আঠা গজাত, তা থেকে একরকম গালা হয়। বিহার থেকে আসত লাক্ষাব্যবসায়ীরা। সেইসব আঠা সংগ্রহের জন্যে রায়চৌধুরীদের সেলামী দিত তারা। গাছগুলো কিছুটা নাড়া হয়ে যেত তখন।

লোকেরা নাম দিয়েছিল কুলবাড়ি। তা থেকে হল কুলবেড়ে। তার পশ্চিমে ঢালু হয়ে চাষের জমি নেমে গেছে বিলের দিকে। মেনকা নদীর অববাহিকায় মিশেছে। দক্ষিণবাহিনী ছোট ওই নদী একটু দূরে পুবে বাঁক নিয়ে ধুলিয়ানগ্যাজেস-হাওড়া লুপ-লাইন পেরিয়ে গিয়ে মিশেছে ভাগীরথীতে। নদী ছোট, কিন্তু বর্ষা-শরতে প্রচণ্ডতা আছে। আজ তার সব প্রচণ্ডতা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব ইস্পাতের ফ্রেম—এগারো হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী মোটা-মোটা তার লটকানো। মাঠে দাঁড়ালে নাক বরাবর নদী ডিঙিয়ে পশ্চিম-উত্তর কোণে সোজা চলে গেছে দিগন্তে—কোথায় গেছে চাষারা জানেনা। জানেনা, লাঙলের ফালের ডগায় যে ছায়া পড়েছে, তা মহাকালের মহাশক্তিরই। আকাশের লক্ষকোটি কক্ষের শক্তি ওই তারে ঘুমিয়ে আছে, গ্রাহ্যই করে না। তাদের কাজ বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের।...

কুলের জঙ্গলে একদিন বিকেলে এক ঢ্যাঙা দৈত্যের মতো মানুষ এসে দাঁড়াল। কাঁধে বাঁশের শক্ত বাইক বা বাহক, দুধারে শনের দড়িতে ঝুলছে দুটো চওড়া ঝুড়ি, তার মধ্যে গেরস্থালি। সঙ্গে বউ, তার কোলে বাচ্চা—ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। এসেছে তারা দূরের পশ্চিম দেশ থেকে ঘোটাই বুলি বলে। মুসলমান। ভাঙাভাঙা বাংলা বলতেও পারে।

তখন এই জাতীয় সড়কের নাম বাদশাহী সড়ক। এসেছে গৌড় থেকে পদ্মা পেরিয়ে, পৌঁছেছে দক্ষিণে বর্ধমান হয়ে সোজা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর পেরিয়ে ওড়িশার তীর্থ পুরীতে। সড়কের পাশে দীঘি। বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকটা কুলবাড়িতে সূর্যাস্ত দেখছিল। তারপর তার নমাজের সময় হল। চাষাভুষো হলেও সে ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিল।

নমাজ শেষ করার আগেই তার পিছনে আরও এক দীর্ঘদেহী মানুষ এসে দাঁড়াল। ফর্সা টকটকে রং, খালি গায়ে সাদা ওড়না জড়ানো এবং পৈতে, পায়ে, খড়ম হাতে ছড়ি। অরিজিৎ রায়চৌধুরী। পরগণা মাণগ্রামের চাকলাদার। ব্যাপারটা দেখে অবাক লেগেছিল তাঁর। কৌতূহলী হয়েছিলেন। কে এই মানুষ, পথে সংসার নিয়ে চলেছে, আবার প্রার্থনা করতেও ভোলে না! কোথাও একটা শক্তি আছে মানুষটার মধ্যে। অথচ চেহারা ও পোষাকে নিতান্ত চাষাভুষো বলেই মনে হয়। কে এ?...

সেই হল কুলবেড়ের পত্তন। পরদিন সকালে দেখা গেল গড়ে উঠেছে একটা খড়ের ঝোপড়ি। একটা বিশাল মানুষ কুলগাছের গোড়ায় কোপ চালাচ্ছে। সিকে ঝুলছে একটা ছোট্ট অর্জুনগাছে। ঝুড়িতে ঘুমোচ্ছে একটা বাচ্চা। বউটি একহাত ঘোমটা টেনে মাটির উনোন বানাচ্ছে।

কুলের আঠা বিক্রিতে পড়তা হচ্ছিল না। লাক্ষাওয়ালারা তুলত একমণ, হিসেব দিত একসেরের। আর, সেও দেখাশোনার ঝঞ্ঝাটে। ওদিকে বাঘের উপদ্রব হত সারা শীতকাল। শরতে বুনো শুওর এসে লুকিয়ে থাকে। কাঁটার ভয়ে সাপ না থাকার কথা—কিন্তু পাহাড়ী নদী মেনকার স্রোতে বর্ষায় পাহাড়ী অজগর ভেসে আসে এবং মাঠ পেরিয়ে এসে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। তারা কাঁটা গ্রাহ্য করে না।...

কুলবেড়ের জঙ্গলে চাষ পড়ল। দেখতে দেখতে কয়েকবছরেই আরো কিছু মানুষ বন্দোবস্ত নিল জমির। জঙ্গল খতম হয়ে গেল। গড়ে উঠল নতুন এক বসতী। অরিজিতের

আমলে দশঘর চাষা, সবাই দুর্ধর্ষ মানুষ। হিংস্র প্রকৃতির। মেয়েরাও বড্ড কগড়াটে। সুবোধ শান্ত মানুষ এমন করে বসত বাঁধতে আসে না—নেহাৎ দায়ে, না ঠেকলে।

কিন্তু দিনের চাষা রাতের ডাকাত সব। বাদশাহী সড়কে গরুমোষের গাড়িতে ফসল ফলমূল বেচতে যাওয়া আসা চলে। রাহাজানি হতে থাকল। মণিগ্রামে পুলিশের ফাঁড়ি বসল। দশঘর কুলবেড়ের মানুষ পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়েও দমে না। জেলে যায়। ফিরে আসে। আবার আইন ভাঙে। রক্ত পড়ে। ডাকাতি করে। ছেলেপুলের জন্ম দেয়। কুলবেড়ের নাম শুনলেই দূরের গাঁয়ে আতঙ্ক। রায়চৌধুরীদের গাল দেয় লোক। অরিজিতের আত্মাকে নরকে পাঠাতে চায়।...

সময় বয়ে গেল। এলেন এক খান্দানী শৈয়দবাংলীয় মৌলবী। কুলবেড়ের মসজিদে নমাজ পড়াবেন। আরবী-উর্দু শেখাবেন বাচ্চাদের। ইসলামী বিষয় শিক্ষা দেবেন। অভিজাত মুসলিম মিয়াপরিবারের পত্তন হল।

সময় আরও বয়ে গেল। হিন্দু চাষী সদ্গোপ পরিবার এল বিলের জমির পত্তনী নিয়ে। এলেন তাঁদেরও গুরুদেব গোস্বামীরা। ডাক্তার সাতকড়ি গোঁসাই যে বংশের মানুষ।

এলেন এক কায়স্থ গোমস্তা। সড়কের ধার ঘেঁষে বাড়ি করলেন। ক্রমশ এল বেনে, কলু, তাঁতি, কামার কুলবেড়ে মণিগ্রামের মতো বড় গ্রাম হয়ে উঠল। একশোবছর ধরে এই গড়ে ওঠার পালা চলেছিল। এখন পালাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো জাতীয় সড়কের দুইপারে দুটি গ্রাম। দূরের লোকে বলে কুলবেড়ে-মণিগ্রাম।

সেই আদি বিহারী দৈত্যটিই হাজি মেহের আলির পূর্বপুরুষ।

পবিত্র রক্তপাত

কগড়াঝাঁটি দাঙ্গা খুনোখুনি বরাবর যা হয়েছে, প্রায় সবই মুসলমানপাড়ায়। কিন্তু এই চাষী পাঠান পরিবারের কেউ খুন হয়নি এতদিন। এবার হল। হল—কিন্তু এ ভারি অদ্ভুত খুন! হাজি মেহের আলি যৌবনে মানুষ হিসেবে দাগট দেখিয়েছে। দাঙ্গায় লাঠি ধরতেও ওস্তাদ ছিল সে। কিন্তু এখন তো সত্তর বছরের বুড়ো! প্রথম হজের পর থেকে কোনরকম সাতেপাঁচে থাকত না, ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। পয়গম্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গরীব অরক্ষণীয়া খান্দানী মুসলিম মেয়েকে সাদী করেছেন। এটা তার কোন কসুর হতে পারে না। গরীব ঔরতের ইজ্জত রক্ষা করার হিম্মত এতদিন তো কেউই দেখায় নি। আর মেয়েটিও তেমন কিছু কমবয়সী বা প্রথম যুবতী নয়। বত্রিশ তেত্রিশ বছর—বুড়োদের হিসেবে। গরীবদের চিন্তাভাবনা দুঃখকষ্টের তীব্র ছাপ তার চেহারাকে ভেঙে দিয়েছে অনেকটা, শুধু রংটাই যা ফর্সা। মুখের লম্বাটে গড়নে খান্দানী ঢঙ আছে। সরু লম্বা নাক, কটা চোখ, চুল একটু লালচে, পাতলা ঠোঁট। ভালোবেসে পরতে পেলে অবশ্য আগুনজ্বালানো ব্যাপার একটা হত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র তার গায়ে ছায়া ফেলে এসেছে। যে ঘাস গাছের আড়ালে জন্মায়, তার মতো ফাকাসে ক্লান্ত এই মেয়ের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য।

তার কপাল, এতদিনে দারিদ্রের ছায়াটা সরে গিয়েছিল। হঠাৎ গায়ের ওপর এক আকাশ তীব্র রোদের ঝলকানি, প্রথম-প্রথম ক'কড়ে থেকেছে সে। খাবারদাবার ও কাপড়-চোপড়ের নিরাপত্তার দিকে অবাক চোখে টুকটুক করে তাকিয়েছে। তার বাবা ছিলেন বরাবর ভ্রাম্যমান মৌলবী মানুষ—নিজেকে বলতেন 'মুসাফির'। এ জেলা ও জেলা ঘুরে ধর্মসভা বা 'ওয়াজ মজলিসে' কিছু প্রণামী পেতেন। কোথাও কোন মসজিদে গিয়ে হুট করে উঠতেন। নমাজ পড়াতেন। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারতেন না। কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙা, কর্কশ। উচ্চারণে জড়তা ছিল। 'ওয়াজে'র সময় লোকেরা চুলত, বিরক্ত হত। স্মৃতিশক্তিও ছিল খুব দুর্বল। শ্লোক বলতে ভুল করতেন। শরীয়তী আইনকানুন তেমনটা শেখা ছিল না। তার ফলে ভুল বিধান দিতেন এবং উগ্রপন্থী মুসলিমদের হাতে লাঞ্ছিত হতেন। আসলে সৈয়দ আজিমুদ্দিন ছিলেন সেলফ-মেড মৌলবী—না পড়েছেন মাদ্রাশায়, না পেয়েছেন 'উলেমা' বা পণ্ডিতবর্গের শিক্ষাদীক্ষা। সারা ছেলেবেলা শিক্ষিত 'আলেম' বা পণ্ডিত বাবাকে ফাঁকি দিয়ে টোটো ঘুরেছেন নিষ্কর্মা হয়ে। বাবা থাকতেন একইভাবে সফরে বাইরে—মুসাফির মৌলানা। জবরদস্ত ধর্মগুরু। বাড়িতে নিরীহ সাদাসিদে মানুষ মা। আজিমুদ্দিন ফাঁকি দিয়েছেন। সেই ফাঁকির ফলাফল বাবার মৃত্যুর পর পেলেন। নানান গাঁয়ে শিষ্যরা গতিক বুঝে নতুন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। সারা বছর শিষ্যবাড়ির ধানচাল গুড় কাপড়চোপড় নগদ দক্ষিণা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজিমুদ্দিনকে অনেক

FIVE WORDS FREE IN TELEGRAPHIC ADDRESSES

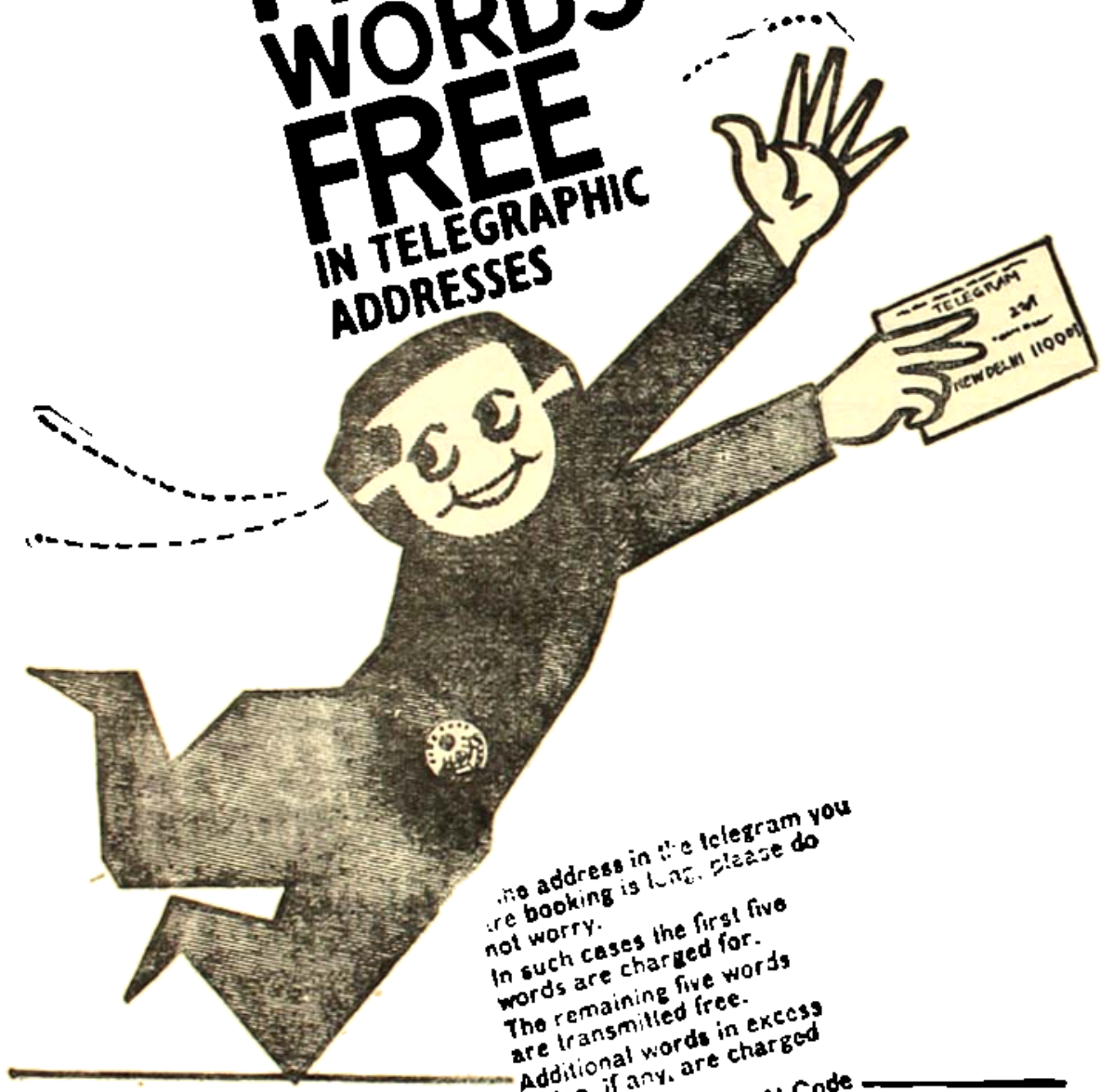

...he address in the telegram you
...re booking is long, please do
not worry.
In such cases the first five
words are charged for.
The remaining five words
are transmitted free.
Additional words in excess
of ten, if any, are charged
for.
Please also write PIN-Code
after the name of the town.
It is not charged for.
Remember complete and
correct address ensures
quick delivery of
you. telegram.

প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলবী মুসলিম সমাবেশে মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ জানাতেন—আপনি কোন মাদ্রাসার পাশ? দেওবন্দ, না আলিগড়? কই, আপনার তকমা? পেশ করুন। আজিমুদ্দিন মুখ নামিয়ে পায়ের নখ খুঁটতেন। তারপর কেটে পড়তেন।

শেষদিকে আজিমুদ্দিন অদ্ভুত-অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করেন। বাড়িতে একদঙ্গল পুষ্যি—চার ছেলে তিন মেয়ে আর বুড়ী মৌলানা বেগম মা। মসজিদ থেকে চুপিচুপি ঘড়ি চুরি করে কেটে পড়তেন। কোন শহরে গিয়ে বেচে দিতেন। কখনও নিদেনপক্ষে মসজিদের দেওয়ালের তাকে রাখা হাদিষ কোরাণও নিয়ে যেতেন। কখনও স্রেফ পিতলের বদনা। ধরা পড়লে প্রচণ্ড মার খেতেন। সে খবর কুলবেড়ে পৌঁছতে হয়তো বছরখানেক লেগে যেত। লোকের মুখে-মুখে দূর মেদিনীপুরের এক গাঁয়ের খবর মুর্শিদাবাদের এক গাঁয়ে পৌঁছতে এতটা সময় লাগবেই। সে আমলে খবর এই বিচিত্র রীতিতে ছড়াত সারা বাংলাদেশে।

এতসব নিকৃষ্ট ঘটনার মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা—অথচ মেয়েদের নামের সঙ্গে বেগম যোড়া থেকেছে। গাঁয়ের অন্য সব পরিবারকে এই সৈয়দপরিবার চাষা বলে মনেমনে তুচ্ছও করেছে। আজিমুদ্দিন বলতেন—এই চাষাভুষো আতরাফ (নিম্নবর্ণের) লোকেদের মধ্যে কেন যে আমরা আছি। লিগগির 'আশরাফ' (উচ্চবর্ণের) কোন 'মোকামে' (জায়গায়) গিয়ে উঠব।

যাওয়া হত না। কে তাঁকে জায়গা দেবে, অতসব বদ-নামের পর? চোট্টামৌলবীর নামে আড়ালে সবাই হাসা-হাসি করে। সতর্ক থাকে। কেউ বিশ্বাস করে না। আর সেইসব দুর্যোগের সময় একেএকে তিনছেলে দুই মেয়ে অকালে মারা পড়ল। নানান রোগে, অচিকিৎসায়। বুড়ি বেগমও মারা গেলেন নমাজরত অবস্থায়। প্রার্থনার আসন 'জায়নমাজে' মাথা ঠেকালেন—আর উঠলেন না। দুকাধের দুই ঐশ্বরিক প্রতিনিধি 'ফেরেশতা'কে মুখ ঘুরিয়ে অভিনন্দনের সুযোগই পেলেন না। আজিমুদ্দিন তখন দূর হাওড়াজেলার কোন গাঁয়ের মসজিদে বসে আছেন। দেয়ালে ঘড়িটা বাজছে টিক্ টক্...টিক্ টক্...টিক্ টক্! নির্জন স্তব্ধ খোদার ঘর। কোনায় পিদীম জ্বলছে। উসখুস করছেন আজিমুদ্দিন। রাতের খাবার আসবার অপেক্ষা।

বাড়ির কোন মৃত্যুই তিনি মুখোমুখি দেখার সুযোগ পান নি। স্ত্রীর মৃত্যুও না। তারপর একদিন ধাঁরভূমের এক মাঠে খরার দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষিদের কাতর আজিমুদ্দিন সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হলেন। তারপর মারা গেলেন। অখ্যাত নিঃশব্দ একটি মৃত্যু। তার খবর এল অনাথ ভাইবোনের কাছে দুদিন পরে। ফৈজুর বয়স তখন আঠারো, রোকেয়া বেগমের তেরো। ফৈজু মণিগ্রামের বাজারে বিড়ি বাঁধে। রোকেয়া রাঁধে-বাড়ে। বাড়ির বাইরে উঁকি দেবার নিয়ম নেই—কঠোর পর্দা। দারিদ্রে মাথা কুটে মরেছে, তবু এ বাড়ির মেয়েরা কখনও দরজার বাইরে পা দেয়নি। আট নবছর বয়স থেকেই খাঁচায় ঢুকেছে। রোকেয়া বাইরের পৃথিবীকে ভয় পেত। আরও ভয় চাষা-ভুষো ছোঁড়াদের জ্বলজ্বলে চোখগুলোকে। উঠোনে ঢিল পড়ত। ভাঙা বেড়ার ফাঁকে শেয়ালের মতো উঁকি দিত ধূর্ত হিংস্র কোন মুখ। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত বালিকা বেগমসাহেবা।

রোকেয়া যখন চোদ্দ বছরের ফৈজু নাম লেখান যুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। ১৯৪৪ সাল। মণিগ্রামের বাবুবাড়ির কিছু নিষ্কর্মা অর্ধশিক্ষিত ছেলে তার বন্ধু। সবাই চলে গেল কলকাতায় এক নম্বর গোখলে রোডে। লাইন দিয়ে দাঁড়াল। রিক্রুটিং অফিসার মিলিটারির ইংরেজ—আমুদে প্রকৃতির। ফৈজুদ্দিনের কাঠি কাঠি শরীর। কিন্তু মুখে কী যেন দেখলেন। পেটে চিমটি কাটলেন। ফৈজুর মুখে একটুকু বিকার নেই। হো হো করে হেসে বললেন—অলরাইট।

ফৈজু বর্মার জঙ্গলে কিচেন বয় ছিল। মৌজমেনে বাঁশের জঙ্গলে কিচেন। মৌতে সৈনিকদের খাবার দিয়ে আসে। হঠাৎ সকাল নটায় জাপানী মর্টারের গোলা পড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। একটুকরো শার্পনেল লাগল তার হাঁটুতে। উরে শালা!. বলে পড়ে গেল সে।

১৯৪৫'এ ফৈজু ফিরে এসেছে, তখন ল্যাংড়া ফৈজু। বগলে ক্রাচ। রেলে মোটরে ভাড়া লাগে না। খাকি পোষাক পরনে। মিলিটারি কায়দায় হাত তুলে সেলাম দিয়ে বলে—আমি সাতজন জাপানী মেরেছি, স্যার। টাস্ টাস্ করে সাত-সাতটা লাস ফেলেছি!. পটাপট্ পটাপট্। উরে শালা!

এই একটা বছর বোনকে টাকা পাঠিয়েছে মাসে মাসে। দূর সম্পর্কের এক পিসিকে রেখে গিয়েছিল বোনের কাছে। এসে শোনে, বুড়ি খুব খায় আর তান ভান করে।

রোকেয়ার হাড় জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রথম ছোটেই বুড়ি পালাল। মিলটারী মেজাজ ফৈজুর। মদগাজায় বোম হয়ে থাকে তখন। হিসেব নেয়।—কোন শালা উঁকি মেরেছিল?

রোকেয়া বলে—যাঃ!

—কোনো শালা কুকথা বলেছিল?

—না, না। তুমি থামো তো!

—কোন্ বাস্তোৎ বেন শাদী করব বলেছিল, শুনলাম?

হ্যাঁ, চাষীপাড়ার মোজাম্মেল। বলেছিল, সাতবিঘে জমি লিখে দেবে। কিন্তু রোকেয়া তার দূতীকে বলেছিল—পেচ্ছাপ করে দিই চাষাভুষোর জমিতে। সেটার সেই শেষ। এখন আর তুলে লাভ কী? ভাইয়ের মেজাজ মিলিটারীর—যদিও একটা ঠ্যাং নেই। তাই সুবিধে করতে পারবে না। কুলবেড়ের মুসলিম চাষীরা হিংস্র মানুষ।

মাসে তিরিশটে করে পেনসনের টাকা পায় ফৈজু। তাড়ি মদ গাঁজাতেই উড়ে যায়। তখন কসাই হল। খাসি কেটে বাবুবাড়ি বেচে আসে। বিকেলে নেশা গিলে রাজা-উজির মারে। বোনের দিকে ক্রাচ ছোড়ে। মেজাজ ভাল থাকলে বোন বলে—ভাই, এবার শাদী করো!

ফৈজু হা হা করে হাসে।—তোর শাদী আগে হোক তো!. তারপর দেখা যাবে।

মসজিদের ঘড়িচোর মৌলবীর বংশে কে মেয়ে দেবে? তার ওপর বয়ের 'আশরাফী' অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয় গরম বেজায়। তারও ওপর, ঠ্যাংকাটা নেশাখোর কসাই। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬২ সাল এই সতেরটা বছর ফৈজু এভাবেই কাটাল। কিন্তু ঘরের চাল খড় জোটেনি, বোনকে একটা ভাল শাড়িও দিতে পারেনি। বরপণের টাকা নেই—বিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। গত গ্রীষ্মের সময় এক দুপুরে ফৈজু খাসির মাংস বেচতে গেছে মণিগ্রাম, রোকেয়া রান্না চাপিয়েছে। গাঁয়ের শেষে মাঠের ধারে বাড়ি। উঠোন ঘিরে খেজুরপাতার বেড়া—নিতান্ত আব্রু রক্ষা। রোকেয়া ঘরে ঢুকেছে একটা কাজে, খড়খড় শব্দ হল বেড়ায়। কুকুর কিংবা ছাগল ভেবে সে বেরুল না। কাঁখুইয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। স্নান করবে। উনুনে ভাত ফুটছে টগবগিয়ে। হঠাৎ দরজায় কে এসে দাঁড়াল। রোকেয়া ঘুরতে না ঘুরতে জানলাবিহীন প্রায়-অন্ধকারে ঘরে কে ঝাঁপ দিল তার ওপর

ফৈজু ঘেমে তেতে ফিরেছে। মেজাজ আগুন—আকাশের বারোমুখে আগুনবেরুনো সূর্যের ওই সূর্যের মতোই সে জ্বলছে। অসহায় রাগে দুঃখে অভিমানে অস্থির। শালারা বড়মুখে মাংস চিবোবে, বাকিতে খাবে—টাকা চাইতে গেলেই বড় বড় বুলি। হিসেবে গোলমাল করবে। ঝগড়া করেছে প্রচণ্ড। বাড়ুয্যেবাবুর ছেলে তিন কিলো মাংস নিয়েছিল গত কালীপুজোর দিন। ইয়ার-বন্ধু নিয়ে মদ মেরে স্ফূর্তি করেছিল। আজ ফের বলতে গেলেই সবাই মিলে মেরেছে ফৈজুকে। দাঁতের ফাঁকে, কষায় রক্ত। মুখের এখানে ওখানে কালশিটে দাগ—ফৈজু কাঁদতে জানে না। চোখদুটো লাল।

এসেই দেখে রোকেয়া উবুড় হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। আলু-থালু মূর্তি। ফুলে ফুলে কাঁদছে। ফৈজুর সাড়া পেয়েই ধড়মড় করে উঠে চেঁচাল—বোনের ইজ্জত যদি না রাখতে পারো, কেন খাচায় ভরে রেখেছ? এক্ষুনি ছেড়ে দাও। বেশ্যাগিরি করে খাব শহরে গিয়ে। কিন্তু আর না—দোহায় তোমার...

ফৈজু ঘোতঘোত করে শুধু বলল—কী?

—লজ্জা করে না জিগ্যেস করতে? বাড়িতে পুরুষ হয়ে আছ!. ছোটলোক ইজ্জত খেয়ে যাবে!. রোকেয়ার এই প্রচণ্ড মূর্তি, এরকম বুকফাটা কান্না সে দেখেনি কোনদিন।

কিছু যেন টের পেল ঠ্যাংকাটা লোকটা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল বোনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। রোকেয়ার কানে এল ক্রাচের ক্লান্ত শব্দ খট্‌খট্ খট্...খট্...খট্...খট্।

উনুনে পোড়াভাতে ধোঁয়া বেরুচ্ছে আগুন ছাই হয়েছে। দুটোর আপ ট্রেন গেল স্টেশনের দিকে। মেনকার সাকোয় শব্দ উঠল মাঠের দক্ষিণে। ধান তোল্ তোল্ ধান তোল্ তোল্!. তারপর হঠাৎ হুইসল—বার বার—দাঁড়িয়ে গেছে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়েই।

তার চাকার তলায় ল্যাংড়া ফৈজুর লাস। ক্রাচটা পড়ে আছে একপাশে, অক্ষত। অভিমানী শৈয়দবংশীয়ের পবিত্র শরীর ও রক্ত মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে খৃস্টানী সভ্যতা ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহের মতো দেখছে।

'খৃস্টানী সভ্যতা।' ফৈজুর দাদু মৌলানাসাহেব বলতেন। বলতেন—রেলগাড়ি বন্তরমন্তর তাবৎ মুসলমানের জন্য হারাম—নিষিদ্ধ। ওসব কেরেস্তানী জিনিস। সাচ্চা মুসলিমের ঘৃণা। তিনি গরু মোষের গাড়ি বা পাল্কি

চাপতেন। পায়ে হেঁটে তিরিশ মাইল যেতে পারতেন এক-দিনে। তাঁর নাতির রক্ত মাড়াল খৃস্টানী সভ্যতা। আর, মৌলানা জেনেও যাননি যে তারই নাতি খৃস্টানের চাকর হয়ে বার্মার জঙ্গলে ঘুরেছে। এক বিধর্মীর বিরুদ্ধে অন্য বিধর্মীর লড়াইয়ে মদদ দিয়েছে। জানলে তার মুখ দেখতেন না। সৈয়দরা পবিত্র পুরুষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের মেয়ের বংশের মানুষ। তাদের গায়ে হজরতের রক্ত আছে।...

রোকেয়ার গায়েও তো আছে!. সেই রক্তের স্বাদ নিয়ে গেল এক জঘন্য শয়তান চাষাভুষো লম্পট।

সব আশরাফী আভিজাত্য ও পবিত্র রক্তের উত্তরাধি-কারে শয়তান দুটো হাত একে-একে দুদিকে বাড়িয়ে দিল সেই গ্রীষ্মের এক ভয়ঙ্কর দুপুরবেলায়। তার একহাত রোকেয়ার, অন্য হাত ফৈজুর শরীরে।

খবর পেয়ে রোকেয়া বেরোল। এই প্রথম কুলবেড়ের মাঠে তার ছায়া পড়ল—শান্ত, ধীর। রেললাইনে শিমুল-তলায় দাদার লাশের সামনে দাঁড়াল। অজস্র পরপুরুষের চোখের সামনে সেই তার প্রথম দাঁড়ানো। শরমের জীর্ণ বোরখা খসতে খসতে পায়ের তলায় নেমে গেল এবং রোকেয়া তাকে মাড়িয়ে পা ফেলতে থাকল।...

মেহের আলির বর্ণবোধ

মেহের আলি ছিল রায়চৌধুরীদের ডানহাত। পাড়া-গাঁয়ে বড়লোক পরিবারের ডানহাত বলতে যাদের বোঝায়, তারা সচরাচর নিছক লাঠিসড়কি বাজ গুণ্ডা মানুষ—পাইক-সর্দার গোছের। মেহের আলি তেমন চাকর বাকর ছিল না মোটে। তার জমিজমা ছিল প্রচুর। কুলবেড়ের বড়লোক বলতে মেহের আলিই। কিন্তু সে লেখাপড়া শেখেনি। কাগজে টিপসই দিত। পরে অরবিন্দ রায়চৌধুরী তাকে শ্লেটে খড়ি বুলিয়ে নাম সইটা শেখান। মেহের আলি মুখস্থ করার মতো তার নামের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে মোট আটটা হরফ লিখতে শিখেছিল। দিব্যি নাম সই করে ফেলত। ব্যস, ওই টুকুই। নিজের নাম বানান করতে তাকে শেখাননি অরবিন্দ। কিন্তু নাম সই মুখস্থ বা আঙুলস্থ করার পর মেহের আলি তার নাম কোথাও লেখা দেখলে পড়তে পারত। কারণ হরফের অনন্ত দেশে ওইটুকুই তার চেনা জায়গা। শুধু তাই নয়, স্বরচিহ্ন ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে সেই আটটা চিহ্নের যে কোন একটা দেখতে পেলেই সে খুশি হয়ে বলত—চিনেছি! তবে সে 'আ' চিনত—তাই কোথাও 'অ' দেখলে সন্দেহে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকত। বলত—আমার হরফটাই বটে, আবার নয়ও বটে।

অরবিন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক চাকর-মনিবের ছিল না। আবার ঠিক বন্ধুত্বেরও নয়। পরস্পর পরস্পরকে বেশ খাতির করে চলত। এই খাতির সময়ে মেহের আলিকে আবেগাপ্লুত করলে সে অরবিন্দকে তুমি বলতে পিছপা হত না। অন্যান্য সময়ে আপনিই বলত। প্রথম হজে মেহের আলি মক্কায় গিয়ে মাথা মুড়িয়ে টুপি পরে ফিরলে স্টেশনে তাকে স্বাগত জানাতে যান অরবিন্দ। এবং কিছুক্ষণ 'আপনি' বলেন, কারণ 'হাজিসায়েব' বলার ফলে ওই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য করে মেহের আলি তাঁকে বলেছিল—ওসব আপনিটাপনি কেন চৌধুরী মশাই, হজ করে আমার তো আপনাদের মতো লেজ গজায়নি! অরবিন্দ হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ছিলেন এবং বলেছিলেন—আমাদের লেজ আছে নাকি হে হাজিসাহেব? কই, এ্যাদ্দিন তা তো বলোনি! তাই শুনে মেহের আলির মন্তব্য: আছে চৌধুরী মশায়। ভেতর দিকে আছে।

হিন্দু বাবু এবং মুসলিম মিয়া অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয়দের সম্পর্কে মেহের আলির কিছু তাচ্ছিল্য ছিল। সেটা সময়ে প্রকাশ পেত। সে বলত—মাটির ওপরে হাঁটেন ওনারা, মাটির ভেতরে হাঁটে চাষা। মাটির তলায় কী আছে যে জানেনা, সে কলের মানুষ। নিজের চাষার সম্পর্কে তার গর্ব ছিল প্রচণ্ড রকমের। অরবিন্দের পাল্লায় পড়ে নিজের নামটা আঙুলস্থ করতে শিখলেও লেখাপড়া না শেখার জন্য তার এতটুকু গলানি ছিল না। বরং বলত—লেখাপড়া শিখলেই মানুষ মামলাবাজ হবে। সব সময় অকাজ-কুকাজে নাক গলিয়ে বেড়াবে। তার চেয়ে দেখ, আমরা কেমন আছি। মাঠঘাটে পাছার কাপড় এঁটে খাটি, খাই, ঘুমোই। কোন সাতেপাঁচে নেই। মেহের আলির এই বক্তব্য অবশ্য মোটেও নির্ভুল নয়।

কিন্তু এই বিশ্বাসের ফলে তিনছেলেকে সে লেখাপড়া শিখতে দেয় নি। অরবিন্দ পাল্লাই পাননি। দুই মেয়ে কিছুদিন মসজিদে মৌলবীর কাছে আরবি মুখস্থ করে-ছিল। কোরাণ পড়তে পারার পরই তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলেদের মধ্যে বড় ফরিদ। বাপের মতো গোঁয়ার মানুষ। তার ছেলে কামাল। কামালকে ছ'বছর বয়সে অরবিন্দ প্রায়

অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন

নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।

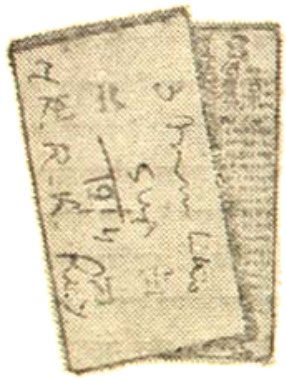

অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে কত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন। কন্ডাক্টর শেষ থাকত না।

পুরো ভাড়া এবং জরিমানা কিংবা মাঝ পথেই বাধা হয়ে নেমে যাওয়া; অথবা ২১০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস, ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।

অযথা জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন। মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। ১৯৭৩ সালে পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে অসংখ্য লোক ধরা পড়েছেন।

টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোষাবেন না। অনুমোদিত বন্ধু থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

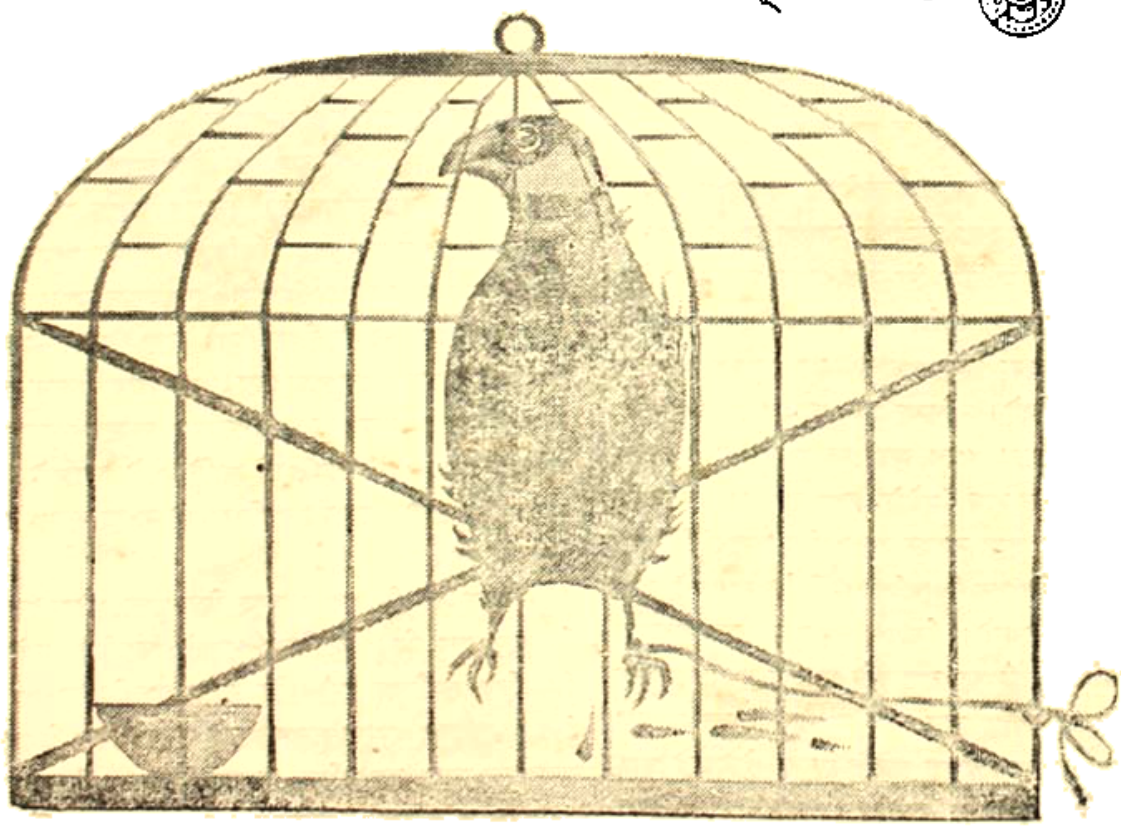

কোলে তুলে নিয়ে পাঠশালায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। মেহের আলি বলেছিল—ঠিক আছে। আমে-দুধে যার। তার মধ্যে একটা সখের ফুলগাছ থাকে তো থাক্।

নাতির সাজ পোষাক, লেখাপড়া নিয়ে মেহের আলি বরাবর ঠাট্টা কৌতুক করেছে। কখনো বলেছে, 'রঙের গোলাম'। কখনও—'কলগাড়ি'। স্কুলে যাচ্ছে নাতি—সেজেগুজে যাচ্ছে। মেহের আলি হা হা করে হাসতে হাসতে বলেছে—ওই চলল কলগাড়ি।

পরে কিন্তু ফরিদ তার ছোট ছেলেকেও লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিল। মেহের আলি আপত্তি করে নি। ততদিনে সে অনেক নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। সারা যৌবন মাঠে ঘোরা দুর্দান্ত চাষামানুষ মেহের আলি প্রথম হজের পর থেকে বদলে যাচ্ছিল। ধর্মমুখী হয়ে পড়ছিল। কুলবেড়ে-মণি-গ্রাম এলাকায় সে কারণে-অকারণে অনেক মানুষের মাথা ফাটিয়েছে একসময়। পুলিশের বা মামলার হাঙ্গামা সামলাতে অরবিন্দ ছিলেন তার মাথার ওপর। এতটুকু আঁচড় লাগতে দেননি গায়ে। প্রথম হজের পর অরবিন্দ চলে গেলেন সপরিবারে কলকাতায়। আত্মীয় স্বজন এবং গ্রাম দলাদলির ঝঞ্ঝাটে অস্থির হয়েই চলে যান। অবশ্যও পড়ে এসেছিল দিনে দিনে। মাঠের জমিজমা বেচে দিয়ে ফতুর হচ্ছিলেন তলেতলে। মেহের আলি টের পেত। কিন্তু অরবিন্দও তার মতো দুর্দন্ত গোঁয়ার মানুষ। শেষ দিকে দেশের অবস্থাও এত বদলেছিল যে নিছক লাঠির জোরে অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার সুযোগ আর মিলছিল না। মেহের আলিদের ভূমিকা ১৯৭৪'এর আগস্টেই ফুরিয়েছে তিনি টের পেয়েছিলেন। এখন তাঁর দরকার ছিল অন্যরকম ডান-হাত। তাই তিনি গ্রাম ছাড়লেন।

তারপর মেহের আলি একা বোধ করল। ধর্মে মন দিল। আরও জোরে খোদার দিকে হাঁটতে থাকল। পরনে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে ধানের সাদা বিশাল পানজাবি, মাথায় টুপি, হাতে একটা বেঁটে লাঠি। মেহের আলি যেন শেষবেলায় নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে একা পশ্চিমদিকে হেঁটে যাচ্ছিল—ওই দিকেই তো তার খোদা থাকেন!

তৃতীয়বার বিমান হজের পর মেহের আলি একেবারে অন্য মানুষ। লোকে বলে, আসমানে উঠে উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে দুনিয়া দেখেই হাজির মাথা ঘুরে গিয়েছিল। দুনিয়া কী, মানুষই বা কী, টের পেয়ে গিয়েছিল। তা নাহলে হঠাৎ এই আজগুবি কাণ্ডের কোন মানে হয় না।

ল্যাংড়া ফৈজুর বোন রোকেয়া বেগমের কাছে গোপনে মহিলা পয়গাম অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বিশেষ দূত গেল কুরনবুড়ি। হৈবর আলির মা। ধূর্ত গোয়েন্দা-বিশেষ মেয়ে। ইদানীং হাজির কাছে বসে ফুসুর ফাসুর করত। হাজি মোড়ায় বসে তারায় শণের দড়ি পাকায়।...

লোকে আরও বলে—অবশ্য নাতি কামালও ব্যাপারটা টের পেয়ে ভেতর থেকে হাত লাগিয়েছিল। সে নিজেও নাকি ফৈজুর বোনের কাছে একবার যায় এবং কথাটা তোলে।

আশ্চর্য, মেয়েটা রাজী হয়ে যায়। শোভানাল্লা! এ কী বিদঘুটে ঘটনা ঘটল কুলবেড়ের! উনসত্তর বছরের বুড়ো বর, মধ্য যৌবনা কনে। ফর্সা, দুধেখরিসের মতো চেহারা—খাঁদানী নাক মুখের গড়ন। দুটো চোখ কটা—অর্থাৎ পিঙ্গল।...

অগত্যা হাফানির রুগী, শয্যাশায়িনী হাজি বিবি অর্থাৎ ফরিদ-হামিদ-ওহিদ ও নুরী-পরীর মা তসলিমা বিবি সায় দিয়ে বলে—আমার অমত নাই। ছরতে ঘুণ ধরেছে। হাজি তো বেটা ছেলে—সাধ আহ্লাদ আছে।...

নিশিরাতে হাজিবাড়ি মেয়েরা ঢোলে চাটি মারল। গান গেয়ে উঠল। নাতিনাতনীরা হাজিকে হলুদ মাখাবেই। জোব্বা ধরে টানাটানি। হাজি হাসে আর বলে—তোবা তোবা! ওরে থাম্, থাম্! শরমের মাথা খাওয়াবি এ-বয়সে? ওদিকে উঠোনে হাসাগ জ্বলছে। পাড়ার তুখোড় মেয়ে কুলসুম মাথায় পাগড়ি বেঁধে, কাছা দিয়ে কাপড় পড়ে, লাঠি হাতে কাবুলির সঙ সেজেছে মেয়েদের আসরে। যে মেয়েটা ঢোলের তালে নাচছে, তার গলায় গান—কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে সেই গানের পদ হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ ছাড়া কোন শব্দরূপ ধরতে পারছে না। বাইরে থেকে একবার ফরিদ আলি এসে ধমক দিয়ে যায়—সমাজে দুষবে। হচ্ছে কী সব? বে-শরা (ইসলামের কানুনবিরোধী) চললে মস-জিদে কথা উঠবে!

কেউ শোনে না। ধর্মটর্ম এখন শিকেয় তুলে রাখো বাপু! বিয়ে হচ্ছে বিয়ে। একি লুকোছাপার ব্যাপার নাকি মুখ গোমড়া করে থাকার?

তখন মেহের আলির দাড়িতে চাপচাপ মেহেদী পাতা বাটা। হাতের তালুতেও। হাজি মুহাত তুলে বসে তোবা তোবা করে হাসছে। শুধু হাসছে।

ওদিকে কনের বাড়ি একপাল মেয়ে হাজির। বিকেলে কামাল নিজে গিয়ে পাঁচশো টাকা গুণে দিয়ে এসেছে কনের

হাতে। বরযাত্রীরা এসে নাস্তা করবে। শরবত খাবে। পান খাবে। সেখানে কামালের চেলাচামুণ্ডা চাষাভুষো ছেলে ও বয়স্করা সব তাম্বুর তয়ারক করছে। সৈয়দ পরিবারে এই প্রথম মেয়েরা ঢোল বাজাল। নাচল-গাইল।

কনেবউটি নির্বিকার। সবাই বলে—একটু হাসো না বাছা! তখন রোকেয়া একটু হাসে।

—মকবুল মসলা কিনতে মণিগ্রাম যাবে। কম পড়েছে। টাকা দাও গো!

রোকেয়া আঁচলের গিঁট থেকে টাকা খোলে। আস্তে বলে—কত?

—দশপনেরটা দাও।

রোকেয়া টাকা দেয়। নির্লিপ্ত মানুষের মতো। হিসেব করে না। এত টাকা সে কোনদিন দেখে নি। কেউ না থাকলে খুলে আবার দেখত। বারবার দেখত।

কামাল এসে পড়ে দুমদাম হঠাৎ।—ও দাদী! সরি! বলে জিভ কেটে হাসে।—হুঁ, বেগমসায়েবা! টাকায় কম পড়বে মনে হচ্ছে না তো? একশো লোক খাবে—মনে রেখো।

রোকেয়া মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। বোঝা যায় না, কী বলে।

—ঘাবড়ে যেও না বেগমসায়েবা! আমি তোমার ডান হাত হয়ে আছি।

রোকেয়া নিষ্পলক তাকায় শুধু।

—কেন এত নার্ভাস হচ্ছ বেগমসায়েবা? সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি উঁচুবংশের মেয়ে—তোমার ইজ্জত বজায় রাখতেই এত কাণ্ড।...

রোকেয়া নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকে। কামাল ওই-রকম চাহনির সামনে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মুহূর্তে তীব্র অপরাধ বোধই যেন বা কাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। চলে আসে সেখান থেকে। হঠাৎ মনে হয়—এ কী সব হয়ে গেল! সে তো ইচ্ছে করলেই দূরের কোন গাঁয়ে কোন মিয়া-পরিবারে এই গরীব মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারত। কেন করল না?

বিয়ের দিন কামাল বন্দুক নিয়ে বিলে-বিলে ঘুরে কাটিয়েছিল। মেহের আলির তিন ছেলেই মাঠে গিয়ে চাষ-বাসে মন দিয়েছিল। দুমেয়ে বিয়েতে আসেনি। তবু বিয়েটা জমাটি হল। কথায় বলে, সব বিয়ে কি মানুষে-মানুষে হয়? পয়সায় পয়সায় কিছু হয়। কিছু বা পাঁরিতে পাঁরিতে।

কিন্তু শেষঅব্দি সব বিয়েই তো শরীরে-শরীরে—শরীরের সঙ্গে শরীরের কারবার। মাংসের বাজারে বিকি-কিনি। উনসত্তর বছরের হাজি মেহের আলিকে কুলবেড়ের লোকে, আড়ালে কসাই বলতে শুরু করল।—মেহের আলি নির্বিকার। সাদা দাড়িতে মেহেদীর রঙ নিয়ে সে মসজিদে যায়। ধর্মকর্মের বহর বেড়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল। তাই দেখে লোকে বলে—খোদার কাছে যৌবন ফেরত চাইছে। নমাজে বসে হাজি ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। এর গূঢ় কারণ তো বোঝাই যায়!

মণিগ্রামের সোনাবাবু কামালকে বলেছিল—যযাতির গল্প জানিস খোকা?

—জানি। কেন সোনাদা?

—তোর যৌবনটা দাদুকে ধার দে।

কামাল হাসত। তারপর গম্ভীর হয়ে যেত। তীব্র অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছিল সে। রোকেয়া বেগমের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত না। বাড়ির পিছনদিকে আম কাঁঠালের বাগান। ওদিকটায় বড় ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে থাকে রোকেয়া। হাজি মধ্যরাতে মসজিদ থেকে ফিরে আসত। তার কাশির শব্দ এবং রোকেয়ার লম্ফ হাতে দরজা খোলা টের পেত সে। অমনি এক দুর্বোধ্য আতঙ্ক কামালের মধ্যে জেগে উঠত। মাঠঘাট বনবাদাড়ের এক আদিম হিংস্র জন্তু—এখন নখে যার ধার নেই, জরোশাব এমন এক প্রাণী যেন হরিণীর গুহায় ঢুকে যাচ্ছে।...

এক রাতে কামালের প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল। সে চুপিচুপি ওই ঘরের জানলায় গিয়ে কান পেতেছিল।

কিন্তু একটু পরেই অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ঘরের মধ্যে আদিম জন্তুটা ফুঁসছে। মেহের আলি চাপা হিংস্র কণ্ঠস্বরে তার যুবতী বিবিকে শাসাচ্ছে।—হ্যাঁ, আমি জানি। সব জানি।

—কী জানো তুমি?

—ফয়েজ আলি তোকে নষ্ট করেছিল!

অমনি ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ হল।—বেইমান! তুমি বেইমান! তোমার হজ মিথ্যে। তোমার পাঁচওক্ত নমাজ পড়া মিথ্যে! তুমি কসাই!

—খবর্দার! আমি সেই মেহের আলি। জবাই করে ফেলব!

—করো, এক্ষুনি জবাই করো! না-ফরমান! শয়তান! বেহেস্তা! ধিক্ তোমাকে!

কামাল ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আদিম মানুষ-টিকে কিছু বিশ্বাস নেই। কিন্তু মেহের আলি তেমন কিছুই করল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে শোনা গেল তাকে। তারপর ধরা গলায় বলে উঠল—তোর পেটের বাচ্চাটা তো আমার না। আমি জানি। ওটা ফয়েজ আলির।

রোকেয়া আবার কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে। আবার স্তব্ধতা। তারপর আবার মেহের আলির কথা শোনা গিয়েছিল।—তবু সব জেনেশুনেই তোকে সাদী করেছি। কেন—তা শোন।

—শুনব না। আমি জানি।

—তুই জানিস না হারামজাদী। তুই ভাবছিস, তোর রূপযৌবন দেখে এই বাঘের বেটা বাঘ মজে গিয়েছিল। তা নয়। তুই আমার বেটির বয়সী। তবু তোকে সাদী করলুম —লোকলজ্জার মাথা খেলুম। কেন, তা শোন্। তোদের আশরাফী বংশের গৌরব-গিদের ভাঙতে। হ্যাঁ—ছেলেবেলা থেকে আমার ইচ্ছে ছিল, ওই খান্দানী গুমোর আমি ভাঙব। যৌবনে পারি নি। এ্যাদ্দিনে বাগে পেয়েছি। ভেঙেছি। বাস্! আমার কাজ শেষ।...

বাগানের দিকের দরজা খোলার শব্দে কামাল একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। তারপর সে দেখল, হাজি মেহের আলি টর্চ জেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাগান ঘুরে আলো মিলিয়ে গেল। হাজি সম্ভবত মসজিদে চলে গেল। সেখানেই শুয়ে থাকবে। ভোরের নমাজ পড়ে বাড়ি ফিরবে। দহলিজে বসে শণের দড়ি পাকাবে টেরায়। তখন একেবারে অন্য মানুষ।

কামাল সে রাতেই টের পেয়েছিল মেহের আলি আসলে কে। তার ধর্মকর্ম তার সংসার তার বিনয় ভব্যতাবোধ—সব কিছুর তলায় বসে আছে এক আদিম মানুষ—যে প্রকৃতির পাঠশালায় পাঠ নিয়েছে।

বিস্তীর্ণ মাঠে বিলে নদীর ধারে তাই এখনও তাকে যেতে হয়। এখনও সে দুনিয়াটাকে উর্বর ও কর্ষণযোগ্য ক্ষেত মনে করে। সে অংশীদার সহ্য করতে পারে না। আপোষ করতে জানে না।

খান্দানী গুমোর ভাঙা হয়েছে। শেষপর্যন্ত এই সুখ নিয়ে বেঁচে আছে। কামালের হাসি পাচ্ছিল—দুঃখমিশ্রিত হাসি। সে আস্তে আস্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল ঘরটার ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল—তার সাড়া পেয়েই সরে গেল।

কামাল টর্চ আনেনি সঙ্গে। মূর্তিটা আমগাছের তলায় ঘন অন্ধকারে মিশতেই সে দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—কে? কে?

লোকটা পালিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। কামালের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল রোকেয়া। দরজা খুলে লম্ফ হাতে সে উঁকি মারছিল।—কী হয়েছে খোকা?

কামাল বলেছিল—কিছু না। শেয়ালটেয়াল হবে।...

পরদিন সকালে কামাল সাইকেলে বাজারের দিকে যাচ্ছে, ডাইনে ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়েছিল দূরে মাঠের মধ্যে হাজি মেহের আলি চলেছে। মাথায় সাদা টুপি, পরনে লম্বা সাদা পানজাবি। সবুজ ধানের মধ্যে ওই সাদা চলমান একটা সত্তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তখনই একটা চাপা ত্রাস জেগে উঠেছিল মনে। মেহের আলি ও-ভাবে কোথায় যাচ্ছে?

ওই ভাবে যেতে-যেতে অবশেষে মেহের আলি চলেই গেল। আর তার ঘরে ফেরা হল না।...

বাদুই পাখির বাসা

বাদুই বলে—শাউন্ডব্রুফ ঘরের মতো তোমাদের এই গ্রামটা। হিরন্ময়ী ওর এই মন্তব্যের মানে বোঝেন। তাঁর জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে পাড়াগাঁয়ে, দ্বিতীয় অংশ শহরে। যে-সে শহর নয়, কলকাতায়। হিরন্ময়ীর নিজস্ব পরিসংখ্যান: সেখানে আশি লাখ লোক, আশি হাজার কারখানা এবং আশি হাজার গাড়ি। কানের পর্দা ফেটে যায়। জীবনের তৃতীয় অংশে হিরন্ময়ী আবার গ্রামে কাটাচ্ছেন। তাঁরই তো হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবী এত শব্দহীন কেন? দম আটকানো ভাবটা কিছুক্ষণ থাকে। তারপর কেটে যায়। এই গ্রামীন পৃথিবীর শব্দগুলো বড় সূক্ষ্ম। তাছাড়া আকাশটা এত বিশাল যে সব শব্দই তীব্রতা হারায়। তারপর কানে আসে, ঘাসফড়িং আর পাখিদের ডাক। টুকরো সব কণ্ঠস্বর। গাভীর গলার ঘণ্টাধ্বনি এবং বাছুরের হাম্বা। সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজে। কোথাও বেজে ওঠে দিনশেষের শাঁখ। সেই চিরকেলে পাড়াগাঁই যেন রয়ে গেছে।...

এক বিকেলে কামাল এল। হন্তদন্ত ঢুকেই বলে—

"প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৪১.৬৬টাকা. এই ব্যবস্থাই আমি চাই— নিয়মিত রোজগার"

	মাসিক দেয় সুদ		
	১২/৩৩ মাস ৮% হারে টা:	৩৬/৬০ মাস ৯% হারে টা:	৬১ মাস ও তদূর্ধ্বের জন্য ১০% হারে টা:
১,০০০	৬.৬৬	৭.৫০	৮.৩৩
৩,০০০	২০.০০	২২.৫০	২৫.০০
৫,০০০	৩৩.৩৩	৩৭.৫০	৪১.৬৬
১০,০০০	৬৬.৬৬	৭৫.০০	৮৩.৩৩

ইহা সহজেই সম্ভব। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মাসুলী ইন্টারেস্ট ডিপোজিট স্কীমের অধীনে শুধু আপনি ৬১ মাসের জন্য ৫০০০/- টাকা জমা রাখুন এবং তার দরুণ প্রতি মাসে নগদ ৪১.৬৬ টাকা হাতে পান।

আপনি আরও কম বা বেশী দিয়েও শুরু করতে পারেন। আপনার জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ ও মেয়াদের ওপর সুদও কম বেশী হবে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

যে ব্যাঙ্ক নানা দেশে নানালোকের সেবা করতে আগ্রহী

বাবুই কোথায় মাসিমা?

হিরন্ময়ী খোলা বারান্দায় চেয়ারে বসে উল বুনছিলেন। শীত আসছে। বরাবরের অভ্যাস। বলেন—আর খোকা। বাবুই বেরিয়েছে ভাংএর সঙ্গে।

কামাল বলে—সুখবর এনেছি, মাসিমা। বাবুইয়ের মাস্টারিটা হয়ে গেল।

হিরন্ময়ী তাকান।

—বিশ্বাস হচ্ছে না? এইমাত্র ম্যানেজিং কমিটির মিটিং থেকে আসছি। আমিও একজন মেম্বার জানেন না?

হিরন্ময়ী একটু হাসেন।—হ্যাঁ রে, বাবুই পারবে তো?

কামাল হো হো করে হাসে।—বরাবর আপনার ওই কথা। কেন পারবে না? তারাসুন্দরী বিদ্যাপীঠের গার্লস সেকশনে যে সব মেয়েরা পড়ে, তারা নিছক গাঁয়ের মেয়ে। বাবুই যা স্মার্ট!. দেখবেন, ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবে। তবে একটা কথা মাসিমা। ওকে বিটিটা পড়তে বলুন।

—বেশ তো। তুই-ই বলিস।

—বলব। আপাতত অবশ্য টিচার্স ট্রেনিং বলে একটা ব্যবস্থা আছে, জানেন তো? সেটা দিয়ে নিতে হবে।

—বাইরে নাকি রে?

—বেশি দূরে নয়। বহরমপুরে। ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করবে বরং।

হিরন্ময়ী একটু চুপ করে থেকে বলেন—কেউ আপত্তি করেনি?

—কেন? কামাল একটু অবাক হল।

—আমরা ফিরেছি, এতেই তো অনেকের চক্ষুশূল।

—না মাসিমা। তাছাড়া, স্কুলটা তো বাবুইয়ের দাদুর তৈরী। এখন না হয় নামটা ওরা গায়ের জোরে বদলেছে। কিন্তু লোকে তো সবই জানে। বাবুইয়ের ন্যায্য অধিকার আছে। তার জোরেই সে স্কুলে ঢুকছে।

হিরন্ময়ী অন্যমনস্কভাবে হাসেন।—হ্যাঁ। দিদিমণি হয়ে ঢুকছে!

গতিক বুঝে কামাল প্রসঙ্গ বদলায়। কুলবেড়ের প্রাইমারি স্কুলটা বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে এ্যাদ্দিনে। কিন্তু এখনও কামালকে প্রতিদিন দশটায় বাড়ি-বাড়ি ঢুকে ছাত্র বের করে আনতে হয়। মুসলমান চাষীরা ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর মানে এখনও বুঝতে পারছে না। অবশ্য তারা বড্ড প্রাকটিক্যাল। ছেলে আট বছর বয়স পেলেই তো চাষের কাজে বাপকে সাহায্য করতে পারে। অন্তত গরুমোষগুলো চরিয়ে আনতেও পারে তারা। ছেলে স্কুলে পড়তে গেলে চাষীদের অনেক সমস্যা এসে যায়। তারপর চাষী একদিন বুড়ো হয়ে যাবে। তখন শিক্ষিত ছেলে আর হাল ধরতে চাইবে—নাকি পারবেও? তখন বাবুদের মতো ভাগে দিতে হবে। সবাই লেখাপড়া শিখলে ভাগচাষই বা করবে কে?

এইসব সমস্যা নিয়ে কামাল বিরত। অবশেষে বলে—মেকানাইজ চাষবাস হলে অবশ্য সমস্যাটা আর থাকে না। গরুর পিছনে শিক্ষিত ছেলে হাল ঠেলতে রাজী হবে না—কিন্তু পাওয়ারটিলার চালাতে আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। প্যান্ট শার্ট টুপি পরেও এটা চলে কিনা!. বুঝলেন মাসিমা? আমার নিজের দ্বারা তো কিছু হল না। ভাবছি, মুকুলটাকে এগ্রিকালচার পড়াব। কল্যাণীতে।

এক ফাঁকে কুকার জেলে হিরন্ময়ী চা করে দেন। তারপর বলেন—থাক্‌গে ওসব কথা। হ্যাঁরে, তোদের মামলার কী হল?

—কোন মামলার? বলে কামাল তক্ষুনি অপ্রস্তুত হাসে।—ও, দাদুর খুনের? সে তো ফয়েজআলি আর তার তিন চেলাকে হাজতে রেখেছে। জামিন দেয়নি। সাক্ষী-টাক্ষী ভাল আছে। আমার ধারণা, বড় আকারে সাজা হয়ে যাবে।

হিরন্ময়ী হাতের উল গুটিয়ে রেখে বলেন—ফয়েজ আলিটা কে রে?

—আপনি চিনবেন না। বয়স খুব বেশি নয়—আমার দুতিন বছরের বড় হবে। একটু বাউণ্ডুলে টাইপের ছেলে বরাবর। ক্লাস সিক্স অব্দি পড়েছিল। গুণ্ডামি করে সব বরবাদ হয়ে যায়। ইলেকশান-পলিটিকসে ওকে আপনাদের বাবুপাড়ার অনেকে টেনে আনেন। তারপর তো ফয়েজ এলাকার মস্তান গুণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর কাজ ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা বাজারে সাপলাপাল নিয়ে আড্ডা দেওয়া। ছলছুতো পেলেই মারামারি করে নিজের ক্ষমতার প্রপোগাণ্ডা চালানো। দেখলে আপনি বুঝতেও পারবেন না যে ও এক হাফ-এজুকেটেড মাস্তান। প্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জি পরে থাকে। হাতে স্টেনলেস স্টিলের বালা। তেমনি গোঁফের বাহার!...কামাল হাসতে থাকে।

হিরন্ময়ী অবাক হয়ে বলেন—বলিস কী রে! এসব তো শহরে দেখা যায়।

we're at home

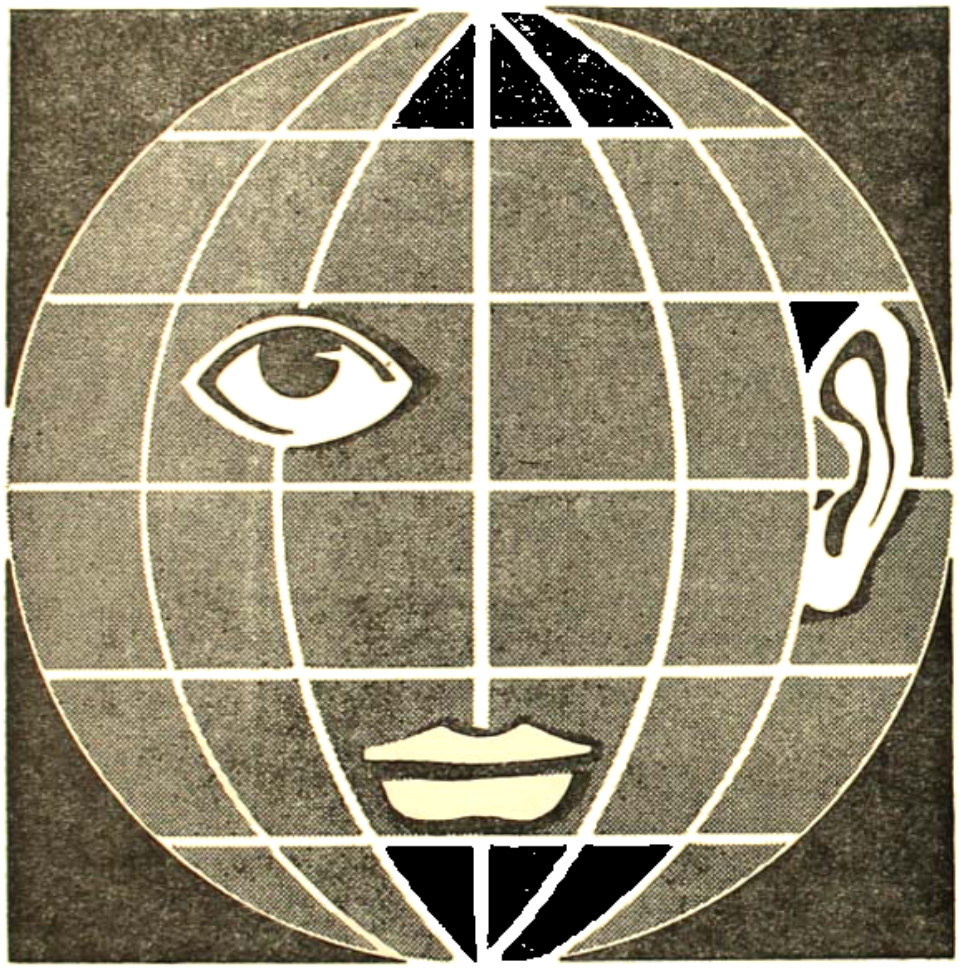

around the world

APEEJAY
SURRENDRA

AMIN CHAND PAYARE LAL

"APEEJAY HOUSE"

15, Park Street, Calcutta-700 016

কামাল বলে—শহর আজকাল গায়ে ঢুকে গেছে, মাসিমা। বাইরে-বাইরে হয়তো খুব বেশি কিছু চোখে না পড়তেও পারে। কিন্তু ভেতরটা বদলে গেছে অনেক বেশি। আপনি আরও কিছুদিন থাকুন, টের পেয়ে যাবেন সব। যা দেখে গিয়েছিলেন, তা আর নেই।

হিরণ্ময়ী বলেন—কিন্তু এ কি ভাল, না মন্দ রে খোকা!. তোর কী মনে হয়?

কামাল একটু ভেবে নিয়ে বলে—একেবারে মন্দ বলতে ইচ্ছে করে না। কারণ, মানুষ এখানে আত্মসচেতন হতে পেরেছে, তাতে কোন ভুল নেই। আমার ধারণা, এটাই মানুষহিসেবে একটা বড় লাভ। এতকাল তো ভেড়ার পালের মতো সবাই বেঁচেছিল।...

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কামাল বেরিয়ে যায়। বাজারে ঢোকার মুখে সোনাবাবুর সঙ্গে দেখা। সোনাবাবু বলে—খোকা মিয়া!. ব্যাপার কী হে? ফয়েজরা জামিন পেল যে!

কামাল দাঁড়িয়ে পড়ে।—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। একুনি তো ওরা চারজনে রিকশো থেকে নামল। প্রমথের চায়ের দোকানে এখনও বসে আছে।

কামাল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। ননবেলেবল কেস। হঠাৎ কীভাবে এমনটা হল, বুঝতে পারছিল না সে।

সোনাবাবু বলে—কানে অনেকরকম আসছিল। দেখা গেল, একেবারে মিথ্যে নয়। ফয়েজের পক্ষে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। সেটা স্বাভাবিকই বটে বাঁড়ুযোরা সাক্ষী ভাঙা-চ্ছিলেন, শুনেছিলুম। মনে হচ্ছে, তাও সত্যি। তা না হলে রাতারাতি এমন হতে পারে না।

কামাল হঠাৎ বলে—মরুক গে। আমি কী করতে পারি! চলি, সোনাদা।

সে অনামনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। হেমন্ত এসে গেছে। মাঠে ধানের রঙ হলুদ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার দিকে একটু ঠাণ্ডা আসে। প্রমথের চায়ের দোকানে সত্যি সত্যি ফয়েজকে দেখতে পায় এবং দ্রুত হাঁটতে থাকে। তেমাথা পেরিয়ে কুলবেড়ে ঢুকবে ভাবে। কিন্তু মনে একটা হইচই চলেছে। গ্রামা রাজনীতিতে হাজির খুনের মামলাটা ঘোঁট পাকিয়ে গেছে। এর ফলাফল কতদূর পৌঁছবে, সে বুঝতে পারছে না। উত্তরদিকে হাইওয়ে ধরে সে চলতে থাকে। একটু পরেই সে দেখে, বাবুই আর ডাং ফিরে আসছে একই রাস্তায়। সম্ভবত দূরে খালের ব্রীজে ওরা এতক্ষণ বসেছিল।

হঠাৎ কী একটা ঘটে যায় কামালের মনে। ডাংএর বাবা ফয়েজকে বরাবর প্রশ্রয় দেন। সোনাবাবুও বলল যে এই মামলার সাক্ষী ভাঙাচ্ছে বাঁড়ুযোরা। সেই বাবার ছেলে এই ডাংএর সঙ্গে বাবুই ঘুরে বেড়ায়। সব মিলিয়ে কামালের মনে একটা গভীর অস্থিরতা। বাবুইকে সুখবর দিতেই হয়তো এদিকে পা বাড়িয়েছে সে—বাবুই এদিকেই ঘুরতে ভালবাসে, সে জানে। কিন্তু সেই সুখবর দেওয়ার সুখটা হঠাৎ মিইয়ে গেছে।

দূর থেকে তাকে দেখেই বাবুই হাত নেড়েছে। তখন কামালের আর চলে যাওয়া হয় না। কাছে এসে বাবুই বলে—কামালদা, আজ কেউটে সাপ দেখলুম! সত্যি বলছি!

কামাল একটু হেসে বলে—তুমি বুঝি শুধু সাপ দেখতেই এসেছ এখানে?

ডাংও হাসে।—রিয়্যালি! সাপ ছাড়া কিচ্ছু দেখতে চায় না।

কামাল তামাসা করে বলে—কিন্তু তাই বলে সাপের রিয়্যালিটি পরীক্ষা করতে আবার ছুঁয়ে বসো না। সাবধান! যাক্ গে, শোন—কাল থেকে তুমি দিদিমণি।

বাবুই ভুরু কুঁচকে বলে—তার মানে?

—তোমার মাস্টারিটা হয়ে গেছে।

ডাং হাততালি দিয়ে বলে—হুররে!. বাবুই, কী খাওয়াচ্ছ?

বাবুই বলে—সত্যি?

কামাল জবাব দেয়—হ্যাঁ, সত্যি। আজই কমিটির মিটিংয়ে হয়ে গেল। আমাকে বলতে বলেছে, তুমি কাল মর্ণিংয়ে স্কুলে যাবে। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করবে।...

বাবুই চুপ করে থাকে। তার স্তব্ধতায় কী একটা ছিল, ডাং বা কামাল কেউ কথা বলে না। ওকে লক্ষ্য করে। চুপচাপ হেঁটে আসে তিনজনে। পাঁচের ওপর ব্যাং লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে। বাবুই ব্যাংটা দেখে কিংবা কেন হঠাৎ হেসে ওঠে। কামাল মুখ ঘোরায়। ডাং বলে—কী? ব্যাং দেখে অবাক হচ্ছ নাকি?

—না। বাবুই মাথা দোলায়।

—তবে?

আমরা দুঃখিত

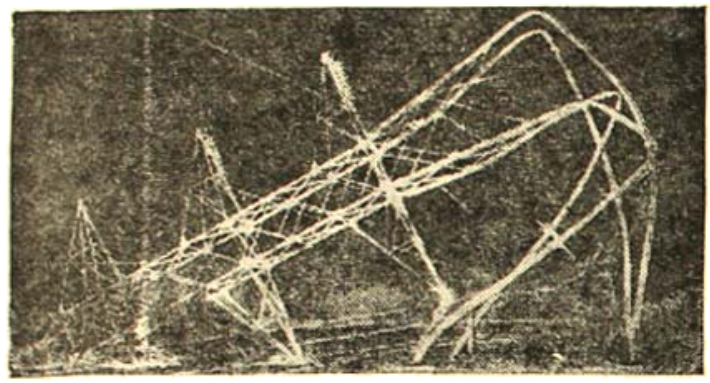

আমরা অসহায়।

সারা রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজটা কিন্তু ছেলেখেলা নয়। মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, পাহাড় পেরিয়ে বিদ্যুৎ-বাহী স্তম্ভ রাজ্যের আনাচে-কানাচে বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে চলেছে। আর এই কাজে দিবারাত্র নিয়োজিত আছেন আমাদের অসংখ্য কর্মী। কিন্তু কিছু সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম পণ্ড হতে চলেছে। বিদ্যুৎস্তম্ভের নানা অংশ চুরি করে এই সব দুর্বৃত্ত গোটা ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দিতে বসেছে। এ ধরনের চুরি-চামারির ফলে বিদ্যুৎস্তম্ভের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং কালবৈশাখীর ঝাপটায় সেগুলি সহজেই ভূমিসাৎ হচ্ছে। ফল তো আপনারা নিজেরাই দেখছেন— বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষেতে জল যাচ্ছে না, ট্রেন মাঝপথে আটকে পড়ছে, কল-কারখানায় কাজ বন্ধ হবার উপক্রম। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু আমরা একান্তই অসহায়। সারা রাজ্য জুড়ে এ ধরনের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, এমন কি পুলিশেরও। অথচ চুরি বন্ধ না হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসাধ্য।

• এর প্রতিকার আপনাদেরই হাতে। আপনারা যদি সংঘবদ্ধভাবে সমাজবিরোধীদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন, তাহলেই কিন্তুটা সুরাহা হতে পারে। কোন চুরির খবর পেলেই পর্ষদের দপ্তরে বা পুলিশে খবর দিন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পুরস্কারও পেতে পারেন।

সমাজবিরোধীদের প্রতিহত
করতে এগিয়ে আসুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB 126/75

—ও কিছু না।...

তেমাথার কাছে এসে বাবুই হঠাৎ বলে—কামালদা, তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে বলেছিলে। গেলে না তো?

কামাল কিছু বলার আগেই ডাং বলে ওঠে—ওদের বাড়িতে তো এখন অশান্তি চলছে। তাই না কামাল?

কামাল একটু বিরক্ত হয়েছে ডাং'এর কথায়। অশান্তি হচ্ছে, তা ঠিকই। রোকেয়ার পেটে যে বাচ্চাটা আছে, সে বাইরে এলে কামালের বাবা-কাকাদের সঙ্গে সম্পত্তির সমান হিস্যে পাবে। রোকেয়ার অবস্থা হয়েছে কাকের দলে পেঁচার মতো। দিনরাত ঘরে ঢুকে থাকে। ওকে পৃথকান্ন করে দিয়েছে ওরা। মেপে চালডাল দেয়। মা-বাবার মন রাখতে কামাল রোকেয়াদাদীর খবরাখবর নিতে যায় না। আজকাল বাড়িতে খুব কম সময় থাকে সে। এই কলকাতার স্মার্ট মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা এখন ভাবা যায় না। সে বিরক্তি চেপে একটু হেসে বলে—আমাদের বাড়ি শুধু লাঙলবোয়াল গরুমোষ আর গোবরপচা গন্ধ। চাষা-ভুষোর বাড়ি। তুমি টিঁকতে পারবে না একমুহূর্ত!

ডাং বলে ওঠে—তার ওপর হয়তো গিয়ে দেখবে গরুর আস্ত ঠ্যাং ঝুলছে!. বলেই সে হো হো করে হাসতে থাকে।

পলকে কামালের মুখটা বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। বাবুই তা লক্ষ্য করে। তারপর বলে—সায়েবরা গরু খেলে ডাংবাবুর আপত্তি হবে না। যত আপত্তি...

বাধা দিয়ে কামাল বলে—বাবুই, থাক। ডাং সত্যি বলেছে।

বাবুই বলে—এযুগে ওসব চলে না।

ডাং তর্কের ভঙ্গীতে বলে—কী?

কামাল গতিক বুঝে বলে ওঠে—থাক্ না বাবা। এ নিয়ে বিস্তর তর্ক করা যায়। আপাতত এমন চমৎকার সন্ধ্যাবেলাটা অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে।

ডাং দমে যায়নি। বলে—তুমি জানো বাবুই? গোমাংস খেলে পেটে বাইশহাত লম্বা কেঁচো জন্মায়? এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ও জিনিস খেলেই কুষ্ঠব্যাধি হয় তা জানো?

বাবুই হাসতে হাসতে বলে—তুমি নিশ্চয় স্ট্যাটিস-টিকস নিয়েছ?

ডাং উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। গোঁ ধরে বলে—ওসব কথা নয়। কথা হচ্ছে—মানে আমি ডিরেক্ট বলছি—বাবুই, তুমি গরু খেতে পারো?

বাবুই মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে বলে—মানে, অভ্যাস।

—তার মানে, খেতে তোমার নীতিগতভাবে আপত্তি নেই!

—তা তো নেই-ই!

—নেই? ডাং অবাক হয়ে যায়।

বাবুই মুখ সোজা করে বলে—নেই।

—তাহলে খেও। ...বলে ডাং গম্ভীর হয়ে যায়।

কামাল অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। কিন্তু ওদের দুজনকে তার আয়ত্তের বাইরে মনে হচ্ছে তার। হেসে বলে পাগল! পাগল যত সব! দিলে এত ভাল সন্ধ্যাটা বরবাদ করে। আরে বাবা, এখন আকাশ দেখ—নক্ষত্র দেখ। পাখির ঝাঁক দেখ। নেচারে কী আশ্চর্য রূপান্তর ঘটছে, লক্ষ্য করো। তা নয়—এক নিরীহ প্রাণীকে নিয়ে বেমক্কা টানাটানি শুরু করেছ তোমরা! কোন মানে হয় না—কোন মানে হয় না!

হঠাৎ বাবুই ঘুরে দাঁড়ায়।—কামালদা, চলো তোমাদের বাড়ি যাব।

ডাং মুখ ঘুরিয়ে পুবে স্টেশন রোডের বাজার দেখতে থাকে। কামাল ইতস্তত করে বলে—বেশ তো! কিন্তু....., মাসিমা তোমার দেরী দেখে.....

—কেউ ভাববে না। চলো।

ডাং বলে ওঠে—আমার একটু কাজ আছে। আমি চলি, বাবুই।.....এবং সে তক্ষুনি হনহন করে স্টেশন রোড ধরে এগোতে থাকে।

কামাল তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বলে—ডাং রাগ করেছে।

—করুক।

দুজনে কুলবেড়ে ঢোকে। পশ্চিমেই কাঁচা সড়ক। দুধারে গাছ ঝোপসাড়। তারপর মাটির বাড়ি সব। কামাল ভাবে, ওকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাবে—দেখবে নিতান্ত চাষাভুষোর বাড়ি। অগোছাল। আদিম জিনসপত্রের স্তূপ। নিজের ঘরটা অবশ্য মোটামুটি সাজানো। কিন্তু সেখানে বাবুইকে নিয়ে গিয়ে বসালে বাড়ির লোকেরা কত কিছু ভেবে বসবে। অবশেষে ঠিক করে ফেলে—নতুনদাদীর ঘরেই নিয়ে যাবে।

আম বাগানের পথে যায় সে। কিন্তু রোকেয়ার ঘরের কাছে গিয়ে অবাক হয়। এদিকের দরজা খোলা। ভেতরে

আলো জ্বলছে। কিন্তু তার মা বাবা কাকা আরও সবাই ভিড় করে কিছু দেখছে। কামাল ব্যস্তভাবে দরজার বাইরে থেকেই বলে—কী হয়েছে?

কামালের মা জবাব দেয়—মাগী পালিয়েছে।

—পালিয়েছে? সে কী!

—হ্যাঁ। যা-যা সব ছিল, নিয়ে কেটে পড়েছে। আমরা এদিকে লক্ষ্য করিনি। সন্ধ্যাবেলা এই খিড়কি দিয়েই পালিয়েছে।

বাবুইকে কেউ লক্ষ্য করছিল না—কারণ বাবুই অন্ধকারে বাইরে কামালের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। কামাল চাপা স্বরে বলে—বাবুই, দুঃখিত। এসো।

বাবুই তাকে অনুসরণ করে। আমবাগান পেরিয়ে কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে কামাল বলে—পালিয়েছে, ঠিকই করেছে। তবে আমাকে জানালে আমিও সে ব্যবস্থা করে দিতুম। যাক্‌গে, বাবুই। কিছু মনে করো না, লক্ষ্মিটি! চলো, তোমাকে আগে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর.....

বাবুই আস্তে বলে—তারপর তুমি কোথায় যাবে?

কামাল একটু হাসে। —মনে হচ্ছে বেগমসাহেবা নিজের ভিটেয় চলে গেছে। দেখা দরকার।.....

বাজারের মধ্যে দিয়ে ওরা যখন যাচ্ছে, কারা শিস দিল। কামাল ঘুরে দাঁড়াল একবার। তার চোখ জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু শিসটা কোত্থেকে এল বুঝতে পারল না। বাবুই অস্ফুটস্বরে বলল—কী?

—কিছু না।

তারা পা বাড়ালে আবার শিসের আওয়াজ শোনা গেল। কামাল আর দাঁড়াল না। হনহন করে চলতে থাকল। বাবুই বলল—দৌড়চ্ছ কেন? একটু আস্তে হাঁটো না, কামালদা!

কামাল টের পাচ্ছিল, এইমাত্র যে শিসটা উঠল, তা ভবিষ্যতে মারাত্মক কিছু ঘটার আভাস দিচ্ছে। বাবুইয়ের সঙ্গে যেটুকু মেলামেশা করছিল এতদিন, আর তা করা ঠিক হবে না। ওদের বাড়ি যাওয়াও সঙ্গত হবে না। বহিরাগত এই দুটি মানুষ স্ত্রীলোক এবং অসহায়—এদের নিরাপত্তার জন্যেই তাকে এটা করতে হবে।

বাড়ির কাছে গিয়ে বাবুই হঠাৎ হাসতে হাসতে বলল—দেখো শ্রীমান ডাং মারের কাছে অলরেডি রিপোর্ট দিয়েছে যে আমি তোমাদের বাড়ি গরু খেতে গেছি।

কামাল শিউরে ওঠে। বাবুই পাখির বাসা লক্ষ্য করে সাঁতা কি কোন সাপ এগিয়ে যাচ্ছে?...

নিরবধি কাল এবং পৃথ্বী বিপুলা

ভবভূতি বলেছিলেন, কাল নিরবধি—পৃথ্বী বিপুলা। অন্তহীন কাল আর পরিব্যাপ্ত পৃথিবীর এক কোণে কিছু মানুষ কী করে বা কী ভাবে, তাতে কিছু যায়-আসে না প্রকৃতির। কুলবেড়ের দিনগুলো যায়, রাতগুলো আসে। আবার একটি করে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়। মানুষ জন্মায়, মরে—আবার জন্মায়, আবার মরে। কে জানে কেন।

শীতের শেষে শেষ বালিহাঁসের ঝাঁক কুলবেড়ের আকাশ পেরিয়ে উত্তরে হিমালয়ের দিকে চলে যায়। মেনকা-নদীর বাঁধে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে এক যুবক। তার হাতে বন্দুক। কিন্তু আজকাল পাখি মারতে তার অনিচ্ছা। কাশবনের মধ্যে সে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যায় কতদূর। একলা হাঁটুটি পাখিটা বিষণ্ণসুরে টি-টি করে ডাকে। সে ঝড়ে ওপড়ানো গাছের ডালে চুপচাপ শুয়ে থাকে। তার রুক্ষ চুলে সবুজ পাতার আদর। তার ধুতির ওপর লালটুকটুকে পোকা হেঁটে বেড়ায়। হঠাৎ তাকে দেখলে মনে হয় এই পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির একটি অংশ। তার মুখে ধূসরতা—চোখে যেন মাকড়সার জাল এবং সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে সে কোন একটি মুখ দেখার চেষ্টা করে। অস্ফুট দূরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে না?

সে একটু হাসে। আস্তে বলে—আমার কোন বাড়ি নেই।

দিন শেষে সে ফিরে আসে মাঠ পেরিয়ে সোজা বরাবর স্টেশন রোডে, তারপর বাজারে কোন চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকে। নতুন সময়ের হট্টগোল চারদিকে। নতুন কথা—নতুন মানুষ সব। এরা কেউ তার নয় হয়তো।

—খোকা! খোকামিয়া!

সে তাকায়। একটু হেসে বলে—কী?

—ফরেজ আলিরা বেকসুর খালাস।

—তাই বুঝি;.....

কোনদিন ফের কেউ তাকে ডাকে—খোকা! খোকা-মিয়া!

বলো!

—তোমার নতুনদাদীর ছেলে হয়েছে। মুখ দেখে এসো গে।

—যাব।

সে হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে। রোকেয়ার বাড়ি যার হন্ত-দন্ত। গিয়ে দেখে, ফয়েজ আলি বাচ্চাটা কোলে নিয়ে আদর করছে। সে তখনই ফিরে আসে। মনে মনে বলে—ভালই তো! খুব ভাল।

ফাল্গুনে হাইওয়ের দুধারে গাছপালার নতুন পাতার রাঁক উজ্জ্বল রোদে ঝকমক করে। মাঠের ঢাঙা শিমুলে লাল-লাল ফুল ফোটে। তারাসুন্দরী বিদ্যাপীঠের পঞ্চাশ-বর্ষপূর্তির উৎসব। ম্যানেজিং কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য তখন মেনকানদীর ব্রীজে বসে বালির চড়ায় পাখির নাচ দেখছে।

কিসের অভিমান এত? সে খোঁজে। তারপর লজ্জিত হয়। বিড়বিড় করে বলে—না, না। আমি কিচ্ছু ভাবিনি। ভাবব না।

এক সন্ধ্যায় সে ফিরে আসছে মেনকানদীর বাঁধ থেকে —ক্লান্ত, তে'তো—উদ্দেশ্যহীনতার জন্য বিরক্ত। কেন এমন হয়ে গেল সে?

তার হাতে বন্দুক। হঠাৎ দেখে আবছা অন্ধকারে রাস্তায় পাশাপাশি দুটি মূর্তি। হঠাৎ তার মধ্যে একটা শিহরণ জাগে। পুরনো কালের এক গোঁয়ার দুরন্ত চাষা-পুরুষ অথবা হিংস্র এক পাঠান যোদ্ধা তার অস্তিত্বে বিস্ফোরণের মতো ফেটে বেরিয়ে পড়ে। তক্ষুনি বন্দুক তুলে তাক করে সে। তার আঙুল কাঁপে ট্রিগারে।.....

এক মুহূর্ত। তারপর বন্দুক নামায়। থরথর করে কাঁপতে থাকে। এ কী করতে যাচ্ছিল সে? চোখ ফেটে জল আসে তার। নিঃশব্দে পিছিয়ে পালাতে থাকে তাড়া-খাওয়া ভীত জন্তুর মতো।

বাড়ি ঢুকে বন্দুকটা আলমারিতে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি চাবি এঁটে আশ্বস্ত হয় সে। আর কোনদিন বন্দুক হাতে নেবে না। তার রক্তের গভীরে এখনও সেই আদিম পূর্ব-পুরুষ ওঁৎ পেতে বসে আছে।.....

কিছুদিন পরে।

হিরণ্ময়ী অবাক হয়ে বলেন—খোকা না? তারপর অনেকদিনের ক্ষোভ ফেটে পড়ে।—তুই না আসবিনে বলেছিলি এবাড়ি? কেন এলি? ...মুখ ফিরিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ী।

কামাল একটু হেসে বলে—বলেছিলুম নাকি? ডাং বলেছিল নিশ্চয়।

—ডাং কেন বলবে? বাবুই বলেছিস। আশ্চর্য!

—মাসিমা, আজই কলকাতা যাচ্ছি।

—কলকাতা যাচ্ছিস? কেন রে?

—পড়াশুনো করব আর কী! ইউনিভার্সিটিতে। কই, পায়ের ধুলো দিন।

হিরণ্ময়ী একটু হাসেন। —তা ভাল। কিন্তু তোর সমাজসেবার কী হবে?

সে কথার জবাব না দিয়ে কামাল পায়ের ধুলো নেয়। তারপর বলে—আসি মাসিমা। আশীর্বাদ করবেন।

—এতদিন পরে এসেই চলি? কামাল, আমরা তোর কী করেছি বলবি?

কামাল জিভ কেটে বলে—ছিঃ! ও কী বলছেন মাসিমা?

হিরণ্ময়ী শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলে—কামাল! আমি সবই জানি। লোকে তোকে আর বাবুইকে জড়িয়ে অনেক কথা বলেছে, সবই কানে এসেছে। কিন্তু আমি তো জানি, সব মিথ্যে। বাবুইয়ের সঙ্গে মেলামেশা বেটুকু করে, সে বাঁড়ুযেদের ডাং। তুই তো তেমন মেলামেশা করিসনি—অথচ আশ্চর্য.....

বাধা দিয়ে কামাল বলে—বাবুই নেই?

—এখন থাকবে কী। ও তো স্কুলে।

—তাহলে আর দেখা হল না। রিকশো দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেণের দেরী নেই। চলি মাসিমা। ওকে বলবেন।.....

হিরণ্ময়ী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। নিজেকে অসহায় লাগে—কেন লাগে মনে মনে খোঁজেন। তারপর শিউরে ওঠেন। দ্রুত ঘরে গিয়ে অরবিন্দ চৌধুরীর ছবির সামনে দাঁড়ান। মনে মনে বলেন—ওই ছেলেটাকে তুমি নাকি কেড়ে নিয়ে এসেছিলে। বেঁচে থাকলে কি আটকাতে পারতে আজ? আমি পারলুম না। আমাকে ক্ষমা করছ তো? হিরণ্ময়ীর চোখ ছাপিয়ে জল আসে। তারপর একলা ঘরে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু বলে ওঠেন—সুখে থেকো বাবা।

সমাপ্ত

★ 885 development blocks in service of the people. Irrigation Facilities for 69.83 hectares. ★ 12,39,173 irrigation wells, 4,22,057 persion wheels, 2,42,215 private tubewells at work : 8,33,201 borings done ★ Construction of Bundhies in 2,80,340 hectares and Gula and tanks in 23,590 hectares in hill areas. ★ Rural Engineering Service for executing construction work of the value up to Rs. 1 00,000. ★ Rs. 70 crore of short term loan advanced for Agro-Industries during 1974-75. ★ 1,109 veterinary hospitals and 2,073 stockman centres working. ★ 200 sheep and work development and 19 sheep breeding centres set up. ★ Intensive sheep development scheme launched in Allahabad, Varanasi and Mirzapur.

as india changes

COMMUNITY DEVELOPMENT

U. P. ON THE MOVE

With best compliments from

D. P. GOYAL & COMPANY

168/C, KESHAB CHANDRA SEN STREET,
CALCUTTA-700 009.

With best Compliments from

★

INDIA SUGAR MILLS ASSOCIATION

দার্জিলিং থেকে রওনা হবার সময় আকাশের এক কোণে সামান্য এক টুকরো মেঘ ছিল ঠিকই কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করেননি। অমন মেঘ ত প্রায় বারো মাসই দার্জিলিঙের আকাশে কোথাও না কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ট্যাক্সিতে মাল-পত্তর তুলে উজ্জ্বল রিসেপসন কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভারেস্ট লাক্সারীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। কোট আর হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে নিয়ে একটু পরেই সোমা এসে পাশে দাঁড়াল। তরুণ-বাবু একবার সোমার দিকে তাকিয়েই উজ্জ্বলকে বললো, আপনাদের মত লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করাই ভাল।

চোখ দুটো বড় বড় করে সোমা জিজ্ঞাসা করল, কেন?

একবার একটু জোরে নিশ্বাস ফেলে তরুণ-বাবু বললেন, নানা কারণে।

নানা কারণে? বিস্মিত হয়ে উজ্জ্বল প্রশ্ন করে।

কত প্যাসেঞ্জারই ত আমাদের হোটেলে আসা-যাওয়া করেন কিন্তু আপনাদের মত প্যাসেঞ্জাররা চলে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

মিনিট খানেকের জন্য সবাই চুপ। সবাই কি যেন ভাবছেন, মনে মনে কি যেন হিসাব-নিকাশ করছেন।

সোমা জিজ্ঞাসা করল, আর কি কারণ?

তরুণবাবু একটু হেসে বললেন, কথা দিলেও আর কোনদিন আসবেন কিনা তার ত কোন ঠিকঠিকানা নেই।

সোমা এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বলকে দেখেই হাসতে হাসতে বললো, আমি বিয়ের আগে মাই হাসব্যাণ্ড আমি কথা দিচ্ছি এই সামনের পুজোতেই আবার আসব।

উজ্জ্বলও কথা দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি আসব।

এই হোটেলেই উঠবেন ত?

সোমা বললো, ও না উঠলেও আমি উঠব।

একসঙ্গে তিনজনেই হেসে উঠলেন।

হ্যাণ্ডসেক, নমস্কার। গুড্ বাই।

ট্যাক্সি। যাত্রা শুরু। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো দুদিনের স্বর্গবাসের স্মৃতি রোমন্থন।

সোমার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে উজ্জ্বল জিজ্ঞাসা করল, বল, কেমন কাটালে এ কটা দিন?

একথা আবার জিজ্ঞাসা করছ?

জিজ্ঞাসা করব না?

না।

কেন?

এসব স্মৃতি প্রশ্নোত্তরের ঊর্ধ্বে।

তবু জানতে ত ইচ্ছে করে।

এসব প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

তুমি কিছু বলবে না?

এখন না।

কেন?

এক্ষুনি নেশা করে এলাম ত। এখনও বেশ বেহুঁস আছি। পরে বলব।

উজ্জ্বল খুশি। বললো, আর পরে বলতে হবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

দুজনেই একটু চুপচাপ।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিটা বাইরের দিকে যেতেই উজ্জ্বল চমকে উঠল, দেখেছ কী মেঘ করেছে?

সোমা মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললো, আমার আকাশে এখন শরতের হাসি। কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই।

বাইরের আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখে যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, সেই উজ্জ্বল খুশীতে ভরে উঠল। সোমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বললো, এটা ট্যাক্সি না হয়ে স্লেলের কুপে হলে...

থাক থাক। আর বলতে হবে না।

কেন?

স্লেলের কুপে হলে তুমিও জানিয়ে দিতে যে তোমার মনেও কোন মেঘ নেই বরং...

সোমা থামতেই উজ্জ্বল বললো, বরং বলেই থামলে কেন? কথাটা শেষ কর।

কথাটা শেষ করে আর কী হবে? তার চাইতে কয়েক ঘণ্টা পরে শিলিগুড়িতে ট্রেনের কুপেতে উঠেই বরং তুমি...

বেহুঁস অবস্থাতেও আবার নেশা করবে?

এমন বেহুঁস অবস্থায় আছি যে তুমি নেশা করিয়ে দিলেও ত আপত্তি করতে পারব না।

লাভলি।

খেলনার মত গাড়ী গড় গড় করে নেমে আসছে। দার্জিলিং শহরটা পিছনে ফেলার পরই টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। যত নীচে নামছে বৃষ্টিও ততই বাড়ছে। দরজার কাচ তুলে দিতে হয়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনে ওয়াইপার চলছে। ঘুম ছাড়াবার পর থেকেই ট্যাক্সির গতি কমেছে। আস্তে আস্তে আরো কমছে। উজ্জ্বল একটু চিন্তিত না হয়ে পারে না। বললো, সোমা, বৃষ্টি যে বাড়ছে!

বাড়বেই ত!

তার মানে?

যে মেয়ে দার্জিলিঙে জন্মেছে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ আর হিমালয় কাঁদবে না?

তুমি দার্জিলিঙে জন্মেছিলে?

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় আছে যে আমি জন্মাতে পারি?

তুমি দার্জিলিঙে জন্মেছ বলেই কী তোমার দিদিমা তোমাকে পার্বতী বলে ডাকেন?

হ্যাঁ।

আমি কোথায় জন্মেছি জান?

কোথায়?

পুরীতে।

সোমা হাসতে হাসতে বললো, আমিও এই রকমই একটা কিছু অনুমান করছিলাম।

কেন?

হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর কাছে তুমি যে-ভাবে মাথা নত করে থাক তাই দেখে...

যদি বলি অভ্রলম্পর্শ সমুদ্রনন্দনকে দেখে হিমালয়-দুহিতা মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে?

সেটা বোধহয় হিমালয় দুহিতার ঔদার্য!

কার্শিয়াং!

এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে এক কাপ চা খাবার জন্য ট্যাক্সি থেকে বেরুবার উপায় নেই। তবু ড্রাইভার নেমে গেল।

উজ্জ্বল বললো, এ তো আচ্ছা বৃষ্টি সুরু হলো!

সাঁতা! তাছাড়া এই স্পীডে ট্যাক্সি চললে ত ট্রেন ধরাই মুস্কিল হবে।

ও কথা বলো না সোমা। বুধবার আমাকে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছতেই হবে।

সে ত আমিও জানি কিন্তু হিলসএ বৃষ্টি বড় খারাপ জিনিষ। কখন যে কী হবে, কেউ বলতে পারে না।

রাস্তা খুব খারাপ হয়ে যায়, তাই না?

রাস্তা ভাল-খারাপে এখানকার ড্রাইভারদের বিশেষ কিছু আসে যায় না কিন্তু বেশীক্ষণ বৃষ্টি হলেই যে কোন সময় যে কোন জায়গায় ধ্বস নামতে পারে।

এই একদিনের বৃষ্টিতেই?

ধ্বস নামার কোন ঠিকঠিকানা নেই। কখনও দু' এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেও ধ্বস নামে আবার কখনও কখনও দু' পাঁচ দিনের বৃষ্টিতেও কিছু হয় না।

হঠাৎ এক ঝাপে দরজা খুলেই ড্রাইভার টাক্সির ভিতরে ঢুকল। বললো, সাব, সড়ক বন্ধ।

সে কী?

হাঁ সাব। আমি অনেকক্ষণ ধরেই উল্টো দিকের কোন গাড়ী দেখছিলাম না বলে সন্দেহ হচ্ছিল। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে।

সোমা আর উজ্জ্বল এক সংগে প্রশ্ন করল, ধ্বস নেমেছে?

জী সাব।

তাহলে?

সড়ক সাফ করা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সকালের আগে কোন গাড়ী যেতে দেবে না।

তাই নাকি?

হা সাব।

দু' পাঁচ মিনিট সবাই চুপ। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

ড্রাইভার বললো, সাব, ইনসপেকশন বাংলোয় জায়গা আছে। আপনারা ঐখানে চলে যান। তারপর কাল খুব ভোরবেলায়...

উজ্জ্বল শুধু বললো, কিন্তু আমাকে ত বুধবার জয়েন করতেই হবে।

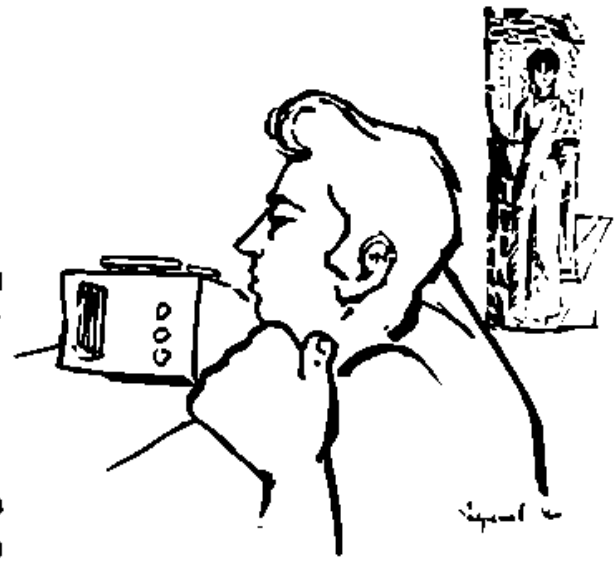

সোমা জিজ্ঞাসা করল, একটা কাজ করলে হয় না?

কী?

আমরা যদি কাল বাগডোগরা থেকে প্লেনে কলকাতা চলে যাই?

একটু যেন আশার আলো দেখল উজ্জ্বল। বললো, কিন্তু...

কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর প্লেনে যাওয়ার চাইতে বাগডোগরা থেকে কলকাতা প্লেনে যাওয়া অনেক কম খরচের। তাছাড়া কলকাতা থেকে ত আমাদের রিজার্ভেশন করাই আছে।

তা ঠিক কিন্তু...

আবার কী কিন্তু?

যদি কাল প্লেনে সীট না থাকে?

ঠিক পাওয়া যাবে। তাছাড়া এখন ত সীজন নয় যে ভীড় থাকবে।

এতক্ষণে ড্রাইভার আবার কথা বললো, চলুন সাব, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরী করলে ওখানেও জায়গা পাওয়া যাবে না।

সোমা জিজ্ঞাসা করল, মালপত্র?

বৃষ্টি থামলে আমি পৌঁছে দেব।

উজ্জ্বল বললো, ঠিক হ্যায় চলো।

আর দেরী না করে ওরা তিনজনেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সত্যি ইনসপেকশন বাংলোয় একটা ঘর পাওয়া গেল কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে উজ্জ্বল এক মুহূর্ত দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের তলায় চলে গেল। বললো, সোমা, আমি কিন্তু কিছুতেই বিছনা ছেড়ে উঠছি না। আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

আমি ত তোমাকে উঠতে বলছি না।

বাঁচালে। এখন যদি স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে বাজারে ছুটতে হয় তাহলে আমি আর নেই।

আজে-বাজে কথা বলো না ত! চুপ করে শুয়ে থাক। ঠিক সময় তুমি তোমার খাবার-দাবার পেয়ে যাবে।

শুধু আমাকে খাইও না, তুমিও কিছু খেও।

ভয় নেই; আমার উপবাস করা অভ্যাস নেই।

ড্রাইভার আর চৌকিদারের জন্য খাওয়া-দাওয়ার বিধিব্যবস্থা করতে সোমার বিশেষ অসুবিধা হলো না। দু' হাতে দু' কাপ চা নিয়ে কিচেন থেকে বারান্দা পার হয়ে ঘরে যাবার পথে সোমা চমকে উঠল। এ কী? এ গান কে বাজাচ্ছে? এ ত আমারই গাওয়া। কিন্তু...

না, না, এতে কোন কিন্তু নেই। থাকতে পারে না। নিজের গলা নিজে চিনতে পারব না? হঠাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীর মাঝখানের একটা পাতা খুলে পার্থ বলেছিল, সোমা, পর পর ছটা গান গেয়ে যাও। আমি রেকর্ড করব।

তুমি যখনই বল তখনই ত আমি তোমাকে গান শোনাই। রেকর্ড করার কী দরকার?

টেপ রেকর্ডারে কাসেট ভরতে ভরতে পার্থ বললো, দ্যাখ সোমা, শরতের মেঘের মত এসব দিন কখন কোথায় ভেসে চলে যাবে কেউ বলতে পারে না। তাই আগে থেকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভাল।

এসব আজেবাজে কথা বললে আমি আর কোনদিন তোমাকে গান শোনাব না।

আচ্ছা বলব না কিন্তু সব সময় ত তোমার গান শুনতে পাই না তাই...

সোমা আর কোন কথা না বলে রেকর্ডিং'এর বোতামটা টিপে দিয়েই গাইতে শুরু করল, আমি তোমায় সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, তুমি জান না আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।

শেষ হতেই আবার শুরু করল, এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে।

তারপর 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে।'

তারপর 'বাণী মোর নাহি, স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।'

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে গানগুলো শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় সোমা। ভাবল, পার্থ এখানে একলা বসে বসে আজো আমার গান শুনছে?

বিবিজী, গান শুনছেন?

হঠাৎ চৌকিদারের গলা শুনে সোমা হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, হ্যাঁ।

এই প্রফেসারবাবু প্রায়ই আমাদের এখানে আসেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বিবিজী। আর সারাদিন মেশিনে ওর বিবির গান শোনেন।

বিবির গান?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর বিবি যে মারা গিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বিবিজী খুব দুঃখের কথা।

প্রফেসার সাহেবের কী নাম বলতে পার?

পার্থ চক্রবর্তী। সরকারী কলেজে...

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সোমা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজে পড়েছিলাম ওর স্ত্রী মারা গিয়েছেন।

কে ছেলেটি

নীললোহিত

ছেলেটি অনেকক্ষণ বসেছিল এক কোণে। ঘর ভর্তি লোক। দিবানাথ চৌধুরী এককালে নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন, এখন, বড় ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত সমাজসেবক। সুতরাং বহু লোক আসে তাঁর কাছে। কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানায়, অনেকেই নানারকম চাকরিবাকরি বা অনুগ্রহ চায়, কেউ কেউ শুধু একবার দেখা দিয়ে পুরোণো পরিচয় ঝালিয়ে যায়—কখন কি দরকার পড়বে, তার তো ঠিক নেই।

কলকাতায় যেকদিন থাকেন, দিবানাথ সকালের কয়েক ঘণ্টা এই সব লোকের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন। তাঁর অনেক কাজ, অনেক লিখিয়ে—তবু এদিকটাও উপেক্ষা করা যায় না জনসংযোগ রক্ষা করাও তো দরকার।

দিবানাথের বসবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি পাতা, হঠাৎ দেখলে কোনো বড় ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয়। এর পাশেও একটি ছোটঘর আছে, সেখানে দিবানাথের সেক্রেটারি বসেন। সেক্রেটারিই দর্শনার্থীদের নাম ধাম লিখে ভিতরে পাঠান।

দিবানাথ এক এক করে লোকজনের সঙ্গে বলছিলেন। একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়, ঠিক ডাক্তারদের মতন। কারুর সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ কথা বললেই সমালোচনা করার অভ্যেসটা হয়ে গেছে। এত লোকজনের দিবানাথ ছেলেটিকে লক্ষ্যই করেন নি।

দিবানাথের বয়স ষাটের কাছাকাছি, বেশ রাশভারি চেহারা, মুখ দেখে মনে হয়, পৃথিবীর ওপর তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগই নেই। তবে, অন্যান্যদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

চাকরির আবেদন প্রার্থীই বেশী। এদের সঙ্গে একঘেয়ে ভাবেই কথা বলতে হয়। সবার আবেদন পত্রের ওপর তিনি এর সুপারিশ করে দিতে পারেন না। সেটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। তিনি সবাইকে বোঝাতে চান যে, সবাইকেই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে শিল্প বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা তো চলছেই। কিন্তু

বাঙালী যদি শুধু চাকরিলোভী হয়েই থাকে—ইত্যাদি।

কেউ কেউ আসে হাসপাতালের সীট কিংবা সরকারী ফ্ল্যাট যোগাড় করার চেষ্টায়। কারুর কারুর গোপন কথাও থাকে।

ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তাকে কেউ ডাকে নি, সামনে যেতেও বলে নি। এক সময় সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে দিবানাথের সামনে এগিয়ে বললো, স্যার—।

দিবানাথ মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেটির রোগা দোহারা চেহারা, একমাথা অবিন্যস্ত চুল, আধ ময়লা পাঞ্জাবী ও ধুতি পরে আছে—বয়স একুশ বাইশের বেশী না।

দিবানাথ তখন আর একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, হাত তুলে বললেন, একটু পরে। একে একে আসবে।

ছেলেটি বললো, স্যার, আমি কিছু চাইতে আসিনি। আপনাকে একটি জিনিশ দিতে এসেছি।

—কি, দরখাস্ত?

—না, একটা বই।

দিবানাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। অনেকেই তাঁকে বই-টই উপহার দেয় বটে। এককালে তাঁর বই পড়ার খুবই নেশা ছিল, কিন্তু সে নেশা অনেকদিন ঘুচে গেছে। এখন সময় কোথায়? সব সময়ই তো লোকজন ঘিরে থাকে। গত এক বছরের মধ্যে সরকারী রিপোর্ট আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বই উল্টে দেখেছেন কিনা ঠিক নেই।

ছেলেটির হাতে একটি ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট ছিল—সেটি খুলে একটি বই দিবানাথের টেবিলের ওপর রাখলো। খুব বিনীতভাবে বললো, একবার উল্টে দেখবেন, আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। বইখানা বহুদিনের পুরোণো। অতি সাধারণ চেহারা, মলাট পর্যন্ত ছেঁড়া। একজন এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তিকে আর কেউ কোনোদিন এরকম একটি পুরোণো অকিঞ্চিৎকর বই উপহার দেয়নি।

দিবানাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা

ছেলেটি বললো, কলেজস্ট্রিটের পুরোণো বইয়ের দোকানে পেলাম।

একবার চোখ না বুলিয়ে পারা যায় না। নিয়মরক্ষার জন্য দিবানাথ একবার বইটার পাতা ওল্টালেন। একটি ইংরেজি কবিতার সঙ্কলন, পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' এই বই হঠাৎ তাকে দেবার মানে কি?

পরের পাতা উল্টে দেখলেন অতি অস্পষ্ট কালিতে লেখা আছে, 'তোমাকে দিলাম'—দিবানাথ চৌধুরী।

দিবানাথ একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইলেন। হাতের লেখাটা তাঁর নিজেরই মনে হচ্ছে। অবশ্য, বহুদিন তাঁর বাংলায় কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। তবু চেনা যায়। কিন্তু সেটা দেখে দিবানাথের কিছুই মনে পড়ে না।

আর একটি পাতা উল্টে দেখলেন, গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখা আছে, 'শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায়, দোল পূর্ণিমা'।

দিবানাথের ষাট বছরের বুকটা ধক্ করে ওঠলো। একি! এটা তো সত্যিই তিনি একদিন একজনকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা!

—তুমি এ বই কোথায় পেলে?

কেউ উত্তর দিল না। দিবানাথ চোখ তুলে দেখলেন, ছেলেটি নেই। ঘরের অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল ছেলেটি?

—দেখলুম তো স্যার, বেরিয়ে গেল।

—আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল? রতন, রতন!

পাশের ঘর থেকে দিবানাথের সেক্রেটারি হন্তদন্ত ভাবে ছুটে এলো। দিবানাথ বললেন,

একটি ছেলে এখানে ছিল এইমাত্র, রোগা মতন, সে কোথায় গেল দেখ তো!

রতন জিজ্ঞেস করলো, কি নাম, স্যার?

—নামতো বলেনি। পাঞ্জাবি পরা, বড় বড় চুল—

সেক্রেটারি ছুটে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে আরও দুতিনজন। একটু বাদেই ফিরে এসে বললো, নেইতো। চলে গেছে। পুলিশে খবর দেবো?

দিবানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, তার দরকার নেই।

আর কারুর সঙ্গে কথা না বলে দিবানাথ বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এক এক সময় এইসব কবিতা মুখস্ত ছিল তাঁর। আশাকে এর থেকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অতি কষ্টে দু পয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে এই বইটা কিনে উপহার দিয়েছিলেন আশাকে। তখন বইটার দাম ছিল মাত্র দুটাকা। বইটা পেয়ে আশা খুব খুশী হয়েছিল—দিবানাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ—এই চল্লিশ বছর পরেও।

তখন বৃটিশ আমল, দেশ জুড়ে অত্যাচার চলছে, চাকরি বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। সহায় সম্বলহীন দিন এই কলকাতায় কতদিন কলের জল খেয়ে কাটিয়েছেন। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন কত লোকের কাছে। কেউ পাত্তা দেয়নি। সামান্য একটি টিউশানিই ছিল সম্বল। সেই সূত্রেই আশার সঙ্গে আলাপ। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আশাকে। কিন্তু আশার মা-বাবা জানতে পেরে দিবানাথকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় ভালো ছিলেন দিবানাথ তবু পাত্র হিসেবে তাঁকে পছন্দ করেন নি তাঁরা। আশার বিয়ে দিয়েছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। আজ ওরকম কত ইঞ্জিনিয়ার দিবানাথের কাছে হাত জোড় করে বসে থাকে। দিবানাথের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো। আশা কোথায় আছে এখন। বেঁচে আছে কিনা তাও তিনি জানেন না।

কিন্তু এতকাল পরে তাঁর এই দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কি? ছেলেটি কে? কেন এসেছিলো? এমনও হতে পারে—ছেলেটি হয়তো আগে দুএকবার এসেছিল, চাকরি বা কোনো সাহায্য চেয়েছিল, পায়নি, তাই কি এমনভাবে প্রতিশোধ নিয়ে গেল? একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে আঘাত দেবার সুখও তো কম নয়।

কিংবা, দিবানাথের আর একটা কথাও মনে হলো। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন, চল্লিশ বছর আগে তাঁর নিজের চেহারাও ঐ ছেলেটিরই মতন ছিল। ঐরকম রোগা, একমাথা চুল, জামা ময়লা। ঐ ছেলেটি কি তাঁরই বিবেক? একটা ছেলের ছদ্মবেশ ধরে তাঁর বিবেক এসেছিল তাঁকে সচেতন করে দিতে?

দিবানাথ আপন মনে একটু হাসলেন। তাঁর যে বিবেক আছে বা কোনোদিন ছিল—এ কথাটাই যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন অনেকদিন।

সঙ্গীত সম্পর্কে বিনীত অভিমত

পঙ্কজকুমার মল্লিক

কর্তব্যবোধে প্রথমেই জানাতে ইচ্ছা করি যে আমি লিখতে পারি বটে কিন্তু লেখক বলতে যথার্থরূপে যে অর্থ বোঝায় সেটি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি সাহিত্য ও প্রবন্ধলেখক নই। আমার পরিচয় হচ্ছে যে আমি একজন কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী এবং সুরকার। এখন বার্ধক্যে উপনীত। সঙ্গীতকলা আমার সাধনার বিগ্রহস্বরূপ। সঙ্গীতবিদ্যার আমি উপাসক ও সেবক। আপনাদের 'দক্ষিণী বার্তা' নামাঙ্কিত পত্রিকার বর্তমান বৎসরের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি সেইহেতু সঙ্গীতবিষয়ের শরণাপন্ন হলাম। লেখাটি মনে হয় না যে দোষ-ত্রুটিমুক্ত হবে অতএব দোষ-ত্রুটি ঘটিলে সেগুলি যেন মার্জনীয় হয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিমত ও যার সাদৃশ্য কয়েকজন বিশ্বচিন্তানায়কের চিন্তাধারা বর্ণনাপাঠে লাভ করেছি। সঙ্গীতবিদ্যা মানবীয় কৃষ্টির বিশিষ্ট সম্পদসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমাদের ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাস হচ্ছে আমাদের শাস্ত্র। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সঙ্গীতের আদি সৃষ্টি বিহিত হয় নাদ বা ব্রহ্মরূপে। এই নাদধ্বনি তপোবনের পবিত্র পরিবেশ মুখরিত ক'রে রাখতো। প্রকৃত চরিত্রের সঙ্গীত বলতে আমার ধারণায়, এই পর্যায়ের অথবা ইহারই সমগোত্রীয় সঙ্গীতকে বোঝায়। প্রকৃত সঙ্গীত স্বর্গীয় সুষমা ও ভাবরসাদৈর্ঘমণ্ডিত। একদিন পরমমধুর বংশীধরের পরমমধুর বংশীরবে যমুনা উজান বয়েছিল, সমগ্র ব্রজবাসী ভক্তিরসাসিক্ত হয়েছিল, গোপীরা কুল, মান, লাজ, ভয় ছেড়ে লীলাময়, বংশীধর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন সঙ্গীতে সমগ্র বঙ্গদেশে ও বহির্বঙ্গে ভক্তিভাবের বন্যা বহেছিল। আজও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য জ্ঞান, অনন্ত সৌন্দর্য, অসীম মাধুর্য, অশেষ লালিত্য ও ভাবগৌরবসমৃদ্ধ সঙ্গীত বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজকে মুগ্ধ করছে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত নায়ক Beethoven-এর কল্পনায় সঙ্গীত মূর্ত হয়েছে এইরূপে—তিনি বলেছেন সঙ্গীত জড় ও অধ্যাত্মজীবনের মাঝে সেতু রচনা করে। মনীষী mazzini বলেছেন সঙ্গীতই সৃষ্টির ঐক্যবদ্ধ সুর, এক অদৃশ্যজগতের সুরলহরীর প্রতিধ্বনি যা' একদিন অনন্ত বিশ্বে একতান হয়ে উঠবে। এই কল্পনার বাস্তব ইতিহাস আমাদের অবিদিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই সঙ্গীতবিদ্যাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং প্রার্থনা করি সেই মর্যাদা যেন চির-অম্লান থাকে।

উপরিউক্ত পর্যায়ের পরই দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, কৌতুক ইত্যাদির আলেখ্যরূপে সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ঐরূপ সুরে রচিত হতে পারে। দেশাত্মবোধের উদ্রেক ও উৎসাহ, অনাবিল আনন্দসৃষ্টি, কৌতুকরস পরিবেশ ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যথাযথভাবের ব্যঞ্জনার জন্য সঙ্গীত রচনা রমণীয় হয়। এই রমণীয়তাও সঙ্গীতের একটি সম্পদ। প্রার্থনা করি এই সম্পদও যেন চিরস্থায়ী হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গীত রচনার একটি অংশ উল্লেখ ক'রে আমার লেখা শেষ করি।

"তোমার সুরের ধারা করে বেথায় তারি পারে,
দেবে কি গো বাসা আমার একটি ধারে?
আমি শুনব ধ্বনি কানে, আমি ছন্দ ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্ত বীণায় তার বাঁধিব বারে বারে॥"

With best Compliments from

METRO EXPORTERS (Pvt.) LTD.

SHAH HOUSE

SHIV SAGAR ESTATE

●

Dr. ANNIE BESANT ROAD, WORLI,

BOMBAY—400018 (INDIA)

PHONES :

With the best Compliments of

ASSAM STORES

Distributor of Hindusthan Lever Ltd.

★

65, RAJA KATRA

CALCUTTA-7

Phone : 33-9873 (3 Lines)

শরৎচন্দ্র ঃ মঞ্চে ও পর্দায়

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বাংলার মরমী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। মরমী কথাটির মধ্যেই যেন বাঙালী জনসাধারণ একান্ত আপন করে ধরে রেখেছেন শরৎচন্দ্রকে। এমনি আপন-করা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র লিখিত শোকাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে। অভিভূত সুভাষচন্দ্র মান্দালা জেল থেকে দেশবন্ধুকে 'একান্ত আপনজন' বলে অভিহিত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে।

পরাধীন জাতির দুঃখবেদনার হলাহল পান করে চিত্তরঞ্জন হয়েছেন দেশবন্ধু আর সেই ব্যথা-বেদনার কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকট করে তুলে শরৎচন্দ্র জাতির মরমী কথাসাহিত্যিকের আসন অধিকার করে বসেছেন। জাতির মর্মে মর্মে অবরুদ্ধ মর্মর ধ্বনি উদ্ঘাটন করে শরৎচন্দ্র মরমীর জয়মুকুটে অভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁর আসন অধিকার করবার স্পর্ধা নিয়ে আজও কোন কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব চোখে পড়েনি। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে বিনা দ্বিধায় তাই বলতে পারি: 'তোমার আসন শূন্য আজিকে।"

হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে বাংলা ১২৮০ সালের ৩১শে ভাদ্র, ইংরেজী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। যকৃতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে বেলা দশটা ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮, বাংলা ২রা মাঘ, ১৩৪৪ সালে ৬১ বছর ৪ মাস বয়সে মারা যান। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী আত্মীয়স্বজন ও অগণিত গুণমুগ্ধ দেশবাসীকে রেখে যান। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শরৎ-শোকাঞ্জলির মধ্যে দেশবাসীর মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে দেশবাসীর মনোভাব কবিগুরু ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতার ছন্দে।

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥"

১৯১০ থেকে ১৯৩৮। মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা সীমিত। শরৎ-কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যথা-বেদনাসিক্ত আনন্দের তরঙ্গ-প্রবাহে যেভাবে পাঠক তথা দর্শক মন রঞ্জিত করে তোলে—বর্তমানকালেরও খুব কম সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সেই অনুরণন পরিলক্ষিত হয়। তাই রঙ্গমঞ্চে বা রুপালী পর্দায় শরৎকাহিনীর আবেদন আজও দুর্বার ও দুর্জয়।

সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধত্বের নিকষঘন জমাটবাঁধা অন্ধকার আলোর ঝরণাধারায় বিদূরিত করার সার্বিক প্রচেষ্টা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা-মুকুরে প্রতিফলিত নিপীড়িত দরিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেষিত জনমানসের ব্যথা-বেদনা আত্মস্থ করেই পরম দরদীর মন নিয়ে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। নির্মম বাস্তবের নগ্নরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন ক্ষমাহীন দুর্বাসার রোষবহ্নি মূর্তি। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র আমাদের অতিপরিচিত—অতি আপনজন বলে যেমন মনে হয়, তেমনি পরিবেশের মধ্যেও খুঁজে পাই সংশ্লিষ্ট যুগকে। বিভিন্ন অবহেলিত-অনাদৃত চরিত্রকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের দরদী মনের অভিব্যক্তি আজও আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রুবন্যায় ঝরে পড়ে। নারী হৃদয়ের গোপনতম অনুভূতি এমন করে আর কেউ উদ্ঘাটন করেন নি। ফল্গুর অন্তঃস্রোত ধারার মত নায়ক-নায়িকার অন্তরের চাওয়া-পাওয়াকে অন্তর প্রবাহিতা রেখে

তাদের বুকফাটা হাহাকারকে অপূর্ব মুন্সীয়ানার পাঠক মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও কামনা-বাসনার প্রচণ্ড ঝড় তুলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীমনের নির্লিপ্ততায় সে ঝড়কে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। নারীপুরুষের গহন-মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে সুর—সেই রুদ্ধ সুরে তার সমগ্র সৃষ্টি সুরময়।

রঙ্গমঞ্চে বা রূপালী পর্দায় শরৎ কাহিনী রূপায়িত করবার সময় এই সুরে যারা নাটক বা সিনেমাকে সুরময় করে তুলতে পেরেছেন—তারাই সার্থক হয়েছেন—যাঁরা পারেন নি তাঁরা ব্যর্থতার বোঝা ভারী করে শিল্পজগতের অভিশাপ কুড়িয়ে নিয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চে শরৎ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নামই করতে হয় সর্বাগ্রে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় প্রয়োগাচার্য প্রমথেশ বড়ুয়ার নাম।

শরৎচন্দ্র সরাসরি কোন নাটক লেখেন নি। ষোড়শী (দেনাপাওনা), বিজয়া (দত্তা), রমা (পল্লী-সমাজ) এই তিনটি কাহিনীর নাট্যরূপের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মুন্সীয়ানা জড়িয়ে আছে।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ৩রা আগষ্ট, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয় 'বিরাজ বৌ'। ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য রূপায়িত বিরাজ বৌ শরৎচন্দ্রের সমর্থন পায় না। তারক পালিত, রসরাজ অমৃতলাল বসু, কুসুমকুমারী প্রভৃতি ছিলেন অভিনয়াংশে। বিরাজ বৌ-র প্রথমাভিনয় জনপ্রিয়তার্জন করলেও সুধীজনের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। দেনাপাওনার নাট্যরূপ ষোড়শী বিরাট আলোড়ন নিয়ে দেখা দিল শিশির-কুমারের অধিনায়কত্বে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট কর্ণওয়ালীশ থিয়েটারে (নাট্য-মন্দির) মঞ্চস্থ হলো ষোড়শী। জীবানন্দ আর ষোড়শী-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন শিশিরকুমার আর চারু-শীলা। পরস্পরবিরোধী জীবানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভায় পাদ-প্রদীপের আলোকমালার সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট স্টার থিয়েটার সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ করলেন পল্লীসমাজের নাট্য-রূপ রমা। অহীন্দ্র চৌধুরী, তারাসুন্দরী, নীহার-বালা যথাক্রমে রমেশ জ্যেঠাইমা আর রমা চরিত্রে অভিনয় করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে শিশির সম্প্রদায়ে 'রমা' অভিনীত হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মিনার্ভা মঞ্চে মঞ্চস্থ হলো চন্দ্রনাথ। নাম ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায় আর সরযূ চরিত্রে অভিনয় করেন আসমান তারা। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা মঞ্চে নতুন করে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাট্য রূপায়িত 'চন্দ্রনাথ' মঞ্চস্থ হয়। ছবি বিশ্বাস—চন্দ্রনাথ, সরযূবালা—সরযূ, অহীন্দ্র চৌধুরী—কৈলাশখুড়ো আর নট-শেখর নরেশচন্দ্র মিত্র অভিনয় করেন কাশীর পাণ্ডা চরিত্রে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই স্টার থিয়েটারে নবনাট্য-মন্দিরের প্রযোজনায় শিশির-কুমার বিরাজ বৌ মঞ্চস্থ করলেন। নীলাম্বর আর বিরাজ বৌ চরিত্রে অভিনয় করেন শিশিরকুমার আর কঙ্কাবতী। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার উপহার দিলেন বিজয়া। শিশিরকুমারের রাসবিহারী জীবা-নন্দের মতই বিস্মিত করলো। তবু সমালোচনার ঝড় উঠলো রাসবিহারীকে নিয়ে—কিন্তু শিশির-কুমারের অলৌকিক প্রতিভায় 'বিজয়া' নাট্যজগতের দিগদর্শী হয়ে রইল। শিশিরকুমারের প্রয়োগ নৈপুণ্য, শিক্ষণক্ষমতা ও অভিনয়-চাতুর্যে অভিভূত শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, "আশ্চর্য—এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া যে তাহার দলের নতুন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন—বিশেষ করিয়া তাহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে—দেশের সমস্ত অভিনেতা যে অভিনয়ে ইহার কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন তাহাতে

বিস্মিত হইবার কিছু নাই, এই সত্য স্বীকার করায় তাহাদের গৌরব আছে।"

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রঙমহল মঞ্চস্থ করলেন যোগেশ চৌধুরী নাট্যরূপায়িত চরিত্রহীন। রতীন বানার্জী আর শেফালিকা সতীশ আর সাবিত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে বিরাজ বৌ, বিজয়া, ষোড়শী, রমা, চন্দ্রনাথ, অচলা (গৃহদাহ), চরিত্রহীন মঞ্চস্থ হয়। এর মধ্যে ষোড়শী, বিজয়া, রমা, চরিত্রহীন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করেছেন। সম্মিলিত অভিনয়েও এগুলি একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রযোজক প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা ১০ই মে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ করলেন শরৎচন্দ্রের পথের দাবী। পথের দাবীর ওপর তখন সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। অবিভক্ত বাংলায় তখন লীগ মন্ত্রীত্ব বিরাজমান। জনাব এ কে ফজলুল হকের মারফত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত করিয়ে প্রবোধ গুহ মশায় পথের দাবী মঞ্চস্থ করলেন। নাট্যরূপ দিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কিন্তু কয়েক রজনী অভিনীত হবার পর আবার নিষেধাজ্ঞা জারী হলো। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সব্যসাচী চরিত্রে। শশী কবি আর থেঙ-ম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অমল বানার্জী ও ছবি বিশ্বাস। স্বাধীনতালাভের পর রাহুমুক্ত পথের দাবী মঞ্চস্থ করেন রঙমহল। সব্যসাচী আর শশীকবি রূপে এবার দেখা দেন কমল মিত্র আর জহর গাঙ্গুলী। প্রথমাভিনয়ে সুমিত্রা হয়েছিলেন প্রভাদেবী, দ্বিতীয়বারে দেখা যায় শান্তি গুপ্তাকে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই নাট্যভারতীতে শচীন সেনগুপ্ত নাট্যরূপায়িত দেবদাস বিরাট আলোড়ন নিয়ে দেখা দেয়। জহর গাঙ্গুলী দেবদাস, সরযূদেবী পার্বতী আর নাট্যকারের সৃষ্ট বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন নটশেখর নরেশ মিত্র। পরবর্তীকালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে দেবদাসের নতুন করে অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস দেবদাস আর বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী। পার্বতীরূপে সরযূবালাই ছিলেন। চন্দ্রমুখী চরিত্রে অভিনয় করেন রাণীবালা। দেবদাসের প্রথমাভিনয়ের পর প্রায় প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে লাগলো শরৎ কাহিনী। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীরঙ্গমে বিপ্রদাস, ১৯৪৪-এর ২১শে মার্চ মিনার্ভা নতুন করে দেবদাস, ২২শে জুন রঙমহলে গ্রামের সুমতি, ২০শে ডিসেম্বর শিশিরকুমারের প্রযোজনায় বিন্দুর ছেলে মঞ্চস্থ হয়ে বিরাট আলোড়ন আনলো। মিনার্ভা উপহার দিলেন কাশীনাথ, রঙমহল অনুপমার প্রেম, নিষ্কৃতি, দক্ষিণ কলকাতার কালিকা বৈকুণ্ঠের উইল ও নেজাদিদি এবং সুন্দরম মঞ্চস্থ করলেন স্বামী। শ্যামলীর পর স্টার থিয়েটার ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ করলেন পরিণীতা। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্টার থিয়েটার ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী শ্রীকান্ত এবং ২রা জুন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ করলেন শ্রীকান্তের পরবর্তী অংশ নিয়ে রাজলক্ষ্মী। পেশাদার রঙ্গশালায় যাদের শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে স্বর্গত যোগেশ চৌধুরী, স্বর্গত শচীন সেনগুপ্ত এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও দেবনারায়ণ গুপ্তের নামোল্লেখযোগ্য। স্বর্গতঃ লক্ষ্মী মিত্র ও কানাই বসুর নামও নাট্যরূপদাতাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ও বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শরৎকাহিনীর নাট্যরূপ অভিনয় করেছেন।

নির্বাক যুগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মনমোহন থিয়েটারে আঁধারে আলো সর্বপ্রথম মুক্তি পায়। শিশিরকুমার আর নরেশ মিত্র যুগ্মভাবে আঁধারে আলো পরিচালনা করেন। অভিনয়ে দুজনেই ছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পায় নরেশ মিত্র পরিচালিত চন্দ্রনাথ। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন দুর্গাদাস। নরেশ মিত্রের পরিচালনায় নির্বাক দেবদাস মুক্তি পায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। দেবদাস আর পার্বতী চরিত্রে অভিনয় করেন ফণি বর্মা আর মিস লাইট। তারাকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত শ্রীকান্ত

মুক্তি পায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। শ্রীকান্ত আর পিয়ারী বাঈজী রূপে অভিনয় করেন কান্তি বানার্জী ও শান্তাকুমারী। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পায় ধীরেন গাংগুলী পরিচালিত এবং হেম গুপ্ত (সতীশ) ও শীলা টনকানস (সাবিত্রী) অভিনীত চরিত্রহীন। এই বছরই চারু রায় পরিচালিত স্বামীর মুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে নির্বাক যুগে শরৎ কাহিনীর চিত্র রূপায়ন।

সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের জয়যাত্রা শুরু হয় শরৎ কাহিনী দিয়ে। নিউ থিয়েটার্সের সর্বপ্রথম সবাক চিত্র 'দেনা পাওনা' ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তি পায়। জীবানন্দ আর ষোড়শীরূপে অভিনয় করেন দুর্গাদাস ও নিভাননী। শিশিরকুমার পরিচালিত পল্লীসমাজ মুক্তি পায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই। শিশিরকুমার, রমেশ আর জোঠাইমা ও রমা চরিত্রে অভিনয় করেন কঙ্কাবতী আর প্রভাদেবী। শুধু বাংলাদেশে নয় সর্বভারতের রূপালী পর্দায় শরৎচন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে নাম করতে হয় প্রমথেশ বড়ুয়ার। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ চিত্রায় দেবদাস মুক্তিলাভ করে। ২২শে সেপ্টেম্বর নিউ সিনেমায় মুক্তি পায় হিন্দি সংস্করণ। বাংলায় দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী আর চুণীলাল চরিত্রে অভিনয় করেন প্রমথেশ, যমুনা দেবী, চন্দ্রাবতী আর অমর মল্লিক হিন্দিতে সায়গল আর যমুনা দেবী অভিনয় করেন পার্বতী, আর দেবদাস চরিত্রে। নহেন চরিত্রে 'রাজু' ছদ্মনামে অভিনয় করেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

দেবদাসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিত্রজগৎ চলচ্চিত্রের ভাষা খুঁজে পেল। দেবদাস ভারতীয় চিত্রজগতের তাই দিগদর্শী হয়ে আছে। প্রমথেশ নিউ থিয়েটার্সের পথ থেকে আবার উপহার দেন গৃহদাহ ও হিন্দি সংস্করণ মঞ্জিল। শরৎ কাহিনীর আর এক সার্থক চিত্র রূপায়ণ।

নিউ থিয়েটার্স চিত্র রূপায়িত অন্যান্য শরৎ কাহিনীর মধ্যে নাম করা যেতে পারে বড়দিদি, বিজয়া, কাশীনাথ, বিরাজ বৌ ও রামের সুমতির। দেবদাস, গৃহদাহ ও বড়দিদির হিন্দি রূপও জনপ্রিয়তার্জন করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিত্ররূপায়িত শরৎ কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য —পণ্ডিতমশাই, বিন্দুর ছেলে, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, পরিণীতা, আলো ও ছায়া, নিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ, মামলার ফল, ছবি, অনুরাগ, সতী, মন্দির, শুভদা, বামুনের মেয়ে, হরিলক্ষ্মী, নববিধান, পরেশ, দর্পচূর্ণ, মেজদিদি, স্বামী, জয়া (রসচক্র), পথনির্দেশ, পথের দাবী, কমললতা, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদা দিদি। কলকাতায় সুনন্দা দেবী হিন্দিতে শুভদা, মীরা মিশ্র ছোটি মা (বিন্দুর ছেলে), এবং বম্বেতে বিমল রায় দেবদাস ও পরিণীতা নির্মাণ করে যশস্বী হন। বিহারী (পণ্ডিত মশাই), ছোটি ভাই (রামের সুমতি)—হিন্দি চিত্ররূপেও জনপ্রিয়তার্জন করে। পরিণীতা, বিন্দুর ছেলে, পল্লীসমাজ, দত্তা, অরক্ষণীয়া, আলো ও ছায়া (শেষ নিবেদন), গৃহদাহ, ষোড়শী (দেনাপাওনা), বিরাজ বৌ, বৈকুণ্ঠের উইল, বড়দিদি প্রভৃতি একাধিকবার বাংলায় চিত্রায়িত হয়। দত্তা তৃতীয়বারের জন্য নির্মিত হচ্ছে। এবার বিজয়া চরিত্রে দেখা যাবে সুচিত্রা সেনকে। পথের দাবী দ্বিতীয়বার সব্যসাচী নামে নির্মিত হয়ে মুক্তির দিন গুণছে। নাম ভূমিকায় জনপ্রিয় উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন। উত্তমকুমার ইতিপূর্বে যেসব শরৎ কাহিনীতে অভিনয় করেছেন সেগুলির মধ্যে বড়দিদি (সুরেন্দ্রনাথ), রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (শ্রীকান্ত), চন্দ্রনাথ (চন্দ্রনাথ), গৃহদাহ (মহিম), কমললতা (শ্রীকান্ত) উল্লেখযোগ্য। সুচিত্রা সেনকে দেখা গেছে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (রাজলক্ষ্মী), চন্দ্রনাথ (সরযূ), কমললতা (কমললতা) ও গৃহদাহ (অচলা) চিত্রে।

শরৎ কাহিনীর জনপ্রিয়তা আজও চলচ্চিত্রে বা রঙ্গমঞ্চে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু শরৎ কাহিনীর চিত্র বা মঞ্চস্বত্ব সংগ্রহের সামনে অযৌক্তিক চাহিদা বিরাট প্রাচীর হয়ে আছে। সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে

পশ্চিমবাংলার জনসংযোগ ও তথ্য বিভাগীয় মন্ত্রীমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষেও শরৎ কাহিনীর চিত্র ও নাট্যরূপ সংগ্রহ করা যেখানে সম্ভব হয়নি—সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি? উপায় নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের মত দেশের সৃষ্টি সম্পদকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেবার কোন আইনগত পন্থা গ্রহণের কথা বর্তমানের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী—দেশবাসী। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাই সোচ্চার হউন। জয় হিন্দ।

PLEASE ASK US FOR

All types of Unmachined & Machined Castings in Malleable Cast. Iron & High Grade Plain and Alloyed Gray Iron to Indian and International Standard Specifications, for use in :

1. Automobiles
2. Material Handing Equipment
3. Electrical Equipment
4. Overhead Electric Transmission Lines
5. Electrical Rail Traction
6. Rolling Stocks
7. Foundry & Machine Tool Industries
8. Cotton, Wool & Jute Industries
9. Agriculture & Tea Gardens
10. Any other use

Also Mild Steel & High Carbon Steel Ingots

HINDUSTHAN MALLEABLES & FORGINGS LIMITED

Regd. Office & Works :

Jalan Nagar, P. O. Bhuli. Dist. Dhanbad

Telegrams : "JALANCO" Dhanbad

Telephones : 4331; 4332, 3177 Telex : JALAN 029-234.

With Compliments of :

★

Bon International Corporation

CALCUTTA-700 017

আমরা বেঁচে আছি

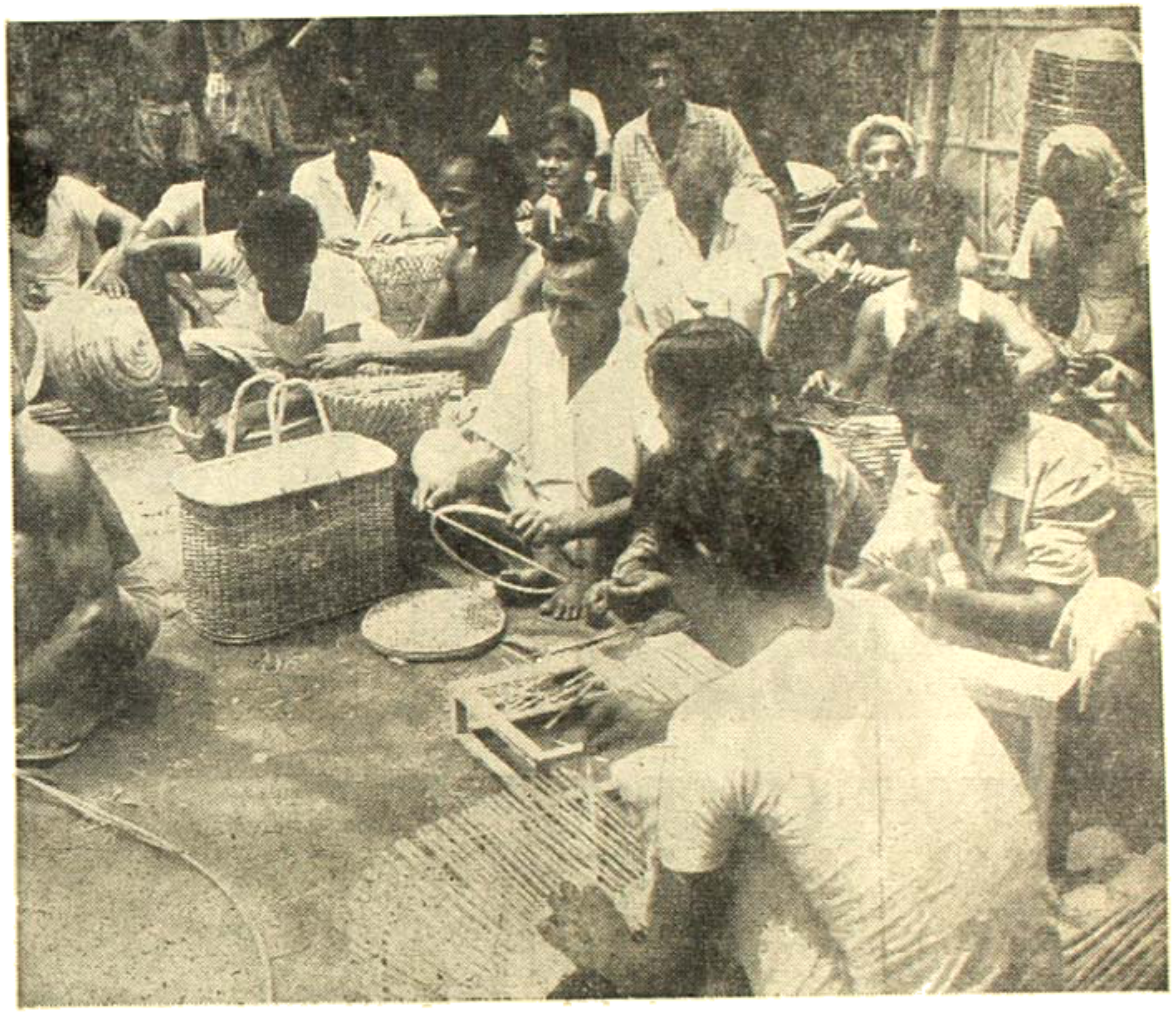

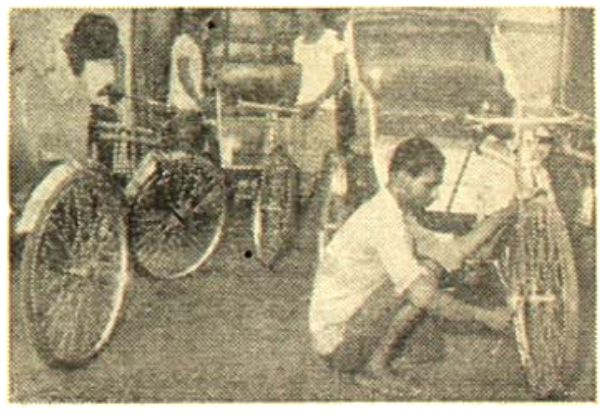

আমরাও বেঁচে আছি

দুপুরের দিকে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় আলাপ হয়েছিলো। খুব বেশি হলে দু-তিন বার। তেতলা বাড়ি। কল্যাণ একতলার ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে ঘর দেখার সময় বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো মেয়েটি। এখনকার আন্দাজে একটু বেশি করে কাজল টানা। বাড়িতে পরে থাকার শাড়িও এমন জরিপাড়। নির্ঘাৎ আদরের দুলালী।

এ-বাড়িতে উঠে আসার পর কল্যাণের ধর্ম-পত্নী রেণু নিজেই একদিন বলেছিলো, অমলা খুব মিশুকে মেয়ে। স্কুলে পড়ায়। আমাদের খুকিকে অঙ্ক করানোর জন্যে রাখবে?

এতো বড়ো বাড়ির মালিকের মা-মরা একমাত্র মেয়ে কি তোমার খুকির জন্যে অঙ্কের টিউশুনি করবে!

তারপর রেণু আর বলেনি। দুপুরের দিকে কলের জল ফুরোলে বাড়িওয়ালার তেতলায় যেতে হয়েছে রেণুকে। অনন্তবাবু অফিসে। তেতলার বারান্দায় ধুলোমাখা ফুলের টবে কোকড়া চুল ফুটে করে যাচ্ছে। অমলা স্কুলে না গিয়ে টান টান ঘুমোচ্ছে। ডাকতে মায়া হয়েছে রেণুর। ওদের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাকে খুঁজে নিয়ে তবে নিজেই জলের পাম্প চালিয়ে নিয়েছে।

স্নান করতে করতে রেণুর মনে হয়েছে, বেশ আছে কিন্তু যা-হোক। খাচ্ছেদাচ্ছে বেড়াচ্ছে। দিব্যি নতুন শাড়ি। এই তো সেদিন পিকনিক করে এলো একগাদা দিদিমণির সঙ্গে। মাস গেলে মাইনে।

সাবানখানা শাওয়ারের জলে ধুয়ে যাচ্ছিলো বলে আলগোছে তুলে রাখলো। এবার নাকি গুঁড়ো সাবানের সঙ্গে ফ্রি একখানা করে সোপকেস দেবে।

শনিবার দিন কল্যাণ অফিস পাড়ায় আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে করে ফেললো। বাড়ি ঢুকতেই মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এলো, বাবা, আজ না ছাদে ফাংশান হয়েছে। অমলাদি নাচলো। অমলাদির বাবা গান গাইলো।

তুমি সকাল সকাল ফিরলে পারতে। পাড়ার সব বাচ্চাদের ডেকে অনন্তবাবু ছাদে রবীন্দ্রজয়ন্তী করলেন।

মাকে থামিয়ে মেয়ে বললো, সবাইকে প্রাইজ দিলো অমলাদির বাবা। আমি একটা ডট পেন পেয়েছি।

রেণু ধমকালো মেয়েকে, কতো বার বলেছি, অমলা পিসী বলে ডাকবি।

কল্যাণ হেসে ফেললো, 'কেন? অমলা মাসি বলেও তো ডাকতে পারে।' তারপর মেয়েকে বললো, 'না খুকু—তুই অমলা দিদি বলেই ডাকবি। কেমন—'?

রবিবার সকালে অনন্তবাবু বেড়াতে এলেন ওদের একতলার ফ্ল্যাটে। খুব অস্থির মানুষটি। এটা পড়ছেন, ওটা বলছেন। ওমলেট কাটতে গিয়ে হাতের চামচখানা মেঝেয় ফেলে দিলেন। নিজেই আবার কুড়োতে যাচ্ছিলেন।

রেণু এগিয়ে এলো, থাকুক না, এই তো আরেকটা চামচ রয়েছে।

অনন্তবাবু শুনলেন না, চামচ কুড়িয়ে নিয়ে বেসিন থেকে ধুয়ে নিলেন, 'আমার নিজের কাজ আমি সব করি।'

কল্যাণ মনে মনে বললো, তুমি কে গো বিদ্যাসাগর! মুখে আচমকা বলে দিলো, 'বৌদি কিসে মারা গেলেন?'

ডায়াবেটিস। খুব পাজি রোগ। আগে যদি সুগার করলো থাকতো। সাবধান হবারও চান্স পাইনি।

দোতলার ফ্ল্যাটে একটা বড়ো ফ্যামিলি থাকে। তাদের পায়ের দুপদাপ একতলায় বসে সবসময় শোনা যাবে। তেতলা থেকে অমলা এসে বললো, বাবা ওঠো।

কল্যাণ তাকিয়েছিলো। চান হয়ে গেছে। আলতো করে পাউডার বুলিয়েছে। ছাই রঙের জমির পাশে তাঁতের শাড়িতে আজকাল যে কতো রকমের নকশা করে পাড় তোলে। দিব্যি দেখাচ্ছিলো অমলাকে।

রেণু এগিয়ে এসে বললো, এই সাতসকালে কোথায় বেরোচ্ছো ভাই—

জবাব দিলেন অনন্তবাবু, আজ আমার ভাগ্নেরার বাড়ি যাবো একবার, সেখান থেকে আমাদের শাশুড়ির ওখানে যেতে হবে।

রেণু জোর করে দুটি মিষ্টি দিয়ে একখানা প্লেট এগিয়ে দিলো অমলাকে।

না না। মিষ্টি এখন খাবো না বৌদি।

ভালো দোকানের তৈরি ভাই। তোমাদের পাড়ার দোকানের।

এ পাড়া তো এখন তোমাদের বৌদি।

কল্যাণ ভাবলো, সত্যি তো! আমাদেরও বটে। ফুটপাথ, ছাইগাদা, এককালের বুড়ো বুড়ো কুল গাছ—তার ছায়া, ডালপালা—সবই আমাদের। সকালের ঘরের পাপোশে পড়ে সবকিছু নতুন করে দিচ্ছে। ভীষণ কৃতজ্ঞ চোখে অমলার দিকে তাকালো কল্যাণ। তার মুশকিল—এই এখুনি যে অজানা আনন্দটুকু হচ্ছে—তার মানে বুঝতে চেষ্টা না করেও তো অমলার দিকে তাকানো যায়। কিন্তু রেণু পাছে যদি কিছু আন্দাজে আন্দাজ করে—তাই—

চোখ নামিয়ে নিলো কল্যাণ। সত্যি! কতো কাল হলো নিজের বউ ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলে না। মানে, বলার টাইম হয় না। অফিসে ইউনিয়ন সেই যে ওভারটাইম চালু করেছে—অফিসের পর কোথাও আর বেরোনো হয় না। পুরোনো বন্ধুবান্ধবীরা যে-যার কাজে ব্যস্ত। ট্রামে-বাসে বোঝাই কলকাতা কিন্তু আগেকার সেই কলকাতাতেই আছে। শুধু সে নিজে নেই।

বিকেলের দিকে অমলার সঙ্গে দেখা হলো কল্যাণের। রেশন দোকান থেকে চার টাকা চল্লিশে এক কেজি করে রেপ সিড তেল দিচ্ছিলো। তাই নিয়ে ফিরছিলো। অমলা উঁচু সিঁড়ি দিয়ে নামতে

নামতে হাসলো। মোটা বেণীটাকে বুকের ওপর আছাড় মেরে ফেলেছে এইমাত্র। শাদা কাজ করা ব্লাউজের বাইরে টিকের দাগে দাগানো হাত, মৃদু সেন্টের গন্ধ, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা শাড়ির সপ্-সপ্ আওয়াজ—সব মিলে গিয়ে সিঁড়ির মুখে তেলের টিন হাতে কল্যাণ প্রায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো খানিকক্ষণ।

রেণু বালিশের ওয়াড় সেলাই করছিলো। দাঁতে সুঁচ কামড়ে আস্তে আস্তে বললো, এখন তো তোমার আয় বেড়েছে। দু পয়সা উপায় করো ওভার টাইম দিয়ে। আমার মাকে মাসে মাসে দশটা করে টাকা মনি অর্ডারে পাঠাবো?

পাঠাও না—

তিন চারটে প্রসঙ্গ ঘুরে রেণু অমলায় চলে এলো। বললো, ভালো কত্থক নাচে কিন্তু। মাস্টার রেখে শিখিয়েছেন অনন্তবাবু। আমাদের খুকুকে ওর কাছে শেখালে হয়—

পাগল! টাকা নেবে ভেবেছো?

না-ই নিলো। যেদিন যেদিন শেখাবে আমি লুচি ভেজে খাওয়াবো।

তোমার লুচির জন্যে বসে থাকবে ভেবেছো?

অহ্! তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কি এমন রাজকন্যে। সেদিন বলছিলো তো, কোথায় টিউশানি করে—

সে দামোদর গিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারির মেয়েকে হয়তো মাস গেলে সেড়শো টাকায় পড়াচ্ছে।

অ্যাতো? আমি তো হালদারদের মেয়েকে বিয়ের আগে ধারাপাত ধরাই। ওদের বারান্দায় পাঁচটি মেয়ে পড়তো এক সঙ্গে। মোট পঁচিশ টাকা পেতাম।

সেদিন চলে গেছে রেণু। টাকার জন্যে পড়ায় না তো অমলা—

শখ। বসে আছি, সামান্য নড়ে চড়ে যদি টাকা আসে আসুক না। এই হলো ভাবখানা। দাখো গিয়ে গয়না গড়াচ্ছে। ব্যাঙ্কে রাখছে। শখ পুরিয়ে নিচ্ছে।

গয়নার অভাব আছে নাকি! মায়ের গয়না পেয়েছে কতো। তারপর নিজেই বললো রেণু, হাতের বারো গাছা চুড়ি অবশ্য নতুন—

তাও দেখেছো?

বাঃ! চোখ রয়েছে দেখবো না। তারপর গলা নামিয়ে বললো, না, খুকিকে ওপরে নাচ শিখতে পাঠানো ঠিক হবে না।

কেন?

বিকেলের দিকে একটি ছেলে আসে দেখেছি। ফাঁকা বাড়িতে দুজনায় হাসি গল্প চালায়। মুড়ি মাখে। চা করে।

এই তো নর্মাল।

খুব ভালো লেগেছে শুনে—তাই না! তোমাদের পুরুষদের সবাই এক রকম।

আগে ছুঁচটা রেখে নাও কোথাও। গায়ে ফুটবে—

আমাদের অত ফোটে না।

মাঝে দুচারদিন জল নিয়ে অনন্তবাবুর সঙ্গে কল্যাণের খিটিমিটি হওয়ার যোগাড় হলো। একটুর জন্যে হলো না শেষ পর্যন্ত। জলের পাম্পঘর নিচের তলায়। অনন্ত তেতলায় থাকে। কখনো মেশিন একদম বন্ধ থাকে। আবার কদিন এমন চলে যে ট্যাঙ্ক উথলে সারারাত জল গড়িয়ে যায় সর সর করে। সে শব্দে ঘুমোনো যায় না। দেখায় কেউ নেই। ছোটো মতো বাড়ির কাজের ছেলেটা ফুটপাথে গুলি খেলে বেড়ায়। তাকে ধরাও যায় না। অমলা স্কুলে বেরোয় নটায়। যখন ফেরে কল্যাণ তখন অফিসে।

কলকাতায় হু-হু করে গরম বাড়ছে। দুপুরের দিকে সাদা রোদ্দুর নিষ্ঠুর ভাবে এই শহরটির ঘাড়ে চড়াও হয়। কোনো মায়াদয়া নেই।

বাসে কন্ডাকটরের কাঁচা চামড়ার ব্যাগের গন্ধ ছাড়িয়ে যায়। বিকেলে শহর জুড়োবার মুখে ফুলের মালা ফিরি হয় মেড়ে মোড়ে। আর মাস দুই বাদে কলাপাতার ঠোঙা ভালশাঁস আসবে গাঁ থেকে। ভালো বোঝাই দিয়ে এ-মোড়ে সে-মোড়ে ব্যাপারীরা বসবে। লোকে এখন খুব পাউডার মাখে।

মঙ্গলবার হাফ—হলিডে পড়লো কিসের। নেগোশিয়েবেল ইনস্ট্রুমেন্ট আক্টে ছুটিছাটা বেঁধে দেওয়া থাকে। বাড়ি ফিরেই ঘর অন্ধকার করে ঘুমিয়েছিলো। জেগে উঠে দেখলো, দুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ জুলে আছে। গাঢ়, গম্ভীর। চাই কি বৃষ্টি হতে পারে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাওয়া পেলো।

দরজা খুলে চিঠির বাক্স দেখতে গিয়ে একটি ছেলের মুখোমুখি হলো। গুন গুন করে গান ভাজতে ভাজতে কখন প্যাসেজ দিয়ে এদিকেই আসছিলো। ওপরে যাবে। বাঁক ঘুরে কল্যাণের সামনে পড়ে গেলো। গান স্টপ। মুখে বেকার হাসি আর ব্রণের দাগ। সার্টের কোলা কলার বুক-পকেট ছুঁয়েছে। প্রাচীন জুলফি। গলায় জাগ্রত কণ্ঠমণি।

আপনিই তো কল্যাণবাবু?

কিছু না বলে দাঁড়িয়ে থাকলো কল্যাণ। মনে মনে বললো, তুমিই তো হিরো। আমি চিনেছি। চালিয়ে যাও—

আপনার কথা শুনেছি অনেক। আমার নাম অনিমেষ—অনিমেষ রায়।

তোমার নামই তো কলকাতা। খুব লাকি ভাই। আস্ত একখানা রাজকন্যা আর তিন-তিনটি ফ্ল্যাট ফিউচারে! সাবধানে এগোবে কিন্তু। এসব কথা জোরে বলা যায় না। মনে মনে বলতে হয়।

কি শুনেছেন?

আপনি নাকি খুব সুন্দর গাইতে পারেন?

আমি! অবাক হলো কল্যাণ। কোথায় শুনলেন?

ও! থতমত খেয়ে থামলো কল্যাণ। অনন্ত-বাবুর মেয়েটি তাহলে তার নাম করে গানের কথা বানিয়ে বলেছে। রীতিমতো ব্যাপিকা বলতে হবে অমলাকে। সেই মুহূর্তে মনে পড়লো, ছাদনাতলায় শুভ দৃষ্টির সময় আমার যা একখানা ছবি আছে না! দেখলে যে-কোনো মেয়ে ঢলে পড়বে। অনিমেষ লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে গেলো। আমি মাঝে মাঝে অবশ্য গান গাই। একা একা তন্ময় হওয়ার জন্যে। হতে হতে কেটে যায়। কিন্তু সে গান অমলা শুনলো কোত্থেকে?

এ পাড়ায় একটা বাজার আছে। দশ বছর আগেও সেখানে কেউ যেতো না। এখন লোক বেড়ে গেছে। তাই ভিড় হয়। গলাকাটা দাম। গড়িয়া-হাটার নকলে পাপোস, খড়ম ফুলকাটা খুব গুছিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। বেলা দশটার পরে মাছ থাকে না। সন্ধ্যে হলে ঝাঁপ বন্ধ।

একদিন রাত আটটা, মুরগি খাবার বাই উঠলো।

খুকিটা ইদানীং খেতে শিখেছে। ভাত মেখে আগে খেয়ে নেয়। মাংস প্লেটের এক কোণে চামড়ে রাখে। শেষে খাবে।

বাজার ঘুরে না পেয়ে কল্যাণের মনে পড়লো, তাই তো। অনন্তবাবু যে-ছাদে পোলট্রি করেছে।

কলকাতার ছাদে ছাদে সেদিন জ্যোৎস্না ছিলো। পাড়ার রাস্তায় আলুর চপের দোকানে খুব ভিড়। পাশের বাড়ির উকিল ছেলের বিয়েতে গেট বানাবার অর্ডার দিয়েছে। সেখানে বৌভাতে লালই বসবে বলে সোনা বাচ্ছিলো তেতলায় উঠে দেখলো, কেউ নেই। মোরগ মুরগিরা জ্যোৎস্না দেখে জালের ভেতরে বসে মাঝে মধ্যে ডেকে উঠছে।

ফিরে আসছিলো কল্যাণ। হঠাৎ দেখলো, অমলা কার্নিশের কাছাকাছি প্যারাপেট ধরে দাঁড়িয়ে। ওই তো সেই ছোকরা। অনিমেষ জলের ট্যাংকটার পাশে বসে। কোনো কথা নেই।

কল্যাণ দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমি তো কোনো চাকরি পাইনি আজও। বিয়ে করে কোথায় নিয়ে রাখবো তোমাকে?

অমলা কোনো জবাব দিলো না। দিলেও কল্যাণ শুনতে পেলো না। ঠিক সেই সময়েই মুরগিগুলো ডেকে উঠলো, পাখা ঝাপটালো।

অনিমেষ কি শুরু করলো আবার। কল্যাণ চেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে নেমে পড়লো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রেণুকে বললো, আজকাল ছেলেগুলোর কি হয়েছে বলো তো? একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না?

রেণু কোনো মানে করতে পারলো না।

পরদিন কল্যাণ অফিস কাটলো। ঠিক দুটোয় তার বয়স একচল্লিশ। ওজন সাতষট্টি কেজি। গরমকালে ভাতের পাতে আমটক খায়। কলকাতায় সবার আগে বসন্তের টিকা নেয়। অফিস কাটতো না। দোতলার জানালায় গিয়ে খালি দেশলাইয়ের বাক্সটা ছুঁড়তে গিয়ে দেখলো, বাতাসে সেটা দুলে দুলে নিচে পড়ছে। সেখানে কতকগুলো ছেলে দাঁড়ানো। ক্যাসিয়া ফুলের হলুদ বিন্দুগুলো ঝাঁকড়া গাছটার সবুজ পাতার মাথায় মাথায় ভাসছে।

কল্যাণ প্রথমেই গেলো তার কলেজ পাড়ায়। এ পাড়াটা তার খুব আপন লাগে।

তখন ক্যাম্পার হাসপাতাল ছিলো। এখন পাঁচতলা হয়েছে। উল্টোদিকে কলেজ। তার পাশে পার্ক। এখন একটা লোকও নেই। কলেজ বুক স্টোর্সের দীনবন্ধুবাবু ঝুঁকে পড়েছেন। পাশের কে ডি রেস্তোরাঁর ছেলেরা, মেয়েরা চায়ের কাপ নিয়ে গুলতানি দিচ্ছিলো। আরকটু এগিয়ে একটা নতুন কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁ উঠেছে। তাতে বিরাট কাচের দেওয়াল। কল্যাণ খানিক ঘুরেও একজনও চেনা লোক পেলো না। নিজেকে খুব বোকা লাগলো। এ আমি কি করছি। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই এখন যে যার কাজে ব্যস্ত। তখনকার টাম-গুলোই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। নম্বর মনে রাখেনি বলে মিলিয়ে নিতে পারছে না শুধু।

আপনি কি করছেন এখানে? কাচের দেওয়ালে ছায়া পড়েছিলো, কল্যাণ ঘুরে দাঁড়ালো। অমলা। দুপুরবেলার রোদে লাল শাড়ি ব্লাউজের বাইরে যেটুকু বেরিয়েছিলো তা রীতিমতো চোখ ঠেলে রাখে। কল্যাণ নিজেকে বোঝালো, এসব কী হচ্ছে! তুমি তাকাবে কেন? তুমি না কল্যাণ। তুমি না রেণুকে ভালোবাসো।

তবু দেখলো, না তাকিয়ে পারা যাচ্ছে না। এমনি! আপনি?

আমিও এমনি। চা খাবেন? লোকানটা বেশ কায়দার। দু কাপ চা। মুখোমুখি দুজনে বসে। প্রথমেই কল্যাণের মায়া হলো। আহা! অনিমেষ ছেলেটা কী? চাকরি পায়নি তো তাতে কি? অমলার মাইনের টাকায় দিব্যি ভাত ফুটিয়ে খেয়ে থাকতে পারতো। রোদে অমলার মুখ পুড়ে গেছে একেবারে।

দূর ছাই! দোকানে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। চলুন কোথাও যাই।

বেশ তো।

গোড়ায় গোড়ায় কল্যাণের নিজেকে রীতিমতো আউট লাগছিলো। গঙ্গার ঘাট, ওপারে হাওড়ার কলকারখানা, নোঙরকরা জাহাজের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে। ভাসানো জেটির রেলিং ধরে অমলা দাঁড়িয়েছিলো। ডান হাতখানা বাড়িয়ে কল্যাণের একখানা হাত ধরলো, 'কেমন লাগছে?'

কেঁপে উঠলো কল্যাণ। কোনটা? ওই যে লঞ্চ যাচ্ছে ওপারে—তার জলকাটা ঢেউয়ের পেছন পেছন সাদা পাখি উড়ছে মাঝ নদীতে? না, এই যে এইমাত্র অমলা তার হাত দিয়ে কল্যাণকে ধরেছে—সেইটে?

বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো কল্যাণ। মাঝি মাল্লারা এদিকে তাকোচ্ছে ঠিকই। আবার তাকাচ্ছেও না। একজন এসে বললো, ওপারে যাবেন? গার্ডেনেও যেতে পারেন। দেড়

ঘণ্টা লাগবে। বাতায়াত বারো টাকা।

কল্যাণ তাড়িয়ে দিচ্ছিলো ছোকরাকে।

'দি আইডিয়া'। বলেই অমলা ছোকরা মাঝিকে প্রায় লুফে নিলো।

বারো টাকা কোথায় পাবে এখন। কল্যাণ বললো, আমি যাবো না। ভাড়া বেশি বলেছে।

ততক্ষণে অমলা জলের দিকে নেমে গেছে, 'আসুন তো। বৌদিকে টাকার হিসেব দিতে হবে না। আমিই ভাড়া দিয়ে দেবো।'

তোমার টাকায় নৌকো চড়বো না।

এই তো চাই। দিব্যি তুমি বলে ডাকলেন আমাকে। এবার আপনি নর্মাল হয়েছেন।

মেয়েটা ঠাট্টা করছে না তো? ভাবার সময় পেলো না কল্যাণ। অমলা তার হাত ধরে এক ঝোঁকে নৌকোর পাটাতনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো তাকে। ততক্ষণে লগির ধাক্কায় নৌকোটা খানিক এগিয়ে পড়লো জলে।

ভালো হলো?

খারাপ কি?

অনিমেষ যদি দেখতে পায় এখন?

হেসে উড়িয়ে দিলো অমলা। খানিক পরে নৌকো হাওড়ার ঘাটগুলো ঘেঁষে চলতে লাগলো। পুরোনো পুরোনো ঘাট। কোনোটা চটকলের। কোনোটা লবণমহলের আমলের। গাদা গাদা সিমেন্ট জমিয়ে মাটি আটকানো। তাতে মাঝে মাঝে সামান্য মাটি পেয়ে এক একটা বট, অশ্বত্থ শেকড় নামিয়ে দিয়েছে। বিকেলের আলো কম। পাখিরা জলে ডানা ভাসিয়ে বড়ো বড়ো সাদা ফুলের ধারা ভাসছিলো। মাছি পেলেই ঠোঁটে নিয়ে বাতাসে ভাসবে।

পুরোনো লাল রঙের ইঁটের চিমনি। তার পেছনে আর পুরোনো সব বাড়ির ছাদ।

পাটাতনে বসে থাকা কল্যাণের কোলে মাথা ঢেলে দিয়ে অমলা ভেঙে বললো, 'বাবাঃ। সেই কখন থেকে হাঁটছি।' এর পর আরও অনেক কিছু লেখা যায়। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করছে না।

কল্যাণ সরে বসছিলো। পারলো না। অমলা দেখতে খারাপ নয়। কাজল একটু মোটা করেই টানে। অনিমেষ একটি গাড়োল। আলগোছে হাত রাখলো অমলার মাথায়। রেখেই তুলে নিতে গেলো। অমলা দিলো না। তার হাতের ওপর নিজের হাতখানা চেপে রাখলো।

এস এস তামিলনাড়ু লেখা একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কি পিছিয়ে যাচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। অনেকটা জায়গা জুড়ে সাদা ফেনা তুলছে। নৌকোখানা দুলতে লাগলো।

ভেতরে গিয়ে বসুন।

মাঝির কথায় অমলা আগেই ভেতরে গেলো। কল্যাণ তখনো বাইরে বসে। নৌকোর দুলুনি আরো বেড়ে গেলো। ভেতর থেকে একেবারে অন্য গলায় অমলা ডাকলো। তাতে আবদার দিলো। আদেশ দিলো। ভয় পেয়ে যাওয়া দিলো।

কল্যাণ আরো বেশি ভয় পেয়েছিলো। আমি কি কোনোদিন আর ফিরতে পারবো না তীরে? রেণুর কাছে? নিরুদ্বেগ মাঝিরা দাঁত বের করে হাসছিলো। ভেতরে গিয়ে বসেন। দাঁড়ালে পড়ে যাবেন।

কল্যাণ ভেতরে বসলো। এবার তার কোলে মাথা দিয়ে অমলা টান টান পা ছড়িয়ে দিলো। সাদা অনেকখানি গা, পা নৌকোর ভেতর সামান্য ছায়ায় জ্বলজ্বল করে উঠলো।

কল্যাণ অনেকটা ঝুঁকে মাথা নোয়ালো। তারপর ঠোঁট রাখতে গিয়ে দেখলো নাগালে আসছে না।

অমলা মাথা তুলে সুবিধে করে দিলো এক সেকেণ্ডে। তখন তার মুখে হাসি ছিলো না। দুঃখ না। রাগ না। স্মৃতি না।

তুমি ভুল করলে। আমি অনেক পুরোনো। আমার গায়ে দাগ ধরে গেছে অমলা—

এঁরা কে কী বলেন

নাট্যকার-অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত

শারদীয়া সংখ্যার কাজ নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। প্রেসে কাজের চাপও ভীষণ। পূজোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে সাক্ষাৎকারের পর্বেও তখনও দুই-একজন বাকি। এই দুই একজনের ভিতরে মহেন্দ্র গুপ্ত অন্যতম। মহেন্দ্রবাবুকে পাওয়ার আশায় আমি তখন মরিয়া হয়ে ঘুরছি। এমন সময়ে কাগজের বিজ্ঞাপনে মহেন্দ্রবাবুর নাম দেখলাম। ছুটলাম স্টার-থিয়েটারে। স্টারে সেদিন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর ফাইনাল রিহার্সাল চলছিল। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বলে উঠলেন—'আজকে ভীষণ ব্যস্ত। কাল সকালে স্টার অফিসেই আসুন।' পরের দিন যথা সময়ে উপস্থিত হলাম স্টারে। গ্রীণরুমে ঢুকতেই দেখলাম সুব্রতাকে কি যেন বোঝাচ্ছেন মহেন্দ্রবাবু। হাত ইসারা করে আমাকে বসতে বল্লেন। একটু বাদেই মহেন্দ্রবাবু ফিরে এসে বল্লেন—'নূতন বই তাই ভীষণ ব্যস্ত। দীর্ঘ বাইশ বছর পর স্টারে আবার অভিনয় করতে এসেছি। মনে পড়ে আমার লেখা চক্রধারী নাটক এক সময় এই স্টার থিয়েটারে সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৪০ সাল থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত একটানা ৮২ বছর বহু নাটক আমি পরিচালনা করেছি। ১৯৪৭ সালে 'স্বর্গ হতে বড়' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ রঙ্গশালায় আত্মপ্রকাশ করি। তারপর থেকেই একটানা বহু বইয়ে অভিনয় করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', তারাশংকরের 'কালিন্দী', অনুরূপা দেবীর 'মা' অপরেশ চন্দ্রের 'কর্ণার্জুন', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', এছাড়াও 'নৌকাডুবি', দুর্গেশনন্দিনী', 'শাহজাহান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটকে একটানা অভিনয় করে গিয়েছি। আজ আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের-উইল'এ এসে ঠেকেছি এই স্টারে। যাক সে সব কথা। এবার বলুন আপনার কথা।' আমি বলে উঠলাম 'এসব কথা শুনতেই আমি এসেছি', অতীতের কথাই আজ শুনব।

তাহলে প্রথম থেকেই কথা শুরু করি কি বলুন ?

'হাঁ' আমি বল্লাম। সিগারেট ধরালেন নাট্যকার মহেন্দ্রবাবু। ফিরে গেলেন তার অতীতের স্মৃতিতে। ডুব দিলেন হারা ফেলে আসা অতীতের ইতিহাসে। সেখানে নাট্যকার, অভিনেতা মহেন্দ্রবাবু, আড়ালে লুকিয়ে আছে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। আমিও ডুব দিলাম তার সাথে। ১৯১১ সালে ফরিদপুর টাউনে যখন বাবা থাকেন সেই সময়ে আমার জন্ম। বাবা উকিল ছিলেন। দুই ভাই চার বোন আমরা। বাবা দেবেন্দ্র মোহন গুপ্তের অনুপ্রেরণাতেই সাহিত্যিক জয়াসন্ধ, ও কবি জসিমুদ্দিন সাহিত্য জীবন শুরু করেন। পণ্ডিতের বংশ আমরা। সাংস্কৃতিক বিষয়ে চর্চা চলেছে এ বংশে বহুদিন থেকে। ফরিদপুর 'ড্রামাটিক' ক্লাবে আমার বাবা নাটক করতেন ও নাটকের শিক্ষা দিতেন। পৈতৃকভাবে বাবার কাছ থেকেই অভিনয়ে দীক্ষা পাই। স্কুল জীবনে 'বুদ্ধদেব' অভিনয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করি। ফরিদপুরে কলেজ জীবনে 'আলমগীর', 'নারায়ণ' 'সীতা' প্রভৃতিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ে সুনাম অর্জন করি। এই সময়ে কলেজ জীবনে 'উত্তরা' নাটক লিখি। পরে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ও প্রশংসা অর্জন করে। ফরিদপুর থেকে বি. এ. পাশ করে এম.এ. পড়তে চলে এলাম কলকাতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই সেই যুগের সেরা নাট্যকার নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। এক কথায় বলতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় আমি নাট্যজগতে প্রবেশ করি। এম.এ. পাশ করে দিল্লীতে চাকরী নিয়ে চলে যাই। যাওয়ার আগেই আমার লেখা 'গয়াতীর্থ' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে অসামান্য সাফল্যের ফলেই দিল্লীর চাকরী ইস্তাফা দিয়ে পুনরায় কলকাতার রঙ্গশালায় ফিরে আসি। সেই থেকে আজ অবধি একটানা ১০০ খানা বইয়ে অভিনয় করে চলেছি। ৮০ খানা বইয়ে পরিচালনা করেছি। নিজের এই কর্ম-ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে বই লেখার শখও আছে। প্রায় এ পর্যন্ত ৩০ খানা বই লিখেছি। প্রসঙ্গ পাল্টে

আমি প্রশ্ন করলাম—সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর :

মঞ্চের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের চেতনা জাগান যতটা সম্ভব করা যায় অন্য কিছুতে ততখানি করা যায় কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। নাটকের ভিতর দিয়ে আমি সেই চেষ্টাই করে এসেছি।

প্রশ্ন :

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে ভারতবর্ষের শিল্পী সমাজ কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন—আপনার ধারণা ?

উত্তর :

শিল্পীরা অনেকেই অগ্রসর হতে পেরেছেন, আমি প্রত্যক্ষ ভাবে এই ধরণের বইয়ে অভিনয় করে দর্শকদের মানসিকতার দিকে প্রেরণা যোগাতে চেষ্টা করেছি। বর্তমানে শিল্পী সমাজের আন্দোলন রাজনৈতিক গোষ্ঠি দ্বারা প্রভাবান্বিত। জাতির সামনে কিছু কিছু শিল্পীদের এই কর্ম তৎপরতা বড়ই বিভ্রান্তিকর। সমস্ত শিল্পীদের আজ বোঝা প্রয়োজন গোষ্ঠির স্বার্থের চেয়ে জাতির স্বার্থ বড়। এক সময়ে গিরীশবাবু, দিজেন্দ্র লাল রায়ের নাটক স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়।

প্রশ্ন :

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি ? অথবা দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে কিনা ?

উত্তর :

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না। একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন :

গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সঠিক পথ কি ? বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা মত তা সাহিত্যে বা শিল্পে যেখানেই হোক তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কি অগণতান্ত্রিক ?

উত্তর :

গণতন্ত্রের অজুহাতে কোন কোন শিল্পী যেচ্ছাচারিতা করেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কোনটাই অগণতান্ত্রিক নয়।

এই উত্তরের শেষে আমি প্রশ্ন না বাড়িয়ে 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল' আর 'ভোলা-ময়রা' নিয়ে কয়েকটি টুকি-টাকি কথা বলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

With best Compliments from

THE JUBILEE MILLS LIMITED

"NIRMAL" 18th Floor

241-242 BACKBAY RECLAMATION

NORIMAN POINT

BOMBAY-1

With best Compliments from

Asian Cables Corporation Limited

DUNCAN HOUSE

●

31 NETAJI SUBHAS ROAD

CALCUTTA-700001

অতীতের কানন দেবী

নির্বাক-এর যুগ দিয়ে যার অভিনয়-প্রকাশ সবাকের যুগ দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনি একজন চিত্রতারকা হলেন শ্রীমতী কানন দেবী। শিল্প, সাহিত্য, ও সঙ্গীতে এই ত্রিমুখী প্রতিভার অধিকারী কানন দেবী। যাকে জীবদ্দশায় দেশবাসী মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে নিয়েছে। স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। শ্রীমতী কানন দেবী আট বছর বয়সে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রথম নির্বাক ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন। কানন দেবীর প্রথম নির্বাক ছবি ছিল জয়দেব। এরপর ১৯৩০-৩১ সালে সবাক চিত্র "জোরবরাত" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর থেকেই একটানা ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত অভিনয় করে গেছেন। এই সময় প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে শুরু করে বহু বড়ো বড়ো অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ শ্রীমতী কানন দেবীর এসেছিল। খ্যাতির শীর্ষে তিনি আরোহণ করে ছিলেন। একটানা হিন্দি বাংলা ছবি মিলিয়ে প্রায় ৭০ খানা বইতে তিনি অভিনয় করেন। অভিনয়ের পাশাপাশি চলেছিল তাঁর মিষ্টি সুরের গান। যা শ্রোতাকে বারবার মুগ্ধ করেছে। কুড়িয়ে নিয়েছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা আর হাততালি। এই সময় বি এন রু থেকে সুরু করে বহু প্রতিষ্ঠান তাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসনে স্থান দিয়েছিলেন। সর্বোপরি ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত করেন। তাঁর শেষ বই "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদা দিদি"।

চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অবসর নিয়েও তাঁর কর্ম জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। চলচ্চিত্রের সুরু থেকে দীর্ঘকাল যিনি নীরবে চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন এই সময় শিল্পীদের দুঃখ দুর্দশা ও বিড়ম্বিত জীবন। তাই অবসরের পর নিজেকে উৎসর্গ করেছেন দুস্থ শিল্পীদের কল্যাণের জন্য। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহিলা শিল্পী-

মহল। এছাড়া আজও সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে থেকেও বাড়িতে গোপাল ঠাকুর আর একমাত্র নাতিকে নিয়ে কাটে তাঁর অবসর সময়।

এই অবসর সময়ের ফাঁকেই শ্রীমতী কানন দেবীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম।

প্রশ্ন : সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর : সামাজিক আন্দোলনে শিল্পীদের ভূমিকা নিশ্চয়ই থাকতে পারে এবং থাকা উচিতও। আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পীদের কোন ভূমিকা না থাকাই ভালো। সামাজিক ক্ষেত্রে আমি কাজ করার ইচ্ছে আজও রাখি এবং করতেও চাই।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র শিল্পীরা অনেক টাকা নেন

সাধারণ মানুষের এই যে ধারণা সেটাকে সত্যি ? সত্য হয়ে থাকলে বন্ধ করার কোন পথ আছে কিনা

উত্তর : কালো টাকা নেন কিনা আমার জানা নেই। তবে বন্ধ করার উপায় মনে হয়, মানুষের সততাই সবচেয়ে বড় মূলধন।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি ? অথবা দুটোই এক সঙ্গে চলতে পারে কিনা

উত্তর : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় না।

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সঠিক পথ কি ? বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী যা মত তা সাহিত্যে বা শিল্পে যেখানেই হোক তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কি অগণতান্ত্রিক ?

উত্তর : মনে হয়, হলে প্রতিবাদ আন্দোলন অগণতান্ত্রিক। কিন্তু গোড়ার আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : পশ্চিমবাংলায় হিন্দী ছবির ভীড় বাংলা ছবির বাজার ছোট করছে কি ? করে থাকলে প্রতিকারের কোন পথ আছে কিনা ?

উত্তর : নিশ্চয়ই করছে। প্রতিকারের পথ হচ্ছে ভালো রুচিসম্পন্ন আমোদ মূলক ছবি করা প্রয়োজনীয়।

সর্বশেষে সিনেমা-শিল্পে অশ্লীলতার কথা তুলতেই কাননদেবী দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠেন সিনেমায় অশ্লীলতা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। সেই রকম দৃশ্য বাদ দিয়েও ভালো ছবি তৈরী করা যায়।

With best Compliments of :

KAMAL TIMBER WORKS

1 RADHA KRISTO SETT STREET

CALCUTTA-700006

ভালোমানুষ-এর অজিতেশ

সকাল দশটার কিছুটা পরে রীতিমতো গলদ-ঘর্ম হয়ে শ্রীযুক্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম, একটু ইতস্তত —একটু সহজ হয়ে ফ্ল্যাটের চার তলার কলিং বেলটা টিপে ধরলাম, কলিং বেলের রেশ শেষ হতেই দরজা খুলল ও ভদ্রমহিলার সাদর অভ্যর্থনা পেলাম, ভিতরে আসুন। কিছুটা বিস্ময় কিছুটা সংশয় নিয়ে ভদ্র-মহিলাকে অনুসরণ করে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলাম। অজিতেশবাবু উর্দু শিক্ষা চর্চা করছিলেন, আমাকে দেখেই স্মিত হেসে বললেন আসুন, অপেক্ষা কর-ছিলাম। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে বললাম ধন্যবাদ, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময়ে না আসতে পারার জন্য দুঃখিত। অজিতেশবাবু পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোককে বললেন, মাষ্টারজি আপনি কাল আসুন, আমার ওর সাথে কিছু দরকারী কথা আছে। বুঝলাম ভদ্রলোকটি অজিতেশবাবুর উর্দু শিক্ষার শিক্ষক। মাষ্টারজির অন্তর্ধানের সাথে সাথেই ভদ্রমহিলা অজিতেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেই বসবে না ভিতরের ঘরে গিয়ে বসবে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা মল্লা বানার্জি। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পালা শেষ করে আমরা শ্রীমতী বানার্জির ইচ্ছানুযায়ী ড্রয়িংরুমের খোলস ছেড়ে অন্দরমহলেই প্রবেশ করলাম। ছিমছাম ও মার্জিত পরিবেশ, সামনে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, উপযুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত। চায়ের পেয়ালায় দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অজিতেশ-বাবু নিবিড় ভাবে অতীতের স্মৃতিতে ডুবে গেলেন, শিল্পী ফিরে যাচ্ছেন তার শিল্পসত্তায় যেখানে তিনি একা—আমি শ্রোতা শুনছি···লিখছি···

আমার জন্ম ১৯৩৩ সালের ৩০শে নভেম্বর, দেশ বর্তমান, পিতা স্বর্গীয় ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা চার ভাই ও পাঁচ বোন, বর্তমানে আমার একটি মাত্র পুত্র সন্তান, দার্জিলিং এর স্কুলে পড়াশুনা করছে। ছড়েচড়ে সহজ হয়ে বসে মুচকি হেসে অজিতেশ-বাবু বললেন এটা আমার পরিচয়পত্র হিসাবে ধরে নিতে পারেন অবশ্যই আপনার সুবিধার্থে। আত্ম-চিন্তায় মগ্ন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমজীবন অর্থাৎ কৈশোর কালের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আমার বারবার চিন্তায় এসে পড়ে জাপানী যুদ্ধ, মিলিটারী আর মহাত্মাগান্ধী, অস্বীকার করার উপায় নেই এই তিনটির প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনে অনেকখানিই পড়েছিলো। ন বছর বয়স হতেই অভিনয়ে আমার হাতে খড়ি, প্রায় ছাত্রাবস্থা থেকে, কুলটি স্কুলে পড়াকালীন ছোটখাট চরিত্রে মোটামুটি ভাবে অভিনয় শুরু করি, তবে আবৃত্তিও তখন আমার আরেকটি অন্যতম লক্ষ ছিল। বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজ প্রাংগনে প্রবেশ করলাম, আমি তখন আসান-সোল কলেজের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। কলেজ জীবনে এসে অভিনয়কেই আমার প্রধান নেশা বলে ধরলাম ফলে কলেজ অনুষ্ঠানে 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে অভিনয় করে প্রচণ্ড উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রশস্তি পেলাম এবং ঐ নাটকে আমি একাই চল্লিশটি মেডেল পাবার গৌরব অর্জন করলাম। আমার শিল্পী জীবন সুরু করার প্রথম সোপানে পা দিলাম। এরপর পড়াশুনায় অকস্মাৎ ছেদ টেনে কল-কাতায় আসি ও ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বি.এ পড়তে আরম্ভ করলাম এবং সাময়িক কিছু দিনের জন্য হিন্দু বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতাও করি। এই সময়ে আমি সারাভারত গণনাট্যসংস্থার সহকারী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, ফলে নাটক, আবৃত্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ও চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলাম। এরপর ১৯৬০ সালের ২৯শে জুন আমি ও শ্রীযুক্ত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে 'নান্দীকার' নামে একটি নাট্য গোষ্ঠির জন্ম দিলাম এবং এ পর্যন্ত নান্দীকারের প্রযোজনায় কুড়িটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকগুলিতে গান, সুর, পরিচালনা

১৯৭৩ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমির পুরস্কার অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে পুরস্কারপ্রাপ্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

প্রস্তুতির দায়িত্ব আমাকেই পুরোপুরি বহন করতে হয় যদিও অন্যান্যদের সহযোগিতার কথা অনস্বীকার্য। রেডিওতে প্রায় ১৫টি নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছি এবং টেলিভিসনের প্রথম অনুষ্ঠানে নান্দীকার গোষ্ঠী কর্তৃক প্রথম "নানা রঙের দিন" নাটকটি প্রদর্শিত হয়। আমার নিজের লেখা চারটি বই আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতালবিদ্রোহ, সেতুবন্ধন ও হে সময় উত্তাল সময়। বাংলা ও হিন্দী মিলিয়ে চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করেছি পঁচিশবার। বর্তমানে নান্দীকার গোষ্ঠীর নূতন নাটক লেখক জ্যোতি দত্ত রচিত "আমরা সবাই যাব বুল পাড়তে।" চলচ্চিত্রে আগামী তিনটি ছবিতে অভিনয় করছি যথাক্রমে নেকড়ে, নায়িকা থেকে গরীব ও সমর্পণ। গত ১৯৭৩-৭৪ সালে শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে সংগীত নাটক একাদেমী পুরস্কারের সম্মান লাভ করেছি। প্রসংগক্রমে একটা বক্তব্য রাখতে ইচ্ছা করছে যে অনেকেই বলেন যে নাটকে বিদেশী চিন্তাধারা বা ভাবধারার প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, অস্বীকার করার নেই কিন্তু স্বপক্ষে বলতে হয় এই প্রভাব অনস্বীকার্য কারণ ভাল নাটকের অভাব ও তদুপরি প্রয়োগরীতিতে আমরা সর্বাংশেই পাশ্চাত্য নাট্যশৈলী থেকে পেছিয়ে রয়েছি। ...আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতহেসে বললেন, আর কিছু? প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললাম, অনেক কিছু...যা শুনলাম...যা বুঝলাম... আর কয়েক মিনিট আপনার সময় নষ্ট করব। ...পারি?...স্বচ্ছন্দে...।

প্রঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন কিনা?

উঃ নিশ্চয়ই পারে এবং আমি মনে করি এই মহান দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকেরই আগ্রহী হওয়া উচিত এবং এটা একমাত্র সম্ভব নিজস্ব শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি সে সুযোগ পেয়েছি ও তা যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

প্রঃ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে ভারতবর্ষের শিল্পী সমাজ কতদূর সফল হতে পেরেছিলেন—আপনার ধারণা

উঃ আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আমরা খুব বেশী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারিনি, স্বপক্ষে বলতে হয় মানসিকতার এই পথের প্রধান অন্তরায় হলো আমাদের জনশিক্ষার অভাব।

প্রঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি এবং সাথে চলতে পারে কি?

উঃ সাংস্কৃতিক চেতনা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব। শক্তির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে তাৎক্ষণিক অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ চিন্তাধারা অ-জ্ঞানপ্রসূত...তাই আমার চিন্তানুযায়ী উল্লেখিত সাংস্কৃতিক চেতনা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মূল্যহীন ও ব্যর্থ।

প্রঃ গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সঠিক পথ কি? শিল্পে বা সাহিত্যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কি অগণতান্ত্রিক

উঃ প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ কখনই অগণতান্ত্রিক নয়। আমাদের কোন আন্দোলনই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ১৪৪ ধারা ভংগ, অনশন ও ধর্মঘট প্রভৃতি সব কিছুই মহাত্মা গান্ধীর মত ও পথ...সুতরাং শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কখনই অগণতান্ত্রিক নয়।

প্রঃ চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা কতদূর প্রযোজ্য

উঃ আমার মনে হয় অপ্রাসংগিক চিন্তাধারা বা ভাবধারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অশ্লীল। আর নয়, এবার প্রশ্নবাণের পালা শেষ, ইচ্ছা নেই তবুও ইতি করছি, ভালো লাগল আপনার ও বৌদির এই আতিথেয়তা ও সহযোগিতার জন্য সাধুবাদ। অজিতেশ-বাবু বৌদিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সাক্ষাৎকারের

প্রশ্নোত্তরগুলি শুনলেন। ...তিনি গভীর মনোযোগে শুনলেন...মন্তব্য করলেন. আরও প্রাঞ্জল হলে ভাল হতো...আমি বললাম নিশ্চয়ই. তবে আমি তৃপ্ত. উজাড় করে প্রশ্ন করেছি. উত্তর পেয়েছি...এবার আসি. নমস্কার শিল্পী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা ও প্রখর বাগ্মিতা ও আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে নবজন্মের আনন্দে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করুন। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাংবাদিক আমি নূতন সংবাদের আশায় পথে এসে দাঁড়ালাম।

—

एक ही जादु

—कड़ी मेहनत

—दूर दृष्टि

—पक्का इरादा

—अनुशासन

-इन्दिरा गान्धी

१—समय की पुकार—अनुशासन और कार्यकुशलता

२—अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन

३—काम अधिक, बातें कम

४—देश का नारा—अधिक उत्पादन

५—काले धन्धे का मजा—काला मुंह, कड़ी सजा

६—प्रधान मंत्री का क्रान्तिकारी कार्यक्रम—आइए, इसे सफल बनाएं

७—इमरजेंसी का उद्देश्य—लोकतन्त्र का बचाव

८—सरकारी काम जनता की सेवा है

९—अच्छा बतावे कीजिए—जनता का दिल जीतिए

१०—भ्रष्ट लोगों को पकड़ने में सहयोग दीजिए

११—काम जल्द निपटाइए—देश को आगे बढ़ाइए

१२—इमानदार कर्मचारी को सभी कदर करते है

१३—रेल्वे आप ही की सम्पत्ति है—इसकी रक्षा कीजिए

१४—रेल्वे आप ही की सम्पत्ति है—इसे साफ रखिए

१५—देश का नुकसान—हमारा नुकसान

१६—खुशहाली के लिए उत्पादन बढ़ाइए

१७—आपात स्थिति अनुशासन पर्व है

—विनोबा भावे

(राजस्थान सरकार द्वारा प्रचारित)

রসসাগর জহর রায়

মেস ছাড়তে পারিনি, একটা সংস্কার আমার বেরবার বাধা দিয়েছে। তাই ১৯৪০ সালে সেই যে মেসে উঠেছি সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেই মেসেই রয়েছি। যদিও আমার পরিবার পাশেই ঘর ভাড়া করে রয়েছে তবুও আমি ঘরে গেছি এই মেসেই—এই কথাগুলো বলে উঠলেন জহর রায়। কোন এক শনিবারের সকালে দক্ষিণী বার্তার শারদীয়া সংখ্যার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম অভিনেতা জহর বাবুর কাছে। সূর্য সেন স্ট্রীটের সেই মেস বাড়ীর কোণার ঘরে বসে জহর বাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আপন মনেই তিনি বলে গেলেন ১৯১৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর আমার জন্ম। বরিশালে তখন আমরা থাকি। বাবার হাত ধরে বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে এলাম। বাবা সতু রায় তখনকার দিনে একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে অনেক বই করেছেন। এমন সময় মামা কলকাতা এলেন আমায় নিয়ে যেতে পড়াশোনা হচ্ছে না দেখে। ফিরে গেলাম আবার পাটনায় মামার বাড়ীতে। ঐখানেই ম্যাট্রিক, আই-এ শেষ করে বি, এ কোর্সে ভর্তি হলাম। কিন্তু কোর্স আর শেষ করা গেলনা। নেমে পড়লাম জীবন সংগ্রামে, পয়সার তাগিদে। চার বছর দর্জির দোকানে কাজ করেছি। তার পরে পেলাম মেডিকেল রিপ্রে-সেনটেটিভের চাকরী। এক নাগাড়ে তিন বছর করার পর তাও ছেড়ে দিয়ে চলে এসে এই মেসেই উঠলাম।

শুরু হল আমার নূতন জীবন। সিনেমা করার কথা। টালিগঞ্জ আর মেস পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করেছি প্রায় ন' বছর। ধনঞ্জয় বাবু আর হেমন্ত বাবুর সাহায্যেই টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় আমার পরিচিতি। অজিত চট্টোপাধ্যায় তখন কমেডিয়ান রোলে খুব ব্যস্ত ছিলেন! তারই সহায়তা ও সহানুভূতি আজকের কৌতুকাভিনেতা জহর রায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৪৭ সাল। অর্ধেন্দু মুখার্জীর 'পূর্বরাগ' ছবির কাজ শুরু হয়েছে। সেই ছবিতেই আমি সিরিও কমিকের রোল পেলাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সেই ছবিতেই প্রথম হেমন্তবাবু, গৌরীবাবু (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার), নারায়ণবাবুর (নারায়ণ গাঙ্গুলি) লেখা কাহিনী প্রথম ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর তিন বছর আবার কোন কাজ পাইনি। ১৯৪৮ সালে আবার একটা রোল পেলাম। তারপর চার বছর কেটে গেল। ১৯৫২ সালে আমি সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এ পর্যন্ত প্রায় ১৭৫ খানা বই করেছি। ৫৩ সালে থিয়েটার লাইনে এলাম। ৫৪ তে রঙমহল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রঙমহলেই রয়েছি। থিয়েটার প্রায় এ যাবৎ ৫০ খানা করেছি। পরিচালনা করেছি পাঁচখানা বই। একটানা এতক্ষণ কথা বলে জহরবাবু থমকে দাঁড়ালেন। পরণে চেক্ চেক্ লুঙ্গী, গায়ে গেঞ্জি, ছোটখাটো একটা বইয়ের লাই-ব্রেরীর মাঝখানে জহরবাবু বসেছিলেন। অসংখ্য বই দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, বই পড়ার বোধ হয় আপনার একটা হবি আছে—উত্তরে জহরবাবু বলে উঠলেন—পড়াশোনা আমার একটা হবি। এছাড়া সিনেমা দেখা, বেলাধূলার নেশাও আমার আছে। সিনেমা লাইনে আপনি কি বংশগত সূত্রই পেয়েছেন এই প্রশ্ন করতেই জহরবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন নিশ্চয়ই। কথার কথায় হিউমার দিতে আমি ছেলে বেলা থেকেই শিখেছি। এটাই আমার পরবর্তী কালে সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গ পাল্টে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পীদের ভূমিকার কথা তুলতেই ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জহরবাবু বলে উঠলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী-

সাহিত্যিকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। শিল্পীদের এই লাইনে সুযোগ বেশী। আমিও ব্যক্তিগতভাবে সে চেষ্টা করে থাকি।

প্রশ্ন : সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে ভারতীয় শিল্পী-সমাজ কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে

উত্তর: খুব কম পেরেছে। আরও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র শিল্পীরা কি কালো টাকা নেন —এ পথ বন্ধ করার উপায় কি ?

উত্তর : কালো টাকা নেয় কিনা জানিনা। তবে আমি নিইনা। বন্ধ করার উপায় সরকারী প্রশাসন যন্ত্র

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি

উত্তর : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় না।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তি ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলতে পেরেছে কি ?

উত্তর : না পারেনি। তবে সত্যজিৎবাবু, ঋত্বিক বাবু, তপনবাবু, ভুবণবাবু ও অজয়বাবু কিছুটা চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া আর কেউ বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

প্রশ্ন : পশ্চিমবাংলায় হিন্দী ছবির ভিত বাংলা ছবির বাজারকে ছোট করছে কিনা ? করে থাকলে প্রতিকারের কোন পথ আছে কি

উত্তর : নিশ্চয় ছোট করছে। তবে সুব্রতবাবুকে ধন্যবাদ। নতুন মন্ত্রী নতুন নিয়ম চালু করে বাংলার সিনেমা শিল্পকে বাঁচাবার কাজে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

প্রশ্ন-উত্তরের পালা শেষ করে উঠে আসছি এমন সময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি কোন সিরিয়াস রোলে অভিনয় করেছেন ? জহরবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বলে উঠলেন আমাকে দিয়ে সিরিয়াস রোল করানোর চেষ্টা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। এ বিষয়ে কোন পরীক্ষাই আজ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে করা হল না। এটাই আমার আক্ষেপ। কথা না বাড়িয়ে প্রীতি নমস্কার বিনিময় করে জহরবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

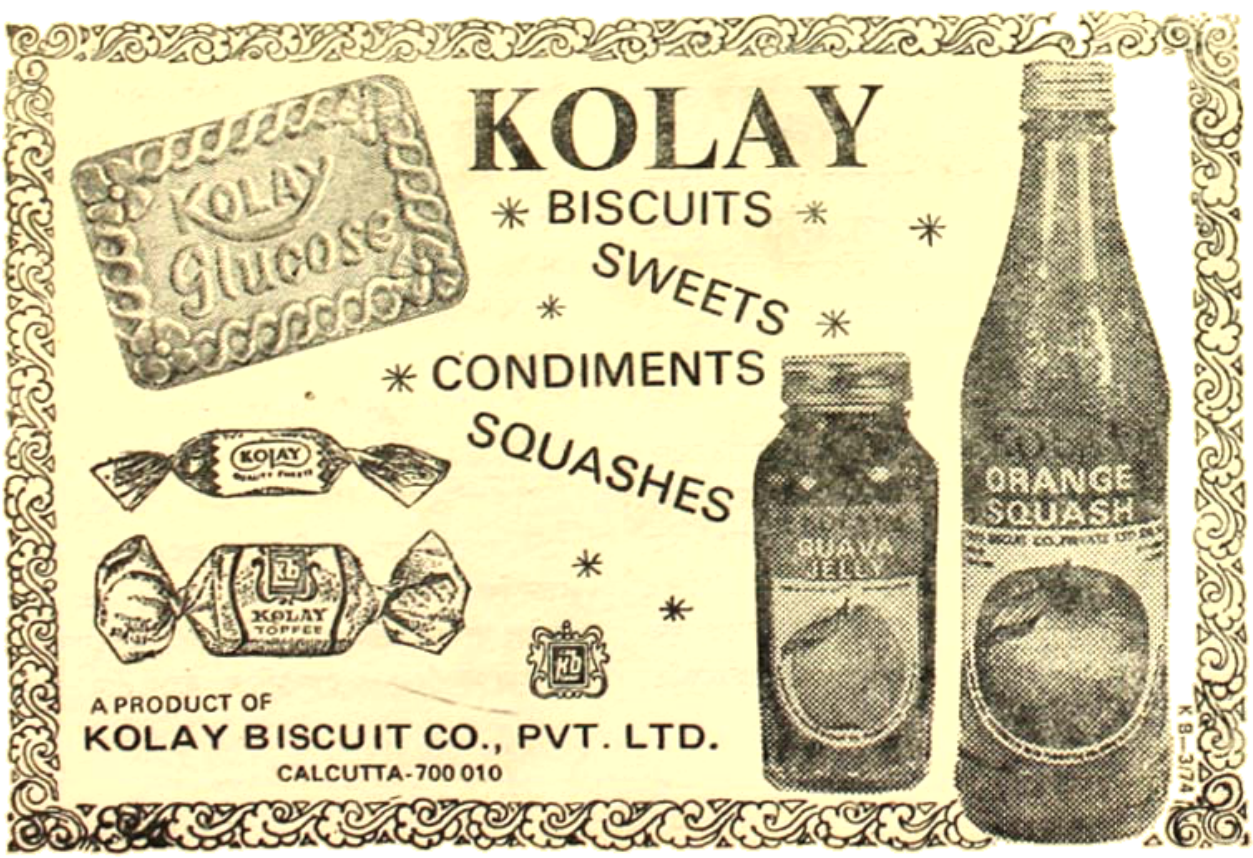

ভুবন সোম-এর সুহাসিনী

বিশপ লেফ্রোয়ের্ড মধ্য কোলকাতার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং অবশ্যই উচ্চবিত্ত অধ্যুষিত এলাকা। ১।১ বাড়ীর তিনতলার আট নম্বর ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুললো একটি অল্পবয়সী ছেলে। "এটা কি সত্যজিৎবাবুর বাড়ি?" সে সম্মতি জানালে আমি জানতে চাইলুম শ্রীমতী সুহাসিনী মুলের বাসা কোথায়? আর এক দফা সিঁড়ি ভাঙিয়ে আমাকে সে পৌঁছে দিয়ে গেলো দোতলায় শ্রীমতী মুলের অস্থায়ী কোলকাতা নিবাসে। এবারও দরজা খুললো ও বাড়ির মাঝবয়সী একজন কর্মচারী। সুদর্শন নামের সঙ্গে, স্বীকার করতেই হচ্ছে তার চেহারা সামঞ্জস্যহীন। পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং শ্রীমতী মুলেই। হয়তো আমারই অপেক্ষা ক'রছিলেন, সে কথা বুঝতে না দেবার চেষ্টা ক'রে ব'লে উঠলেন্ হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকমই তো একটা কথা ছিলো বটে। আমার আপত্তি না থাকলে উনি মিনিট পাঁচেক সময় নিতেন, এ'কথাও জানালেন। আমার আপত্তির প্রশ্নই ছিল না, সানন্দে সম্মতি দিয়ে আমি বসবার ঘরের চারপাশটা দেখতে লাগলুম। মোটামুটি রুচিসম্মতভাবে সাজানো সাধারণ আড়ম্বরের ঘর। পার্টিশনে দু'ভাগ করা, পেছনের দিকটা বসবার। লেফ্‌তে আইভান-হো থেকে গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স এমন কি জর্জ এলিয়ট পর্যন্ত ওদিকে সত্যনাথ ভাদুড়ী থেকে শিবরাম চক্রবর্তী মালিকের রুচির পরিচয় দিচ্ছে। পরে জেনেছিলুম ও ঘরের স্থায়ী বাসিন্দে শ্রীমতী মুলে নন, এক বাঙালী পরিবার।

মিনিট পাঁচেকের আগেই ফিরলেন উনি। পরনে শাদার ওপর গোলাপী ছাপের সিন্থেটিক শাড়ি, ব্লাউজের হাতায় জরির কাজ। একগাল হেসে নিজের নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে চাইলেন, আমাকে মানতেই হ'লো তাঁর ডেন্টিস্ট নিজের কাজে অত্যন্ত নিপুণ। আমার চা-টা কিছু প্রয়োজন কিনা জেনে নিয়ে উনি আমাকে প্রশ্ন করার অধিকার দিলেন। আমি প্রথমেই জানিয়ে নিলুম, আমি পেশাদার সাক্ষাৎকারী নই, সত্যি কথা বলতে এটিই আমার একরকম প্রথম অভিজ্ঞতা। উনি আশ্বস্ত হ'লেন, নিজের মুখেই সে কথা বলে ফেললেন। হালকা প্রসাধন করা গালে সামান্য লাল ছোপ পড়ে হাসলেই। এবং উনি প্রায়ই হাসেন। এখানে ব'লে রাখা ভালো, শ্রীমতী মুলে মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। বাংলা তেমন জানেন না— আমাদের সমস্ত কথাবার্তাও ইংরেজীতেই হচ্ছিলো।

প্রশ্ন—সিনেমার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা কী? তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার সুযোগ কতটুকু? আপনি এ ব্যাপারে কতোটা সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর—শিল্পী বলতে আপনি নিশ্চয়ই শুধুমাত্র অভিনেতাদের বোঝাচ্ছেন না, যে কোনো রকম সৃষ্টি-কর্তাকেই শিল্পী বলা চলে। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের এর থেকে আলাদা করে দেখার কোনো অর্থ হয় না।

তাদের অনেক দায়িত্বের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বর্তমান অথবা অতীতের কোনো ঘটনা—যার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে—চলচ্চিত্রের মতো জোরালো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমি এর ব্যতিক্রম নই।

প্রশ্ন : যে সব শিল্পীরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন—তাঁদের সম্পর্কে আপনার মতামত ?

উত্তর : এ ব্যাপারে সিনেমার চাইতে থিয়েটার জগত অনেক বেশি জড়িত। I.P.T.A., Great National Theatre প্রভৃতি তার উদাহরণ। সে সময়কার ভাবের জোয়ারই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলো বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে কি ?

উত্তর : সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে কোনো বিপ্লবেরই আবশ্যিক অঙ্গ। এর অযথার্থ ব্যবহারের ফলে মূল বিপ্লব ব্যাহত হতে পারে। ইতিহাসেতার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প কি এ রাজ্যের মানুষের কথা বলে ?

উত্তর : টাকা করার পক্ষে সিনেমার ব্যবসা অত্যন্ত উপযোগী। সেই লোভই এর প্রতিবন্ধক। খুব কম পরিচালক আছেন এ রাজ্যে যাদের ছবি এই মহান দায়িত্ব পালন করে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ অথবা প্রতিরোধের সঠিক পথ কি ?

উত্তর : এ ব্যাপারে কোনো মতামত দিতে আমি অনিচ্ছুক।

প্রশ্ন : হিন্দী ছবি কি বাংলা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের বাজার সংকীর্ণ করেছে ? এর প্রতিবিধান কি ?

উত্তর : নিশ্চয় করেছে। তবে যতক্ষণ না আমরা নিজেরা এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছি ততক্ষণ কোনো সরকারেরই শক্তি নেই এর থেকে আমাদের বাঁচাবার। তবে পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারে যা হয়েছে আমার মনে হয় না তামিলনাড়ু ছাড়া অন্য কোথাও এরকম হয়েছে।

প্রশ্ন : শিল্পী তার বাইরের জগৎ এবং নিজের শিল্পসত্তা সম্পর্কে কতোটা সচেতন ?

উত্তর : শিল্পী মূলতঃ মানুষই। সুতরাং বাইরের ঘটনা সম্পর্কে তার অনুভূতির তারতম্য হয় না। নিজের শিল্পসত্তা সম্পর্কে সচেতন তাকে থাকতেই হয়, তার পেশার খাতিরে।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রে নগ্নতা সম্পর্কে আপনার মতামত ? কাহিনীর অথবা চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তা গ্রাহ্য হওয়া উচিত—এমন চিরাচরিত জবাব আপনার থেকে আশা করবো না।

উত্তর : তাইতো সবাই বলে থাকে, তবে আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মুসকিল। আমাদের যৌন জীবনের গোপনীয়তা এতো সযত্নে রক্ষা করা হয় যে রাতারাতি একে রাস্তায় নামিয়ে আনলে তা অনেকেরই সহ্য হবে না।

এক সময় সুদর্শনকে চা আনতে বলে উনি আমার দ্বিতীয় দফা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সিধে হয়ে বসলেন। কতগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে। ওনার বয়স যদিও বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে, ছোট ছেলেমেয়েদের চঞ্চলতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অত্যন্ত বেশি হাত নাড়েন কথা বলার সময়, অবসরে পা ঠোকেন মেঝেতে, মাঝে মাঝে তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এমন ভাবে এক চোখ বুঁজে আমার দিকে তাকালেন, আমি চমকে উঠলাম।

প্রশ্ন : মাণিকবাবুর থেকে শুনেছিলুম আপনার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে হবে, তাই বলছি। ধরে নিতে পারি আপনি তেমন ভালো বাংলা জানেন না। আপনি কি শংকরের "জন-অরণ্য" পড়েছেন ?

উত্তর : না, পড়িনি।

প্রশ্ন : তাহ'লে শুধু ক্ল্যাপার্স্টিক চোকার জন্য তো সত্যজিৎ রায়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজন দেখিনা। যে কোনো পরিচালকের অধীনেই আপনি এ সুযোগ পেতে পারতেন।

উত্তর : আপনি কি মহানগর দেখেছেন? নায়কের চাকরি থাকাকালীন মাহের মুড়োটা তার পাতে পড়তো। চাকরিতে লোকবদলের সঙ্গে সঙ্গে মাহের মুড়োরও পাত বদল হয়ে গেলো। ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে নগণ্য, এমন কি বাংলাদেশের বাইরে খুব কম লোকই এই মুড়োর উপাখ্যান জানেন। তবু এই রকম সূক্ষ্ম কাজ দেখার জন্যই আমি মাণিকদার সঙ্গে আছি, যা আমি আর কারো বইতে খুঁজে পাইনা।

প্রশ্ন : আপনি মাণিকদার সহকারী হওয়া সত্ত্বেও এমন কখনো হয়েছে কি—যেখানে আপনার পরামর্শ মতো কাজ হয়েছে মাণিকদার মূল পরিকল্পনার বদলে?

উত্তর : ছোটখাটো ব্যাপারে হয়তো হয়েছে। বড়ো ব্যাপারে অন্যের মতামত গ্রাহ্য করার মতো লোক উনি নন।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের মতো দু'জন বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার বিরল সুযোগ আপনার হয়েছে। কাকে আপনার বেশী বাস্তবসম্মত মনে হয়? দু'জনের পার্থক্য কোন কোন খানে?

উত্তর : (এ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ ভাবলেন। বলেই ফেললেন, পারলে আমি এই স্পর্শকাতর প্রশ্নটা এড়িয়েই যেতাম। আমি জোর করতে বললেন) দেখুন দু'জনের কাজ করার ধরণ আলাদা। মাণিকদা যা প্লান করেন, পারতপক্ষে তার থেকে একচুলও বিচ্যুত হ'ননা। সেক্ষেত্রে মৃণালদা খানিকটা তাৎক্ষণিক মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল। (ভুবন সোমের এরকম দু'একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন—) আমার ধারণা মাণিকদা হলে কখনোই সে মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন না। উনি শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনে আদৌ বিশ্বাসী নন।

প্রশ্ন : সনন্যা থাকাটা কোনো দোষের ব্যাপার নয়, অন্যায় হ'লো তার সমাধানের চেষ্টা না করা। আপনি কি একমত? সত্যজিৎ রায় আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্ত্বেও সোনার কেল্লার মতো ছবি তৈরী করে এ সমস্যাসঙ্কুল সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব কি এড়িয়ে যাচ্ছেন না

উত্তর : আমি নায়—অন্যায়ে বিশ্বাসী নই, তবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত। মাণিকদার তরফে আমি কোনো দোষ দেখিনা। তিনি চারুলতা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরী করেছেন। তাছাড়া Children film এর কি কোনো প্রয়োজন নেই? বাজার চলতি হিন্দী ছবি ছাড়া এখনকার

সুহাসিনী মুলের সহিত জনঅরণ্যের নায়ক প্রদীপ মুখার্জী

ছেলেমেয়েরা আর কী দেখার সুযোগ পায়? সেক্ষেত্রে মাণিকদা যদি তার এতো বছরের জীবনে একটা গুপীবাঘা অথবা সোনার কেল্লা তৈরী ক'রে থাকেন তার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রশ্ন : কতোটা স্বাধীনতা চলচ্চিত্রকারদের প্রাপ্য? এ স্বাধীনতার সুযোগ কি সকলে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারেন?

উত্তর : সেটা নির্ভর করে দেশের রীতি-নীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। জাপানে, ডেনমার্কে যৌন বিষয়ক ছবির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় হু হু ক'রে তাদের বিক্রী কমে

গেছে। পয়সা করার সহজ মাধ্যম বলে অনেকেই এ স্বাধীনতার যথাযথ উপযোগিতা অনুভব করার সময়ই পান না। যারা পান, সে রকম পরিচালকের সংখ্যা আমাদের দেশে লজ্জাজনক ভাবে স্বল্প।

প্রশ্ন : এটা খানিকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনার ছাত্রী-জীবন, শৈশব, কৈশোর কোথায় কেমন ভাবে কেটেছে? আপনার বাবা কি করেন? মৃণাল সেন কোথা থেকে আপনাকে নায়িকা নির্বাচিত করলেন?

উত্তর : আমার জন্ম পাটনায়। স্কুল জীবন কেটেছে দিল্লী, বোম্বে এবং কোলকাতায় এখানকার বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে কিছুদিন পড়েছিলুম। কলেজ কেটেছে কানাডায়। কমিউনিকেশন নিয়ে পড়েছিলুম—স্পেশালাইজ করেছি টেলিভিশনে। আমার বাবা মৃত। মা ভারত-সরকারের ফিল্ম সেন্সর-শিপের কোন এক দপ্তরে কাজ করার সময় মৃণাল বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি ওনার ছবিতে কাজ করবো কি না? সে বয়সের সব মেয়ের মতো আমারও নায়িকা হওয়ার বাসনা ছিলো। আমি বললাম, করবো। তার তিন বছর পরে ভুবন সোম ছবি করার সময় উনি আমায় ডেকে নিলেন।

প্রশ্ন : আপনি যদি কোনো দিন নিজেই ছবি পরিচালনা করেন—আমার শুভেচ্ছা রইলো, আপনি নিশ্চয়ই করবেন—তাহলে কি আপনি তাতে অভিনয় করবেন?

উত্তর : আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। তবে নিজের ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ পরিচালকের অভিনয় করার জন্যে ক্যামেরাম্যানই পরিচালক হয়ে দাঁড়ায়, যার সঙ্গে বাকী ছবির পরিচালনার কোনো সম্পর্ক নেই। এতে ছবির ছন্দপতন ঘটার সম্ভাবনা। তাছাড়া নিজেই নিজের অভিনয়ের বিচার করা যায় না, সেখানেও মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্যই—আলাদা ভাবে অভিনয় এবং পরিচালনা করাই আমার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

আমার প্রশ্ন করা শেষ। আমি মিনিট দশেক সময় চেয়ে নিলুম পয়েন্টগুলো লিখে ফেলার জন্য। "আপনার আপত্তি না থাকলে কি আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?" আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন "বাই অল মীনস।" "আপনি নিশ্চয়ই সিগারেট খাননা?" লিখতে লিখতে আমি প্রশ্ন করি।" খেয়ে দেখেছি কয়েকবার, ভালো লাগেনা—কেমন তেতো-তেতো।" "মাণিকদা চারমিনার খান শুনেছি।" "না মাণিকদা না, তবে মৃণালদাকে চার-মিনার খেতে দেখেছি আমি।" "আপনি কদ্দিন কোলকাতায় আছেন?" "যদ্দিন না ছবির কাজ শেষ হয়, তবে মোটামুটি অগাস্ট মাসটা আছি।" এবার প্রশ্ন ক'রলেন উনি "আপনাদের কাগজ কবে নাগাদ বেরুবে?" "আপনার সাক্ষাৎকার পুজো সংখ্যার জন্য, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বেরুবে।" এই কথা বলে, সহযোগিতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আজকের নায়িকা
অপর্ণা

দিনটা ঠিক মনে নেই। সম্ভবতঃ বুধবার। টালিগঞ্জের নিউ থিয়েটার্সে "অজস্র ধন্যবাদ" বইয়ের শুটিং চলছে। ফ্লোরে যেতেই পরিচয় হল অরবিন্দ মুখার্জির সঙ্গে। আলাপ হইতেই অপর্ণা সেনের কথা তুললাম। পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি একটু বাদেই শ্রীমতী সেনকে নিয়ে হাজির হলেন আমার কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে শ্রীমতী সেনের সাহায্য চাইতেই একটু অপেক্ষা করতে বলে শ্রীমতী সেন চলে গেলেন। ইতিমধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। শ্রীমতী অপর্ণা সেন মেক-আপ রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন এই অবসরে আমাকে। অমায়িক ব্যবহার শ্রীমতী সেনের কিছু খাবেন কি? আমায় প্রশ্ন করলেন শ্রীমতী সেন। উত্তর দিলাম না। তবুও শ্রীমতী সেন কোল্ড ডিংকসের অর্ডার দিলেন। লাঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা জমে উঠল আমাদের। শ্রীমতী অপর্ণা সেন শুরু করলেন সত্যজিৎবাবুর "তিনকন্যা" ছবির কথা দিয়ে।

১৯৬০ সাল। মানিকবাবুর "সমাপ্তি" ছবিতে স্কুলের ছাত্রী কিশোরী অপর্ণা চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন। ফিরে গেলেন আবার স্কুল জগতে। মডার্ণ হাইস্কুল ফর গার্লস এ অপর্ণা কে-জি থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত

নন-ষ্টপ পড়াশোনা করে গেছেন, তারপর যোগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। স্কুলে একবার একটা নাটক হয়েছিল 'হ-য-ব-র-ল', অপর্ণা তাতে স্বভাবতই অভিনেত্রী ছিলেন, আর তাতেই উনি একটা পুরস্কার পেলেন। ইতিমধ্যে মৃণাল সেনের "আকাশ কুসুম", বাক্স-বদল" ছবিতে অভিনয় করলেন। এই সময় লিটল থিয়েটার গ্রুপে উৎপল দত্তদের ওখানে "প্রফেসার মামলক" নাটকে আরম্ভ করলেন রিহার্সাল।—রুথ মামলকের চরিত্রে। দারুন হয়েছিল ছবিটা। ইতিমধ্যে আবার সিনেমা জগতে হৃষিকেশ মুখার্জি দিয়ে শুরু করলেন এ যাবৎ প্রায় ত্রিশখানা বই করেছেন থিয়েটার করেছেন চারখানা "সুজাতা" ছবিতে অপূর্ব অভিনয়ের জন্য রাজ্য সরকার তাকে পুরস্কৃত করেন। বর্তমানে অনেক বই তার হাতে রয়েছে।

শিল্পীর সঙ্গে এ বিষয়ে আর কথা না বাড়িয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে ধরতেই উনি একে একে উত্তর দেওয়া শুরু করলেন।

প্রশ্ন :—সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর :—সাহিত্যিকদের কথা সাহিত্যিকরাই বলতে পারেন। আমি সাহিত্যিক নই। শিল্পী হিসাবে বলতে পারি অবশ্যই আমাদের একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকা আছে। আমি Socialism এ বিশ্বাস করি। আমাদের Field হল Comunications অথবা প্রচার। এই ক্ষেত্রে আমার একটা ভূমিকা অথবা দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে অভিনেত্রী হিসাবে। যে সব চলচ্চিত্রে Socialism এর প্রচার সঠিকভাবে করা হয় সেসব চলচ্চিত্রে আমি বিনামূল্যে অথবা অতি সামান্য মূল্যে কাজ করেছি—যে কোন ভূমিকায় —এবং ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছা রাখি। চলচ্চিত্র শিল্পীদের কর্মজীবন সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বল্পায়ু। অথচ অবসর গ্রহণ করার পর এরা কোনও প্রকার Pension, Provident Fund বা ঐ জাতীয় benefits পান না। বহু জনপ্রিয় শিল্পী অবসর গ্রহণ করার পর শেষ বয়সে অখ্যাত এবং নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেছেন। কর্মজীবনে শিল্পীরা যে অর্থ উপার্জন করেন বর্তমান Income Tax এর নিয়মানুযায়ী তার বেশির ভাগটাই সরকারকে দিয়ে দিতে হয়। সঞ্চয়ের বিশেষ কোন সুবিধা তাতে থাকেনা। সম্ভবতঃ সেই জন্যই কিছু শিল্পী কালো টাকা নেন বলে শোনা যায় যদিও এর সত্যাসত্য আমি সঠিক জানি না। বন্ধ করার উপায় আমার মনে হয় Income Tax এর নিয়মে কিছু কিছু পরিবর্তন করা। ইদানিং একটা নতুন নিয়ম করা হয়েছে। যা শিল্পীদের অনেকটা সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। এই নিয়মে শিল্পীরা অ্যানিয়েটি স্কীম এ তাদের উপার্জনের খানিকটা অংশ অবসর প্রাপ্ত জীবনের জন্য রেখে দিতে পারেন। শুনেছি Bombayর অনেক শিল্পী আজকাল এই Scheme এর আশ্রয় নিচ্ছেন শেষ বয়সে নিশ্চয়তা সকলেই চায়। শিল্পীরাও ব্যতিক্রম নন। আমার বিশ্বাস Income Tax এর নিয়মাবলীতে এই ধরণের কিছু পরিবর্তন অথবা সংযোজন হলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি ? অথবা দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে কিনা ?

উত্তর : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সমাজের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে প্রয়োজন আছে এই কথা তো আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। দুটো যে এক-

সঙ্গেই চলতে পারে সে প্রমাণ কি পৃথিবীর কোনও দেশ আমাদের দিচ্ছেন।—যদিও এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে এইসব দেশের সঠিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানবার সুযোগ আমার এবং আমাদের অনেকেরই হয়নি।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসার ভিত্তি ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথা বলতে পেরেছে কি ?

উত্তর : একটা কথা অনেকেই ভুলে যান যে চলচ্চিত্রই একমাত্র শিল্প যা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। এ কথা স্বীকার করি যে মানুষের কথা বা মানুষের সমস্যার কথা বলবার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র চলচ্চিত্রই বটে যেহেতু এটা "most important medium of the 20th Century"। কিন্তু চলচ্চিত্র শুধু শিল্পই নয় ব্যবসাও বটে। এই Industry র উপর বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ করে। মানুষের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে যদি কোনও ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ না করে তবে সে ছবির প্রযোজকের দ্বিতীয়বার ছবি নির্মাণ করার মত আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ থাকেনা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র Industry র যে রূপ টলটলায়মান অবস্থা তাতে এই ধরণের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস বেশির ভাগ প্রযোজকের যদি না থাকে তাহলে তাঁদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

অথচ চলচ্চিত্রর শিল্প-সত্তা হরণ করে তাকে কেবলমাত্র ব্যবসায়ে পরিণত করা হোক—এ ব্যবস্থা'কেও আমি সমর্থন যোগ্য মনে করি না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শতকরা আশি ভাগ ছবিই ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে চোখ রেখে নির্মাণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গও ব্যতিক্রম নয়। এবার আমি আপনাকে একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই পশ্চিমবঙ্গের কোনও ছবিই কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথা বলেনি। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক—এরা কি শুধু ব্যবসারক্ষি করেছেন এতদিন ? মানুষের কথা বলবার মত আরও ছবি চাইলে আর্ট থিয়েটারের প্রয়োজন আছে। সরকার যদি কলকাতা শহরে অন্ততঃ একটি দুটি আর্ট থিয়েটার নির্মাণ করে দেন (পৃথিবীর অন্যান্য বড় শহরে যেমন আছে) যেখানে এই ধরণের ছবি বিনামূল্যে চালানো যেতে পারে তবেই পরিবেশনার চিন্তায় পরিচালক এবং প্রযোজক দোরে দোরে ছুটোছুটি করার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারেন। তবেই মানুষের কথা বলার মত ছবি তৈরী করা এখানে সম্ভব হতে পারে। ইদানিং পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প সরকারের তরফ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে এবং পাচ্ছে। এতে করে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসবে আশা করা যায় নিশ্চয়ই। তবে এটা সময় সাপেক্ষ—সুতরাং নিরাশ হবার সময় এখনও আসেনি বলেই আমার বিশ্বাস।

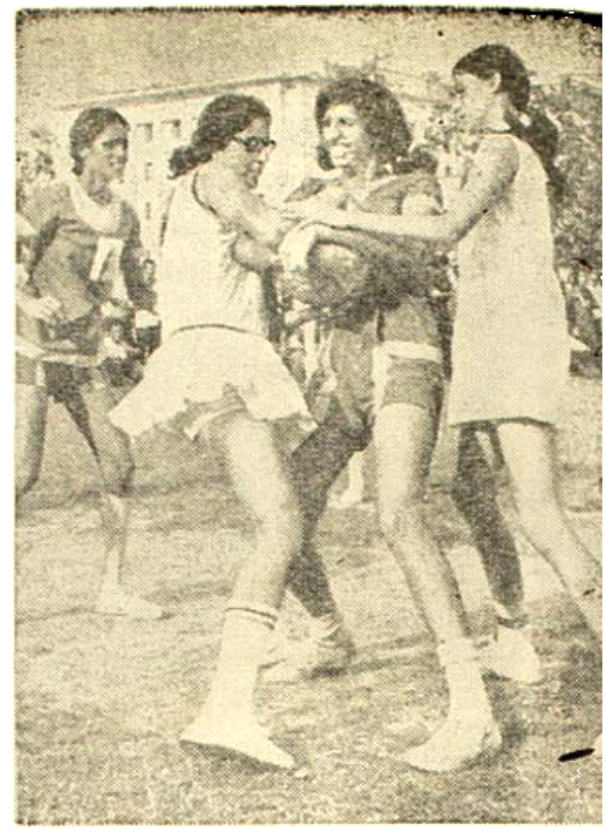

"ধনি মেয়ে"

এই কি অনন্ত

ফটো—কনক দত্ত

চিরনায়িকা কাবেরী

যাদবপুর পার্কের সুসজ্জিত ড্রিয়িংরুম ফ্ল্যাটে বসে শ্রীমতী কাবেরী বসু (চ্যাটার্জী) কথা বলছিলেন। সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে সোফার উপর হেলান দিয়ে কাবেরী বসু বলে চলেছিলেন তাঁর অতীতের কথা। বিখ্যাত বসু পরিবারে ১৯৩৮ সালে আমার জন্ম। বাবা ওকালতি করতেন দাদা বন্ধুত্ব নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। সেই সূত্র ও তাঁরই জুনমে "রাই-কমলে" ছবিতে আমার অভিনয় জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। রাই কমলে অভিনয়ে হয়ত দর্শকদের সেদিন ভালবেসেছিলতাই পরিচালকের দল ভিড় করল আমার বাড়ীতে। শুরু হল একেরপর এক অভিনয়। পর পর আটখানি বইতে প্রাভিনেত্রীর ভূমিকায় আমি আত্মপ্রকাশ করলাম। ১৯৫৫ সালে বরা জুন শ মিলী রিলিজ করল সারা কলকাতা হলে। এইদিনই বয়ের সিঁড়িতে আমি বসলাম। সাতপাকে বাঁধা হল কৃতী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শেষ হল অভিনয় জীবনের শুরু হল ঘর বাঁধার পালা। টুপাস, টুম্পা আর টিনা এই তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার জমে উঠল। সংসারের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বই পড় শুরু করে দিলাম। এরপর ১৯৭০ সালে স্বামী কলকাতার বাসী হয়ে গেলে শ্রী-জিত বাবুর অনুরোধে "অবসরের দিনরাত্রিতে" আবার আত্মপ্রকাশ করলাম। কিন্তু ঐখানেই শেষ। এরপর ১৯৭০ সালের ১২ই জুন আমার সুখের সংসারের উপর কালোছায়া নেমে এলো। রাজিলংএ এক মোটর দুর্ঘটনায় ছোট মেয়ে টিনা ও আমার স্বামী টানা আমার কাছ থেকে চিরকালের মত সরে গেলেন। সব থেকে আশ্চর্য কি জানেন জুন মাসেই আমার বিয়ে হয়ে ছিল আর ঐ জুন মাসেই আমার দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

আমি প্রশ্ন ঘুরিয়ে বলে উঠলাম আমার গুটিকয়েক প্রশ্ন ছিল শ্রীমতী বসু সানন্দে উত্তর দিলেন নিশ্চয়ই দেবো।

প্রশ্ন : সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে ভূমিকা পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন কিনা?

উত্তর : সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে সুযোগ বেশী। তবে শিল্পীদেরও সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ আছে। আমার ব্যক্তিগত ভাবে করার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ খুব বেশী নেই। সামাজিক দিক দিয়ে কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা আজও করছি। শিল্পী হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে রকম সুযোগ আজও আসেনি।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র শিল্পীরা কালোটাকা নেন সাধারণ মানুষের এই যে ধারণা সেটা কি সত্যি? সত্যি হয়ে থাকলে বন্ধ করার কোন পথ আছে কিনা?

উত্তর : কেউ টাকা নেন কিনা জানিনা, তবে আমি নিনা। প্রোডিউসাররা যদি কালো টাকা দেওয়া বন্ধ করেন তবেই এ পথ বন্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন : সংস্কৃতির বিপ্লব ছাড়া সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি? অথবা দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে কিনা?

উত্তর : সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজ বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় না।

উত্তর : বাজার ছোট করছে। তাই বাধ্যতামূলক ভাবে বাংলা ছবি দেখানো প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে রাজ্য তথ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুখার্জী যে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাতে মনে হয় আগামী দিনে তিনি এই কাজে সফলতা অর্জন করবেন।

প্রশ্নের শেষ দিকে তিনি বলে উঠলেন বিশু শিল্পে ছোট ছোট কথা কুশলীদের কি অভাব তা নিজে চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। বিশেষ করে যারা টেম্পরারি কাজ করে তাদের দিকে আজ সবার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আমি প্রসঙ্গ না বাড়িয়ে প্রীতি নমস্কার বিনিময়ের আগে অবসর সময়ের কথা তুলতেই শ্রীমতী বসু বলে উঠলেন রান্না ঘর সংসার এই নিয়েই আমার ভাল লাগে।

গরীবের মেয়ের কাছে গরীবের মা

জয়যাত্রায় শান্তিগোপাল

সাংবাদিক আমি, সংবাদের আশায় ঘুরে বেড়ানই আমাদের নেশা ও পেশা, ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছিলাম 'রূপ ও মঞ্চের' অফিসে, গিয়ে দেখি মেঘ না চাইতেই জল। স্বয়ং শান্তিগোপাল মহাশয় বোধহয় ব্যক্তিগত কাজে উপস্থিত। এই সুযোগের বিন্দুমাত্র অপচয় না করে সাদরে সুযোগের সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিলাম। বললাম, শান্তিগোপালবাবু আপনার মূল্যবান সময়ের কিছুটা যদি আমার জন্য ব্যয় করেন বিশেষ বাধিত হবো। অমায়িক ভদ্রলোক, প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন, অবশ্যই, বলুন কি করতে পারি। বললাম কিছুই না...শুধুমাত্র কিছু জিজ্ঞাসা.....কিছু অনুসন্ধিৎসা .....আর প্রশ্নোত্তরে কিছুটা তৃপ্তি..... পেতে পারি কি!

.....নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বলুন কি জিজ্ঞাস্য আপনার? বললাম, আগে প্রশ্ন নয়, আপনি বলুন আমি শুনি, পরে প্রশ্ন। 'বেশ' বলে ভালভাবে গুছিয়ে বসলেন বর্তমানের যাত্রার দিকপাল শান্তিগোপাল।

যাত্রাজগতে আমি শান্তিগোপাল নামে পরিচিত কিন্তু পিতৃদত্ত নাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল। আমার বাবা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। আমার জন্ম ১২০৪ সালে, আমরা চারভাই ও দুই বোন। বর্তমানে আমার একটি পুত্রসন্তান। কৈশোর থেকেই অভিনয়ের প্রতি আমার একটা দারুণ মোহ ছিল এবং এই নেশার ঝোঁকে আমি প্রায়শই বাড়ীর অগোচরে বিভিন্ন স্থানে থিয়েটার দেখে বেড়াতাম। আমার বয়স যখন ষোল তখন আমি সর্বপ্রথম সৌখিন মঞ্চে অভিনয় করি—নাটকটির নাম ছিল "মেবার পতন", উক্ত নাটকটিতে আমি বৃদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। প্রথম জীবনে অধিকাংশ নাটকই ছিল সামাজিক।

লেনিনের ভূমিকায় শান্তিগোপাল

কিছুক্ষণ থেমে শান্তিগোপালবাবু কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বললেন, এরপরই আমার পেশাদার নাট্যের শুরু, ধারাবাহিক কয়েকটি বছরের অক্লান্ত মরণপণ সংগ্রাম। অভাব অনটনের সংসার তাই বাধ্য হলাম স্কুল ছাড়তে, ইচ্ছে থাকলেও কলেজের প্রাংগণে প্রবেশাধিকার পেলাম না, বেরিয়ে পড়লাম রোজগারের জন্য, মূলধন বা বাঁচার হাতিয়ার হলো আমার সামান্য অভিনয় ক্ষমতা, একে সম্বল করেই রুঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। ১২৫৬ সালে যাত্রা দিয়ে জীবন শুরু করলাম, যোগ দিলাম 'নিউ রয়াল বীণাপাণি অপেরায়', মাসিক বেতন পঁচাত্তরটি টাকা। অনেকে উপহাস করেছে, ঠাট্টা করছে, বলেছে, শেষ পর্যন্ত যাত্রায়? উপহাসের পাত্র হয়েও স্মিত হেসে

উত্তর দিয়েছি অভিনয় আমার নেশা তাই পেশা হিসাবেই একে গ্রহণ করেছি। কিন্তু মনেপ্রাণে আমি জানতাম যাত্রা ছাড়া অতি সহজে কোন জায়গায় অভিনয় করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। চলচ্চিত্র বা থিয়েটার একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ। মনকে প্রবোধ দিলাম সুযোগ আমার আসবেই সেদিন এইসব উপহাসের যোগ্য জবাব আমি দেব। তখন রয়েল বীণাপাণি অপেরার সবচেয়ে দামী অভিনেতা ছিলেন শ্রীপঙ্কু সেন, ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যাত্রা জীবনে তার অমূল্য ও দরাজ সহযোগিতা না পেলে আমি কখনই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে সক্ষম হতাম না; অবশ্য মালিক পক্ষের সহযোগিতাও অনস্বীকার্য। 'ভাগ্যের বলি' যাত্রায় আমি সর্বপ্রথম নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম ও তারপরে "বীর অভিমন্যু"তে অভিমন্যুর নাম ভূমিকায় অভিনয় করলাম। এর পরের ইতিহাস যদিও সংক্ষিপ্ত নয় তবুও দ্রুত। রয়েল বীণাপাণি অপেরায় একটানা সাত বছর অভিনয় করার পর আমি এক বছরের জন্য নট কোম্পানীতে যোগদান করলাম কিন্তু আবার ফিরে আসি নিউ রয়েল অপেরায়। এরপরের ইতিহাসের চাকা আরও দ্রুত ঘুরতে শুরু করল। ১৯৬৪ সালে তরুণ অপেরা 'লিজ' নিয়ে একটি নূতন যাত্রা গোষ্ঠী তৈরী করলাম, আরম্ভ করলাম নতুন জীবন, মনে অনেক আশা, অনেক উদ্দীপনা কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। বহু দামী নামী অভিনেতা দিয়ে অভিনয় করিয়েও তরুণ অপেরার অস্তিত্বে টান পড়ল, ধ্বস নামল, দিশেহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা হারালাম না, শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরলাম, দলের বিপর্যয় রোধে নিজে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এলাম প্রধান নাম ভূমিকায়—বই নিলাম "হিটলার"। আবার বহুজনের উপহাস, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, অনেকেই মন্তব্য করলেন, হিটলার চরিত্র পরিবর্তন করে 'হাটলার' হবেন। কোন মন্তব্যে কর্ণপাত না করে শ্রীযুক্ত শম্ভু বাগের 'হিটলারের' জয়যাত্রা শুরু হলো। দল বাঁচলো, সুনাম ফিরে এলো। এরপরেই আমার তথা আমাদের তরুণ অপেরার জয়যাত্রা, মঞ্চস্থ হলো লেনিন, আমি সুভাষ, রাজা রামমোহন, ওথেলো ইত্যাদি। বর্তমানে আমরা শ্রীশম্ভু বাগ রচিত "ক্রীতদাস" ও গিরীশ ঘোষের "বলিদান" যাত্রা শুরু করতে চলেছি। আমি আমার যাত্রা জীবনে তিরিশখানা বই অভিনয় করেছি। একটু হেসে শান্তিগোপাল বললেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান মেহেরু পুরস্কার আমি পেয়েছি সোভিয়েত দেশে 'লেনিন' অভিনয় করে। যাত্রায় আমি গতানুগতিকতার, বাঁধা ধরা গতের মুক্তি চেয়েছিলাম এবং আমি তা পেরেছি এমনকি মান্ধাতা আমলের প্রয়োগ-রীতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন লাইট, টেপ, মাইক, ষ্টেজ প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার। বর্তমানে আমাদের তরুণ অপেরায় ৬০ জন সদস্য এবং এরমধ্যে চল্লিশজনই সক্ষম অভিনেতা। একটানা অনেকগুলি কথা বলে থামলেন শান্তিগোপাল, সময় দিলাম ও নিলাম পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

বললাম, শান্তিগোপালবাবু আর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর নিয়েই ইতি টানব। আচ্ছা, বলুন তো সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আপনার মতে কি ভূমিকা থাকা উচিত, আর সেই দায়িত্বের সুযোগ পাওয়া কি সম্ভব, আপনি কি পেয়েছেন? উত্তর দিলেন, নাটক জীবনের সমাজবেদ আর নাট্যকার হলেন শিক্ষক। সুতরাং উৎকৃষ্ট রচনার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক চেতনার উন্নতি সম্ভব। এই মানসিক চেতনার উন্নতিকল্পে পূর্বেও সংগ্রাম চলেছে এবং বর্তমানেও নিয়ত এরজন্য আমার মনে হয় আপোষহীন সংগ্রাম চালানো শ্রেয়। প্রশ্নের প্রসংগান্তরে তিনি বললেন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনই অগণতান্ত্রিক

নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাংস্কৃতিক বিপ্লব ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভবপর কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমার মনে হয় অসম্ভব। শিল্পীর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শিল্পীর নিজস্ব মত হলো, তাঁর সর্বদাই নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অশ্লীলতার প্রশ্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো যাত্রা জগতে অশ্লীলতা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও সহজেই বর্জন করা যায় ও উচিত।

আমার সাক্ষাতকার শেষ। যাত্রা জগতে শান্তিগোপাল একটি নূতন যুগের প্রবর্তক, নূতন চিন্তাধারায়, ভাবধারায় ও সাজানোর অভিনয় ক্ষমতায় উদ্ভাসিত। অতীতের উপহসিত, অবহেলিত মুকুটহীন নায়ক আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বীয় প্রতিভায় যাত্রা সম্রাট। নিত্য নূতন ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী শান্তিগোপাল যাত্রায় নবজাগরণ এনেছেন, আশা রাখি, আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর অবিচল শান্তিগোপাল অনেক প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষার সঠিক দিশারীরূপে ভবিষ্যতে ইতিহাসের সাক্ষ্য রেখে যেতে সক্ষম হবেন।

—

দৈব আশীর্বাদের মত

দুর্গাপুজো হলো নানারাঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব। কিন্তু যাঁরা প্রতিমা গড়েন, উৎসবের অন্তরালে সেই মৃৎশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। ব্যবসার মরশুমে পুঁজির জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে। পরিশ্রমের অনুপাতে লাভ থাকে না।

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মৃৎশিল্পীদের সাহায্য করে আসছে। ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তাঁরা ব্যবসার মরশুমে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একসঙ্গেই কিনে নিতে পারেন। মাটি, খড়, রঙ, সাজপোশাক, অলঙ্কার—এসবি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো। পুজোর বিক্রির পর ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে হয়।

পুজোর সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-9-74B

"White Label"

Dewar's SCOTCH WHISKY

With best Compliments of :

THE PIONEER CHEMICAL WORKS

(A GOVT. CONTRACTOR)

P-130, C. I. T. ROAD,

CALCUTTA-700054

নট-নির্দেশক অরুণ দাশগুপ্ত

মা-মাটি-মানুষের একটি দৃশ্যে অরুণ দাশগুপ্ত ও বীণা দাশগুপ্তা

'সাংসারিক জীবনে আমরা দুজনেই সুখী, কারণ পারস্পরিক বোঝাপড়া আমাদের সম্পর্ককে নিবিড় ও সুদৃঢ় করেছে, বললেন অরুণ দাশগুপ্ত। ১৯২৮ সালে কলকাতার কুমারটুলি এলাকার এক অভিজাত পরিবারে অরুণ দাশগুপ্তের জন্ম, এরা চার ভাই ও চার বোন। ১৯৪৭ সালে বাগবাজার হাই স্কুল থেকে পাশ করে অরুণবাবু মণীন্দ্র কলেজে ভর্তি হন এবং কলেজে পড়াকালীন তিনি "মিলন সংঘের" সদস্য ছিলেন ফলে অভিনয় তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়ায়। নাট্য জগতে আসার কারণ সম্বন্ধে বললেন, এর মূলে রয়েছে আমাদের সংসারের আর্থিক অনটন, অভাবের তাড়নায় আমি যাত্রা জগতে প্রবেশ করি, আমার জীবনে অভিনয়ের নেশা অবশ্যার পারিপার্শ্বিকতায় পেশা হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬৪ সালে অরুণ দাশগুপ্ত নট্ট কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং সেই থেকে আজও অরুণবাবু নট্ট কোম্পানীর সাথে সম্মানের সংগে জড়িত আছেন পরিচালক ও প্রধান অভিনেতারূপে। আজ পর্যন্ত অরুণবাবু পঞ্চাশখানা নাটকে অভিনয় করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন সর্বসমেত বুড়িখানা, এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে তিনি দিশারী পুরস্কার লাভ করেছেন। চলচ্চিত্র অভিনয় সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এখনও চিন্তা করেন নি। অরুণবাবু মারফত জানতে পারলাম নট্ট কোম্পানীর বয়স প্রায় একশ বছর এবং বর্তমানে ষাটজনের মতো সদস্য রয়েছেন। আসাম, ত্রিপুরা ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে নট্ট কোম্পানী অভিনীত যাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে নট্ট কোম্পানীর পরিচালনায় নন্দকুমারের ফাঁসী, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি নাটক প্রস্তুতির পথে। পারিবারিক জীবন যাত্রায় ও নাট্য-জগতে অরুণ দাশগুপ্ত ও বীণা দাশগুপ্তা একে অপরের সুযোগ্য সাথী। ১৯৪৬ সালে ফরিদপুরে বীণাদেবীর জন্ম এবং কৈশোরকাল থেকেই নাটক, থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতির প্রতি ওর উৎসুক ও গভীর ভালবাসা ছিল এবং তারই ফলে ইতিহাসের নটী বিনোদিনীকে বাস্তবে এসে বীণা দাশগুপ্তা ঐ চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। পশ্চিমবাংলা সরকার কর্তৃক তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

শিল্পী বললেন, ...সাংবাদিক আমি লিখছি... লেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করছি.....উত্তর পাচ্ছি...

প্রশ্নঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিল্পী সাহিত্যিকদের কি কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। থাকলে সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ কেমন করে পাওয়া যেতে পারে—আপনি পেয়েছেন ?

উঃ নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে, আত্মসচেতন ব্যক্তি মাত্রই দেশ ও দশের কথা ভাবে ও চিন্তা করে এবং যাত্রা, নাটক ও থিয়েটারের মধ্যে এই সুযোগ বেশি পরিমাণে বিদ্যমান এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমি সে সুযোগ প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি।

প্রঃ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ এর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে ভারতবর্ষের শিল্পী সমাজ কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন—আপনার ধারণা ?

উঃ আমার মনে হয় জাতীয়তাবাদী চিন্তা বা ভাবধারা প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যে রয়েছে এবং এর প্রতিফলন যাত্রা, নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়েই হয়। প্রসংগত উল্লেখ করেন বিদ্যাসাগর যাত্রা-অভিনয়ের সময়ে উগ্রপন্থীদের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন তবে তারজন্য বিচলিত হননি বা অভিনয়ে পেছিয়ে পড়েননি।

প্রঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত দৃঢ় করা যায় কি ?

উঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের কথা চিন্তা করা অবাস্তব, একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে প্রথমে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন।

প্রঃ সাহিত্য বা শিল্পে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কি অগণতান্ত্রিক ?

উঃ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কখনই অগণতান্ত্রিক নয়, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

প্রঃ একজন শিল্পী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিরাসক্ত সব সময়। কিন্তু শিল্পী তার নিজের সম্পর্কে সচেতন।

উঃ নিজের সম্পর্কে ভাববার বা চিন্তা করবার অবসর মেলেনি তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজের কাজের জন্য বোকা বনে যেতে হয়েছে।

প্রঃ সিনেমা শিল্পে অশ্লীলতা কতদূর প্রযোজ্য ?

উঃ আমার মতে যাত্রায় অশ্লীলতা সর্বাংশে বর্জন করা সম্ভব। নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তবতার জন্য হয়তো আংশিক প্রযোজ্য কিন্তু যাত্রার ক্ষেত্রে একে পুরোপুরি বাতিল করা সম্ভব।

খাতা কলম ঝোলায় পুরে ফেললাম, বললাম আর নয় এবার চলি। আমার জন্য আপনাদের Sound of music দেখা হলো না। স্মিত হেসে অমায়িক ও রসিক অরুণ দাশগুপ্ত বললেন, হ্যাঁ, আর বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখতে হতে পারে—উভয়ের প্রাণখোলা হাসিতে আমিও তাতে সরবে যোগদান করলাম, ...বাইরে এলাম...আগামীদিনের কথা ভেবে এগিয়ে চললাম।

মুক্তি আসন্ন.....

সৌমিত্র, অপর্ণা, বসন্ত, শেখর, দিলীপ, অনুপ,
কাজল ও উৎপল দত্ত অভিনীত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের —

"নিশি মৃগয়া"

পরিচালনা—দীনেন গুপ্ত
সঙ্গীত—হেমন্ত মুখার্জী
চিত্র নাট্য—কুনাল মুখার্জী
পরিবেশনা—মোক্ষদা ফিল্মস্

ফোন : ২১-২৫৬৫

ময়দানের শংকর

হুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললাম, একটু বিরক্ত করতে এলাম. আশা করি কিছু মনে করবেন না। প্রতিনমস্কার জানিয়ে কিছুটা অনুসন্ধিৎসা. কিছুটা ঔৎসুক্য নিয়ে শংকর ব্যানার্জি বললেন. বিন্দুমাত্র না. তবে আগমনের হেতুটা বুঝতে পারলে কৌতূহলের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম। হাসিমুখে বললাম, আমার হাতের কাগজ কলম দেখেই আশাকরি বুঝতে পারছেন আগমনের হেতু। সাংবাদিক মানুষ. নিছকই আপনার খেলোয়াড় জীবনের সংবাদের আশায় এসেছি। স্মিত হেসে শংকর ব্যানার্জি বললেন যতদূর সম্ভব আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তবে প্রশ্ন করলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়, মনে হয় এতে আপনারও সুবিধা হবে। তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম নিশ্চয়ই, একটু থেমে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের ভীড় ঠেলে বললাম, তাহলে শুরু করি। বললেন করুন।

প্রঃ—আপনার খেলোয়ার জীবন কবে শুরু হয়? কোন ক্লাবে প্রথম খেলেন?

উঃ—কৈশোরকাল থেকেই আমার খেলোয়াড় জীবনের হাতে খড়ি, স্কুলে পড়াকালীন রাধানগর হাইস্কুলের হয়ে খেলে ১৯৬৩ সালে রাণী রাসমণি স্কুলকে ফাইনালে হারিয়ে সুব্রত মুখার্জি কাপে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। এরপর থেকে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে আমার খেলোয়াড় জীবনের গতি শুরু হয় ১৯৬৬ সালে হাওড়া ইউনিয়নে ও ১৯৬৭ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলি। ১৯৬৮ থেকে ৭ সাল অবধি ইষ্টবেংগল ক্লাবের হয়ে খেলি ও তারপর ১৯৭১ সাল থেকে বর্তমানে ৭ সাল পর্য্যন্ত মোহনবাগানের হয়ে নিয়মিত খেলছি।

প্রঃ—কোন খেলা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে? খেলার জীবনে আপনার গুরু কে?

উঃ ১৯৭১ সালের আই এফ-এ শীল্ডের খেলায় ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়লাভ করে. ঐ খেলায় আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং অনস্বীকার্য যে ঐ খেলাটিই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় খেলা। একটু থেমে বললেন. আমার খেলোয়াড়ী জীবনের প্রেরণা আমি বলাইদা অর্থাৎ বলাই মান্নার কাছ থেকে পাই, ওর কাছে আমি চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

প্রঃ—বর্তমানে খেলোয়ারদের সুযোগ সুবিধা ও খেলার মান অতীতের থেকে অবনত না উন্নত?

উঃ আমার কাছে মনে হয় অবনত অতীতের খেলোয়াড়েরা ছিলেন এক একজন দিকপাল এবং নিজেদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং সময়মতো দলের কার্যকরীমুহূর্তে যোগ্যতর ভূমিকা নিতে কসুর করতেন না, কিন্তু বর্তমানে এর ঠিক বিপরীত আমরা দেখতে পাচ্ছি. এখন খেলোয়াড়েরা নিজেদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না, নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সবসময়েই সন্দিহান। ফলে একে অপরের উপর বড় বেশি নির্ভরশীল, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত অতীতের সেই খেলার art or style এখন নেই বললেই চলে! খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বলতে গেলে কতকগুলি দিকের উল্লেখ না করে পারছি না। আমরা মাঠে নামছি এবং খেলছি কিন্তু আমাদের নানারকম সমস্যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারছি না ফলে বর্তমানে খেলোয়াড়রা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষা ক'রেই চলেছেন,

বাঁচার তাগিদে খেলছেন কিন্তু ভাল উন্নত ধরনের ক্রীড়া প্রদর্শন করতে পারছেন না। এইসব সমস্যাগুলির জন্য ক্রমশঃ আমাদের আন্তর্জাতিক মান নিচুর দিকে চলে যাচ্ছে, standard of living যদি satisfactory হয় তবে আপনা-থেকেই খেলার মানও বাড়বে। খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের নিজেদের চরিত্রের প্রতি নজর রাখতে হবে। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্ত মানসিকতা ব্যতীত ভাল খেলা সম্ভব নয়। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন ও সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন হন তবে স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায় খেলোয়াড়ের নিজস্ব মান অনেক বেশী উন্নত হবে। তবে বর্ত্তমানে সরকার এর প্রতি যথেষ্ট নজর দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা খেলোয়াড়েরা আশা করব আরও বেশি সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমরা পাব ও নিজেদের আরও ভালভাবে তৈরী করতে পারব।

প্রশ্ন : খেলোয়াড় জীবনে আপনি কতবার বিদেশ গেছেন ?

উত্তর : Pre অলিম্পিক খেলতে গিয়েছি ১৯৭২ সালে আর ১৯৭৬ সালে ইন্দোনেশিয়া গেছি।

প্রশ্ন : কলকাতায় ষ্টেডিয়াম হতে বাধা কোথায় ?

উত্তর : কোথাও নয়, সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতা ও সর্ব্বোপরি জনগণের অর্থাৎ যারা খেলাপাগল তাদের অনুপ্রেরণা সক্রিয় ভাবে পেলেই নিশ্চয়ই একদিন কলকাতায় ষ্টেডিয়াম তৈরী হবে

প্রশ্ন : পশ্চিমবাংলায় রেফারি ও লাইন্স-ম্যান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

উত্তর : রেফারি বা লাইন্সম্যানের ক্ষেত্রে দু একজন ছাড়া পরিচালনার মান আমাদের দেশে রেফারিদের শারীরিক পটুতা অত্যন্ত কম থাকার দরুন ওরা বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে পারেন না ফলে খেলার গতি অনেকক্ষেত্রেই ব্যাহত হয় ও এরজন্য খেলোয়াড়দের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রের মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়। আশাকরা যায় ভবিষ্যতে এর উন্নতি সম্ভবপর হবে।

প্রশ্ন : মাঠের উচ্ছৃংখলতা ও দক্ষ পরি-চালন ভার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

উত্তর : আমার মনে হয় এসবই যুগের হাওয়া। একটা অনস্বীকার্য্য অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষ পরিচালনার অভাবে উচ্ছৃংখলতা হয় তবুও ওটা এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতা বলেই মনে হয়।

একটানা অনেক গুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একালের জনপ্রিয় খেলোয়াড় শংকর ব্যানার্জি। সদালাপী, সদা-হাস্যময় শংকর ব্যানার্জী খেলোয়াড় নির্বিশেষে সকলের প্রিয়। বর্ত্তমানে Central Bank of India-তে চাকুরিজীবি। অনেক আশা অনেক আকাংখা ওর মনে, দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছেন এই তরুণ, আশা রাখি আশা রাখব অমায়িক শংকর ব্যানার্জী খেলোয়াড় জীবনে আরও বেশি সাফল্য লাভ করবেন ও ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের সঠিক পথের সঠিক দিশারী হবেন।

ভলি-পটীয়সী তপতী মণ্ডল

এ বছর ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া সাংবাদিকদের বিচারে নৈহাটী এথলেটিক ক্লাবের কুমারী তপতী মণ্ডল নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের ছেলে এবং মেয়ে ভলিবল খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভলিবল খেলোয়াড়। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে অভিনন্দন জানাই তপতীকে তার এই সম্মান লাভের জন্য।

২৪ পরগণা জেলার নৈহাটীতে ১৯৫৭ সালে তপতীর জন্ম। এক ভাই ও তিন বোন, বোনেদের মধ্যে অবশ্য তপতীই বড়। বাবা শ্রীতুলসী চরণ মণ্ডল সামান্য রোজগার সত্ত্বেও প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে আসছেন তপতী ও তার বোনেদের পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধূলা ও গান-বাজনার চর্চ্চায়। তপতীর ছোট বোন তনুশ্রী দিদির মত খ্যাতি লাভ না করলেও ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যদলের হয়ে সর্বভারতীয় গ্রামীন ভলিবল প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করেছে। এ বছর রাজ্য মিনি ভলিবল দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে যাচ্ছে হায়দ্রাবাদে। এই হায়দ্রাবাদেই জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগীতায় ১৯৭৪ সালে তপতী ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যদলের অধিনায়িকা এবং ফাইনালে কেরালাকে হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্মান এনে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকে।

১৯৬৯-৭০ সাল থেকে তপতী নিয়মিত খেলে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যদলের হয়ে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগীতায়। ইতিমধ্যে অবশ্য দুই বার আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ এসেছে তপতীর। প্রথম সিংহল এর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় বার প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ১৯৭০ সালে। দুবারই তপতী ভারতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় ভারতের মেয়েদের খেলার মান কি রকম—এ কথা জিজ্ঞাসা করতে তপতী একটু হেসে উত্তর দিল—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় যোগদানের সুযোগ আমাদের কোথায়—গত Asian Games এ তেহেরানে যাবার জন্য ভারতীয় মেয়ে দল তৈরী হলো। ভারতীয় দলে নির্বাচিত হলাম। অনেক আশা নিয়ে অনুশীলন করেছিলাম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের মেয়ে দলকে পাঠান হলনা। এ বছরও অষ্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত Asian Volleyball Championship এর জন্য ভারতীয় দলের নির্বাচন হল, নির্বাচিত হলাম ভারতীয় মেয়ে দলে খেলবার জন্য, কিন্তু এবারও ইতিহাসের পুনারবৃত্তি—ভারতীয় দল গেলনা। কাজেই আমাদের ভারতীয় দলের ক্রীড়ামান আন্তর্জাতিক আসরে পরখ করার সুযোগ নেই বলাই চলে। তবে প্যারিস-এর মেয়েদের খেলা যা দেখেছি, তাতে বলতে পারি যে তাদের খেলার মান আমাদের চেয়ে উন্নত এবং শারীরিক পটুতাও অনেক বেশী। তবে আমাদের অনুশীলনের সাজ সরঞ্জাম ও সুযোগ কোথায় —বেশ আক্ষেপের সঙ্গে বলল তপতী: নইলে দেখুন

ধন্যি মেয়ে

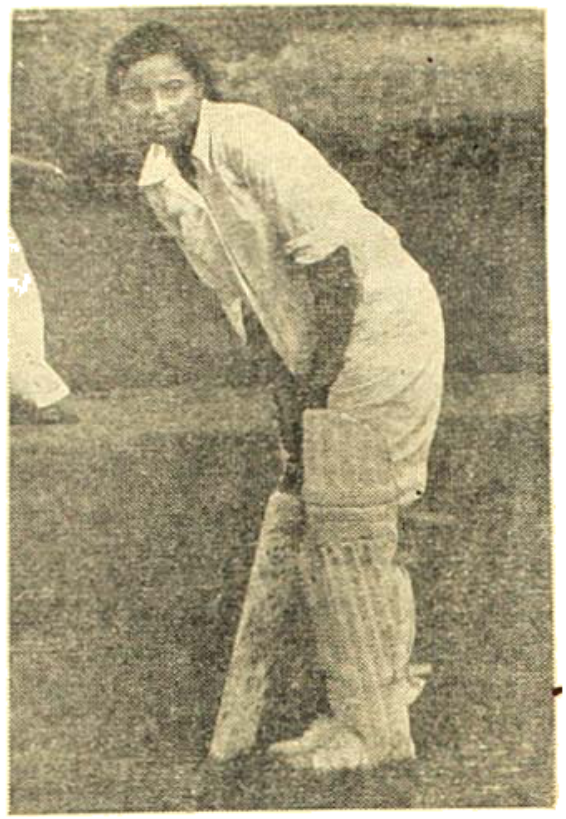

জাপানের মেয়েরা কি করে শুধু অধ্যবসায় এবং অনুশীলনের সুযোগেই প্রতিষ্ঠা করল নিজেদের—আন্তর্জাতিক ভলিবল জগতে—১৯৬৪ সালে সবাইকে হারিয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করল। কথাগুলি বেশ দৃঢ়তা এবং নিজের উপর বিশ্বাস রেখেই তপতী বলছিল।

কবে থেকে তুমি ভলিবল খেলছ এবং কার কাছে তোমার ভলিবলে হাতে খড়ি—এ প্রশ্নের উত্তরে তপতী জানায়—১৯৬৭ সালে কলকাতায় ইডেন উদ্যানে জাতীয় ভলিবলের আসর বসেছিল। নৈহাটী ক্লাবের কোচ শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস হাত ধরে নিয়ে এলেন কলকাতায় আমাদের কয়েকটি মেয়েকে Volleyball National দেখাতে। পাঞ্জাব অন্ধ্রপ্রদেশ, এদের খেলা দেখে এত ভাল লাগল যে নৈহাটী ফিরে গিয়ে ঠিক করলাম আমরাও ভলিবল খেলব। সেই ১৯৬৮তে খেলা শুরু করি। খেলায় হাতে খড়ি শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাসের এর কাছে।

ক্রিকেট ফুটবল ইত্যাদি অন্য অনেক খেলা ছেড়ে ভলিবল তুমি বেছে নিলে কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে তপতী একটু চিন্তা করে জানাল ভলিবল আমার ভাল লাগে তাছাড়া এ খেলায় শারীরিক পটুতা অন্য অনেক খেলার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়। এ খেলায় খেলোয়াড়দের দৈহিক সংঘর্ষের অবকাশ না থাকায় আঘাত বা Injury র সম্ভাবনা খুব কম এ কারণেই আবার মনে হয় ভলিবল খেলা মেয়েদের পক্ষে আনন্দ এবং উপযুক্ত খেলা। তাছাড়া তপতী জানাল যে Table Tennis-ও তার খুব প্রিয় খেলা। ভলিবলের সঙ্গে সঙ্গে সে Table Tennis খেলে। গত আগষ্ট মাসে W.B. Sports Council আয়োজিত Table Tennis Coaching Camp-এ তপতী তালিম নেয় Table Tennis কি করে খেলতে হয়। তাছাড়া গান ও নাচ তপতীর নিত্য সঙ্গী, বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের খুব ভক্ত তপতী।

প্রশ্ন করেছিলাম তপতীকে—তোমার এই সাফল্যের জন্য তুমি কার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছ মনে কর—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—আমার ক্লাব—নৈহাটী এ. সি। প্রফুল্ল সেন বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী তপতী মণ্ডলের সঙ্ঘের প্রতি তার এই আনুগত্যে মনে হল ভবিষ্যতের সব প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে সে আরও সাফল্যের পথে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে।

Builders :

ASHOKA MARKETING LTD.

11, CLIVE ROW CALCUTTA 700 001

আমি ক্লান্ত

মায়াময়ী ছায়া দেবী

শিয়ালদাই পাড়া দিয়ে ঢুকে একটু এগোলেই বাঁ হাতে একটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান চোখে পড়ে। দোকানের সামনে অনেকগুলি গাড়ী দাঁড়িয়ে। বুঝতে অসুবিধা হল না সংবাদের খবের সামনাতে মালিক আজ হিসিস্ খাচ্ছে। দোকান ছাড়িয়ে বাঁ হাতে মোড় নিতেই মদন ঘোষ লেন। পুরাণ পাড়া, এককথায় বলতে গেলে কলকাতার অন্যতম বনেদী পাড়া, খুঁজতে খুঁজতে ১০নং বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, ভেজান দরজা ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই চোখের সামনে আর একটি এসে পড়ল। একটু ধমকে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা মারলাম। ভিতরে নূপুরের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। ক্রমশই এলেন নূপুরের পদধ্বনি এগিয়ে আসতে লাগল। এগিয়ে একটি মেয়ে। এক কথায় সুন্দরী রুচিসম্পন্না। পরণে মুর্শী ও কুর্তা, মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কাকে চাই'? দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই যেন একটা নাটকীয় ভাব ছিল। উত্তরে বলেছিলাম—'ছায়াদেবী আছেন?' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—'কোথা থেকে আসছেন?' এর পরে নিজের পরিচয় দিতেই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম, মনেহী আমলের সুসজ্জিত ড্রইং রুমে প্রবেশ করলাম। কিছুক্ষণ বাদেই উচ্চশিক্ষিতা, অভিজাত এবং প্রভাবশালী হারাধন গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ছায়াদেবী প্রবেশ করলেন। প্রীতি নমস্কারের পালা শেষ করে নিজের কাজের কথা তুলতেই ছায়াদেবী, হেসে বলে উঠলেন—তুমী এখন ঘাটে কেরার দিকে আর কেন। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম—বাংলার মানুষ এখনও আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করে। মিষ্টি হেসে স্মৃতিচারণ শুরু করলেন তিনি। আমিও তার স্মৃতিচারণকে কলমের টানে প্রকাশ করতে লাগলাম।

১৯২১ সালে ভাগলপুরের রাজবাড়ীতে জন্ম। পিসিমার কাজেই মানুষ। বাড়ীর সবাই ডাকত কনক বলে। প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু হয় ভাগলপুরের মোক্ষদা গার্লস স্কুলে। এখানে কিছু দূর লেখাপড়ার পর বাবার সঙ্গে চলে আসি দিল্লীতে। ওখানকার ইন্দ্রপস্থ গার্লস স্কুলে ভর্তি হই। পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী মাত্র এগারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসার করা হয়নি। এ আমার ভাগ্যের লিখন। ক্লাস টেনের ছাত্রী যখন সেই সময় বাবার সঙ্গে চলে আসি কলকাতায়। সঙ্গীতে তালিম নিয়ে থাকি ওস্তাদ দে'র কাছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির ম্যানেজার উপেন মোহাদী ছিল আমার বন্ধু। তাঁরই সহযোগিতায় আমাকে 'সোণার সংসার' ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ করে দিলেন, ১৯৩৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে অভিনয় করে শুধু খ্যাতিই নয়, সোণার মেডেলও পেয়েছিলাম। এরপর অভিনয় করি পথের শেষে, রজনী, প্রভাস মিলন, ছিন্নহার, বাঙ্গা বৌ, খনা, হাল বাংলা রিক্তা, প্রতিশোধ এবং বাঙলা ও হিন্দীতে চিত্রায়িত দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি' ছবিতে, এর মধ্যে 'বাঙ্গা বৌ' ও 'হাল বাংলা' ছবিতে গানও গেয়েছিলাম। মাঝখানে ছবির জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই ভাগলপুরে এবং রামোদর মিশ্রের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নিই। ও উচ্চাঙ্গ নৃত্য শিক্ষা করি খ্যাতনামা নন্দু মহারাজের কাছে। এই বলে থামলেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম—'এ পর্যন্ত কত ছবিতে অভিনয় করেছেন আপনি?' একটু ভেবে উত্তর দিলেন—'ঠিক কত হবে মনে নেই। তবে কিছু কিছু মনে আছে। দেবকী বাবুর রামানুজ, উত্তরা - অভিমন্যু, থেকে শুরু বর্তমানে নগর-দর্পণেও আমি আছি। বর্তমানে ঘোমটা, রাজরক্ত শুটিং পথে। গর্বের সঙ্গে বলে ওঠেন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে এসেছি পুরস্কার রাজা রামমোহন ছবিতে মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য। এছাড়া রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি ঘরোঠাকুর, রাজা রামমোহন, আরোগ্য নিকেতন, আপনজন প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করার জন্য।

প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম—'পশ্চিম বাংলার হিন্দী ছবির ভীড় বন্ধ করার উপায় কি'? একটু ভেবে ছায়াদেবী বল্লেন—'পশ্চিমবাংলা হিন্দী ছবি তৈরী করে এর প্রতিকার করা যাবে। বহুকাল এই প্রথা ছিল। আমি বলে উঠলাম—'দিল্লীরা যে কালে টাকা নেন

এটা কি সত্যি, নিলে বন্ধ করার উপায় কি ?" উত্তরে বলে উঠলেন—'কালো টাকা মেন কিনা ঠিক জানিনা। তবে কালো টাকা বন্ধ করার উপায় হল প্রযোজকদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অশ্লীলতার প্রশ্ন তুলতেই প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন—'এ ভাই সরকার ছাড়া পারবেনা'। 'সেনসার' যত শক্ত হবে, তত বেশী শিল্পে নৈরাজ্য বন্ধ হবে। ভাবলেও অবাক লাগে সস্তায় পয়সা করার জন্য মানুষের রুচির 'বারোটা' কি ভাবে বাজছে। প্রশ্ন উত্তরের পালা শেষ করে কলম বন্ধ করতে যাচ্ছি ছায়াদেবী বলে উঠলেন বসুন আসছি। একটু বাদেই ঠাণ্ডা সরবৎ নিয়ে ঢুকলেন ছায়াদেবী। ইতিমধ্যে পুনরায় ভেসে উঠল মৃদুস্বরে সরস্বতি। সরবতে চুমুক দিতে দিতে দেখলাম পূর্বের সেই মেয়েটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে। ছায়াদেবী আলাপ করিয়ে দিলেন আমার ভাইঝি ঝুমুর গাঙ্গুলি। ঝুমুর হাত তুলে নমস্কার করতেই বলে উঠলাম—'আপনার বই দেখেছি', নূতন কি বই করছেন ? ঝুমুর বলে উঠল—বাংলা দেশে ছবির কাজে' শুটিং করে এলাম। কলকাতায় হারমোনিয়াম ও দো-কল্প-ক্যাথারে অতিথি শিল্পী হিসাবে আছি।

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে আসছিলাম ছায়াদেবী বলে উঠলেন—'আবার আসবেন। দয়া করে এক কপি বইও আনা চাই।"

With Compliments from

NATIONAL INSTRUMENTS LTD.

(A Government of India Enterprise)

RAJA SUBODH CHANDRA MULLICK ROAD,
C A L C U T T A - 3 2

Telex : NIL-CA. 3339

Manufacturers of :

Surveying Instruments — Drawing Instruments
Gptical Instruments — Meteorological Instruments
• Pressure & Vacuum Gauges
AND
Infra Red Night Vision Sighting Instrument for Defence

Regional Sales Offices
at
BOMBAY MADRAS — CUTTACK — NEW DELHI

PIONEER IN OPTICS BASED INSTRUMENTS

সবার প্রিয় গৌতম

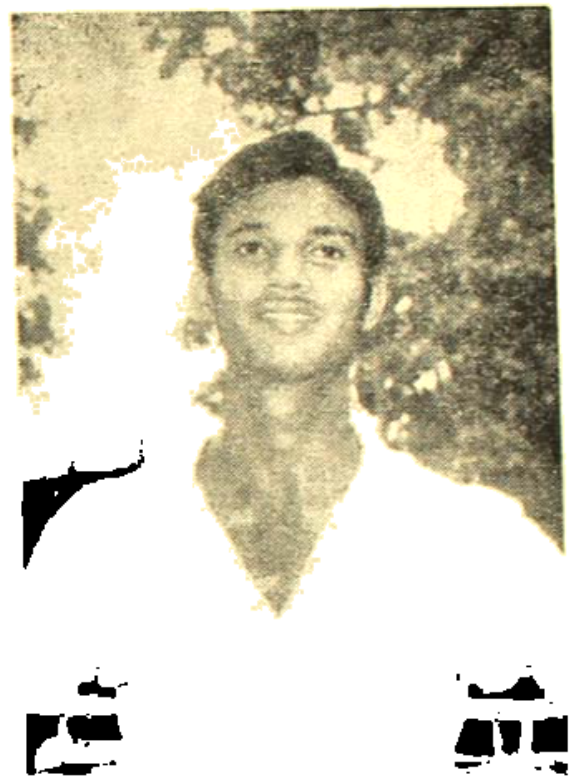

সেদিন সকালে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম, টাকা-পয়সা লেনদেনের কাজে নয়। আজকের ইস্টবেঙ্গলের অসম্ভব জনপ্রিয় খেলোয়াড় গৌতম সরকারের কাছে। আমার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করে তিনি হাসি মুখে জবাব দিলেন—'চলুন একটু ফাঁকায় গিয়ে বসি, তাহলে বোধহয় আপনার কাজের সুবিধা হবে।' প্রশ্ন-উত্তরের পালা শুরু করার আগে তার কাছে স্বল্প কটি কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিলেন—'পৈত্রিক ভিটে বাংলা দেশের ঢাকায়। কিন্তু জন্ম, শৈশব, কৈশোর সবই কেটেছে এই পশ্চিম বাংলার আসানসোলে। আমার বাবা শ্রীমাখন সরকার আসানসোলে টেলিফোন বিভাগে কাজ করতেন, বাবা খেলাধুলায় বেশ ভালই ছিলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুটোই খেলেছেন। খেলাধুলার উৎসাহ আমি বাবার কাছ থেকেই পাই। একটু থেমে বললেন—'বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? প্রশ্ন করলাম—"আপনার খেলোয়াড় জীবন কবে শুরু হয়? কোন ক্লাবে প্রথম খেলেন?" একটু ভেবেই উত্তর দিলেন—"আমি ১৯৬৪ সাল থেকে খেলোয়াড়ী জীবন শুরু করি। প্রথম আমি I.F.A. Affiliated third division ক্লাব জোড়াবাগানে খেলি। আবার প্রশ্ন করেছিলাম—"কোন খেলা আপনার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে খেলার জীবনে আপনার গুরু কে? উত্তরে বলে উঠলেন—১৯৭২-এ East Bengal Mohamedan sporting charity খেলাটাই আপাততঃ স্মরণীয় হয়ে আছে। খেলার জীবনে আমার তিন-চারজন গুরুস্থানীয় আছেন। যাদের অবদানের কথা আমি কখনই অস্বীকার করতে পারব না। তাদের মধ্যে প্রথমের—নিখিল নন্দী, অচ্যুৎ ব্যানার্জী, সুশীল ভট্টাচার্য এবং প্রদীপ ব্যানার্জী। তবে এদের মধ্যে প্রদীপ ব্যানার্জী আমার জীবনে সবচেয়ে সার্থক কোচ। এর পর আমার প্রশ্ন ছিল—অলিম্পিক খেলার মান রাখতে কি কি করা উচিত ও রাষ্ট্র খেলা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? একটু চিন্তিত হয়ে বলে উঠলেন—আমার কাছে এটা দারুণ জটিল প্রশ্ন। কারণ অলিম্পিক খেলার মান রাখতে অর্থাৎ অলিম্পিকের সোপানে পৌঁছাতে আমাদের যা যা করা প্রয়োজন বা আমাদের যা পাওয়া দরকার তার কোনটাই আমরা করি না বা পাই না। তাই সর্বপ্রথম আমাদের Asian Games প্রতিযোগিতার কথা ভাবা উচিত। কারণ Asian Middle-east Countryগুলো যে ভাবে Progress করছে, তাদের সাথে পাল্লা দিতে আমাদের যে প্রস্তুতি দরকার তার অর্ধেক আমরা করতে পারি কিনা সন্দেহ আছে। Indian Soccer টিমের হয়ে বিদেশে International Football খেলে আসার পর আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা

থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে আমাদের পক্ষে এই Poor training করে বিদেশের মাটিতে কোন মর্যাদা রাখা সম্ভব নয়। এছাড়া during training period এ আমরা যে সমস্ত trouble face করি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অতএব আন্তর্জাতিক খেলার পূর্বে আমাদের Asian games এ Successful হওয়ার জন্য বর্তমান ভারতীয় সরকারকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। Flood light ফুটবলের আসর জমানোর আগে আমাদের সর্ব প্রথম একটা কথা ভাবা উচিত। তবে এটাও ঠিক stadium এর সাথে সাথে Flood-light খেলার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কারণ Afternoon Match এ আমরা যতটা ক্লান্তি বোধ করি তার বেশীর ভাগই কম বোধ হয় Flood-light এ।

অতএব কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় যদি Flood-light এ খেলার প্রচলন হয় তবে খেলার মান আশা করি কিছুটা উন্নত হবে এবং ভারতীয় ফুটবলের প্রসার ঘটবে। এর পর আবার প্রশ্ন করেছিলাম—কলকাতায় স্টেডিয়াম হতে বাধা কোথায়। উত্তরে বলে উঠলেন—ঠিক কোন দিক দিয়ে বিচার করে এই প্রশ্ন আমায় করেছেন জানি না তবে সব দিক দিয়ে পর্যালোচনা করে আমার মনে হয় এই প্রশ্ন এবং উত্তর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই করা বা দেওয়া উচিত। উত্তর শেষ না হতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচ্ছা বলুন তো—"পশ্চিমবাংলার রেফারী ও লাইনসম্যান সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? মাঠের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দক্ষ পরিচালনার সম্বন্ধে বর্তমানে আপনার মতামত কি? বেশ একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলেন—বর্তমানে "I. F. A." যে সমস্ত রেফারীর উপর ছোট এবং বড় খেলার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তা হয়ত বিশেষ ক্ষেত্রে সঠিক হয় না। কারণ সাধারণ রেফারীর খুবই সামান্য ভুলের জন্য খেলার মধ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হয়। অবশ্য বিপরীত ক্রমে আমি এ কথাও বলব যে আমাদের I. F. A. রেফারী ও লাইনসম্যানদের উপর যে গুরুদায়িত্ব দেন, সেই দায়িত্ব তারা যদি সঠিক-ভাবে পালন করেন তবেই খেলাগুলো সুসম্পন্ন হবার আশা থাকে, আর মাঠের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দক্ষ পরিচালনার জন্য আমি আমাদের ক্রীড়ানুরাগীদের কাছ থেকে ঠিক যতখানি সহযোগিতা আশা করি, রেফারী লাইনসম্যান, পুলিশ, কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের সতীর্থদের কাছ থেকেও আমি অনুরূপ ব্যবহার আশা করব। এরপরই আবার প্রশ্ন করলাম—"বর্তমানে খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা ও খেলার মান অতীতের থেকে অবনত না উন্নত? একটু ঠিক হয়ে বসে বলতে লাগলেন—খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে প্রথমেই বলতে হয় যে বর্তমানে আমরা যে Monthly help পাই তার অঙ্ক প্রায় অতীতের খেলোয়াড়দের থেকে অনেক বেশী, কিন্তু তার valuation অনেক কম। এটা মনে রাখা উচিত যে আমাদের খেলোয়াড়ী জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রথম ও প্রধান বিষয় শুধু টাকাই নয়। কারণ স্বাস্থ্যকে অটুট না রাখলে কোন খেলোয়াড়ই একটা নামী team এ পাঁচ-ছয় বছরের বেশী পূর্ণ মর্যাদায় খেলতে পারে না। এই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ভাল ও উৎকৃষ্ট খাবার এবং যার অভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। তাই টাকা বেশী হলেও এই Real food পাওয়া খুবই দুষ্কর। কিন্তু কয়েকজন সীমিত খেলোয়াড় ছাড়া সাধারণ খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এই food Problem টা আরো মারাত্মক। এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় সুযোগ হচ্ছে Service এর ক্ষেত্রে। অবশ্য সেখানেও Gradually আসন সংখ্যা কমে আসছে। সুতরাং আমাদের অসুবিধা সম্পর্কে লিখতে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে।

এইবার খেলার দিক দিয়ে বিচার করে বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের Regular practice এর কথা। কিন্তু এখানকার game system এ রকম ধরনের যে আমাদের বছরের সব সময় নানারকম tournament এ

অংশগ্রহণ করতে হয়, তাই বর্তমানে নানারকম সুবিধা এবং অসুবিধার মধ্য দিয়েই আমাদের খেলাধুলো করতে হয়। একজন খেলোয়াড় হয়ে কখনই বলব না যে বর্তমানে খেলার মান অতীতের থেকে অবনত হয়েছে। খেলোয়াড় সুলভ মন নিয়ে একথা ভাবলে প্রত্যেকেই হয়তো আমাদের সাথে একমত হবেন। আজ খেলায় System এ আমূল পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু অতীতে Two-back system এ খেলা হতো। সেখানে Forward or Centre-half দের Indivdual performance দেখানোর scope যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু এখন 4-3-3 or 4-2-4 system এর খেলায় এবং Man to Man খেলার জন্য Individual game এর থেকে সম্পূর্ণ দলের খেলাই প্রধানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেখানে প্রতিটি Player কেই Exact line এ বল distribute করা ছাড়া খুবই তৎপর থাকতে হয়। তাই সর্বদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে বলব খেলার মান উন্নত বই অবনত হয়নি।

সবশেষে প্রশ্ন করলাম আচ্ছা গৌতমবাবু—"খেলোয়াড় জীবনে আপনি কতবার বিদেশে গেছেন? আর এই আপনার অবসর সময়ে কিভাবে কাটে বা আপনার হবি কি? একটু হেসে উত্তর দিলেন—আমি ভারতের হয়ে পর্যায়ক্রমে পাঁচবার বিদেশ সফর করেছি। সময়ের অবসরে আমি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন sports and games এর Topics পড়া ছাড়াও Indoor game এ অংশ গ্রহণ করি। আমার প্রধান হবিই হচ্ছে—To over the opponence in Soccer.

প্রশ্ন উত্তরের পালা শেষ করে ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান সহ-অধিনায়ক গৌতম সরকারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ছোট-খাট মাপের দেহ গৌতমের, কিন্তু খেলার মাপটি রীতিমত বড়সড় গৌতমের সংগ্রামী ফুটবল কলকাতার মাঠে এক পরিচিত বস্তু। এই সাহস, সুন্দর ও সংগ্রামী ফুটবলের চাবিকাঠিটি দিয়েই দর্শক মনের মধ্যে তার সহজ প্রবেশ সম্ভব হয়েছে এবং অতি সহজেই সবার হৃদয় জয় করেছে। ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ লক্ষ অনুরাগী দর্শকের আজ নয়নের মণি গৌতম। 'টাগেট' দৈহিক বাধাকে ছাপিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। ফুটবলে এখানেই, বাধা বাধ আক্রমণকে প্রতিরোধ করা এবং ডিফেন্স-অফেন্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ছাড়াও প্রয়োজন ও সুযোগের ক্ষেত্রে গৌতমের সার্থক আক্রমণাত্মক ভূমিকা কলকাতা মাঠের অগণিত দর্শক বহুদিন মনে রাখবেন।

Puja Greetings

★

HINDUSTHAN GENERAL SALES AGENCY

Sole Selling Agents for **JAYKAY SOAPS**

200-V, SHYAMA PROSAD MUKHERJEE ROAD,

CALCUTTA-700026